শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বর্ষ ২২ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

জননী

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

চিঠিপত্র শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

১

বৌমা, আজ মেজবোঠানকে লিখে দেব পঞ্চামৃত প্রভৃতি উৎপাত করবার কোনো দরকার নেই। মিছামিছি ওঁকে এত খরচ করিয়ে কি হবে।

রথীকে কাল লিখেছি যে যদি জাহাজেই চড়তে হয় তাহলে ২২ দিনের জন্যে সমুদ্রের ধাক্কা খেয়ে এসে লাভ কি? একেবারে জাপানে গিয়ে কিছু দেখেশুনে এলে তবু কষ্ট ও খরচপত্র সার্থক হয়। কি বল বৌমা! যে দেশে মানুষ নেই কেবল আনারস আছে সে দেশে গিয়ে কি হবে? রথীকে বোলো কলম্বো দিয়ে একটা জাপানী ষ্টীমার জাপানে যায় তাতে গেলে বেশ আরামে যাওয়া যাবে— হয় ত সস্তাও হতে পারে। Family Party যদি একসঙ্গে যায় তাহলে অনেকটা concession পাওয়া যেতে পারে। সেটার খোঁজ নিতে পারে। তাহলে তোমার অনেক দেশ দেখা হবে— আর আমারও তিনমাস লম্বা ছুটিতে অনেকটা বিশ্রাম হতে পারবে। আর যদি তুমি ভাল মনে কর তাহলে Italian Steamerএ করে ইটালীর কোনো একটা মনোহর জায়গায় মাস দেড়েক বেশ নিভৃতে কাটিয়ে আসা অসম্ভব নয়। সেখানকার জলবায়ু খুব বেশি ঠাণ্ডা নয়…ভাল আঙুর ও সুখাদ্য ফল বিস্তর পাওয়া যায়। জাপানে রথীর কৃষিবিদ্যা আলোচনার সুবিধা আছে বলে জাপানের কথাই আমার মনে হয়েছিল। যা হোক্ তুমি তোমার ঠাকুরজামাইকে তোমার দলে টেনে নিয়ে হিসাবপত্র কষে যেটা ভাল মনে কর সেইটে ঠিক করে আমাকে লিখো। সিঙ্গাপুরে যেতে হলে ডাঙ্গার সম্পর্ক অত্যন্তই অল্প হয়— কেবলি সমুদ্র— সবসুদ্ধ পাঁচ ছয় দিনের বেশি ডাঙ্গা পাওয়া যাবে না— তাতে নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগ্‌বে। তীর থেকে সমুদ্র যতটা ভাল লাগে সমুদ্রের ভিতরে ততটা নয়— আমরা ত তিমি মৎস্য কিম্বা জলহস্তী নই সেইজন্যে ডাঙ্গার জন্যে নাড়িতে সর্ব্বদাই টান পড়ে।

রথীকে বোলো Encyclopœdiaর যে বইখানা ওখানে গেছে সেটা কলকাতায় আসবার সময় হাতে করে নিয়ে এলেই হবে। তোমাদের ওখানে পোঁতবার জন্যে অনেক বিলাতী নিমের চারা তুলিয়েছি কিন্তু কলকাতায় পাঠাবার লোক আজও পেলুম না। ওদিকে বর্ষা গেলে বোধ হয় কোনো কাজে লাগ্‌বে না। ইতি ২১শে ভাদ্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ [রেঙ্গুন]

বৌমা,

আজ রেঙ্গুন থেকে যেতে হবে। এখানে দুটো দিন বেশ কাট্‌ল। এখন মনে হচ্চে যদি অন্য কোথাও না ঘুরে এখানে কোনো গ্রামের বৌদ্ধমঠে ৩।৪ মাস কাটাতে পারতুম অনেক বেশি ভাল লাগত। ঘুরে বেড়ানো স্বপ্ন দেখার মত— তাতে কিছুই দেখা হয় না।

কাল এখানে আমার অভ্যর্থনা হয়ে গেল। খুব ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতা গান প্রভৃতি হয়ে গেল। রুপোর caskelগুলো তোমাদের পাঠাতে বলেছি— বেশ সুন্দর কাজ— বর্ম্মার লোকেরা হাতির দাঁত কাঠ আর রুপোয় খুব ভাল খোদাই করতে পারে। এখানকার লোকদের আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। আমার কেমন মনে হচ্চে জাপানের লোকদের আমার তেমন ভাল লাগ্‌বে না— তাদের মন বোঝা শক্ত হবে। আর কোথাও না যাই ত জাপান থেকে চীনে যাব।

তোমরা কে কেমন থাক মাঝে মাঝে খবর দিয়ো। মীরার জন্যে আমার মন একটু উদ্বিগ্ন রইল। আশা করি তুমি এতদিনে সেরে উঠেচ। মুকুল খুব মনের আনন্দে আছে।

আমাদের ঝড়ের বর্ণনা খবরের কাগজের cutting থেকে দেখ্‌তে পাবে। এমন ঝড় সচরাচর হয় না।

ঈশ্বর অন্তরে বাহিরে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাদের কল্যাণের দিকে নিয়ে যান এই আমি নিয়ত প্রার্থনা করি।

[২৬ বৈশাখ ১৩২৩]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

বৌমা খবর সমস্তই নানা লোকের নানা চিঠি থেকে পাবে। বিষম গোলমালের মধ্যে আমি কিছুই সময় পাইনে। কম টানাটানি চল্‌চে না। আমার আশীর্বাদ। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

বাবামশায়

৪

ওঁ

বৌমা,

আমেরিকায় পাড়ি দেবার মুখে সমস্ত চিঠির পালা সেরে নিচ্চি—সেখান থেকে দীর্ঘকাল লেখা সম্ভব হবে না। তোমাদের কাছ থেকেও অনেকদিন চিঠি পাইনি এবং পাবও না। সেইজন্যে আমার দেশটা আমার কাছে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেচে— এখানে যে দেশে এবং যাদের মধ্যে আছি তারাই যেন বড় হয়ে উঠেচে। তেমনি এখান থেকে আশ্চর্য্য আদর যত্ন পেয়েচি। প্রত্যেক ষ্টেশনে লোক জমে যায়— কেবল

কৌতূহল নয়— আন্তরিক ভক্তি। আমাকে জানেনা সমস্ত জাপানে এমন বোধ হয় একজনও নেই। এমনি করে এই বাইরের সংসারটার জন্যেই ঈশ্বর আমাকে অন্তরে বাহিরে নানারকম করে তৈরি করে নিচ্চেন। বিদায় হবার আগে এই বড় জগৎটাকেই সম্পূর্ণ আত্মীয় বলে আমাকে বরণ করে নিতে হবে।

মুকুলকে এইখানেই রেখে গেলুম। সবাই আশা দিচ্চে ও একজন বড় আর্টিষ্ট হতে পারবে। মিছিমিছি আমার সঙ্গে ওকে আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরিয়ে বেড়ালে ওর অনিষ্ট হবে। ওর বদলে আমার একজন জাপানী চেলা জুটে গেচে। এই ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লাগে। ইংরেজি অতি অল্পই জানে কিন্তু ক্রমে শিখে নিতে পারবে। সকল রকমে আমার সেবা করতে এর কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। হয়ত বা এ আমার একজন অনুচর হয়ে উঠ্‌তেও পারে। একদিন যখন এ কোনো জাপানী মেয়েকে বিয়ে করবে তখন সে আমার আরো সুবিধে হবে।

উমাচরণ কেমন আছে আমার জান্‌তে ইচ্ছে করে। তার ব্যামো কি একেবারেই সেরে গেছে? কিন্তু দেশে গিয়ে তাকে যদি আবার ম্যালেরিয়ায় ধরে তাহলে সে আর বাঁচবে না। রথীকে বোলো তাকে যেন ভাল রকম সাহায্য করে তার যেন খাওয়া পরা ও চিকিৎসার অযত্ন না হয়। অনেকদিন সে আমার সেবা করেচে। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ। ইতি ৮ই আগষ্ট [১৯১৬]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

শিলং জায়গাটা তোমাদের ভাল লেগেচে শুনে খুসি হলুম। ওখানে থেকে তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠুক এই আমি কামনা করি। কিন্তু আমার এখন কোথাও যাবার জোই নেই— শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় নড়াচড়া করতেও ইচ্ছা হয় না। এখানেও যতটা গরম পড়বার কথা তা পড়ে নি— মাঝে মাঝে একটু বেশি ঠাণ্ডা হঠাৎ দেখা দেয়। আমাদের এখানে বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের উৎসব হয়ে গেল। এবারে কলকাতা থেকে বেশি কেউ আসে নি— কেবল প্রশান্ত আর কালিদাস এসেছিল— তারা আমার উপরের ঘরেই ছিল। মেয়েরা কেউ আসে নি, এলে একটু মুস্কিল হত। সুরমার বিয়ে উপলক্ষ্যে হেমলতা, কমলা আর সংজ্ঞারা সবাই বোধ হয় শীঘ্রই চলে যাবেন। সুরমার বিয়ের সময় তোমাদেরও কলকাতায় ফিরতে হবে না কি? এই গোলের মধ্যে আমার কিন্তু কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করচে না। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্বাদ তোমরা নিয়ো— সংসারের উর্দ্ধে ঈশ্বর তোমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করুন— এবং কল্যাণকর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করবার জন্যে তিনি তোমাদের শক্তি প্রীতি ও মহত্ত্ব দান করুন। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩২৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ পোষ্টমার্ক হংকং, ৭ এপ্রিল ১৯২৪ ইং

বৌমা, আজ হংকং পৌঁছবার কাছাকাছি। কিন্তু বড় দুর্য্যোগ। পথে এক রকম মন্দ কাটেনি। সমুদ্র মোটের উপর শান্ত ছিল। পর্শু থেকে একটু নাড়া দিচ্চে—তাতে ক্ষিতিবাবু নন্দলাল প্রভৃতিকে কাবু করেচে। তাঁরা আজ ব্যাকুল নয়নে ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ডেকের এক কোণে বসে কেবল লেকচার লিখে চলেচি—ঢেঁকির স্বর্গেও বিশ্রাম নেই।

ওঁ

Government House
Singapur

৭ [২০ জুলাই ১৯২৭]

বৌমা,

সুরেন তোমাদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লেখে—সুতরাং আমার ছুটি। সেরকম চিঠি লিখ্‌তেও পারিনে—খবর মনেও থাকে না, কোথায় কি হচ্চে চেয়েও দেখিনে। চিঠির নাম দিয়ে যা বিচিত্রাতে লিখ্‌তে হচ্চে তা একেবারেই ফাঁকি, চিঠি হিসাবে সম্পূর্ণ অপাঠ্য। কিন্তু নিমক খেয়েচি, আরো খাবার প্রত্যাশা আছে তাই লিখ্‌তে হচ্চে। অথচ সময় বেশি নেই—কোথাও স্থির হয়ে বসা অসম্ভব। যা তা লেখবার শক্তিও এখন কমে গেছে। অতএব সুরেনকে আমার শত ধন্যবাদ।

মাদ্রাজে যখন পৌঁছলুম তখন আধমরা। সমস্ত রাত্রি ও পরদিনের অনেকটা অংশ নিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে ভয় হোলো ফিরতে হয় বা। আমার একমাত্র সহায় বায়োকেমিক। সমস্ত রাত দুঃখে কাটিয়ে ভোরের দিকে সেকথা মনে পড়ল। বাক্স তোরঙ্গ ঘেঁটে ঘুঁটে খুঁজে বের করা গেল। মধ্যাহ্নে বোঝা গেল যে জাহাজে চড়া চল্‌বে। গুঁড়ো খেতে খেতে জাহাজে চড়লুম—এতটা সারল যে অভ্যর্থনার ধাক্কাও সইতে পেরেচি—সে বড়ো কম ধাক্কা নয়। সমুদ্রে মনসুনের বিভীষিকা একটুও ছিল না। সমস্ত রাস্তায় একটা ভদ্ররকমের দোলাও পাওয়া যায়নি। জাহাজওয়ালারা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাবিন ও বসবার ঘরে আমাকে স্থান দিয়েচে। তাই একটু লিখ্‌তে পেরেছিলুম কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। সেই আমার তেতলার ঘরেই কুমুদিনীর সঙ্গে আমার কলমের শেষ পরিচয়—সে একটা সঙ্কটের জায়গায় এতদিন চুপ করে বসে আছে—আবার কবে আমার কলমের ধাক্কায় তার ভাগ্যচক্র ঘুরতে আরম্ভ করবে তা বলতে পারিনে,—হয়ত ভারতবর্ষে ফেরা পর্য্যন্ত এই রকম অচল অবস্থাতেই কাট্‌বে।

একটা খবর দিতে ভুলেচি—কিন্তু সে খবর আমার চিঠির কাগজের প্রথম পাতার উপরের কোণেই আছে। নিমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমটা আমার মন কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছিল—ভেবেছিলুম আরাম ও অবকাশ পাব না। এখন দেখছি ভালোই হয়েচে। এখানে এত দল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে এতই ঠোকাঠুকি যে তাদের সমস্ত অভিঘাত আমার উপরেই এসে পড়ত। এখানে একের আশ্রয়ে অনেকের ঝুটোপুটি থেকে বেঁচে গেছি। যতদূর বুঝতে পারচি, ঝুলির অনেকখানি ফাঁক রেখে এখান থেকে ফিরতে হবে না। বিশ্বভারতীর মরাগাঙে বোধ হচ্চে যেন জোয়ারের পালা দেখা দিয়েচে। আরিয়াম এখানে আগে এসে

অনেকটা কাজ করেচে। তাকে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে রাখব স্থির করেচি। তোমাদের অসুস্থই দেখে এসেচি— সেজন্যে মন কিছু উদ্বিগ্ন আছে। কিন্তু মাঝখানে একখানা সমুদ্র রেখে উদ্বিগ্ন হবার কোনো মানে নেই। আশা করা যাক তোমরা সকলে ভালোই আছো। মীরুকে আমার খবর দিয়ো— তার খবরও মাঝে মাঝে পাঠাতে ভুলো না। এখানে গরমের ধাক্কাটা কেটে গেছে, বৃষ্টি বাদলাও বিশেষ নেই। ঠিক সময়েই এসেচি। আর কিছুদিন আগে এলে ঘেমে বারো আনা গলে যেতুম। অম্বালালদের আমার অভিবাদন জানিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেডান
সুমাত্রা

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এ আর একটা দ্বীপ— সুমাত্রা। জায়গাটি সুন্দর, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, বেশ ঠাণ্ডা। এখানে এসে তোমরা যদি ফলের শস্যের বাগান করে গোরু বাছুর নিয়ে একটা আড্ডা করতে পার ত মন্দ হয় না। কিন্তু যাই বলো যে দেশ যত সুন্দরই হোক্ শান্তিনিকেতনের কাছে কিছুই লাগে না। তোমাদের কারো চিঠি পাইনি কিন্তু মেসোপটেমিয়ার একখানা চিঠিতে হঠাৎ শান্তিনিকেতনের হাওয়া এসে মনটাকে একটু উতলা করে দিলে। দেরি আছে ফিরতে। আজ বিকেলে চলেচি জাভার মুখে। বাকে এখানে এসেচে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। সকালে রাস্তায় রাস্তায় মাদ্রাজি সানাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিলে। সম্প্রতি মাদ্রাজি অপথ্য যত রকম আছে তাই দিয়ে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হোলো। আমার দলবল খুব খুসি হয়ে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে। আমার শক্তিতে কুলোয় না, দুই চক্ষে অশ্রু ঝরতে থাকে, হৃদয়দাহ উপস্থিত হয়, তাই আমি কেবল খাবার ভঙ্গী করেছি আসল কর্ত্তব্যটা আমার সঙ্গীদের উপরেই বরাত দিয়েছি। মনে সঙ্কল্প আছে বিকেলে যখন চা খাব রুটি মাখন কেকের প্রতিই বিশেষ ভাবে মনোযোগ করব। যাঁরা আহার করলেন তাঁরা মোটর গাড়ি করে সহর প্রদক্ষিণ করতে বেরলেন। এর থেকে বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ হয়েচে। আমি বক্তৃতা দিই, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করি, মাদ্রাজি শানাইয়ের আওয়াজে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে থাকি, হয়রান হয়ে কোনো নতুন হোটেলে এসে যখন কেদারায় হেলান দিয়ে বসি প্রস্তাব আসে বাইরে রোদ্দুরে বসে ফোটোগ্রাফ নিতে হবে— আর বাকি সকলে ভালো রল্‌স্ রয়েস্ মোটর গাড়ি চড়ে ভালো ভালো জায়গা দেখ্‌তে বেরোন, মালয় নাচ দেখে রাত্তির দেড়টার পর বাড়ি ফেরেন, যখন ইচ্ছে ঘুমোন্ দিনেই হোক্ রাত্তিরেই হোক্, যেখানে ইচ্ছে খান, ঘরেই হোক বাইরেই হোক। আজ এখনি একদল ফোটোগ্রাফওয়ালা আস্‌চে আমার ফোটোগ্রাফ তুল্‌বে বলে। এসে অবধি রোজ একটা দুটো ফোটোগ্রাফ তোলা চল্‌চেই। জাভাতে যেরকম আয়োজনের কথা শুনচি তাতে বোধ হচ্চে সেখানে জম্‌বে ভালো। তোমরা সঙ্গে থাক্‌লে খুসি হতুম। আমিতো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে পারিনে— তোমরা দেখতে পেলে আমার এই ঘোরাঘুরির কষ্ট অনেকটা দূর হোত। ললিতার চিঠি থেকে বুঝতে পারচি যে তোমরা কলকাতায়, পুপে নন্দিনীকে নিয়ে কলকাতায়। কিন্তু

এতদিনে নিশ্চয় শান্তিনিকেতনে এসেচ। এখন সেখানে ভরপূর বর্ষা। এদিকে বৃষ্টি বহুদিন একেবারেই হয়নি— কাল থেকে মেঘ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে। ঘুম পাচ্চে এইখানে চিঠি বন্ধ করি। ইতি ১৭ আগষ্ট ১৯২৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

[শান্তিনিকেতন]

ওঁ

বৌমা,

তোমার ১০ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ১৬ এপ্রিলে পেলুম। ওখানে থেকে চিঠি আসতে কম তো দেরী হয় না। আমার এ চিঠি তোমাদের [কাছে] পৌছবে কিনা কে জানে, অর্থাৎ তার আগেই তোমরা কলম্বোয় হয় তো রওনা হতে পারো। ১লা বৈশাখের টানে এখানে এসেছিলুম আজ ফিরব কলকাতায়। প্রশান্ত অপূর্ব্ব প্রভৃতিরা এসে খুব কষে কমিটি প্রভৃতি করে এখানকার হাওয়া খুব আলোড়িত করে দিয়েচে। প্রথমটা সবাই রুখে দাঁড়িয়েছিল, শেষটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে।

...এর টাকা পেয়েছি। তাতে য়ুরোপের খরচ চালাতে হলে সাবধানে ব্যয় করতে হবে। জাপানী জাহাজে আর ওরিয়েণ্ট লাইনের জাহাজে দামের তফাৎ অনেকটা। বিশেষত জাপানী জাহাজে আমাকে যে সুবিধে দেবে তার পূরো মূল্য নেবে না। এণ্ড্রুজ আমার সঙ্গে যাবে না, তার যাবার বিশেষ ইচ্ছা নেই— সে এখানে অনেকগুলি কাজে জড়িত— তার উপর বোলপুরের দুর্ভিক্ষ ও এখানকার কর্ত্তৃত্ব নিয়ে সে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে পারবে। আমি য়ুরোপের কোথাও গিয়ে চুপটি করে থাকতে চাই— এখানকার হাজার রকম খুচরো উৎপাত থেকে একদমে ছুটে পালাতে মনটা ব্যাকুল। রথীকে জাপানী জাহাজের কথা তার করে দিয়েচে— কি পরামর্শ দেয় তার অপেক্ষায় আছি। এখানে এখনো বৃষ্টি নামে নি— ইঁদারাগুলির অবস্থা বাছুরহীন গোরুর বাঁটের মতো। গাছপালা শুকিয়ে গেল।

Ultra Violet rays কিছুদিন নিয়ে ভালো বোধ করছিলুম— কলকাতায় গিয়ে আবার নেব। তোমার জ্বর ছেড়েচে মনটা নিশ্চিন্ত হয়েচে। এক একবার মনে হচ্চে য়ুরোপে না গিয়ে তোমরা দীর্ঘকাল ঐ পাহাড়ে থাকলে হয় তো তোমার পক্ষে ভালোই হত। ইতি ১৭ এপ্রেল ১৯২৮

বাবামশায়

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত আছে। উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি এরূপ কয়েকটি চিঠি এখানে মুদ্রিত হল।—

পত্র ১ ॥ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সংবাদ পান যে, রথীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক জাহাজ-যোগে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবার উদ্যোগ করছেন। এই প্রসঙ্গে 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ৭ ও ৮ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ২, ৩ ও ৪ ॥ ১৩২৩ সালের ২০ বৈশাখ (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথ জলপথে জাপান হয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন।

পত্র ৬ ॥ ২১ মার্চ ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ চীন অভিমুখে কলকাতা থেকে রওনা হন।

পত্র ৭ ও ৮ ॥ ১৪ জুলাই ১৯২৭ মাদ্রাজ বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন: সিঙ্গাপুর মালয় বলি জাভা সিয়াম।

পত্র ৯ ॥ এই সময়ে (১৯২৮) ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দেওয়ার জন্য বিলাতযাত্রার আয়োজন চলেছে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। পরে, ১৯৩০ সালে শেষ য়ুরোপ ভ্রমণের সময় ১৯ মে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে কবির হিবার্ট বক্তৃতা শুরু হয়।

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অপূর্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। রবীন্দ্রনাথের এককালীন সেক্রেটারি

অম্বালাল সারাভাই—গুজরাটের ধনী ব্যবসায়ী

আরিয়াম—ই. এইচ. আর্যনায়কম্। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

উমাচরণ—ভৃত্য

এণ্ডূজ—সি. এফ. এণ্ডূজ

কমলা—কমলা দেবী। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কালিদাস—শ্রীকালিদাস নাগ

'কুমুদিনী'—যোগাযোগ উপন্যাসের নায়িকা

ক্ষিতিবাবু—ক্ষিতিমোহন সেন

ঠাকুরজামাই—জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নন্দলাল—শ্রীনন্দলাল বসু

নন্দিনী—শ্রীনন্দিনী দেবী; রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা

লসিতা—ভিয়েনা-নিবাসিনী Miss Pot. কবিকর্তৃক প্রদত্ত নাম 'লসিতা'

পুপে—শ্রীনন্দিনী দেবী

প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ

বাকে—মি. বাকে (Bake)। ডাচ। ভারতীয় সংগীত বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য কার্ন পরিষদ (Kern Institute) থেকে বৃত্তি পেয়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

'বিচিত্রা'—মাসিক পত্রিকা

মীরা (মীরু)—কবির কনিষ্ঠা কন্যা

মুকুল—শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

মেজবৌঠান—কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সংজ্ঞা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সুরমা—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী

সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ কর।

হেমলতা—শ্রীহেমলতা ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী

সীমা ও অসীম মধ্যযুগ : কবীর

ক্ষিতিমোহন সেন

যুক্তিশাস্ত্র বলেন সীমা ও অসীম পরস্পরবিরুদ্ধ। যদিও ইহার এক'কে বাদ দিয়া অন্য দাঁড়াইতেই পারে না। যুক্তির কাছে এপিঠ ওপিঠ পরস্পরবিরুদ্ধ, কিন্তু সত্যের কাছে প্রত্যেক জিনিসের, এমনকি একখানি কাগজেরও, এই দুই পিঠ না থাকিলে কোনো সত্তা নাই। তাই বাউল গান করেন—

এপিঠ ওপিঠ উল্টা কথা
দুইয়ে মিলেই সত্য পাতা।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। ঈশ. ১, ৫
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। মুণ্ডক, ৩, ৭

সীমা ছাড়িয়া অসীম একটা খণ্ডিত কল্পনা (অ্যাবস্ট্রাকশন) মাত্র। সত্যের সন্ধানে নাস্তিবাদীদের ও সব জ্ঞানের কসরতে ক্রমে পৌঁছিতে হয় সর্বশূন্য রিক্ততায়। জ্ঞান ও যুক্তির বিশ্লেষণের দাপটে সেই কাল্পনিক অসীম ক্রমে হইয়া উঠেন একটা শূন্যধর্মী নাই-বস্তু। এমন অবস্থায় শূন্যতায় মধ্যে না গিয়া উপায় নাই।

কিন্তু অস্তিবাদীদের পথ ভিন্ন। সে তাহার প্রেমময়কে সব-কিছুর অতীত করিয়া দেখে না। সে তাঁহাকে দেখে সব-কিছুরই মধ্যে। কবীর গাহিলেন, আমি আপন প্রিয়তমের কথা বুঝিব কাহার কাছে? কবীর বলেন, তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনধাম মেলে না তেমনি সকলকে ছাড়িয়া বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাকে পাইবে না।

মৈঁ কাসে বূঝোঁ অপনে পিয়কী বাতরী।
কহৈঁ কবীর, বিছুড় নহি মিলিহো জ্যোঁ তরবর ছোড় বন ধামরী॥ প্রথম, ১০৮

এই সকল সীমা যদি ভরপুর করিয়া তিনি বিরাজমান না থাকেন তবে সেই অসীম না থাকারই শামিল। কবীর গাহিলেন, এক (আমি) নিরন্তর, অন্তর কোথাও নাই। সকলের মধ্যেই আমি আছি, নহিলে আমি নাই। বিযুক্ত করিতে করিতে আমাকে একেবারে করিয়া দিল বিচ্ছিন্ন পৃথক্।

এক নিরংতর অংতর নাহীঁ।
হৌ সব হিল মেঁ না মৈঁ নাহীঁ॥
মোহি বিলগ বিলগ বিল গাইল হো॥ চতুর্থ, ৫২

ধ্যানে উপলব্ধি করিয়া কবীর বলেন, কেহ যেন তাঁহাকে দূরে খুঁজিতে না যায়। মন শুদ্ধ করিয়া ধর ধ্যান, দেখ এই যে স্বামী আমার সব ভরপুর করিয়া বিরাজমান।

কহৈঁ কবীর বিচার করি জিনি কোই খোজৈ দূরি।
ধ্যান ধরৌ মন সুধ করি, রাম সঙ্গে রহ্যা ভরপূরী॥

নাগরী প্রচারিণী, ২৪৩ পৃঃ

যুক্তির কাল্পনিক জগতে সবাই খোঁজে বলিয়াই কবীর কহিলেন, কিবা ধ্যাও কিবা গাও, ছাড় সকল গণ্ডগোল। ইনি সবার হৃদয়ে করেন বাস, কেন তবে সেবা কর শূন্যতার মরুভূমি?

কেহি গারো কেহি ধ্যাবহু ছোড়ো সকল ধমার।
য়হ হিরদে সবকো বসে কৈঁ্যা সেরো সুন উজাড়॥ তৃতীয়, ৬৩

তাঁহাকে দূরে নির্বাসিত করিয়া বৃথা আমরাও মরিতেছি দূরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া। কবীর বলেন, সেই কর্তাকে দূরে স্থাপন করিয়া দূরেরই করিলে সম্মান। কর্তা যদি দূরেই থাকিতেন তবে অন্য আর কে করিতেছেন এই জগৎসৃষ্টি? যদি মনে কর তিনি এখানে নাই তবে দূরেই তুমি হও ধাবমান। দূর হইতে দূরে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া নিষ্ফলময় দুশ্চিন্তায়। দূরের দরশন দুর্লভ, নিকটেই নিত্য আনন্দের বাস। কবীর বলেন, পাছে তাঁহার দাস (আমি) তাঁহার বিরহে দুঃখ পায় তাই তিনি নিরন্তর আমাতে হইয়া আছেন ব্যাপ্ত।

দূরহি করতা থাপিকে করী ব্যো দূরকে মান।
জো করতা দূরৈ হুতে তো কো জগ সির জৈ আন॥
জো জানো যহঁ হৈ নহী তো তুম ধারো দূর।
দূরসে দুর ভ্রমি ভ্রমি নিষ্ফল মরো বিসূর॥
দুর্লভ দরশন দূর কে নিয়ড় সদাসুখ বাস।
কহৈঁ কবীর মোহিঁ ব্যাপিয়া মত দুখ পারে দাস॥ তৃতীয়, ৬৪

তিনি সর্বদা সর্বত্র সমগ্রভাবে বিরাজমান। তাঁহাকে ভিতর বা বাহির, এখানে বা ওখানে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ও খণ্ডিতভাবে বলা চলে না। কবীর বলেন, যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন (বাহিরের জগতে নাই) তবে বিশ্বজগৎ লজ্জায় যায় মরিয়া; যদি বলি তিনি বাহিরে তবে তাহাও যে হয় মিথ্যা! বাহির ভিতর সকলকে নিরন্তর (অভেদ) করিয়া তিনি বিরাজমান, চেতনঅচেতন এই দুই তাঁর দুই পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন, প্রচ্ছন্নও নহেন, বাক্যে যে তাহা যায় না বুঝানো।

ভীরে কহুঁ তো জগময় লাজৈ বাহর কহুঁ তো ঝুঠা লো।
বাহর ভীরে সকল নিরংরে চেত অচেত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পয়লট অগোচর বাতন কহান জাঙ্গা লো॥ তৃতীয়, ৬৪

যেন জলে ভরা কুম্ভ জলের মধ্যেই হইয়াছে রাখা। বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি। তাঁহার নামও উচ্চারণ করিতে নাই, যদি মনে হয় তিনি আগে হইতে কিছু স্বতন্ত্র!

জল ভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া, বাহর ভীতর সোই।
উনকো নাম কহন কো নাহীঁ দূজা ধোখা হোই॥ প্রথম, ৯৯

যিনি নামের অতীত তাঁহার নাম বাহিতে গিয়া যিনি অনির্বচনীয় তাঁহাকে নির্বাচন করিতেছি এই তো কেহ ধ্যান করে নিরাকারকে কেহ ধ্যায় আকারকে। যিনি যথার্থ জানেন তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি এই উভয়েরই অতীত।

কোই ধ্যাবৈ নিরাকারকো, কোই ধ্যাবৈ আকারা।
বা বি ইন দোনো তে ন্যারা, জানৈ জানন হারা॥ প্রথম, ১০৫

কবীরের একটি চমৎকার কথা আছে জ্যোঁ কা ত্যোঁ, অর্থাৎ ঠিক যেমন আছে তেমনি। সত্য ঠিক যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। সেই সহজ বিরাজিত সত্যকে ছাড়িয়া, এই চতুর্দিকের যে সব রূপে ও আকারে তাঁহার নিত্য লীলা চলিয়াছে তাহা ছাড়িয়া কল্পনায় মৃগতৃষ্ণার পিছে আর কত ধাওয়া করিবে? এই মিথ্যা ও ছুটাছুটির কি কোনো শেষ আছে? কবীর বলিতেছেন, হে মন, সব-কিছুর পারে উত্তীর্ণ হইয়া সব-কিছু ছাড়াইয়া গিয়া কোথায় চাও পৌঁছতে? এই সব পার হইয়া গেলে তাহার পর না আছে কোনো পথিক না আছে কোনো পথ; কোথায় বা সেখানে গতি, কোথায় বা সেখানে স্থিতি। কবীর কহেন, সব কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া জ্যোঁ কা ত্যোঁ, 'সত্যে হও প্রতিষ্ঠিত'।

মন তূ পার উতর কহঁ জৈ হৌ
আগে পংথী পংথ ন কোঈ কূচ মুকাম ন পৈ হৌ।
কহৈঁ কবীর সব ছাড়ি কল্পনা জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরৈহৌ॥ দ্বিতীয়, ২২

এইখানেই চাহিয়া দেখ সকল রূপে আকারেও সীমাই, সকল 'ঘটে' চলিয়াছে তাঁহার আনন্দের 'খেলা'। আগাগোড়া সৃষ্টিই তাঁর সেই আনন্দের খেলা। এই খেলার মধ্যেই যদি 'খেলনেওয়ালা'কে না ধরিতে পার তবে এই খেলা ছাড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে আর ধরিবে কোথায় কোন শূন্যতার মধ্যে?

অসীম অপার অনন্ত পরমাত্মা পরমেশ্বর তিনি। 'খেলা' কি তাঁহাকে মানায়? কিন্তু 'খেলা' ছাড়া এই সৃষ্টিরচনাকে আর বলিবে কি? এ কি তাঁর বাহিরের কোনো প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি? আনন্দের পূর্ণতা হইতে বিনা প্রয়োজনে স্বাধীন সহজ লীলায় যাহা উচ্ছ্বসিত, তাহাকে 'খেলা' ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যায়? অসীম হইতে তাই সীমায় খেলা, পূর্ণতা হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দের নির্ঝর আসিল নামিয়া।

ধ্যানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া কবীর বলিতেছেন, যাঁহার না আছে রূপ না আছে ঠিকানা সেই নিরাকার ও নির্গুণের দ্বারাই সকল ঠাঁই রহিয়াছে পরিপূর্ণ।

কর্তা আনিলেন আনন্দের খেলা, এবং (ভাবরূপ) ওঁকার হইতে সৃষ্টি করিলেন উচ্ছ্বসিত। আনন্দ ধরিত্রী, আনন্দ আকাশ; আনন্দ চন্দ্র সূর্য পরকাশ।

খেলা হইতেই এইসকল হইয়াছে নির্ঝরিত, খেলার মধ্যেই রহিয়াছে এই সংসার; কবীর কহেন, সকল (সংসার) এই খেলারই মধ্যে। তবু খেলনেওয়ালাকেই গেল না চেনা!

কহৈঁ কবীর বিচাররকে ডাকে বর্ণন গাঁব।
নিরাকার ঔর নির্গুনা হৈ পূরণ সব ঠাঁব॥

করতা আনন্দ খেল লাঈ।
ওঁকারতেঁ সৃষ্টি উপাঈ

আনংদ ধরতী আনন্দ অকাস।
আনন্দ চন্দ্র সুর পরকাস॥
খেলকা য়হ সকল পাসারা।
খেল মাহিঁ রহৈ সংসারা॥
কহৈঁ কবীর সব খেলনমাহিঁ
খেলনহারকো চীন্হৈঁ নাহীঁ॥ তৃতীয়, ৭৭

সৃষ্টি যদি তাঁহার প্রেমেরই খেলা তবে ইহাতে এত অসম্পূর্ণতা কেন? তিনি তো সর্বশক্তিমান, তাঁহার রচনায় কেন কোনো ত্রুটি থাকিবে?

তিনি সর্বশক্তিমান একথা সত্য, কিন্তু তার চেয়েও যে তাঁর প্রেম বড়। এই প্রেমের সৃষ্টি বলিয়া নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই সৃষ্টি অপরূপ এক মহিমায় ভরপুর। অসম্পূর্ণতাই তাঁহার প্রেমের নিদর্শন। কবীরকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টি কেন অসম্পূর্ণ অঙ্গবিহীন? কবীর বলিলেন—

কি আর বলিব, প্রেমময়ের আমার মন তো মানিল না। বিশ্বচরাচরের পথের মধ্যেই তিনি তাঁহার তাঁতের তানা করিলেন প্রসারিত। মহী ও আকাশের মধ্যেই শূন্যতার মধ্যে রচিলেন তাঁহার তাঁতগর্ত, চন্দ্র সূর্য দুই ভরিলেন (আলোক-অন্ধকারের সুতায় ভরা) মাকু। (সেই আলোক-অন্ধকারের সুতায়) ক্ষণে ক্ষণে করেন তিনি বয়ন, (মনের মতো হয় না বলিয়া) ক্ষণে ক্ষণে ফেলেন ছিঁড়িয়া। তাই যেখানেই যাও সেখানেই দেখিবে ছিন্ন অঙ্গবিহীন। আমার প্রতি অসীম তাঁহার প্রেম। সেই অপরিসীম প্রেমভরে প্রেমময় আমার জন্য এই বিশ্ব-তানায় আলোক-অন্ধকারের সুতায় অপরূপ চিত্র বস্ত্র চান রচিতে। এতো অসীম প্রেম তাঁর যে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা সত্ত্বেও তাঁহার প্রেমের উপযুক্ত বস্ত্র কিছুতেই হয় না রচিত।

চিত্ত-বস্ত্র আমার উপযুক্ত কিছুতেই হয় না রচিত তাই ক্রমাগতই তিনি চলিয়াছেন বুনিয়া, আর ক্রমাগতই তিনি ফেলিতেছেন ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া আর নিরন্তর অপরিপূর্ণ প্রেমের ব্যথায় কাঁদিতেছে তাঁর অন্তর।

কা কহৌঁ পিয় কৌ মন নহি মানা।
মায়গ মাহিঁ পসায়ল তানা॥
মহী আকাশ বীচ গঢ়া বনাঈ।
চন্দ্র সূর্য দউ নরা ভরাঈ॥
ছিন ছিন বিনৈ ছিন ছিন ছীনা।
জহঁ জাহু তহঁ অংগ বিহীনা॥
চিত্র বস্ত্র মম সম নহি হোবৈ।
নিতহী বিনৈ অরু অন্তরর রোবৈ॥

এই প্রেম তাঁহার সব-কিছুকে অতিক্রম করা। শুধু তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা নয় তাহার সব দিকের সব কিছুকে অতিক্রম করা তাঁহার মহা প্রেম। তাই দেখিতেছি অসীম হইয়াও তিনি আপনাকে মানিতেছেন অপূর্ণ। সীমা ছাড়া তাঁহার মন কিছুতেই মানে না পূর্ণতা। এই সীমা-অসীমের পরস্পর প্রেমসম্বন্ধ

সকল যুগের মরমী ভক্তদের অন্তরের বিশেষ ধন। এখানে মধ্যযুগের দাদূ ও আজিকার রবীন্দ্রনাথ উভয়ের বাণীও মনে হয় যেন একেবারে এক। অথচ আমি বলিতে পারি রবীন্দ্রনাথের এই দাদূবাণী জানিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার এই বাণী লিখিবার অন্ততঃ কুড়ি বৎসর পরে আজ দাদূর বাণীগুলি তাঁহার কাছে উপস্থিত করিলে, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, কি মুস্কিল, ইঁহারা দেখি তিন-চারি শতাব্দী পূর্বেই আমাদের সব লেখা চুরি করিয়া রাখিয়াছেন!

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে, গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে॥
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা॥
> প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি, ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
> বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি, মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

সীমা-অসীমের নিবিড় প্রেম সম্বন্ধে দাদূ বলিলেন, গন্ধ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম ফুলকে, ফুল বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম গন্ধকে! ভাস (প্রকাশ্য ভাষা) বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাবকে; ভাব বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাসকে! রূপ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম সৎকে; সৎ বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম রূপকে! পরস্পরান্তে উভয়েই উভয়কে চায় করিতে পূজা। অগাধ এই পূজা, অনুপম এই প্রেমের পূজা!

> ব্রাস কহৈ হৌঁ ফুলকো পাউঁ ফুল কহৈ হৌঁ ব্রাস।
> ভাস কহৈ হৌঁ সতকো পাউঁ সত কহৈ হৌঁ ভাস॥
> রূপ কহৈ হৌঁ ভাব কো পাউঁ ভাব কহৈ হৌঁ রূপ।
> আপস মেঁ দউ পূজা চাহৈ পূজা অগাধ অনূপ॥

—আবুল আলা মু'অর্‌রী-ততঃ শম্‌সতব্রেজী, ততঃ রূমীসাদী

শম্‌স আল তব্রীজের শিষ্য মৌলানারুমী বলিলেন:

আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি; আমি হলাম তনু তুমি হলে প্রাণ। এরপর আর যে কেউ বল্‌তে না পারে তোমা ছাড়া আমি আর আমা ছাড়া তুমি।

> মন তু শুদম তু মন শুদী, মন তন শুদম তুজান শুদী
> তা কস নওয়দ বা'দ অজ্-দিন, মন দীগ্‌রম্ তু-দীগ্‌রী॥

এই প্রেম-খেলাতে অপরূপ লীলা হইল সীমার অসীমে এই প্রেমযোগ। তার পর আরও বিস্ময়কর লীলা হইল কেমন করিয়া অসীম হইতে সীমার, অরূপ হইতে রূপের ধারা ক্রমাগত আসে বাহির হইয়া। অসীমের মধ্যে সীমার আশ্রয় এই কথা ভাবিতেই মনে বিস্ময় কিন্তু সীমার মধ্যেই অসীম যে আপনাকে করেন প্রকাশ সে লীলা তো আমাদের সাধারণ ধারণারই অতীত।

বিন্দু 'সামাইল' ভরপূর ভাবে প্রবেশ করিয়া সমাহিত সিন্ধুর মধ্যে ইহাই তো জানে সবাই।

কিন্তু সমুদ্র যে 'সামাইল' বিন্দুর মধ্যে সে তত্ত্ব বুঝে সে জন যে হয় মরমী। হেরিতে হেরিতে (*সন্ধান, ধ্যান ও প্রত্যক্ষ করা অর্থে কবীর 'হেরন' বাদ প্রয়োগ করিয়াছেন), হে সখী, কবীর আপনাকেই ফেলিল হারাইয়া! সিন্ধু যে 'সামাইল' বিন্দুর মাঝে কোথায় মেলে সন্ধান?

অসীম সামাইল সীমার মধ্যে লইল কাল আর স্থানে! প্রেমের অরূপ লীলা বলে অসীম সামাইল প্রেমরূপে, কখনও সেই লীলায় রহস্য পড়ে না ধরা! এক সামাইল সকলের মধ্যে সকল সামাইল সেই একেরই মাঝে। ডুবিয়া যা' কবীর সেই প্রেমের মাঝে সেখানে দ্বিতীয় আর কেহই নাই।

বুংদ সমানী সমুংদ মেঁ যহ জানে সব কোয়।
সমুংদ সমানা বুন্দ মেঁ বূ সৈ মরমী হোয়॥
হেরত হেরত হে সখী রহা কবীর হেরায়
সমুংদ সমানা বুংদ মেঁ সো কিত হেরা যায়॥
অনহদ সমানা হদ্দ মেঁ লিয়া কাল্ অরু স্থান।
প্রেমরূপ সমাইয়া কবহূন পাবৈ জান॥
এক সমানা সকল মেঁ সকল সমানা তাহিঁ।
কবীর ডুবু সো প্রেম মেঁ তহঁ দূসর কোই নাহিঁ॥

সত্য কবীর গুরু শিষ্য হেরা অদ্দ।

প্রেম-সাধনার মরমীদের ইহা সার্বভৌম সহজ সত্য। কায়া যোগীরা ইহা আবার তাঁহাদের সাধনাতে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত বিশ্বের সকল খেলা চলিতেছে মানবের মধ্যে, কায়া মানবই এক পরিপূর্ণ বিশ্ব। তাই তাঁহারা বলেন এই দেহের মধ্যে— গঙ্গা উলটিয়া সমুদ্রকে ফেলিল শুষিয়া আর চন্দ্র সূর্য্যকেও করিল গ্রাস।

উলটী গংগ সমুংদ্রহি সোথৈ শশি ঔ সূর হি গ্রাসৈ॥ তৃতীয়, ৮২

এই মানবের মধ্যে তখন চলে বিশ্বের পরিপূর্ণ লীলা। সীমা-অসীমে প্রভেদ যায় লুপ্ত হইয়া। এই ঘটের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্র। ইহার মধ্যেই সব নদী-উপনদী; ইহারই মধ্যে চন্দ্র সূর্য বিরাজিত ইহারই মধ্যে নয় লক্ষ তারা।

য়া ঘট ভীতর সপ্ত সমুংদর য়াহী মেঁ নন্দী নারা।...
যা ঘট ভীতর চন্দ্র সূর হৈঁ য়াহী মেঁ নৌলখ তারা॥ প্রথম, ৮৫

এই ঘটেই চন্দ্র এই ঘটেই সূর্য। এই ঘটেই নিনাদিত অসীমের তুরী।

য়হী ঘট চংদা মহী ঘট সূর
য়হী ঘট গাজৈ অনহদ তূর॥ প্রথম, ৮৩

এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ-নিকুঞ্জ, ইহারই মধ্যে বিরাজিত তাহার রচয়িতা; এই ঘটের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্র, ইহারই মধ্যে নব লক্ষ তারা। ইহারই মধ্যে অসীম নিনাদিত ইহারই মধ্যে উঠিতেছে ফোয়ারা।

ইস ঘট অংতর বাগ বগীচে ইসী মেঁ সিরজনহারা।
ইস ঘট অংতর সাত সমুংদর, ইসী মেঁ নৌলখ তারা॥
ইস ঘট অংতর অনহদ গয়জৈ, ইসী মেঁ উঠত ফুহারা॥ প্রথম, ১০১

অসীম আপনাকে সীমার মধ্যে কি অপরূপ প্রেমলীলায় দিতেছেন লুটাইয়া কে তাহার করিবে ধারণা? নিত্যকাল বিশ্ব ভরিয়া চলিয়াছে এই মহোৎসব! স্থানে কালে কি তাহা সীমাবদ্ধ?

অখণ্ড পূর্ণ বাণী কহিতেছেন কবীর। সকল সীমার ঘটে ছাইয়া আছে সেই অসীমের ঘর অনন্তের লুট চলিয়াছে ঘটের ভিতর— ঘটের 'মরম' (রহস্য) কেহই তো পাইল না।

কবীরা সকলী বোলৈ বাণী সব ঘট মেঁ ঘর ছায়া।
অনংত লুট হোত ঘট ভীতর ঘটকা মর্ম ন পারা॥ চতুর্থ, ৫১

তিনি অসীম। কিন্তু অসীমের নাই প্রকাশ। তাই তাঁহাকে নিতে হয় সীমায় শরণ। কাজেই আমার কাছে তাঁহার ঠেকা আছে। খেলায় যদি দুই পক্ষেরই গরজ সমান না হয় তবে আর প্রেমের খেলা কি? একদিকেই যদি গরজ হয় তবে তো তা জুলুম। তাই এই প্রেমের খেলাতে পূর্ণতার জন্য সীমার কাছেও অসীমকে করিতে হয় অনুনয়। কবীর বলিলেন, সকল মহীমণ্ডল যাঁহার অবতার সেই অনন্ত দেখি করজোড়ে দণ্ডায়মান; অদ্ভুত অদম্য, অনবসহ রচিয়াছ তোমার এই লীলা, এমন খেলা তোমাকেই শোভা পায়।

সকল অবতার জাগে মহিমণ্ডল অনংত খড়া কর জোড়ে।
অদভুত অগম ঔগাহ রচো হৈ ঈ সব শোভা তেরে॥ চতুর্থ, ৫১

বাংলায় নিরক্ষর দীন দুঃখী বাউল এই কথাই কি চমৎকার সাহসে বলিতে পারিলেন। জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতের দল এই সাহস পাইবেন কোথায়? এ যে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা। হে অসীম, তোমার প্রকাশ যে আমি। তাই আমার সীমায় শরণও লইতে হয়। নহিলে প্রেমের খেলাই থাকে অপূর্ণ।

আজি তোমার সঙ্গে আমার হোরী ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহে গো রয়েছে যে তোমারো দায়॥
তোমার সুখের তাই তো হাসি, তোমার ফুকের (সুরের) পাই তো বাঁশি
আমার প্রেমে তোমার বিলাস, তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়।

শক্তিকৃতি এমনকি জ্ঞানের ক্ষেত্র পর্যন্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় প্রভাব। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সকল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধুইয়া মুছিয়া আসিতে হয়। যিনি রাজার রাজা প্রেমের দায় থাকিলে তাঁহাকেও পায়ে ধরিয়া করিতে হয় অনুনয়। জগতের ক্ষেত্রে এই সত্য লোকে জানে এবং এ কথা লোকে ভাবিতে সাহস পায়। কিন্তু অনাদি অনন্ত অসীম পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই কথা উপলব্ধি ছাড়া বলিতে সাহস পায় কে? দীন দুঃখী সকল বাউলের দল শাস্ত্র ও নিয়মের ধার তো ধারে না। তাহারা যেমন দেখিয়াছে তেমনই বলিয়াছে।

এই বিশ্বরচনার মধ্যে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? কার্যকারণের অভেদ্য নিয়মশৃঙ্খলিত জগতে এত ব্যাকুল সৌন্দর্যের কিসের প্রয়োজন? কবীর, দাদূ, রজ্জব, হামরসী প্রভৃতি এক একজন সাধক এক একরকম করিয়া এই সৌন্দর্যের মর্মটি ধরিয়াছেন। জ্ঞানী তো সৌন্দর্যকে মিথ্যা ও মায়া বলিয়া দিলেন উড়াইয়া। হায় বিশ্বে এত গান এত রঙ্গ একি শুধু মায়া! মরমী বলিলেন, দেখ নাই পৃথিবীতে মুখে যে কথা বলা যায় না সে কথা বলা চলে সৌন্দর্য দিয়া? অন্তরের অপ্রকাশ্য প্রার্থনার প্রকাশ হয় সৌন্দর্যে, প্রসাধনে,

গানে ও সহস্রবিধ সুকুমার কলায়। এই বিশ্বে দেখিতেছি অনন্তরূপ সৌন্দর্য। কত গান, কত বর্ণ, কত গন্ধ, কত ছন্দ, কত সুকুমার চারুলীলা—এ কি আমাকে অনুনয় করা নয়? প্রেমহীন এই চিত্তকে কি তিনি প্রেমের ব্যাকুলতায় ডাক দিয়া বলিতেছেন না—দেখো দেখো আমার দিকে চাহিয়া, আমি আছি তোমার প্রেমের প্রতীক্ষায়। তাই তো বাউল বলিলেন—

সত্য কৈরা কইরে বন্ধু,
আমার পায়ে দিছে হাত॥

সৌন্দর্য হইল আবার পায়ে হাত দিয়া তাঁহার ব্যাকুল অনুনয় দেখো দেখো, একবার শুধু দেখো।

কি দুর্জয় সাহস! একি শাস্ত্র-আচার বা সম্প্রদায়-বিধিবদ্ধ প্রাণহীন মিন মিনে সব বাঁধা বুলি! কোনো শিবোলেথ বা কাণ্ট ইহার কাছে আসিতেও কি সাহস পায়?

কবীর দাদূ রজ্জবের কথা এই প্রসঙ্গে আর না-ই বলিলাম। তাঁহাদের কথা কিছু কিছু জানা এবং ভবিষ্যতে বলিবার অবসরও হইবে। আজ ঐ যে হাথরসী নাম করিলাম তাঁহার একটি মাত্র গান এখানে দেখান যাউক। ভক্তেরা বলেন তাঁহার মহারাষ্ট্র পেশোয়া বংশে জন্ম। রাজ্য পাওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল। ভগবানের জন্য দুর্জয় ব্যাকুলতায় তিনি যৌবনে রাজত্বের সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া হাথরাস নগরে সাধনায় জীবন কাটাইয়া দেন।

প্রেমের অপেক্ষা যাঁহারা নীতির উপর জোর বেশি দেন তাঁহারা হয় তো ভয় পাইতে পারেন, তাই তো, নীতি তাহা হইলে দাঁড়ায় কোথায়? কিন্তু প্রেমের অনুরোধে যে নীতি তাহার কাছে কি আর কোনো নীতি দাঁড়াইতে পারে? এই কথা যখন মনে হয়, আমার মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ, আমি তাঁহার করধৃত দর্পণ, আমার মধ্যে প্রেমময় আমায় দেখিবেন তাঁহার দিব্য অপরূপ শোভা, তখন যেভাবে নিজেকে পবিত্র স্বচ্ছ রাখার তাগিদ আসে সে তাগিদ কি আর কোনো রকমে আসে?

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন কথা মনে হইতেছে। বহুদিন পূর্বে দাণ্ড নামে এক বৃদ্ধ নিরন্ন সাধককে দেখিতে যাই। বয়স্কের বিশুদ্ধ নীতিধর্মপরায়ণ সেই বৃদ্ধ সাধকটি। তাঁহার কাছে আমি অনেক গভীর রসের রহস্য জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, বাবা এইসব গভীর রাজ্যে আমার তেমন প্রবেশ নাই যেমন প্রবেশ আছে আমার শিষ্য বল্লভ ও দুর্লভের। দাণ্ড বৃদ্ধ, বল্লভ-দুর্লভ যুবা। তবু গেলাম, অনেকদিন পর্যন্ত সারাদিন-সকলের-সেবারত ঐ যুবা দুইটি ধরা দিলেন না। তার পর ক্রমে যখন ধরা দিলেন তখন রাত্রির পর রাত্রিতে তাঁদের গভীরতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কাশীতে আমার জন্ম। বাল্যকাল হইতে কত কত মহাপণ্ডিত সাধু-সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষের কাছে বেদ-বেদান্তাদি কত শাস্ত্র শুনিয়া আসিয়াছি কিন্তু অপরূপ তাঁহাদের রসের রাজ্যে প্রবেশ। তাহার তুলনা হয় না। যাক, সেসব কথা, আমি বৃদ্ধ দাণ্ডকে বলিলাম, বাবা, বল্লভ দুর্লভ এই যে তোমার দুইটি শিষ্য এরা যে প্রেমে ভরপুর! দিনভর দেখি তাঁহাদের চলিয়াছে নিরন্তর সেবা। যখন আবার সব কাজ চুকিয়া যায় তখন গভীর রাত্রে তাঁহাদের কাছে বসিয়া বুঝিয়াছি গভীরতা কাহাকে বলে। কিন্তু এঁরা তো ভগবানের প্রেমের রসেই ভরপুর। নীতির কথা তো একটি দিনও বলেন নাই। তুমি তো প্রধানতঃ নীতি-দ্বারা পবিত্র জীবন যাপন কর ও নীতির কথাই দেও উপদেশ! যে উত্তরটি দাণ্ডর কাছে পাইলাম, তাহা কখনো আশাই করিতে পারি নাই। গুরু হইয়া শিষ্যদের কথা এমনভাবে বলিতে যে কেহ পারে

তাহা আমার ধারণাতেও ছিল না। দাশু বলিলেন, বাবা, উহাদের মতো সৌভাগ্য কয়জনের? ভগবানের বিশেষ কৃপা না থাকিলে কি এমন সৌভাগ্য হয়? আমি হইলাম প্রভুর মন্দিরের পূজার তাম্রপাত্র, প্রতিদিন আমাকে মাজিয়া নির্মল রাখিতে হয়, না মাজিলেই আমি যাই মলিন হইয়া। আর উহারা যে প্রভুর পূজার জন্য ঠিক বিকশিত কমল। ওদের গায়ে কি এই মাজন চলে? তাঁর পূজার কমল ঘষিয়া নষ্ট করিবে এমন সাহস কার বাবা? উহারা যে তাঁর বরণের প্রেমের কমল। এমন সৌভাগ্য কয়জনের? ভগবানের কত কৃপায় মেলে এই সৌভাগ্য। উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

প্রেমের রসে যিনি নিরন্তর ডুবিয়া আছেন তাহাকে আর নীতি কি নির্মল করিবে? তাঁহারা নীতিহীন নহে, তাঁহারা নীতির অতীত। এইখানে একটি গল্প মনে হইতেছে। একবার এক শুচিবায়ুগ্রস্ত বৃদ্ধা দেখিলেন মাছেরা পুকুরে-ফেলা ভাত খাইতেছে। তিনি বলিলেন, মাগো, এঁরা সব এঁটো মাগ্‌ছে, এদের স্নান করানো দরকার। এখন মাছকে স্নান করাইবে কে?

প্রেম ও নীতির তত্ত্বকথা এখন থাকুক।

দেখা গেল সীমার মধ্যেই অসীম আপনার প্রকাশ, আপনার প্রেমকে পূর্ণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। এই প্রকাশের মধ্যেই তাঁহার সকল আনন্দ ও সার্থকতা নিহিত। এই বিশ্বে চলিয়াছে তাঁর নিত্য প্রেমোৎসব। না হইলে এই বিশ্বে এত বিচিত্র সৌন্দর্যের সমারোহ কেন?

কবীর বলিলেন, কায়া নগরের মাঝে প্রেমময় স্বামী আবার মাতিয়াছেন বসন্তোৎসবে। সরস রাগিণীর চলিয়াছে গান, সরস সুর আজ শোভমান, নিরতিশয় আজ আনন্দ-উৎসব। বিনা করতাল বিনা তম্বুরায় অসীমের রাগিণী আপনি বাজিয়া উঠিতেছে মধুর ধ্বনিতে। বিনা রসনায় সেখানে ছত্রিশ রাগিণী সংগীত, পরিপূর্ণ রাখিয়াছে মহানন্দ মহোৎসব।

> কায়া নগর মঁঝার সাঙ্গি খেলৈ হোরী।
> গাৱত রাগ সরস সুর সোহৈ অতি আনন্দ ভয়োরী॥
> অনহ্‌দ বাজে বজৈ মধুর ধুন বিন করতাল তংবুরা।
> বিন রসনা জহাঁ রাগ ছতী সোঁ হোত মহানংদ পূরা॥ দ্বিতীয়, ১১৭

কাজেই অসীম হইতে সীমা ধায় কিসে? তার এ যে অসীম রহস্য। জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে অসীমকে কেমন করিয়া ভয়ঙ্কর ধারণ করিয়া আছে সীমা, সে এক অনির্বচনীয় রহস্যলীলা। তাই কবীর কহিলেন, সীমা লইয়া যে আছে সে তো মানবজনোচিত। অসীম লইয়া যে আছে সে সাধক। সীমা অসীম দুইই যে যুক্ত করিয়া করিতে পারে গ্রহণ অগাধ তাহার মত।

> হদ মেঁ রহে সো মানবী বেহদ রহে সো সাধ।
> হদ বেহদ কোনৌগহে তাকা মতা অগাধ॥ সত কবীর, বেহদ অংগ

প্রেমময়ের এই লীলা যে বুঝিল সে কি আর বৈরাগ্যভরে সংসারকে অবজ্ঞা করিয়া অসীমের সন্ধানে মানবের সংসার ছাড়িয়া যায় চলিয়া? তাহাদের কথাতেই কবীর বলিয়াছেন, হে সাধক, ভ্রান্ত সন্ন্যাসীকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারে ঘরে, সে-ই আমার প্রাণের প্রিয়। ঘরেই যোগ, ঘরেই ভোগ, ঘর ত্যাজিয়া যেন না যায় বনে। ঘরেই যুক্ত, ঘরেই মুক্ত যদি অলখ গুরু দেখাইতে পারেন সেই অরূপলীলা। প্রেম

ও বৈরাগ্য তবে যুক্ত সঙ্গত করিয়া অনাহত অসীম ধ্বনি তোলে বাজাইয়া। ঘরেই সেই বস্তুর বসতি, ঘরই সেই ব্রহ্মবস্তু, ঘরই মিলাইয়া দেয় বস্তুকে। কবীর কহেন, শোনো হে অবধূত—ঠিক যেমনটি আছে তেমনের মধ্যেই হইতে হইবে প্রতিষ্ঠিত।

অবধূ ভূলেকো ঘর লাৱৈ সো জন হমকো ভাৱৈ
ঘরমেঁ যোগ ভোগ ঘরহীমেঁ ঘর তজ বন নহি জাৱৈ॥
ঘরমেঁ জুক্ত মুক্ত ঘরহীমেঁ জো গুর অলখ লখাবৈ।
সুরত নিরতসোঁ মেলা করকে অনহদ নাদ বজাৱৈ॥
ঘরমেঁ বসত বস্তুভি ঘর হৈ ঘরহৈ বস্তু মিলাৱৈ।
কহৈঁ কবীর। সুনোহো অবধূ জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরাৱৈ॥ প্রথম, ৬৫

তাঁহার মধ্যেই মানুষ আছে ডুবিয়া। তাঁহাকে যখন মানুষ খুঁজিয়া মরে তখনই কবীরের লাগে অদ্ভুত। কবীর বলেন, জলের মধ্যে নাকি মীন পিয়াসী! শুনিয়া শুনিয়া আমার পাইতেছে হাসি। ঘরেই রহিয়াছে বস্তু অথচ তাহা আসিতেছে না নজরে, বনে বনে ফিরিতেছে কিনা উদাসী হইয়া!

পানী বিচ মীন পিয়াসী।
মোহিঁ সুন সুন আৱত হাঁসী॥
ঘরমেঁ বস্তু নজর নহি আৱত।
বন বন ফিরত উদাসী॥ প্রথম, ৮২

এই জগৎকে আমরা মনে করি ব্যবহারের জগৎ। পরমার্থ খুঁজিতে তাই আমরা যাইতে চাই অন্যত্র। জলে দাঁড়াইয়া ধোপা মনে করে এতো আমার কাপড় কাচার স্থান। পিপাসার জল মিলিবে জানি আর কোথায়। তাই কবীর বলেন, জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া বেচারা ধোপা মরিল পিপাসায়। জলের মধ্যেই সে দাঁড়াইয়া তবু মূর্খ করিতে পারিতেছে না পান, অথচ খাসা নির্মল সে জল। আপন ঘটের জানেনা মরম, কোন্ জনের সে করে আশা?

ধুবিয়া জল বিচ মরত পিয়াসা।
জলমেঁ ঠাঢ় পিয়ৈ নহি মূরখ অচ্ছা জল হৈ খাসা।
অপনে ঘটকে মরম ন জানৈ করৈ কৌন জলকৈ আসা॥ দ্বিতীয়, ৩১

সীমা হইল ঘর। অসীম হইলেন প্রদীপ। আমার এই ঘর ছাড়া প্রদীপ অর্থহীন, প্রদীপ ছাড়া আবার ঘর অন্ধকার। সকল ঘরেই সেই প্রদীপের জ্যোতিলীলা চলিয়াছে। কোথায় বনে বনে দূরে লোকে ব্যর্থ মরে ঘুরিয়া সেই দীপকের সন্ধানে? জ্যোঁ কা ত্যোঁ লীলার মধ্যে দেখো তাঁহাকে বিরাজিত।

ঘরে ঘরে দীপ্যমান সেই প্রদীপ, অন্ধ কিনা, তাই পায় না দেখিতে। দেখিলে হঠাৎ একদিন যেই ফেলিবে দেখিয়া অসীম মৃত্যুর পাশ হইবে ছিন্ন।

ঘর ঘর দীপক বরৈ লখৈ নহিঁ অংধ হৈ।
লখত লখত লখি পরৈ কটৈ জম ফংদ হৈ॥ দ্বিতীয়, ৩৩

যোগী পড়িয়া আছেন বিযোগের মধ্যে, তাই বলেন সেই ঘর দূরে। ওরে, পাশেই বিরাজমান আমার স্বামী আর তুই কিনা তাঁহাকে খুঁজিতে চড়িতেছিস খেজুর গাছে!

যোগী পড়ে বিজোগ কহৈঁ ঘর দূর হৈ।
পাসহি বসত হজুর তু চঢ়, খজুর হৈ॥ দ্বিতীয়, ৩৪

কাহাকে ধ্যাও, কাহার নাম গাও, ছাড়ো সকল গণ্ডগোল, ইনি সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। এই-সকলকে ছাড়িয়া শূন্যতায় মহামরুকে কেন কর সেবা?

কেহি গাৱো কেহি ধ্যাৱহ্‌ ছোড়ো সকল ধমার।
য়হ হিরদে সবকো বসে কোঁ্যা সেৱো সুন উজাড়॥ তৃতীয়, ৬১

সকল সীমা সকল রূপ আকার ভরিয়া সেই অসীম অরূপ বিরাজিত। কিন্তু চিনিতে পারে কয়জন? কবীর বলেন, সকলেরই দৃষ্টিপথে পতিত সেই অবিনাশী, কচিতই কোনো সাধক সেখানে তাঁহাকে পারে চিনিতে। কবীর বলেন, এই রহস্যের মর্মদ্বার যে পারিয়াছে খুলিতে সে-ই জানে এই লীলারহস্য।

সবকো দৃষ্টি পড়ে অবিনাসী বিরলা সংত পিছানৈ।
কহৈঁ কবীর য়হ মর্ম্ম কিৱড়ী জো খোলৈ সো জানৈ॥ দ্বিতীয়, ৫২

এই রহস্যের দ্বার যাহার খুলিয়া যায় সে তখন আপন ভিতরে বাহিরে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে নিত্য নিরন্তর বিরাজমান পরব্রহ্মকে। সে-অবস্থায় তাঁহাকে কিছু বলিবার মতো দূরত্বও সাধক পান না। তখন যোগানন্দ রসে ভরপুর হইয়া নিরন্তর আত্মার মধ্যে সাধক দেখেন পরমাত্মায় লীলা—

আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগত করণং পশ্য তত্ত্ব দৃষ্ট্যা—

এই অবস্থার কথা বুঝাইতে গিয়া কবীর বলিলেন, প্রিয়তমকে লিখিতে পারিতাম পত্র, যদি তিনি থাকিতেন একটুও বিদেশে। তনুতে মনেতে প্রাণেতে নিবিড়ভাবে যে যোগযুক্ত তাহাকে সন্দেশ আর দিব কি?

পিতমকো পতিয়াঁ লিখুঁ জো কছু হোয় বিদেশ।
তনমেঁ মনমেঁ প্রাণমেঁ তাকো কহাঁ সঁদেশ॥ সত্য কবীর অঙ্গ ৫

সকল সীমা ভরপুর করিয়া বিরাজমান প্রিয়তম। ঘটে ঘটে তখন পূর্ণস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ পরব্রহ্ম। তখন আর শুচি-অশুচির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রেমের রাজ্যে নীতিশাস্ত্রের যে বিশেষ করিয়া প্রয়োজন নেই সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। এখন তাহার হেতুটিও দেখা গেল। এমন অবস্থায় বিশ্বের সবই পবিত্র, পূর্ণ ও ব্রহ্মময়, সবই কমাল ব্রাউনিং লিখিয়াছেন—

অল ইজ রাইট উইথ দি অয়ার্ল্ড

জগতে সবই শুদ্ধ সত্য শিবময়।

তবে কেন আমাদের মনে হয় জগৎ অশুদ্ধ মলিন ও অশিব? কবীর বলেন, জগৎকে শুধু চক্ষু দিয়া দেখিয়াছ, আত্মা দিয়া দেখিয়াছ। দেহে যাহা বিরক্তিকর রসনায় তাহা মধুর। জগৎকে যথার্থ দ্বার দিয়া পরিচয় করা হয় নাই। তাই কবীর বলেন, সকল অঙ্গ যাহাকে মনে করিল ক্লেদের মতো, রসনায়

লাগিতেই স্বাদেই বুঝা গেল তাহা মধু। তেমনি যাহা এখন মনে হইতেছে মলিন বিরূপ, তাহা যদি যথার্থ ঠিকানামত পৌছায় তবে সুধারস উঠিবে জাগিয়া।

সকল অংগ ক্লেদ অস মানৈ।
রসনা লাগৈ সহদ রস জানৈ॥
মলিন বিরূপ জো অবলাগৈ।
পহুঁছ ঠিকান সুধারস জাগৈ॥

বাউলও তাই বলিয়াছেন—

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটী
প্রাণরসনায় দেখ রে চাইখা রসের সাঙ্গ খাঁটী॥

চোখে যাহা ধুলা মাটি প্রাণরসনায় তাহাই বিশুদ্ধ অমৃতরস। এমন অবস্থায় মানুষও সব পরমাত্মারই প্রকাশ। সেই সাধনায় সাধক হইয়াই সে আসিয়াছে জগতে, অসীমের পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহার সাধনা। সে তখন ব্রহ্মময়, ব্রহ্মভাবে ভরপুর। ব্রহ্মেরই লীলানিকেতন কবীরের পুত্র কমাল যখন জন্মিলেন তখন কবীর এই অসীম দৃষ্টিদ্বারাই দেখিলেন তাহার আগমনটি। অসীমের সত্যেই সেই পুত্র অর্থবান। তাহার জন্মে যে মহাবাণী কবীরের উচ্ছ্বসিত হইল তাহা অপূর্ব। মানবের জন্মে এমন মহাবাণী কি কখনো উচ্চারিত হইয়াছে?

পুত্রের জন্মসংবাদ পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ধ্যানমগ্ন কবীর। তার পর কহিলেন, হে অসীম-যাত্রী, আমার ঘরে আসিয়াছ এই লোকে অতিথি হইয়া। তোমার স্বাগতে ধরিলাম আমার মঙ্গল অর্ঘ্যপাত্র। আজ সম্মানিত কৃতকৃতার্থ হইল আমার ঘর ও অঙ্গন। যে পথ দিয়া তুমি আসিয়াছ তাহাকে করিয়া আসিয়াছ গুলজার (কুসুমাস্তৃত)। জনম-মরণে চলিয়াছে তোমার পদক্ষেপ, কাল তোমার নিকট পরাজিত। এবার আমার ঘরে যে লইলে তোমার আশ্রয় ইহাতেই আমি পাইলাম আমার পরম পরিপূর্ণতা (কমাল)। কিরূপ সেবা করিব তোমার, কি করিব তোমার পূজা? দেখিতেছি পথও যিনি, পথিকও তিনি। গম্য ঘরও তিনি। সকল দ্বৈত ভাব আজ গিয়াছে মিটিয়া।

অনহদ মুসাফির মহনা আয়া ধরৌঁ মংগর থার
ঘর আংগন কী কদর ভর্দি হৈ রাহ হৈব গুলজার॥
জনমমরণ মেঁ কদম তুম্হারা অবস ভরা হৈ কাল।
মেরা ঘর মেঁ ডেরা লগায়া পায়া হম কমাল॥
কৌন সী সেবা করহোঁ তুমকো কৌন করহোঁ পূজা।
পংখ পংখী ঘর এক হী হৈ জী ভাব্ মিটা অরপূজা॥

কমাল অর্থ পরম পরিপূর্ণতা। তাঁহার এই বাণী হইতেই কবীরের পুত্রের নাম হইয়া গেল কমাল।

কবীরের ধারাতে আসিলেন মহাসাধক দাদূ। তাঁহার শিষ্য ভক্ত ও সাধকশিরোমণি রজ্জবজীর জন্ম মুসলমান বংশে। সীমা-অসীমের তত্ত্বে তাঁহার যে কি গভীর প্রবেশ ছিল তাহা বুঝিতে পারি তাঁহার অপূর্ব সব বাণীদ্বারা। সেইসব বাণীর মধ্যে কি গভীর সত্য নিহিত তাহা একটু দেখিলেই বুঝা যাইবে—

নিরাকারকে যে সাধক ডরায় সে মূঢ়, আবার আকারকে যে সাধক ডরায় সে কাপুরুষ। দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়া দেখো চাহিয়া শিবশক্তির মতো প্রেমানন্দে উভয়ে পরস্পরে যুক্ত।

মূঢ় ডরৈ নিরাকার কূঁ কায়র সো আকার।
উ ভৈ জুক্ত শিবশক্তি জ্যুঁ দেখ্ দৃষ্টি উ ক‍াঁর॥

সত্য কবীর অঙ্গ, ১৫

এখানে শিবশক্তির তুলনায় মনে পড়িতেছে আনন্দলহরীর শঙ্করাচার্যের সেই শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ।

আবার কবীরের মতোই রজ্জব কহিলেন, আকার যে স্বীকার করিল সে হইল সাধারণ মানব, নিরাকার যে স্বীকার করিল সে হইল সাধক। শিবশক্তির মতো যুক্তভাবে যে মহাসত্যকে গ্রহণ করিল অগাধ হইল তাহার মত।

আকার গাহৈ সো মানবী নিরাকার সো সাধ।
শিব শক্তি জ্যুঁ জুক্ত নাই তাকা মতা অগাধ॥

সত্য কবীর অঙ্গ, ১৬

এখন দেখা যাউক সীমা-অসীমের তত্ত্বটিতে ভারতীয় সাধনার জগতে প্রাচীন ও নবীন সকল মনীষীরই কি আশ্চর্য্য মিল। এই সাধকদের আদিমতম যুগের ঋগ্বেদের ও উপনিষদের ঋষিদের কথা দেখানো হইয়াছে এখন এই যুগের রবীন্দ্রনাথের দুই একটি বাণী এখানে দেখানো যাউক। আগাগোড়া তাঁহার বাণী লইয়াই একটি প্রকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার সব কথা ভালো করিয়া দেখানো যায় নাই। এই প্রকরণে এর দুই একটি বাণীই দেখানো যাইবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৈবেদ্যে বলিয়াছেন—

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়। ৮১নং

তুমিই অসীম আকাশ ও তুমিই সসীম নীড়।

সীমা ছাড়া অসীমের তো প্রকাশ নাই, ভাষা নাই, বাণী নাই, বর্ণ নাই। সে শুধু মুক্তি ও বাধাহীন অনন্ত অবকাশ।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী॥

তাই সীমাকে ছাড়া তাহার চলে না। কারণ সীমার মধ্যে সবই আছে—

হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে।
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে॥

আবার সীমাও যদি অসীমকে না পায় তবে কোথায় থাকে তাহার সার্থকতা, কোথায় তাহার প্রাণের সঞ্চার?

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে— উৎসর্গ ৯নং

আকাশের মধ্যে তার প্রাণ চায় সার্থকতা—

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন-মাঝে—
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে॥ ঐ

অসীম আকাশ বিনা তাহার জন্ম যে যায় ব্যর্থ, তাই তার প্রাণের কান্না—

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে,
ভাবিছে উদাস-পারা—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা॥ ঐ

তাহাকে তখন আশ্বাস দিতে হয়—জীবনের এই নিশা কাটিবে, অন্ধকার কাটিবে। প্রভাত আসিবে। তখন আকাশের পথ মুক্ত হইবে, বিশ্বের সঙ্গে যোগে জীবন ধন্য হইবে। তখন—

কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে পুরিবে সকল কামনা।

তখন তুই ধন্য হবি, সার্থক হবি

যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি— জনম ব্যর্থ যাবে না॥ উৎসর্গ ৯নং

এই কান্না যে শুধু সীমার তাহা তো নয়। অসীমের ব্যাকুলতাও তো কম নয়। কারণ তার প্রেমের খেলা চাই, প্রকাশ চাই, তাই রজ্জবের বাণীতে দেখি— রবি ভাবিলেন, এখন দিন আর রাত্রির মিলন-সন্ধ্যা, আরও একটু মিলনের হোরী খেলিব। রবি তাই সন্ধ্যাকাশে হোলী খেলিবার জন্য একটুকরা মেঘ করিলেন প্রার্থনা। অসীম না জানি কিনা হইবে খেলা, একটু মেঘ পাইলে অন্তরের প্রেম পাইবে নব নব রূপে ও রঙ্গে প্রকাশ।

হোরী খেলন কূ রবি সাঁঝা	গগন অংগনি খেল হোই
মাংগে বাদল নভ মাঁঝা॥	রূপ লহৈ প্রেম সোঈ॥ রজ্জব ৬০

তাই রজ্জব বলিলেন, তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিবার মতো শুদ্ধ যদি হইতে নাও পারি তবু হে প্রভু, দেখিয়াছ তো কালো মলিন মেঘের মধ্যে কি অপূর্ব তোমার রঙ্গের হোরী-উৎসব। না হয় একটু মলিন ছিন্ন মেঘ আমায় করিয়া দাও, আমার মধ্যে চলুক, হে প্রেম-রবি, তোমার অপূর্ব সান্ধ্য হোরীখেলা। নহিলে ব্যর্থ গেল আমার এই জন্ম।

দেখা যাইতেছে দুই দিকেই সমান ব্যাকুলতা। প্রেম চায় সাথি। তাই অসীম চায় সীমা। সীমা চায় অসীম। নহিলে তাহা আর কিসের প্রেম?

আবার সেই বাউলের কথা—

আজ তোমার সঙ্গে আমার হোরী ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহে গো রয়েছে যে তোমারো দায়॥ পৃ ১০

কবীরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, এমনকি সাধনা তোমার আছে যে অসীমকে পাইতে কর সাহস? কবীর বলিলেন, আমার সাধনায় যদি সে শক্তি না থাকে, তাঁর সাধনার জোরে তাঁহাকে পাইব। আমাকে ছাড়া তারও কি চলে? কি অপূর্বভাবে কবীর বলিলেন, এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার বীণার সংগীত। বীণার তারের দুই দিকে দুইটি খুঁটি চাই। দুইয়ের মধ্যে তার টানিয়া না ধরিলে সে তার বাজে না। এই বীণার এক দিকে তিনি অসীম, আর এক দিকে আমি সীমা। আমাকে বাদ দিয়া বাজুক দেখি কেমন বাজে তাঁর বীণা! তুমি ও আমি দুই জনে তোমার বিশ্ববীণার দুই দিকে দুইটি তুম্বী। তাই তুমি-আমি এই দুই তুম্বীর মধ্যে প্রতিক্ষণে তাজা তাজা হইয়া বাজিতেছে জীবন্ত সব সুর। সেই সুর কখনো উজ্জ্বল, কখনও কাজল, রঙ্গে রঙ্গে নিত্য তার মৌন প্রেম উঠিতেছে নব নব তাজা তাজা রাগে সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া বাজিয়া।

তুম হম দো তুম্ব বিচ সুর বাজৈ তাজা তাজা।
উজর কবহী কাজর কাবহী রংগ রংগ নিও বাজা॥

যোগের অভাবে খেলা হইয়া আসিয়াছে স্তব্ধ। অসীম মূঢ়, প্রেমহীন কাজেই আমার কোনো ব্যাকুলতা নাই। প্রেমযোগী তিনি হইয়া উঠিয়াছেন ব্যাকুল। রজ্জব তাই বলেন, "দেখো, প্রিয় যে আমার হৃদয়ে সবার চিত্তঅঙ্গনে আজি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কাঙ্গাল হইয়া ভিক্ষা মাগিতে। যাহা-কিছু আছে তোর দিবার নিঃশেষে আজ দে সমর্পণ করিয়া। পূর্ণ হউক আজ প্রেমের সর্বস্ব সমর্পণের উৎসব। আজ আর মিথ্যা বলিস না, কিছুই আজ তাঁহার কাছে লুকাইয়া রাখিস না, ভিখারির বেশে আসিয়াছেন যে প্রিয়তম, তাঁহাকে নিরাশ করিস না। প্রিয়তম আজ আমার কাছে আসিয়াছেন ভিখারি হইয়া, তাঁহার মতো বল আমার আর আছে কে? চিত্ত মন আজ আমার ও তাঁহার কাতর ভিক্ষায় হইয়া গিয়াছে ব্যাকুল অস্থির ও উদাস। আজ অপরূপ এক প্রেমের নব দিন, আজ প্রেমের মহা-মহোৎসব। আজও যদি না পারিস তুই নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতে, ব্যর্থ আজিকার সব মহা-মহোৎসব, তবে ব্যর্থ আজ তোর ওসব কিছু, তোর জনমও আজ এক নিদারুণ পরাভবের ব্যর্থতা। তবে ব্যর্থ তোর এতদিনকার সকল মন্ত্র, সকল জপ, সকল সাধনা।

সীমার দ্বারে অসীমের সেবা
সখি আমারি দুয়ারে

সব জন চিত্ত অংগনি আজি মাঁগে ফকীর সোয়।
জো কুচ আপন আপিকে পূরণ উৎসব হোয়॥
ঝূঠন ভালু, কুছ নহি রালু, না করু তাকু নিরাস।
পিয়া ফকীর মম, নহি কছু তা সম, চিত মন বিকল উদাস॥
প্রেম দিবস নব, মহা মহোৎসব, জৈ অব সৌ পূ ন আপা।
ব্যর্থ আজ সব, জনম পরাভব, ব্যর্থ সব মন্ত্র অরু জাপা॥ রজ্জব, ৬০ পৃঃ

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ— অর্থাৎ লেখকের 'কবীর' গ্রন্থের উক্ত খণ্ড।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও দুইটি তপোবন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১

'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকটি যতবার পড়া যায়, ততবারই ইহার নূতন নূতন রূপ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে— মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় শিল্পকৌশল কত খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিতর দিয়াই যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই অপূর্ব রূপকের বিভিন্ন দৃশ্য, পাত্রপাত্রী, ঘটনাসংস্থান এবং পরিবেশকল্পনার মধ্য দিয়া নাটকীয় আবেদন যে কত অসংখ্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া মহাকবির লোকোত্তর প্রতিভার উদ্দেশে মস্তক অবনত করি। সত্যই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকখানি কালিদাসের প্রৌঢ় প্রতিভার স্বাক্ষর আপন অঙ্গের সর্বত্র বহন করিতেছে। এই নাটকের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত মহাকবির পরিণত শিল্পবোধ সদাজাগ্রত, অতন্দ্র প্রহরীর মতো নাট্যবস্তুর গতিপথ, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রের বিকাশ, তাহাদের উক্তিপ্রত্যুক্তি—সব কিছুই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কিছুমাত্র শিথিলতার চিহ্ন এই অপরূপ শিল্পকর্মের সুপরিমিত সংহতি, শালীনতা, সংযম ও ঔচিত্যকে বিন্দুমাত্রও ব্যাহত করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র প্রস্তাবনায় সূত্রধারের প্রতি নটীর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়—"সুবিহিদপ্পওঅদাএ অজ্জস্স ন কিম্পি পরিহাইস্সদি।"

২

শকুন্তলায় নাটকীয় শিল্পকলা বিষয়ে কালিদাসের অবহিতচিত্ততা যদিও সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত বটে, তথাপি নাটকের উপক্রম ও উপসংহারে, মুখসন্ধিতে ও নির্বহণসন্ধিতে, প্রথমাঙ্কে এবং সপ্তমাঙ্কে কালিদাস যেন শকুন্তলার মর্মকথাটি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় পরিচ্ছন্ন রেখার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই দুইটি অঙ্কের কুত্রাপি শৈথিল্য নাই ; কোথাও যেমন অত্যুক্তির লেশমাত্র নাই, সেইরূপ যতটুকু প্রকাশ করা প্রয়োজন, তাহা প্রকাশ করিতে কবি কোথাও কার্পণ্য প্রদর্শনও করেন নাই। এই দুইটি অঙ্কের বিন্যাস একটি সংহত চতুর্দশপদী কবিতার মতোই দৃঢ়পিনদ্ধ ও বাহুল্যলেশবর্জিত। কালিদাসের শিল্পবোধ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র এই দুইটির অঙ্কের মধ্য দিয়া যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় আখ্যানভাগের ও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার চরিত্রবিকাশের দিক্ দিয়া প্রথম ও সপ্তমাঙ্কের যে পরস্পরসাকাঙ্ক্ষত্ব তাহা রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বহুস্থলে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রাচীন সাহিত্য' হইতে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধার করিতেছি—

> 'যেমন শ্লোকের এক চরণ সম্পূর্ণ মিলের জন্য অন্য চরণের অপেক্ষা করে তেমনি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রথম মিলন সম্পূর্ণতালাভের জন্য এই দ্বিতীয় মিলনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা রাখে। শকুন্তলার এত দুঃখকে নিষ্ফল করিয়া শূন্যে দুলাইয়া রাখা যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে যদি কেবল অগ্নিই জ্বলে,

> কিন্তু তাহাতে অন্নপাক না হয়, তবে নিমন্ত্রিতদের কী দশা ঘটে! শকুন্তলার শেষ অঙ্ক, নাটকের বাহ্যরীতি অনুসারে নহে, তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায় উদ্ভূত হইয়াছে।'[১]

কিন্তু ইহা ত গেল দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের ক্রমপরিণতির দিক হইতে সপ্তম অঙ্কের সার্থকতা বিশ্লেষণ— প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মর্ত্য ভোগলালসার সপ্তম অঙ্কে স্বর্গীয় প্রণয়ে রূপান্তরণ। কিন্তু ভিতরের এই মর্মকথাটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য মহাকবিকে উপযুক্ত বাহ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে— কেননা, ভাব রূপের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কালিদাসও কিভাবে প্রথম অঙ্কে মর্ত্য প্রণয়ের উপযোগী আশ্রমপরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, সপ্তম অঙ্কে কিভাবেই বা মারীচতপোবনের আভোগ নাটকীয় ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখার যোগ্য। এবং এইরূপ বিশ্লেষণের সাহায্যেই কালিদাসের শিল্পসচেতনতা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইতে পারিবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে যে কালিদাস কেবলমাত্র তপোবনের শুদ্ধ, শান্ত, সত্ত্বপ্রধান জীবনধারার প্রতি সহজাত হৃদয়াবেগবশতই[২] নাটকের উপক্রমে ও উপসংহারে আশ্রমের অবতারণা করেন নাই; প্রথম ও সপ্তম অঙ্কের এই আপাতসমতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মহাকবির পরিণত শিল্পবোধ, নাটকীয় ভাবকে যথাযথভাবে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার অবিচলিত তত্ত্বদৃষ্টি ও প্রৌঢ়শিল্পীর অকম্পিত লেখনীর মর্মবেধী রেখাঙ্কন।

৩

প্রথম অঙ্কে দেখি— রথারূঢ় মহারাজ সারথিদ্বিতীয় অবস্থায় মৃগান্বেষণে রত। ক্রমে আশ্রমপরিবেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন— সমিদাহরণে প্রস্থিত বৈখানসদ্বয়ের মুখ হইতে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মহর্ষি কণ্বের মালিনীতীরবর্তী আশ্রমপদ অনতিদূরস্থিত। তখন মহারাজ প্রশ্ন করিলেন— 'অপি সন্নিহিতোঽত্র কুলপতিঃ?'—'কুলপতি কণ্ব কি এক্ষণে আশ্রমে উপস্থিত আছেন?' উত্তর হইল: 'ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলামতিথিসংকারায় নিযুজ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শমযিতুং সোমতীর্থং গতঃ।' সুতরাং মহারাজ দুষ্যন্ত বুঝিলেন এই নির্জন আশ্রমপদের যিনি অধিকর্তা তিনি অনুপস্থিত, কন্যা শকুন্তলার উপরই আশ্রমের পরিচালনভার ন্যস্ত। আশ্রমপ্রবেশের প্রারম্ভেই কালিদাস সামাজিকগণকে জানাইয়া দিলেন যে, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার ভাবী মিলন কুলপতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হইতে চলিয়াছে, মহর্ষির স্নেহ ও শুভাশংসনবর্ষণে ইহা পূত নহে। অপরদিকে সপ্তম অঙ্কে মহারাজ দুষ্যন্ত মাতলিসমভিব্যাহারে স্বর্গ হইতে

---

১ দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২০

২ তুলনীয়: 'কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।'—রবীন্দ্রনাথ: আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩১৫)।

অবতরণ করিতেছেন, দূরে পূর্বাপরসমুদ্রাবগাঢ় হেমকূট পর্বত দেখা যাইতেছে। মাতলি পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"আয়ুষ্মন্। এষ খলু হেমকূটো নাম কিম্পুরুষপর্বতস্তপসাং সিদ্ধিক্ষেত্রম্। পশ্য।
স্বায়ম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽত্র সপত্নীকস্তপস্যতি॥"

এই তপঃসিদ্ধিক্ষেত্র হেমকূট নামক কিম্পুরুষপর্বতশিখরেই প্রজাপতি ভগবান মারীচ পত্নীসমভিব্যাহারে তপস্যায় নিমগ্ন। মালিনীতীরবর্তী আশ্রমটি যেখানে অরক্ষিত, হেমকূটশিখরস্থিত মারীচাশ্রম সেইস্থলে ভগবান মারীচ ও তদীয় ধর্মপত্নী দাক্ষায়ণীর যুগল উপস্থিতির দ্বারা পবিত্র, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনের যোগ্য স্থানই বটে।

প্রথম অঙ্কে কণ্বাশ্রমপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ দুষ্মন্তের কর্ণবিবরে স্ত্রীকণ্ঠের মধুর আলাপ প্রবেশ করিয়াছিল: "ইদো ইদো সহীও।" আলবালসেচনরতা তপস্বিকন্যকাগণের দেহসৌভাগ্যদর্শনে মুগ্ধ মহারাজ দুষ্মন্তের মুখ হইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নির্গত হইয়াছিল: "অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।" ইহাই কি আশ্রমজীবনের উপযুক্ত পরিবেশ? কই, মহারাজ দুষ্মন্তের চিত্তের মালিন্য ত আশ্রমের প্রভাবে দূর হইল না? সখীগণের কলধ্বনিমুখরিত বিশ্রম্ভালাপ ত' শুধুই তাঁহার চিত্তে কামনার সুপ্তবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া দিল মাত্র! প্রিয়ংবদা কর্তৃক সহাস্যকৌতুকে সখী শকুন্তলার 'পয়োধরবিস্তায়িতৃ যৌবন'-এর তিরস্কার, বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীর সাহায্যে কেশরবৃক্ষ কর্তৃক শকুন্তলার আমন্ত্রণ, অনতিদূরস্থিত নবপল্লবাস্তীর্ণ উপভোগক্ষম সহকারবৃক্ষের সহিত স্বয়ংবরবধূ নবকুসুমযৌবনা নবমালিকালতা বনজ্যোৎস্নার সুমধুর মিলনদৃশ্য— এ সকলই আশ্রমজীবনের অননুরূপ। কিন্তু মারীচাশ্রমের বর্ণনায় মহাকবি আশ্রমজীবনের কঠোরতা কি নিপুণভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! আশ্রমের প্রবেশপথেই মাতলি মহারাজ দুষ্মন্তকে দুঃসহ তপশ্চর্য্যায় নিরত স্থাণুবৎ নিশ্চল তপস্বীর মূর্তির দিকে অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সন্দষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসম্পীড়িতঃ।
অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ॥"

মহারাজ দুষ্মন্ত এই সমাধিনিরত মহনীয় মূর্তির প্রতি বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল শুধু একটি সশ্রদ্ধ নমস্কারবাণী— "নমস্তে কষ্টতপসে।" কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে যে উদ্দাম সৌন্দর্যের সঞ্চার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যেমন মহাদেবের তপোভঙ্গেরই উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ, সেইরূপ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথমার্ধে কণ্বাশ্রমের বর্ণনায় কালিদাস যে বিলোলতা, অচিরপ্রবৃত্ত গ্রীষ্মের আবির্ভাবসঞ্জাত প্রকৃতির যে উন্মাদয়িত্রী বর্ণাঢ্য শোভার সমাবেশ করিয়াছেন তাহাও নায়ক-নায়িকার মানসিক চাঞ্চল্য সম্পাদনেরই যথার্থ অনুকূল। কিন্তু সপ্তম অঙ্কে সেই পরিবেশ সৃষ্টির আর প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রথমাঙ্কে দুষ্মন্ত চরিত্রের যে উদ্দামতা, রূপোন্মত্ততা, তাহা বিরহবেদনায় আজ প্রশমিত হইয়াছে; চিত্তস্থৈর্যের, মানসিক প্রশান্তির প্রয়োজন আজ তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক। তাই সেই মানসিক প্রশান্তির প্রতীকস্বরূপ যোগমগ্ন মুনিমূর্তিটিকেই

যেন মহাকবি আশ্রমদ্বারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অদিতিপরিবর্ধিতমন্দারবৃক্ষ প্রজাপতি মারীচের আশ্রমপদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্যন্ত পরমা নির্বৃতি উপলব্ধি করিয়াছেন: "স্বর্গাদধিকতরং নির্বৃতিস্থানম্। অমৃতহ্রদমিবাবগাঢ়োঽস্মি।" আকাশভাষিতের সাহায্যে মহাকবি সুকৌশলে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভগবান মারীচ মহর্ষিপত্নীসঙ্ঘের সম্মুখে দাক্ষায়ণীর কৌতূহলোপশমের জন্য পতিব্রতাধর্মের ব্যাখ্যানে নিরত—

"অয়ে বৃদ্ধশাকল্য। কিমনুতিষ্ঠতি ভগবান্ মারীচঃ। কিং ব্রবীষি।
দাক্ষায়ণ্যা পতিব্রতাধর্মধিকৃত্য পৃষ্টস্তস্যৈ মহর্ষিপত্নীসহিতায়ৈ কথয়তীতি।"

মারীচাশ্রমে প্রবেশের পথে ষোড়শীকণ্ঠের সুমধুর "ইদো ইদো সহীও" ধ্বনি দুষ্যন্তকে অভ্যর্থনা করে নাই। তাহার পরিবর্তে দুষ্যন্ততনয় সর্বদমনের ধীরগম্ভীর কণ্ঠের নেপথ্যভাষিত—"মা খু চাবলং করেহি। কহং গদো এব্ব অত্তণো পকিদিং।"— অশোকতরুমূলে প্রতীক্ষমাণ, দক্ষিণবাহুস্পন্দনে ঈষদ্ আশান্বিত, শকুন্তলাগত চিন্তায় সংশয়াকুলচিত্ত অভ্যাগত মহারাজ দুষ্যন্তের উদ্দেশে মৃদু তিরস্কাররূপে ধ্বনিত হইয়াছে। দুষ্যন্তের দৃষ্টি আপন চঞ্চল প্রকৃতির দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে; তিনি সচেতন হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন— "অভূমিরিয়মবিনয়স্য। কো নু খল্বেষ নিষিধ্যতে।" এই প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে হৈমবত প্রস্থে সমাধিনিরত মহাদেবের আশ্রমদ্বারে প্রহরিরূপে দণ্ডায়মান নন্দীর বর্ণনা মনে পড়িবে—

"লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥"[৩]

শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকারের পূর্বাভাসস্বরূপ মধুকরবৃত্তান্তটি কবি অতিশয় কৌশলের সহিত অবতারণা করিয়াছেন—

"অম্মো সলিলসেঅসম্ভমুগ্গদো ণোমালিঅং উজ্ঝিঅ
বঅণং মে মহুঅরো অভিবট্টই।"

ভ্রমরবাধা হইতে শকুন্তলাকে রক্ষা করিবার ছলেই অজ্ঞাতপরিচয় মহারাজ দুষ্যন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে সখীত্রয়ের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সম্মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন। তপোবনের শান্ত সংযত পরিবেশের মধ্যে ভ্রমরবাধা যেন একটি ক্ষুদ্র বিক্ষোভের মত উপস্থিত হইয়াছে[৪]—অথচ কত স্বাভাবিক ভাবেই না

৩ কুমারসম্ভব, ৩.৪১

৪ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র প্রথম অঙ্ক হইতে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত ভাগে কালিদাস একাধিকবার এই ভ্রমর-রূপকটির (symbol, bee-motif) নানাপ্রসঙ্গে অবতারণা করিয়াছেন, শুধু রূপমোহসঞ্জাত প্রণয়ের অস্থিরতা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভ্রমর' 'মধুকর' প্রভৃতি শব্দ প্রায়শই চঞ্চলস্বভাব বহুবল্লভ নায়কের উদ্দেশে অন্যোক্তিচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলনীয়: পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে হংসপদিকার গীতি—

"অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিদোসি ণং কহং॥"

এবং সেই প্রসঙ্গে বিদূষকের প্রতি দুষ্যন্তের উক্তি: "সখে মাধব্য। মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা। নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।"

মহাকবি ইহার উপস্থাপনা করিয়াছেন! অপর পক্ষে সপ্তম অঙ্কে সর্বদমনের সহিত প্রথম পরিচয়ের সূচনায় সিংহশিশুর কেশাকর্ষণব্যাপৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গকল্প বালকের মূর্তি চিত্রিত করিয়া কালিদাস একদিকে যেমন তপোবনের শান্তরসাস্পদ পরিবেশটি ফুটাইয়া তুলাইয়াছেন[৫], অপরদিকে সেইরূপ দুষ্মন্ততনয়ের বীর্য ও নির্ভীকতা অনুপম ভঙ্গীতে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলারই প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমপরিবেশের মধ্যে শকুন্তলার ন্যায় রূপলাবণ্য যেমন বিসদৃশ, মারীচতপোবনে সর্বদমনের ন্যায় ক্ষাত্রবীর্যসম্পন্ন শিশুর আবির্ভাবও তেমনই আকস্মিক। তাই প্রথমেই যেমন দুষ্মন্তের মনে শকুন্তলার জন্মবিষয়ে সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছে—"অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ" এবং ধীরে ধীরে শকুন্তলার সহচরীদ্বয়ের সঙ্কোচবিজড়িত বিবৃতির মধ্য দিয়া যেমন তাঁহার জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সপ্তম অঙ্কেও সেইরূপ সর্বদমনের আশ্রমবিরুদ্ধবৃত্তিই প্রথম হইতেই দুষ্মন্তকে তাহার জন্মবিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়াছে। যখন দুষ্মন্তের—"অয়ি ভো মহর্ষিপুত্র", এই সম্বোধনের উত্তরে পরিচারিণী তাপসী বলিলেন—"ভদ্দমুহ। ণ খু অঅং ইসিকুমারও", তখন মহারাজ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—"আকারসদৃশং চেষ্টিতমেবাস্য কথয়তি। স্থানপ্রত্যয়াত্তু বয়মেবংতর্কিণঃ।" এইভাবে প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকার ও পরিচয় এবং সপ্তম অঙ্কে সর্বদমন ভরতের সহিত মহারাজ দুষ্মন্তের প্রথম পরিচয়ের বর্ণনার মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। অথচ এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুইটি দৃশ্য কতই বিভিন্ন! প্রথমটিতে শকুন্তলা তাঁহার অমর্ত্যসুলভ রূপলাবণ্য লইয়া মহারাজ দুষ্মন্তের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহার অনুপম রূপসম্পদকে কেন্দ্র করিয়াই দুষ্মন্তের সকল জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য, বিস্ময় ও আত্মাভিমান আবর্তিত। অপরটিতে শকুন্তলা নেপথ্যান্তরালস্থিতা, সর্বদমনের অলৌকিক দেহসৌভাগ্য, শিশুসুলভ অথচ বীরত্বব্যঞ্জক আচরণের উৎস-অন্বেষণেই দুষ্মন্তের সকল হৃদয়বৃত্তি একাগ্র।[৬] প্রথম অঙ্কে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলারই প্রতিচ্ছবি, আশ্রমের উৎফুল্ল পরিবেশের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ একাত্মতাপ্রাপ্ত। শেষ অঙ্কে সর্বদমনের পরিচারিকা-রূপে কালিদাস যে তাপসীদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারাও যেন মারীচাশ্রমের কঠোর সংযম, তাহার রিক্ত নিরাভরণ পরিবেশেরই অনুরূপ। কোথায় গেল কণ্বাশ্রমের সেই বাতান্দোলিত লতাসনাথ কেসরবৃক্ষ, কোথায় বনজ্যোৎস্নালিঙ্গিত সহকারবৃক্ষ, কোথায় বা হাস্যপরিহাসনিরতা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। সপ্তম অঙ্কে যেন কোন্ এক যাদুদণ্ডস্পর্শে সব কিছুই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে শকুন্তলার শুদ্ধান্ত-দুর্লভ রূপ ও যৌবনের বর্ণনায় প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত প্রগল্‌ভতা সংবরণ করিতে পারেন নাই, সপ্তম অঙ্কে সেই শকুন্তলারই বিরহপাণ্ডু বিবিক্তবর্ণাভরণা দেহযষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই দুষ্মন্ত বিস্ময় ও বেদনায় বিহ্বল হইয়া শুধু বলিয়াছেন—

---

৫ তুলনীয় দিবাকরমিত্রের আশ্রমের বর্ণনায় দেখিতে পাই কিভাবে সিংহশার্দূলাদি হিংস্র শ্বাপদগণও তপোবনের পরিবেশের প্রভাবে শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। তুলনীয়—

"জাতসৌগতশীলশীতলস্বভাবৈঃ শার্দূলৈরপ্যমাংসাশিভিরুপাস্যমানম্, আসনোপান্তোপবিষ্টবিস্রব্ধানেককেসরিশাবকতয়া মুনিপরমেশ্বরম্ অকৃত্রিম ইব সিংহাসনে নিষণ্ণম্..."— বাণভট্টকৃত 'হর্ষচরিত' : অষ্টম উচ্ছ্বাস।

৬ তুলনীয়: "প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার সহিত পরিচয় হইবার পূর্বে দূর হইতে তাহার নবযৌবনের লাবণ্যলীলা দুষ্মন্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল। শেষ অঙ্কে শকুন্তলার বালকটি শকুন্তলার সমস্ত লাবণ্যের স্থান অধিকার করিয়া লইয়া রাজার অন্তরতম হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিল।"— প্রাচীন সাহিত্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড।

"অয়ে। সেয়মত্রভবতী শকুন্তলা। যৈষা
বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥"

সর্বশেষে দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

"শকুন্তলে। অবলম্ব্যতাং পুত্রঃ। ত্বাং পুরস্কৃত্য ভগবন্তং
দ্রষ্টুমিচ্ছামি।"

—তখন দাম্পত্যজীবনের যে পরিপূর্ণ অখণ্ড মাধুর্যপূর্ণ আলেখ্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মীলিত হইল, তাহার সহিত তুলনায় প্রথম অঙ্কে নায়ক-নায়িকার সঙ্কোচবিজড়িত বাধাসঙ্কুল প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটি কিরূপ নিষ্প্রভই না দেখায়। ভগবান্ মারীচের মুখ দিয়া কত সংক্ষেপে কালিদাস দুষ্যন্ত-শকুন্তলা-সর্বদমনের মিলনের মাধুর্য ও পরিপূর্ণতা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—

"দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎসমাগতম্॥"

আজ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার দ্বিধাবিভক্ত সত্তা সর্বদমনরূপ আনন্দগ্রন্থির দ্বারা যুক্ত হইয়া একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে—

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥"[৭]

মহাকবি গ্যেটে যথার্থই বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলায় যে প্রেমের পরিণতি কালিদাস চিত্রিত করিয়াছেন তাহা ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে উত্তরণ।

৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক প্রবন্ধে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকটির মর্মকথা অনবদ্য ভঙ্গীতে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, এবং আমার যতদূর ধারণা, তিনিই একমাত্র সমালোচক যিনি শকুন্তলার উপক্রম ও উপসংহারে তপোবনদ্বয়ের সমাবেশের মূলে কালিদাসের যে বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভা ও নীতিবোধ প্রচ্ছন্নভাবে কার্য করিতেছে, তাহা পাঠককুলের সম্মুখে অল্পপরিসরের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সুবিখ্যাত 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলিতেছেন—

"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে

৭ উত্তররচরিত: তৃতীয় অঙ্ক, শ্লোক ১৭।

ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন— এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

"আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট— পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন,[৮] যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে— সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতিবৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

"এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য। আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।"[৯]

অথচ কালিদাস তাঁহার এই নীতিবোধ কত স্বাভাবিক পরিবেশচিত্রণ ও ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়াই না প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে কণ্বতপোবনের যে উপবনাত্মক রূপ[১০] তাহাও যেমন সহজ সুন্দর এবং নাটকীয় কথাবস্তু ও পাত্রপাত্রীর চরিত্রের উপযোগী, সপ্তম অঙ্কে মারীচ-তপোবনের বিবিক্ত অনুদ্বেল রূপটিও সেইরূপ পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, নাট্যবস্তুর তাৎকালিক সুরবিন্যাস ও পাত্রপাত্রীর চরিত্রের ক্রমপরিণতিরই যোগ্য পটভূমি। একটি হইতে আর একটিতে উত্তরণ কি নিপুণভাবেই না চিত্রিত হইয়াছে!

---

৮ "বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা—" শ্লোকটির ভাবানুবাদ। যদিও অনুবাদটি মূলানুগ হয় নাই, তথাপি বর্ণনাটির গাম্ভীর্য ও মহিমা অক্ষুণ্ণ আছে।

৯ দ্র° 'শিক্ষা' : তপোবন
অপিচ—'প্রাচীন সাহিত্য'

১০ "কিদং তুএ উবৰণং তবোবণংত্তি পেক্খামি"
—দ্বিতীয় অঙ্কে মহারাজ দুষ্যন্তের প্রতি বিদূষকের উক্তিটি স্মরণীয়

ভারতবর্ষীয় সভা জনপ্রতিনিধির ভূমিকায় ১৮৬৭-১৮৭১

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবর্ষীয় সভা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। পূর্বেকার কার্যক্রমের সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত হইয়াছি। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার কতকটা পরিবর্তন ঘটে। এতদিন সভা মুখ্যতঃ স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে স্মারকলিপি এবং আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়া নিজেদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করিতেন। এই সময়ে প্রচলিত রীতিপদ্ধতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশবাসীর মধ্যেও সাধারণ সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া জনমত গঠনে সভার নেতৃবৃন্দ প্রবৃত্ত হইলেন। জনসভা বা সাধারণ সভার মাধ্যমে তাঁহাদের কার্যাকার্য সাধারণের গোচরীভূত করিতে অগ্রসর হন। ইহার দুইটি শুভফল সম্বন্ধেও তাঁহারা চিন্তা করেন। স্বদেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের কথা জনসাধারণকে জানাইবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। দ্বিতীয়ত, এই উপায়ে তাঁহাদের সমর্থন লাভও সম্ভব হয়। এক কথায় সভার প্রস্তাবগুলির পশ্চাতে যে জনসাধারণের সমর্থন রহিয়াছে তাহা সূচিত হইয়া এই সকল বিষয়ের গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট মহলে ক্রমশঃ অনুভূত হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ পূর্বের ন্যায় যথেচ্ছ কার্য করিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতে শুরু করেন। কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ে এতদৃশ জনমতের নিকট তাঁহারা নতি স্বীকার করিতেও বাধ্য হন। আমরা ক্রমে ইহা দেখিতে পাইব।

সভা এই সময়ের মধ্যে যে-কয়টি সাংগঠনিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ দ্বারা নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন তাহার মধ্যে প্রথমেই বাংলা সরকারের পুনর্গঠন ব্যাপারটির উল্লেখ করিতে হয়। বঙ্গপ্রদেশ বা প্রেসিডেন্সি পূর্বাঞ্চলের এক বিরাট ভূখণ্ড লইয়া গঠিত। বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথাপি প্রথম হইতেই ইহা বড়লাটের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে ছিল। ১৮৫৩ সনের সনন্দে ইহাকে ছোটলাটের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হয় বটে কিন্তু তখনও সপরিষদ বড়লাটের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ইহার উপর প্রায় অব্যাহত ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশদ্বয় স্বতন্ত্র গবর্নর বা লাটের অধীন থাকিয়া স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইত, এবং প্রতিটি প্রদেশে গবর্নরের একটি পরিষদও ছিল। বঙ্গপ্রদেশের আয়তন ইহার প্রত্যেকটি হইতে বৃহত্তর হইলেও উক্ত সনন্দে ইহাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমমর্যাদা দেওয়া হয় নাই। ইহার ফলে নানা কারণে শাসনতান্ত্রিক বাধাবিঘ্ন ও বিপর্যয় উপস্থিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষকালে কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অবলম্বিত নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত বিপুল লোকক্ষয়ের উল্লেখ করা চলে। ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বঙ্গপ্রদেশকে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো সমমর্যাদা সম্পন্ন সপরিষদ গবর্নরের শাসনাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বিলাতে পার্লামেন্টের নিকট একটি যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ স্মারকলিপি পাঠাইলেন (১৭ মার্চ ১৮৬৮)। ভারতসচিব এরূপ যুক্তিপূর্ণ স্মারকলিপি সরাসরি বাতিল করিতে না পারিয়া সপরিষদ বড়লাটের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট গ্রে সাহেব পূর্বেই এরূপ প্রস্তাবের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া বড়লাট এবং তাঁহার সদস্যবর্গের

অনেকে পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেন। ঐ পরস্পর বিরোধী মত সম্বলিত ডেচ্‌পাচ্‌ বিলাতে পৌছিলে ভারতসচিব ঐরূপ প্রয়োজনীয় প্রস্তাবটি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু করিতে রাজি হইলেন না। দীর্ঘকাল পরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সভার এই অত্যাবশ্যক প্রস্তাবটি নানা চড়াই-উৎরাই পার হইয়া কার্যে রূপায়িত হইবার সুযোগ পায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলাদেশ সপরিষদ গবর্নর কর্তৃক শাসিত একটি নূতন প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। এখানে বলিয়া রাখি যে বঙ্গভঙ্গ জনিত জনবিক্ষোভ প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি পন্থা অবলম্বিত হয় ইহা তাহার মধ্যে একটি। এই সময় হইতে বিহার-উড়িষ্যা ছোটলাট শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। আসামকে কিন্তু গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেই বঙ্গ প্রদেশ হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সভা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষের অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বেসরকারী পরামর্শদাতা কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তখন পরিষদে বাজেট পাস হইবার পর ইহা গেজেটে প্রচারিত হইত। বাজেটভুক্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে আইন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যগণ আলোচনা তো দূরে থাক, এমন কি প্রশ্নাদি করিবারও অধিকার পান নাই। অথচ, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ভারতবাসীরা পূর্বাহ্নে কিছু না জানিতে পারায় কত অনর্থেরই সৃষ্টি হইত। ভারতবর্ষীয় সভা নিজস্ব প্রস্তাব সম্বলিত একটি স্মারকলিপি ভারত-সচিবের নিকট পেশ করেন। ভারতসচিব যথারীতি ইহা ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সপরিষদ বড়লাট এই প্রস্তাব কার্যকরী করার পক্ষে নানারূপ দোষক্রটি দেখাইয়া তাহাকে লিখিলেন। ভারতসচিব এ বিষয়ে আর বিশেষ অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করেন নাই। অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি লইয়া বাজেট পাস হইবার পরে কি রূপ আন্দোলন ও জনবিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহা একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব।

সভার এই সময়কার আর একটি প্রস্তাব—ভারতশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটি রয়াল কমিশন গঠন। কোম্পানির আমলে প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর যখন সনন্দ নূতন করিয়া দেওয়া হইত তখন পার্লামেন্টে ভারত শাসন সম্পর্কে অনুকূল ও প্রতিকূল বিস্তর আলোচনা হইত। এখন আর এই সুযোগ নাই। সুতরাং একটি রয়াল কমিশন দ্বারা মধ্যে মধ্যে শাসন সম্পর্কিত বিষয়াদির অনুসন্ধান করা একান্ত দরকার। ভারতবর্ষীয় সভা এইরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই রয়াল কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাদের এই প্রস্তাব একটি স্মারকলিপির আকারে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করেন ভারতহিতৈষী সার্‌ হেনরি ফাসট (১৬ মার্চ ১৮৬৮)। ভারতবর্ষীয় সভার উক্ত প্রস্তাবে স্থানীয় ইউরোপীয়দেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই ওজর দেখাইয়া ইহাতে আপত্তি করেন যে, ইতিপূর্বেই ভারতীয় অর্থব্যবস্থা তথা বিলিবণ্টন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নিমিত্ত পার্লামেণ্ট হইতে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছে। কাজেই তখন ঐরূপ রয়াল কমিশনের প্রয়োজন নাই। সিলেক্ট কমিটি বিলাতে বসিয়াই ইউরোপীয়দের নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ভারতবাসীদের কোনোরূপ মতামত যাজ্ঞা করা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় বিলাতে গিয়া ভারতবাসীদের উক্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ সিলেক্ট কমিটির কয়েকজন সদস্যকে অগত্যা ভারতবর্ষে পাঠাইতে রাজি হন। সভা কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত নেতৃস্থানীয় ওয়াকিবহাল কয়েক ব্যক্তির নামও স্থির করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

কমিটির সভ্যেরা আর ভারতে আসিলেন না! সভার রয়্যাল কমিশন গঠনের মূল প্রস্তাব তো বানচাল হইলই সরকারী অর্থব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জানানোও আর সম্ভব হইল না।

ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ ঐ যুগে সিবিল সার্বিসকে দুইটি কারণে বিশেষ গুরুত্ব দান করিতেন, প্রথম সাংগঠনিক ও দ্বিতীয় প্রশাসনিক। তখনকার দিনে বিবিধ বিষয়ে সরকারী নীতি নির্ধারণে সিবিলিয়ান কর্মীদের যথেষ্ট হাত ছিল। নেতৃবৃন্দ মনে করিতেন ভারতবাসীরা এই সার্বিসভুক্ত হইলে ভারতের শাসননীতি কতকাংশেও ভারতবাসীর অনুকূলে নির্ধারিত হইবে। প্রশাসনিক ব্যাপারে সিবিলিয়ান কর্মীরা আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। ভারতবাসীরা এই ক্ষমতার অধিকারী হইলে শাসনগত অনাচার নিরাকৃত হইবে এবং ভারতবাসীর দুঃখ দারিদ্র্য বিদূরিত হইয়া স্বদেশের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। সভা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের গ্রহণ সম্পর্কে বরাবর আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের পর বিলাতস্থ কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাব ক্রমশঃ বিভিন্ন কার্যের মধ্যদিয়া পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্য দৃষ্টে তাঁহাদের যেন হঠাৎ টনক নড়িল। পর পর এমন কতকগুলি নিয়ম পরীক্ষক মণ্ডলী করিয়া লইলেন যাহার ফলে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু মনমোহন ঘোষ পরীক্ষা দিয়া আর কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কলমের খোঁচায় পরীক্ষার্থীদের বয়স ২৩ হইতে ২১এ কমান হয়; আবার ক্লাসিক্স তথা সংস্কৃতের নম্বরও অতিমাত্রায় হ্রাস পায়। ভারতবর্ষীয় সভা এই ধরণের অবিচার নীরবে সহ্য করিতে পারেন নাই। মনমোহন স্বদেশে ফিরিলে তাঁহার প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিবার জন্য ১৮৬৭, ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা একটি সভা আহ্বান করিলেন। এখানে মনমোহন তাঁহার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে বিবৃত করেন। উল্লেখযোগ্য যে, বিলাতে অবস্থানকালেই তিনি সংবাদপত্রে এই অবিচারের বিষয় লেখেন এবং তাঁহার লেখা ঐখানেই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ঐ সময় বিলাতে কতিপয় ভারতহিতৈষী ইংরেজ ও ভারত প্রত্যাগত প্রাক্তন ইংরেজ কর্মচারী মিলিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কথা পরে আরও কিছু বলা যাইবে। এই সভা উক্তরূপ অবিচারের প্রতিকার কল্পে ভারতসচিবের সঙ্গে পত্রালাপ করিতে শুরু করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার অভিমত গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনের মতো ভারতবর্ষে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে একই কালে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক। তাহারা আরও বলেন যে, এই পরীক্ষায় ভারতবাসীদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত স্থির করিয়া দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় সভা এই সমিতির কার্যকলাপ অভিনন্দিত করিয়া ইহার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। যাহা হোক ভারতসচিব এই বিষয়টি লইয়া একেবারে নীরব থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট স্কলারশিপ্ নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে ভারতসন্তানেরা বিলাতে গিয়া বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন এবং সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্যও তৈরি হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। কারণ উক্ত নিয়ম দুইটি বলবৎ রহিয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সভা কেন একটি রয়্যাল কমিশনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার কারণও শীঘ্রই অনুভূত হইল। সরকারী অর্থব্যবস্থা তথা করধার্য কর-আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে জনমত প্রায়ই উপেক্ষিত হইত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপন কালে ইহা বিশেষরূপে বুঝা গেল। এই বিষয়ক বিলে বলা

হইল, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী লোককে বার্ষিক দুইশত টাকা আয়ের উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। সরকারী ও বেসরকারী বেতনভোগী কর্মচারীদেরও এই ট্যাক্সের আওতায় আনা হয়। বস্তুতঃ ইহা ছিল আয়করেরই নামান্তর। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। ইহাতে কিছু ফলও ফলিল। বার্ষিক হাজার টাকা কমের বেতনভোগীরা রেহাই পাইলেন। এখানে বলা দরকার যে, এই কর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়। ১৮৬৮-৬৯ সনের বাজেটে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। বার্ষিক পাঁচশত টাকা আয় পর্যন্ত ট্যাক্স মুক্ত করা হইল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু পরবৎসরে মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। বিগত ১৮৬৫ সনে যে আয়কর রদ হইয়াছিল তাহা পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৮৭০-৭১ সনের বাজেটে স্থির হইল পাঁচশত টাকা আয়ের উপর সাধারণ ভাবে করধার্য করা হইবে শতকরা ৩১/৮ টাকা হিসাবে। ইহা লইয়া পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবারে ভারতীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়েরাও সভা করিয়া একযোগে এই ধরণের আয়করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। তাঁহারা এবারেও এইরূপ অনাচার প্রতিরোধকল্পে একটি রয়াল কমিশনের প্রস্তাব সম্বলিত একখানি স্মারকলিপি বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিলেন। আয়কর আদায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনাচার অবিচারের অবকাশ ছিল। ভারতবর্ষীয় সভা এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কিছু ফল হইল। সরকার নির্দেশ দিলেন যে, কালেকটার কর্তৃক ধার্য আয়কর সরকারী পাওনা আদায়ের প্রচলিত আইনমাফিক পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে।

এখন ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন পরিচালনার কথা বলা যাক। আমাদের আলোচ্য সময়ের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক একাধিক সরকারী ও বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইহার দ্বারা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রস্তাবকারীদের ঔদাসীন্যই সূচিত হইল। লাহোরে ওরিয়েণ্টাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেথুন সোসাইটিতে একটি যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি দেখান যে, ইংরেজির চর্চার মাধ্যমেই প্রাচ্য ভাষা-সাহিত্য আলোচনার অধিকতর সুযোগ পাওয়া যাইবে। শুধুমাত্র প্রাচ্য ভাষাগুলি শিখিলে ইহার ফল ভালো হইবে না। দ্বিতীয় প্রস্তাব আসিল আলিগড় হইতে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভারতবর্ষীয় সভার যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল আলিগড়ে। পরবর্তী-কালের মুসলমান নেতা সৈয়দ আহমেদ খাঁ ইহার সম্পাদকরূপে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি একটি ভার্ণাকুলার ইউনিভার্সিটি স্থাপনের কথা পাড়িলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও যাহাতে দেশ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহারই কথা ছিল এই প্রস্তাবের মধ্যে। এই বিষয়ে মূল সভা কলিকাতা হইতে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিলেন এবং প্রস্তাব উত্থাপনকারীকে মৃদু ভর্ৎসনা করিতেও বিরত হইলেন না। বস্তুতঃ ঐ সময়ে ভারতের নেতৃবৃন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজি শিক্ষার বহুল প্রসার ঘটিলে ভারতবাসীদের কি দেশীয় ভাষা সাহিত্যে, কি ঐহিক বিষয় প্রভৃতি নানা দিকে দ্রুত উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। ভারতবর্ষীয় সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮) অন্যতম প্রাচ্যবিদ্যাবিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া বলেন। তিনি আলিগড় প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করিলেন। তিনি বলেন দেশীয় ভাষা সমূহের উন্নতি এমন কি প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের পক্ষেও ইংরেজি শেখা একান্ত আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি বাঙালি মনীষী ও সাহিত্যসাধকদের দৃষ্টান্ত দেখান।

প্রসঙ্গতঃ কবিবর মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ দানের কথা তিনি উল্লেখ করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তখন বাঙলাভাষী মাত্রেরই জানা, সুতরাং তিনি তাঁহাদের কথা বলিতে বিরত থাকেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত, যদিও বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইংরেজি সাহিত্য হইতে এই-সকল মনীষী বিস্তর উপাদান পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল আরও বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা লাভের ফলে অধিক সংখ্যায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন বাঙালিরা এই আশা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাতেই বা ক্ষতি কি? অপরাপর প্রদেশ-বাসীরাও ইংরেজি শিখুন এবং সরকারী পদ লাভ করুন। ইহাতে ঐহিক লাভও যথেষ্ট। উত্তরপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলালের উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন যে, বিভিন্ন জেলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারকল্পে অধিক সংখ্যায় কলেজ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার।

ইংরেজি তথা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দ যখন এতাদৃশ অভিমত পোষণ করিতেন তাহারই মধ্যে আসিল উচ্চশিক্ষা নিরোধক সরকারী প্রস্তাব। সপরিষদ বড়লাট ১৮৬৯, ৯ সেপ্টেম্বর একটি রেজউলিশ্যনে এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারী কোষাগার হইতে এত অধিক অর্থব্যয় আদৌ সমীচীন নহে। ইহার একটি মোটা অংশ জনশিক্ষার খাতে ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ছোটলাট গ্রে সাহেব উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন, তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে কি কি প্রমাণ রহিয়াছে তাহা জানিতে চান। স্বদেশীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইতিমধ্যেই উক্ত সরকারী প্রস্তাবে প্রমাদ গণিলেন। ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কঠোর প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় তাঁহারা ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন। এটিও তাহার একটি বহিঃপ্রকাশ বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লন। শুধু কলিকাতায় নয়, দিকে দিকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মফস্বলের বিভিন্ন স্থলে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে ৪৩টি জনসভার আয়োজন হয় এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজি শিক্ষার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতবর্ষীয় সভা তখন জনসমাজের মুখপাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সভার নেতৃবৃন্দ এই জনমতকে সংহত ও সুপরিচালিত করিবার জন্য কলিকাতায় একটি বৃহত্তর প্রতিনিধিমূলক সভা অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইলেন। ১৮৭০, ২ জুলাই এই সভার অধিবেশন হয়। বাংলাদেশের ১৭টি জেলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়া এই সভায় যোগদান করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এই সভাকে FIRST PARLIAMENT IN INDIA বা ভারতে প্রথম প্রতিনিধি-সভা বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। পত্রিকার কথায়—

"Fortythree district meetings were held and nineteen delegates send to Central Committee. Thus the British Indian Association may now fairly claim to be the Parliament if not of India but of Bengal, and we dare say another impolitic step of Government will still more augment the power of that body and of the nation."

এই সভা অনুষ্ঠান ভারতবর্ষীয় সভার এক অপূর্ব কীর্তি। এখানে পৌরোহিত্য করেন সভার সভাপতি রমানাথ ঠাকুর। অধিবেশন আরম্ভে সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সরকারী প্রস্তাবের প্রতিকূলে এবং ইংরেজি

শিক্ষার অনুকূলে ইতিমধ্যেই সর্বত্র যে জনমত সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। শুধু রাজনীতিবিদগণই নহেন শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক সাংবাদিক সমাজসেবী শিল্পব্যবসায়ী ব্যবহারজীবী চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং কেহ কেহ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভায় সর্বানুকূল্যে চারিটি মূল প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ইহার উপর যাহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন— মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, কালীমোহন দাস, কিশোরীচাঁদ মিত্র। প্রস্তাব চারিটি এই :—

"That in the deliberate judgement of this meeting the people of India have derived the greatest benefits social, moral and intellectual from the system of education through the medium of the English language inaugurated by the late Lord William Bentick and encouraged and supported by successive Governor-General : and that this meeting would regard as a national calamity the withdrawal or diminution of the assistance now afforded by the state to English Schools and Colleges.

"II That this meeting, while strongly advocating the diffusion of English Education, does not the less desire the provision, by every reasonable means, of Vernacular Education. But in the opinion of this meeting the only satisfactory basis of Vernacular Education is the cultivation of Western Literature and Science.

"III That while by the spread of a high and liberal education by means of English language the British Govt. would most fully accomplish its mission in this country it would at the same time derive from it most important economic advantages ; in as much as it would thereby lessen the cost of administration, would greatly facilitate commerce ; would render its law intelligible to all Classes, and would establish a bond of sympathy between the rulers and the ruled.

"IV That in no civilised country are the great seminaries of learning supported solely by payments from the students and the principle is every where acknowledged that it is the duty and interest of the State to encourage liberal education, is applicable with still greater force in India, where the class of students is poor in comparison to any other country, and where the necessity of keeping up a staff of Europian Professors greatly increases the cost of education."

প্রস্তাবগুলিতে এই মর্মে বলা হইল যে— ১. লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা

প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তী বড়লাটগণ ইহা বরাবর চালু রাখেন। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই স্কুলকলেজ সমূহে সরকারী সাহায্যের সংকোচসাধন জাতীয় দুর্দৈব বলিয়া সভা মনে করেন। ২. ইংরেজির পক্ষপাতি হইয়াও সভা অঙ্গীকার করেন যে, দেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলেই দেশীয় ভাষার যথাযোগ্য উন্নতি সম্ভব। ৩. ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হেতু গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাশ্রয় ঘটিবে। ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে এবং বিধিবদ্ধ আইনসমূহ শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য হইবে। শাসক ও শাসিতেরা ভাব-বিনিময়ের দরুণ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবেন। ব্রিটিশ অধিকারের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে। ৪. সভ্য দেশসমূহে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় ছাত্র বেতন দ্বারা সংকুলান হয় না; সরকার ইহার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ভারতে সরকারের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বরাদ্দ করা আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র এবং শিক্ষাদানের নিমিত্ত অধিক বেতনে ইউরোপীয় অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিতে হয়।

এই সকল প্রস্তাবের নিরিখে আগে হইতেই ভারতসচিবের নিকট প্রেরণের নিমিত্ত একখানি স্মারকলিপি রচিত হইয়াছিল। সভায় এখানি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার পক্ষে এই স্মারকলিপি অবিলম্বে ভারতসচিবের কাছে প্রেরণ করেন। বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই বিষয়টি লইয়া বেশ কিছুকাল আলোচনা চলে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কার্যতঃ ইংরেজি শিক্ষা সংকোচনের পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। ১৮৭১, ২৫ অক্টোবর তারিখে লিখিত বড়লাটের ডেসপ্যাচের উত্তরে ভারতসচিব যে ভাষায় লেখেন তাহা পাঠকের নিকট অদ্ভুত ঠেকিবে—

"The Despatch of your Excellency, dated the 25th October (1871) is in effect an emphatic denial of the imputation brought against the policy of your Government in regard to education. You point out that the opinions and intention imputed to you have no place in your policy and no sanction from your declaration, and your statement to this effect, I trust, put an end to the misconception which have risen."

অর্থাৎ কিনা এদেশবাসীরা বড়লাটের কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই, উচ্চশিক্ষা সংকোচ করার মতলব তাহার আদৌ নাই! ইংরেজি তথা উচ্চশিক্ষার ব্যাপার লইয়া বিভিন্ন মফস্বল শহরগুলিতে এই সময়ে যে জাগরণ উপস্থিত হয় তাহাকে সংহত করিয়া একটি স্থায়ী রূপদানেরও চেষ্টা চলিতে থাকে। ভারতবর্ষীয় সভার নেতৃবৃন্দও এ বিষয়ে সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিভিন্ন মফস্বল শহরে দেখিতে দেখিতে বহু রাজনৈতিক সভার উদ্ভব হয়।

ভারতবর্ষীয় সভা উচ্চশিক্ষা সংকোচ ব্যাপারের বিরোধিতায় বস্তুতঃ কৃতকার্য হইলেও আর একটি বিষয়ে কিন্তু সফল হইতে পারিলেন না। কিছুকাল হইতে কোনো কোনো বাঙালি মনীষী জনশিক্ষা তথা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার কল্পে সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান। তাঁহাদের প্রস্তাবের সপক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে নূতন কর ধার্য করা সম্ভব এ সম্বন্ধেও তাহারা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ রেভারেণ্ড লালবিহারী দের কথা সকলের আগে আমাদের মনে হয়।

ভারতসরকার ও বাংলা সরকারের মধ্যে ১৮৬৮ এপ্রিল মাস হইতে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। সভার নেতৃবৃন্দ নূতন কর স্থাপনের কথা অবগত হইয়া জনসভার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের সপক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন। তাঁহারা জনসভায় ও স্মারকলিপিতে এই দৃঢ়মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভূমির উপর কোনোরূপ নূতন কর স্থাপিত হইলে তাহা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ভঙ্গ করারই সামিল হইবে। ভারত সরকার কিন্তু অটল। তাহারা এই অজুহাত দেখান যে, প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, হাসপাতাল প্রভৃতির নিমিত্ত কোষাগার হইতে ব্যয় করিতে অসমর্থ, এবং এই কারণে নির্দেশ দেন যাহাতে বাংলা সরকার একটি নূতন কর ধার্য করিতে অগ্রসর হন। এই কর-ই পরে 'রোড সেস' বা পথকর বলিয়া আখ্যাত হয়। ভারত সরকার এবার আটঘাট বাঁধিয়াই আসরে নামিলেন। তাহারা আগে হইতেই এ বিষয়ে ভারতসচিবের অনুমতি পত্র আনাইলেন।

১৮৭০, ১২ মে তারিখে ভারতসচিব ডিউক অব আগ্রাইল এই মর্মে লিখিলেন যে, করধার্যযোগ্য যাবতীয় সম্পত্তির উপরেই নূতন কর বসানো যাইতে পারিবে। সপরিষদ বড়লাটের প্রস্তাবিত নূতন কর ধার্য হইলে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর প্রতিকূল হইবে না। বিলাতের কর্তৃপক্ষের ইহাই সুচিন্তিত অভিমত। ইহার পরই বাংলা সরকার এই উদ্দেশ্যে নূতন আইন প্রণয়নে অগ্রসর হন। এ বিষয়কে কার্যক্রম সুপারিশের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া তাহারা একটি কমিটি গঠন করেন। এবং ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ জানান তাঁহারা যেন একজন সদস্য এই কমিটিতে পাঠান। সভা মূলতঃ এতাদৃশ নূতন কর স্থাপনের প্রথম হইতেই বিরোধিতা করিলেও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বিরত হইলেন না। অবশ্য তাঁহারা স্পষ্টই জানান যে তাঁহারা এরূপ নূতন কর ধার্য করার নীতিগতভাবে বিরোধী এবং এই নীতি লইয়া কমিটিতে কোনো আলোচনা হইতে পারিবে না। বাংলা সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হইলে সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্র উক্ত কমিটিতে প্রেরিত হন। সরকারও তাহাকে কমিটীতে আনুষ্ঠানিক-ভাবে নিযুক্ত করেন। কমিটির কার্য শেষ হইলেও ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু ইহার বিরোধিতা করিতে ছাড়েন নাই। এবং এই উদ্দেশ্যে সাধারণ সভারও আয়োজন করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাংলা সরকার এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লন। সভা যখন দেখিলেন নূতন কর ধার্য হইবেই তখন তাহারা সাধারণের বিবিধ অসুবিধার কথা যেমন অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিজনিত অজন্মা শস্যহানি ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা সরকারকে লিখিতভাবে জানান। সরকার এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, যে সব অঞ্চলে এইরূপ দুর্দৈব দেখা দিবে সে সব অঞ্চল নূতন কর হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি পাইবে। তাহারা স্থির করেন যে ১৮৭২, ১ সেপ্টেম্বরের পূর্বে নূতন কর আদায় করা হইবে না।

সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভা সাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ বিশেষভাবে কার্য করিতে লাগিলেন। এই ক'বৎসরে জাতির স্বার্থহানিকর ও উন্নতির পরিপন্থী যে সব প্রস্তাব ও বিধিব্যবস্থা হইতেছিল তাহার বিরুদ্ধে সভার কার্যকলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইলাম। এই সময়ে অপরাপর বিবিধ বিষয়েও নানা আইন বিধিবদ্ধ হয়। সভা জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই সেই বিষয়ে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেন, কখনো কখনো আন্দোলন করিতেও পশ্চাদপদ হন নাই। এখানে মাত্র এইরূপ দুইটি আইনের বিষয় কিছু বলিব। প্রথমেই আসাম 'কুলি আইন'এর কথা বলা যাক।

১৮৬৩ ও ৬৫ সনে আসাম চা-বাগানের শ্রমিক সংগ্রহ, চা-বাগানে শ্রমিক প্রেরণ, বাগানে পৌছিবার

পর চা-কর ও শ্রমিকদের ভিতরকার সম্পর্ক প্রভৃতি লইয়া পরপর দুইটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারতবর্ষীয় সভা ঐ ঐ সময়ে এবম্বিধ আইন সম্পর্কে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে কিছু ফলও হইয়াছিল। আমরা পূর্বে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। চা-করগণ কিন্তু এইরূপ আইনে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহারা আইনকে কঠোরতর ও নিজেদের অধিকতর অনুকূল করিবার জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। বাংলা সরকার তাহাদের খুশি করিবার নিমিত্ত তাহাদেরই অনুকূলে ১৮৬৭ সনে একটি আইন পাস করেন। ভারতবর্ষীয় সভা কিন্তু ইহার কোনো কোনো ধারার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলেন। এবং যাহাতে এই আইনটি বড়লাটের সম্মতি না পায় সে জন্য যুক্তি প্রমাণ সহকারে একখানি স্মারকলিপি তাঁহার নিকট পেশ করেন। ইহাতে বড়ই কাজ হইল। বড়লাট এই আইনে সম্মতি দিলেন না। সভা প্রস্তাব করিলেন যে, আসামের চা-বাগান তথা শ্রমিক সংগ্রহ, চা-কর ও শ্রমিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত অবিলম্বে একটি কমিশন বসানো হোক। সভার এই প্রস্তাবের যুক্তিযুক্ততা স্বীকৃত হইল সরকার কর্তৃক একটি কমিশন নিয়োগের দ্বারা। কমিশন যথাবিধি নিযুক্ত হইল এবং সরকারের অনুবোধে সভা দিগম্বর মিত্রকে ইহার সদস্যরূপে পাঠাইতে সম্মত হন। কিন্তু চা-কর সম্প্রদায়ের আপত্তি হেতু কোনো বে-সরকারী সদস্য না লইয়াই কমিশন গঠিত হইল। কমিশনের সুপারিশ ক্রমে বাংলা সরকার আসাম কুলি আইন (১৮৬৮ খ্রী.) নূতন করিয়া পাশ করিলেন। ইহাতেও কিন্তু শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচিল না। বহু বৎসর পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় সভার তৎকালীন সম্পাদক সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল সুপ্রিম কৌন্সিলে (ভারতীয় আইন পরিষদ) এই আইনটিকে Slave Law বা ক্রীতদাস আইন বলিয়া আখ্যাত করেন। এই "কুলি" সমস্যা লইয়া শতাব্দী শেষে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়।

আর একটি আইনের কথাও এখানে বলি। কারণ ও সম্পর্কেও ভারতবর্ষীয় সভার কৃতিত্ব অনেকখানি। ব্রাহ্মগণ কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করিতে যত্নপর হন এবং কতকগুলি বিবাহও সংঘটিত হয়। এই সকল বিবাহকে আইনসিদ্ধ করাইবার জন্য ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রয়াসী হন। আইন সভার সিমলা অধিবেশনে ১৮৬৮ সনে 'নেটিভ ম্যারেজ বিল' বা দেশীয় বিবাহ আইনের একটি খসড়া উপস্থাপিত করেন তৎকালীন আইন খচিব স্যার হেনরি মোন। কিন্তু এই প্রস্তাব লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলেন। ভারতবর্ষীয় সভাও এই বলিয়া প্রতিবাদ জানান যে এরূপ আইন পাস হইলে ধর্মীয় বিধিগুলি লজ্ঘিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপ প্রতিবাদ উঠিলে আইনের খসড়ার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়া '১৮৭২ সনের তিন আইন' নামে বিধিবদ্ধ হয়। ইহাই এদেশে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ আইন, যদিও ব্রাহ্মদের মধ্যকার বিবাহ আইন-সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার সূচনা।

এই সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ সংস্কার সাধিত হয় যেমন চৌকীদার ও পুলিস সম্পর্কীয় নিয়ম, সদর আমিন ও মুনসেফ নিয়োগ প্রভৃতি। ইহার প্রত্যেকটি বিষয়েই সভা নিজ অভিমত যথা সময়ে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। একটি বিষয় লইয়া এই সময় কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহা হইল ১৮৬৭ সনের ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশোধন। ইহার ফলে সরকার বিরোধী কোনো

কার্যই শুধু দণ্ডনীয় হইল না, এরূপ ইচ্ছাও যদি কেহ প্রকাশ করে তবে তাহাও দণ্ডনীয় হইবে এইরূপ বিধিবদ্ধ হয়। ভারতবর্ষীয় সভা স্বভাবতঃই ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন কিন্তু তাহাদের প্রতিবাদ টিকে নাই। এইরূপ সংশোধনের ফলে পরে বিস্তর অনর্থের সৃষ্টি হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের নূতন করিয়া সূচনা হইল এই সময় হইতে। ১৮৬৭-৬৮ সনে জ্বর-রোগ মহামারি রূপে আবার দেখা দেয়। পূর্বে যে এই উদ্দেশ্যে কমিশন বসে তাহাতে ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে দিগম্বর মিত্র স্পষ্ট করিয়া জানান যে, স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী খাল শ্রোতস্বিনী প্রভৃতির গতি নিরোধ হেতু জল মজিয়া মজিয়া সেই সব স্থলে জ্বর-রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই সময় সরকার উক্ত সুপারিশ ক্রমে— পয়ঃপ্রণালী ও জলসেচ বিষয়ক একটি আইনের খসড়া প্রচারিত করেন। ইহার উপর সভা এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, একই সময়ে সর্বত্র কার্য আরম্ভ করিলে তাহা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয়। এক-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইহা সীমাবদ্ধ রাখিলে কাজ ভালো হইবে। সরকার সভার অভিমত গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে হুগলীতেই প্রথমেই এই আইনমত কার্য শুরু করা হইবে।

গঙ্গানদীর উপরে সেতুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ সভা বলিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৮ সনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ভারতসচিবের সম্মতি প্রাপ্ত হন। গঙ্গার আর্মেনিয়ান ঘাট হইতে ভাসমান সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৭৪ সনে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হইল। সভার দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনে একটি প্রয়োজনীয় সমস্যার সুরাহা হয়।

এখন ভারতবর্ষীয় সভার শাখা ও সহযোগী সভাসমিতির বিষয়ে আসা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি উচ্চ শিক্ষার ব্যাপার লইয়া মফস্বল শহরগুলিতে সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সভা অতঃপর যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে সে জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আগ্রহান্বিত হন। ভারতবর্ষীয় সভার পরামর্শক্রমে এই সকল সভা অতঃপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত বিবিধ কার্য পরিচালনে ব্রতী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবগোপাল মিত্র কর্তৃক ১৮৬৭ সনে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষীয় সভার বহু গণ্যমান্য নেতা ইহাতেও সানন্দে যোগদান করেন এবং মেলার বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম পরিচালনায় যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। এই মেলাও ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা সাহিত্য কৃষিশিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে আত্মশক্তির উন্মেষে নিয়োজিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সভার ময়মনসিংহস্থ শেরপুর শাখা এই সময়ে নানা জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হইল। সভার আনুকূল্যে ঐ স্থলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ব্রহ্মপুত্রকে নাব্য করিবার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষীয় সভার আনুকূল্য যাচ্ঞা করেন। মূল সভা প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আদর্শে বোম্বাই ও মাদ্রাজে রাস্ট্রীয় সভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে বোম্বাই সভা উঠিয়া যায়। ১৮৬৮ সন নাগাদ বোম্বাই সভা পুনরুজ্জীবিত হইল। তাহারা ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে একযোগে কার্য করিতেও শুরু করিলেন।

প্রতিষ্ঠাবধি ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর বিলাতে ভারতহিতৈষী নেতৃবর্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। তাঁহাদের প্রেরিত স্মারকলিপি উভয় পার্লামেন্টে এইসব নেতাদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত হইত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি'র নাম উল্লেখ করিতে হয়। কবডেন ব্রাইট ও ডিকিন্সন এই সভার প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। ইহার বিষয় আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ১৮৬৫

খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী এবং সম্পাদক আইন শাস্ত্র অধ্যয়নরত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি)। এ সব কথা পূর্বে আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি। ১৮৬৭ সনে লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় এবং ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পূর্বোক্ত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। এবারে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হন দাদাভাই নৌরজী। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব পূর্ব প্রতিষ্ঠানগুলির মতো এই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও বিশেষভাবে যোগস্থাপন করেন এবং কতকগুলি বিষয়ে যেমন— সিবিল সার্বিস, রয়াল কমিশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কার্য করেন। এক কথায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন হইল বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় সভার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। সভার কোনো কোনো সদস্য লণ্ডনস্থ সভার সদস্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষীয় সভার প্রভাব প্রতিপত্তি অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গ-প্রদেশের জ্ঞানীগুণী, ধনীমানীরাও (শুধু ভূস্বামীই নন) সভার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠেন। প্রসঙ্গতঃ মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর নাম এখানে উল্লেখ করিতে হয়। আবার উহাদের অনেকে সভার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। সভা এই ক'বৎসরে চারিজন খ্যাতনামা বিশিষ্ট সদস্যকে হারাইলেন। প্রথম সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব (১৯ এপ্রিল ১৮৬৭) ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলাভিসিক্ত সভার দ্বিতীয় সভাপতি প্রসন্নকুমার ঠাকুর (৩০ আগস্ট ১৮৬৮) এবং অন্যতম প্রধান সদস্য বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ (১৮ জানুয়ারি ১৮৬৮) ও হাইকোর্টের বিচারপতি এবং প্রথমদিককার কর্মিষ্ঠ সদস্য শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত (৬ জুন ১৮৬৭) মারা গেলেন। ভারতবর্ষীয় সভা ইহাদের প্রত্যেকের কৃতিত্বের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছিলেন।

এতদিন ভারতবর্ষীয় সভার নিজস্ব আবাসস্থল ছিল না, এই সময় এই অসুবিধা ঘুচিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে সভা ১৮নং রাণী মুদি গলির বাড়ি ক্রয় করিলেন। গৃহ নির্মাণ বা ক্রয় খাতে ইতিপূর্বে প্রসন্নকুমার ঠাকুর দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা দেন চারি হাজার টাকা। ইহারা ব্যতীত আরও বহু গণ্যমান্য সদস্য এ নিমিত্ত অর্থ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম মাত্র দানের অঙ্ক সমেত এখানে দেওয়া গেল— ভূকৈলাসের সত্যসরণ ঘোষাল এবং চোরাগানের রাজেন্দ্র মল্লিক দেড় হাজার করিয়া; দুর্গাচরণ লাহা, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক হাজার টাকা করিয়া দান করেন। দানে প্রাপ্ত অর্থ বাদে বক্রী টাকা সভার গচ্ছিত তহবিল হইতেও হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটির অছিগণের নিকট হইতে পাওয়া যায়। সর্ত থাকে যে, হরিশচন্দ্রের নাম সংযুক্ত একটি গ্রন্থাগারের নিমিত্ত ইহার দ্বিতলে কয়েকটি প্রকোষ্ঠে স্থান করিয়া দিতে হইবে। রাণী মুদি গলির পরবর্তীকালে ভারতবর্ষীয় সভার নামানুসারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট হইয়াছে। সভার এই সুকৃতির জন্য ১৮৬৯, ২৪ ফেব্রুয়ারি সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি রমানাথ ঠাকুর সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাইয়া এই কথা কয়টি বলেন—

"Gentlemen, hope begets hope. You have secured a house for the Association, and I hope you will not rest satisfied until you ensure the life of the Assoclation. Private subscriptions are always fluctuating and uncertain;

it is the duty of the wealthy, the educated and the patriotic to come forward and endow the Association and make it representative not only of Bengal but of all India. You will then leave a claim to the everlasting gratitude of your posterity"

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি সভার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইহার কার্যকলাপ ও কৃতিত্ব কথা আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে, ভারতবর্ষীয় সভা জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বরাবর কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাহারা স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষকে বারবার আবেদনপত্র এবং স্মারকলিপি পাঠাইয়া প্রস্তাবিত আইন ও বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে হয়তো ইহার জন্য তাঁহাদের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু সামাজিক ও ভূমিসংক্রান্তবিষয়ক আইন-কানুন এত দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে যে, তাহার উপর তাহাদিগকে কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিবারই জনসাধারণের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। আইনসভাগুলি জনসাধারণের মুখপাত্র না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সভা এই ধরণের কাজে লিপ্ত হইতে বাধ্য।

ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা এবং রাজা শিবরাজ সিংহ উপরি-উক্ত সভায় সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তার কথা এই মর্মে উদ্ধৃত দেখিতে পাই—

"…the other Presidencies would follow the example of their elder sister Bengal. He must candidly confess that Bengal was far ahead of the other presidencies in intelligence and public spirit, and it would be a happy day when three presidencies would unite in all loyalty and work together in co-operation with the Government for the advancement of the common cause."

দেখা যাইতেছে এই সময়েই বিভিন্ন প্রদেশ যাহাতে বাঙালিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কার্য করিতে অগ্রসর হয়, বাংলা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলবাসীরাও সে বিষয়ে চিন্তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। রাজা শিবরাজ সিংহ সভাকে অভিনন্দন জানাইয়া এই মর্মে বলেন যে, উত্তরপ্রদেশে ফিরিয়া তিনি তথাকার নেতৃবৃন্দকে এইরূপ একটি সভা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভা শুধু সংকীর্ণ রাজনীতি বিষয়ে নহে, ভারতীয় সমাজ তথা শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই আলোচনা পর্যালোচনা করিতেন এবং প্রয়োজনমত সরকারকে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া সাধারণের হিতসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। জাতির চিত্তে সভা যে একটি আসনলাভ করেন তাহা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ

প্রবোধচন্দ্র সেন

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

"প্রথমে নারায়ণ, নরোত্তম, নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করে তার পরে 'জয়' (অর্থাৎ মহাভারত) পাঠ করবে।"

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা উচিত যে, মহাভারতের আদি নাম ছিল 'জয়'। 'জয়নামেতিহাসোঽয়ম্'— এই উক্তি আছে মহাভারতেই।

'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি পাঠনির্দেশ আছে মহাভারতের প্রথম শ্লোকের পূর্বেই। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই পাঠনির্দেশের ব্যাখ্যা উপলক্ষে 'নারায়ণ' শব্দের যে অর্থই করুন, 'নারায়ণ' শব্দটি যে 'নর' শব্দ থেকে উৎপন্ন, সহজ বুদ্ধিতে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ যে এ শব্দটিকে অনুরূপ অর্থেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না।

রবীন্দ্রভাবনায় শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীরা নূতন নূতন বিভূতিতে মণ্ডিত হয়ে অপূর্ব ভাবমূর্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁরা ভারতীয় ভাবাদর্শকে কখনও ব্যাহত করেন নি, ঐতিহ্যের সীমাও লঙ্ঘন করে যান নি। চিরাগত ঐতিহ্যময় ভাবরাজ্যেরই তাঁরা অধিবাসী। পৌরাণিক নারায়ণও (বিশেষতঃ যেখানে লক্ষ্মীকে তাঁর শক্তি- বা বিভূতি-রূপে কল্পনা করা হয়েছে)[১] যে রবীন্দ্রনাথের ভাব-রাজ্যে উপেক্ষিত ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে তাঁর নানা রচনায়। রবীন্দ্রভাবনায় পৌরাণিক নারায়ণের স্থান শিবের সম পর্যায়ে না হলেও তাঁর গুরুত্ব নিতান্ত কমও নয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

"দরিদ্রনারায়ণকে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে।··· দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইএর মিলনেই সত্য।"

—'পথে ও পথের প্রান্তে', ৪৭-সংখ্যক পত্র (১৯৩০ ফেব্রুআরি)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট নারায়ণভাবকল্পনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য তা উক্ত পৌরাণিক দেবদেবীকল্পনার অনুরূপ নয়। বস্তুতঃ তাঁর এই 'নারায়ণ' পৌরাণিক দেবতারূপেই কল্পিত নয়। একটি বিশেষ ভাবরূপকেই তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত করেছেন। তবে নামটি যেমন নবকল্পিত নয়, তার ভাবদ্যোতনাও তেমনই ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্যাদর্শবিরুদ্ধ নয়। 'নর' শব্দের নিত্যসান্নিধ্য এবং 'নরোত্তম' শব্দের সঙ্গে অভিন্নতার স্বীকৃতি থেকে স্বতঃই মনে হয় নরত্বকে আশ্রয় করে বিশ্বনিয়ন্তৃশক্তির যে দেবোপম প্রকাশ, 'নারায়ণ' শব্দের দ্বারা তাকে সংজ্ঞিত করাই ছিল ভারতীয় ভাবকল্পনার মূল অভিপ্রায়। এ কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে নানা স্থানে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।—

---

১ লক্ষ্মীনারায়ণ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' গ্রন্থের 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

"ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে।"

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ (১৩২৪ চৈত্র)

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উক্তি এ স্থলে স্মরণ করা যেতে পারে।—

"বন্যদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাব-নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে।"

—'কালান্তর', চরকা (১৩৩২ ভাদ্র)

নরের অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই নাম নারায়ণ, ভারতহৃদয়ের এই দেবানুভূতি রবীন্দ্রচিন্তার সঙ্গে যে কত নিবিড় ভাবে মিশে গিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিদর্শন তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনায় বহু স্থানেই বিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'নারায়ণ'-ভাবনার এই অপৌরাণিক অর্থাৎ তাত্ত্বিক রূপের প্রকাশ ও বিবর্তনের কথাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

'নারায়ণ' নামের এই ব্যঞ্জনার কথা মেনে নিলে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, 'নারায়ণ' ও 'বিষ্ণু'র ভাবকল্পনা মূলতঃ এক ছিল না। পরবর্তী কালে অবশ্য ভারতীয় দেবকল্পনায় নারায়ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলেই গণ্য হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন ও কেমন করে হয়েছিলেন সে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা ঔৎসুক্যকরও বটে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক। এ স্থলে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে একবার (২১শ শ্লোক—'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ') এবং একাদশ অধ্যায়ে দুইবার (২৪শ ও ৩০শ শ্লোক—দুটিই সম্বোধন), এই মোট তিনবার বিষ্ণু শব্দের উল্লেখ আছে ; কিন্তু নারায়ণ শব্দের উল্লেখ নেই একবারও। তবে ভারতীয় চিত্ত যে কোনো সময়ে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণের প্রকাশকে স্বীকার করে নিয়েছিল তার প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্যের সর্বত্রই পরিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এই সুপ্রাচীন ভাব-ঐতিহ্যের ধারা আধুনিক কালে রবীন্দ্রসাহিত্যেও এসে পৌঁছেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।—

"যে পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি, তবে নারায়ণ যতই একলা হোন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন, তিনিই জিতাইয়া দিবেন।"

—'রাজাপ্রজা', সমস্যা (১৩১৫ আষাঢ়)

ঠিক এ কথারই পুনরুক্তি ঘটেছে অল্পকাল পরের আর-একটি রচনায়। সেটিও এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল।—

"আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই এক দিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।"

—'শান্তিনিকেতন', দশের ইচ্ছা (১৩১৫ চৈত্র ৩১)

এখানে 'নারায়ণ' কথাটি এককালেই বিশেষ এবং সাধারণ অর্থে গ্রহণীয়। বিশেষ অর্থে নারায়ণ মানে অর্জুনসারথি কৃষ্ণ, আর সাধারণ অর্থে নারায়ণ মানে মানুষের হৃদয়াধিষ্ঠিত বিশ্বদেবতা। নারায়ণ শব্দের এরকম দ্বৈত-অর্থবহ প্রয়োগের আর-একটি দৃষ্টান্ত এই।—

মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন :

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ।[১]

— মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ।[২]

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ কর, তুমিই সমস্ত।"

—জাভাযাত্রীর পত্র, তৃতীয় পত্র (১৩৩৪ শ্রাবণ ৩)

শুধু নারায়ণ নয়, 'মানুষ' শব্দটিও এখানেও বিশেষ সাধারণ এই দ্বিবিধ অর্থে গ্রহণীয়। দুটি শব্দেরই বিশেষ অর্থটি পৌরাণিক, আর সাধারণ অর্থটিও পৌরাণিক অর্থেরই দ্যোতনা অর্থাৎ ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের বিষ্ণুকল্পনা নূতন ভাবপ্রভায় উজ্জ্বল হয়েই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সে বিষ্ণু তাঁর পৌরাণিক মূর্ত দেবরূপেই প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের দেবভাবনায় 'নারায়ণ' পৌরাণিক কল্পনার সীমা বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারায়ণের পৌরাণিক মূর্তরূপ দেখা যায় না, অমূর্ত ভাবরূপেই তার প্রকাশ। বিশ্বনরের অন্তরতম মহাসত্তায় অধিষ্ঠিত যে দেবভাব, তাকেই তিনি বলেছেন 'নারায়ণ'। এই ভাবকল্পনা পৌরাণিক নয়, অথচ তা চিরন্তন ভারতীয় বিশ্বভাবনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নও নয়।

দেখা গেল 'নারায়ণ'-এর ভাবাদর্শটি একই কালে বিশেষভাবে ভারতীয় অথচ সাধারণভাবে সর্বমানবিক। এইজন্যই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পেরেছেন—

"যে পুরাতন ভারত চিরন্তন ভারত আমি তাকেই প্রণাম করে মেনে নিয়েছি, তার বাইরে যাই নি।"

বাইরে যাবার প্রয়োজনও নেই। কারণ এই পুরাতন ভারত শুধু চিরন্তন নয়, সর্বজনীনও বটে। এ কথার ব্যাখ্যাসূত্রেই তিনি বলেছেন—

"আমার চিত্ত মহা-ভারতের অধিবাসী— এই মহা-ভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।"

—'চিঠিপত্র' ৯, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্র (১৯৩১ জুন ১৮)

এখানেই ভারতীয়তা ও সার্বভৌমিকতা এক হয়ে মিশেছে। এই মহাসাগরসংগমের পুণ্যতীর্থেই 'নারায়ণ' ভাববিগ্রহের প্রতিষ্ঠাভূমি।

"মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত।"

—'মানুষের ধর্ম', দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মাদর্শের বিবর্তন ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সংঘবদ্ধ সমাজের পক্ষে যেমন সত্য, ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষেও তেমনই সত্য। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনেও যে দেব-উপলব্ধির অভিব্যক্তি

---

১ ভগবদ্গীতা ১১।২০

২ ভগবদ্গীতা ১১।৪০

ঘটেছে, তা তাঁর ধর্মচিন্তার ইতিহাস অনুসরণ করলে অনায়াসেই বোঝা যায়। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। নারায়ণের ভাবাদর্শকল্পনায় তাঁর চিন্তাধারায় যে বিবর্তন ঘটেছে, তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

২

"কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়—
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।"

—'প্রভাতসংগীত', নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (ভারতী ১২৮৯ অগ্রহায়ণ)

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—

"এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।"

—'মানুষের ধর্ম', মানবসত্য (১৩৪০ বৈশাখ)

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় মহামানবকেই যে 'মহাসাগর' বলা হয়েছে তার ইঙ্গিত রয়েছে পরবর্তী 'পদপ্রান্তে' শব্দটির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

"হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানবহৃদয়ে মিশিতে।"

—'সোনার তরী', বিশ্বনৃত্য (১২৯৯ ফাল্গুন)

প্রভৃতি আরও বহু উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

চিরন্তন বিশ্বজনের হৃদয়াধিষ্ঠিত এই যে মহামানবসত্তা, নামান্তরে তাকেই তিনি বলেছেন 'নারায়ণ'।—

"হোথা মানবের জয়
উঠিছে জগৎময়—
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।
হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল-মাঝে?"

—'মানসী', কবির প্রতি নিবেদন (১৮৮৮ জ্যৈষ্ঠ)

এখানেও সেই মহামানবেরই ডাক। আর দৈনন্দিন তুচ্ছতার উর্ধ্বে ওই মহামানবের আহ্বানে সাড়া দেবার আকুলতাও সমভাবেই পরিস্ফুট। লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,— মানুষের মধ্যে এই যে বিশ্বব্যাপী মহাসত্তার উপলব্ধি, এখানে তাকেই তিনি বলেছেন নারায়ণ। আর শুধু চিন্তায় নয়, ভাষাতেও তিনি নারায়ণকে নর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি।

অতঃপর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি অবিস্মরণীয় উক্তি। যেমন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।"

—'গীতাঞ্জলি', ১০৬

দেখা যাচ্ছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতো এখানেও মহামানবকে 'সাগর' বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে মহামানবকে 'নরদেবতা' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। মানসী কাব্যে যাঁকে বলা হয়েছে 'নারায়ণ', গীতাঞ্জলিতে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে 'নরদেবতা' বলে।

এবার গীতাঞ্জলির আরও কয়েকটি বিখ্যাত পংক্তির কথা স্মরণ করা যাক।—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।...

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।"

—'গীতাঞ্জলি', ১০৮

বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত 'নরনারায়ণ' ও 'নরদেবতা'ই এখানে বর্ণিত হয়েছেন 'মানুষের প্রাণের ঠাকুর' ও 'মানুষের নারায়ণ' নামে।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে দেশের কল্পনায় মানবদেবতারূপে 'নারায়ণ' নামের উদ্‌ভব, সে দেশেই কালক্রমে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সামাজিক সদাচারের পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নিয়েছে। এইজন্যই কি উত্তরকালের ভারতবর্ষ মর্ত্যদেবতা নারায়ণকে বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন কল্পনায় এবং নারায়ণ শব্দের কৃত্রিম ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ে উৎসুক হয়ে উঠেছিল? যে দেশে এমন মহৎ দেবভাবনার এমন নিদারুণ বিকার ও অবনতি ঘটতে পেরেছে, সে দেশ সত্যই 'দুর্ভাগা'। দেশকে এই অপরিসীম দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করবার অভিপ্রায়েই রবীন্দ্রনাথ নারায়ণের ভাবকল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই তো তাঁকে বড় দুঃখেই বলতে হয়েছিল—

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে ॥"

—'গীতাঞ্জলি', ১১৯

মন্দিরবহির্বর্তী এই যে দেবতা অবজ্ঞাত সামান্য মানুষের মধ্যেও বিরাজ করছেন, তিনিই 'নারায়ণ'। তাঁর সম্বন্ধেই অন্যত্র বলা হয়েছে—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

—'গীতাঞ্জলি', ৯৪

ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা ছেড়ে দেবালয়ের বাইরে এসে সামান্য মানুষের মধ্যেও দেবতাদর্শনের এই সাধনার কথাই ধ্বনিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতেও।—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে-নারায়ণ বিরাজমান, সংকীর্ণ আত্মাভিমানের বাধা অতিক্রম করে তাঁকেই অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ করা,— সে তো সহজ কাজ নয়। গভীর বেদনার সঙ্গে এই কথা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে।—

"অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের,
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।"

—'গীতাঞ্জলি', ১০৭

'রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে' যে দেবতা সর্বত্র নিত্যবিদ্যমান, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন 'দরিদ্রনারায়ণ'। আর এই নারায়ণের সেবাতে দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করবার সাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সহজ পথের পথিক ভারতবর্ষ আজও সেই দুর্গম পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি।

'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটা ইদানীন্তন কালের লোকব্যবহারে তার যথার্থ অর্থগত মহত্ত্ব হারিয়েছে। তাই

এই কথাটার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। এই অপ্রসন্নতা প্রকাশ পেয়েছে নানা-স্থানেই। যেমন হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে (১৯৩১ জুন ১৮) আছে—

"খৃষ্ট বলেছেন, বিবস্ত্রকে যে কাপড় পরায় সে আমাকেই কাপড় পরায়, নিরন্নকে যে অন্ন দেয় সে আমাকেই অন্ন দেয়।···এই কথাটাকেই 'দরিদ্রনারায়ণ' নাম দিয়ে হালে আমরা বানিয়েছি— দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণকে উপলব্ধি ও সেবা করার কথাটা ভারতের জালস্বাক্ষর করা[১]— আমাদের উপলব্ধি প্রধানত গো-ব্রাহ্মণের মধ্যে।"

—'চিঠিপত্র' ৯, ২০-সংখ্যক পত্র

'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের এক পত্রেও (৪৭-সংখ্যক) অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আর এক দিক্ থেকে। সে প্রসঙ্গের উত্থাপন আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

৩

যা হক, এই নারায়ণ ভাবনা পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে কতখানি অধিকার করে ছিল, তার কিছু পরিচয় আছে আমেরিকার শিকাগো থেকে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে লেখা একখানি চিঠিতে (১৯২১ মার্চ)।—

"Our fight is a spiritual fight— it is for Man. We are to emancipate Man from the meshes that he himself has woven round him—these organizations of national egoism.···

We, the famished ragged ragamuffins of the East, are to win freedom for all humanity. We have no word for 'Nation' in our language. When we borrow this word from other people it never fits us. For we are to make our league with *Narayan,* and our triumph will not give us anything but victory itself : victory for God's world."

—*Letters to a Friend* (1928), *p. 128*

"মানুষের আত্মিক মুক্তিসাধনই আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য। মানুষ স্বাজাতিক অহংকারে প্রমত্ত হয়ে নিজের চারদিকে যে মোহের জাল বুনে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে তার থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে আমাদেরই।···

সমস্ত মানুষের মুক্তিসাধনের দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের মতো প্রাচ্যদেশের দীনদরিদ্র লক্ষ্মীছাড়াদেরই। আমাদের ভাষায় 'নেশন' কথার কোনো প্রতিশব্দ নেই। এ শব্দটি আমরা অন্য দেশ থেকে ধার করে

---

১ রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সর্বতোভাবে স্বীকার্য কিনা সন্দেহের বিষয়। আমি আমার নিতান্ত অল্পবয়সেও সুদূর পল্লীগ্রামে আমার মা মাতামহী এবং গ্রামবৃদ্ধাদের বার বার বলতে শুনেছি গৃহস্থের বাড়িতে দরিদ্র ভিখারীরা তুষ্ট হয়ে গেলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তারা বিমুখ হয়ে ফিরলে নারায়ণও বিমুখ হন। সেকালে তাঁদের উপরে খৃষ্টীয় বা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়বার লেশমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না।

নিয়েছি, কিন্তু আমাদের ধাতের সঙ্গে এই শব্দটির ভাবগত কোনো মিলই নেই। বস্তুতঃ আমাদের হাত মেলাতে হবে স্বয়ং নারায়ণের সঙ্গে। আর আমরা যখন সিদ্ধিলাভ করব তখন সে সিদ্ধিও বড় সামান্য হবে না। সে সিদ্ধিতে যে জয় সূচিত হবে, সে জয় বিশ্ববিধাতারই জয়।"

অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা অনুচিত হবে না যে, উদ্ধৃত পত্রাংশটুকুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের (১৯২৬) মূলভাবটি বীজাকারে নিহিত রয়েছে।

আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, *Letters to a Friend* গ্রন্থের আরম্ভেই যে শব্দার্থ-তালিকা দেওয়া আছে তাতে 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে '*God manifest in man*'। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে প্রকাশিত যে ভাগবতস্বরূপ, তারই নাম 'নারায়ণ'। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ও স্বীকৃত অর্থ।

আরও পরবর্তী কালে এই উপলব্ধি রবীন্দ্রচিত্তকে আরও গভীরভাবে অধিকার করে ছিল। তার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।—

"আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'।··· আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

—'আত্মপরিচয়', পঞ্চম অধ্যায় (১৩৩৮ পৌষ)

এই যে মহামানব, 'যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান' এবং যিনি 'নরদেবতা' বলেও অভিহিত, তিনিই রবীন্দ্রানুভূত 'মানুষের প্রাণের ঠাকুর' নারায়ণ।

এই যে কবিচিত্তের উপলব্ধি, তারই আনন্দে তিনি এক সময়ে বলেছিলেন—

'যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি,
ধন্য এ মোর ধরণী।'

৪

এই মহামানব বা নরদেবতার উপলব্ধির কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর '*The Religion of Man*' এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে। এই ব্যাখ্যারও কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পূর্বে যাকে বলা হয়েছে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' বিশ্বসত্তা, 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনও বলেছেন 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব', কখনও বলেছেন 'বিশ্বমানব' বা 'মহামানব'। বাউলের ভাষায় তাঁকেই বলেছেন 'মনের মানুষ', আর দর্শনের ভাষায় বলেছেন 'মানবব্রহ্ম'। বাউল-ভাবনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

"সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়।"

—'মানুষের ধর্ম', তৃতীয় অধ্যায়

'সকল-মনের' মানুষ বলেই তাঁকে বিশ্বমানব বা মহামানব নাম দেওয়া হয়েছে। 'মানবব্রহ্ম' কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ, মানুষের বহিরিন্দ্রিয়-অন্তরিন্দ্রিয়ের যতকিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থ এই যে তিনি[১] মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।"

—'মানুষের ধর্ম', দ্বিতীয় অধ্যায়

এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, আমাদের দর্শনে যাঁকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম, তাঁকেই তিনি মানবব্রহ্ম, মহামানব, মনের মানুষ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করেছেন। নরদেবতা ও নারায়ণ, নামদুটি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে নেই। কিন্তু ওই দুটি নামও যে সগুণব্রহ্মসূচক, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহামানব ও নরদেবতা নানা স্থানে অভিন্নার্থক বলেই গণ্য হয়েছে।

উপরের উদ্ধৃতিটিতে 'মানবব্রহ্ম' শব্দের মতো প্রণিধানযোগ্য আর-একটি শব্দ আছে— 'মানবজগৎ'। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার অনুসরণে বলা যায় সগুণ অর্থাৎ মানবেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 'মানবজগৎ'। মানবব্রহ্মের ন্যায় মানববিশ্বও মানুষের জ্ঞানগম্য। নির্গুণ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম ও বিশ্ব, দুই-ই মানুষের জ্ঞানাতীত। শুধু যে অজ্ঞাত তা নয়, অজ্ঞেয়ও বটে। মানুষের পক্ষে তাদের থাকা ও না-থাকা দুই-ই সমান।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে নির্গুণ (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়) বিশ্ব বা ব্রহ্ম উপলব্ধির সাধনাও নিরর্থক। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত যেমন স্পষ্ট তেমনি বলিষ্ঠ।—

"মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই।…অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে?"

—'মানুষের ধর্ম' দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্যত্র আরও স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলা হয়েছে।—

"আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল-মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে-কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা।…এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক

১ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের কোনো মুদ্রিত সংস্করণেই 'তিনি' শব্দটি নেই। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে আছে। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ৯৪-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৫।

ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন?"

—'মানুষের ধর্ম', মানবসত্য

এই সাধনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনে দেখা দিয়েছিল বহু কাল পূর্বেই। সে কথা তখনই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর এই কবিবাণীতে।—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥"

—'নৈবেদ্য' (১৯০১), ৩০

দেখা গেল মানুষের মধ্যে দেবত্ব-উপলব্ধিকেই রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই দেবত্ব-উপলব্ধির উৎসস্থল রয়েছে মানুষের নিজের মধ্যেই, নিজের আত্মবোধ অর্থাৎ আমিত্ববোধের মধ্যেই। সুতরাং এ কথাও মানতে হবে যে, এই মানুষের ধর্ম স্বভাবতঃই সোঽহং-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিটি স্মরণীয়।—

"মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহং, এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ।"

—'মানুষের ধর্ম', তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রস্বীকৃত এই সোঽহংতত্ত্ব ও ভারতবর্ষের পূর্বাগত সোঽহংতত্ত্বের মধ্যে বোধ করি একটু পার্থক্য আছে। পূর্বাগত তত্ত্বের মূলকথা তৎত্বমসি বা অহং ব্রহ্মাস্মি। অর্থাৎ মানুষই ব্রহ্ম, ব্রহ্মত্বই মানুষের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথও এ কথাই বলেন, কিন্তু উলটো দিক্ থেকে। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাই আমাদের জ্ঞেয়, অর্থাৎ তিনি নারায়ণ, নরত্বই তাঁর স্বরূপ। তাঁর অতিমানবিক প্রকাশ যদি কিছু থাকে, মানুষের কাছে তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাই তিনি মানুষকে ব্রহ্ম না বলে ব্রহ্মকেই বলেছেন 'মানব' বা 'মহামানব'। এই ভাবটা তাঁর গানে কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে নানারূপে। যেমন—

এক। "সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

দুই। "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥"

—'গীতাঞ্জলি', ১২০ এবং ১২১

৫

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বদেবতাকে নিজের জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁকে তিনি পেয়েছিলেন নিজের অন্তরের মধ্যে, তাঁকে দেখেছিলেন নিজ সত্তার সঙ্গে অভিন্নরূপে। কেননা, তিনি অন্তর্যামী, অন্তরতর। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নিজেদের উপাস্য দেবতাকে নিজের বাইরে অবস্থিত বলেই মনে করে। এমন কি, যারা নিরাকারবাদী তাদের অধিকাংশও নিজেদের উপাস্য দেবতাকে নিজের বাইরে রেখেই উপাসনা করে, তাঁকে দেখে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৃহদারণ্যকের বাণী উদ্ধৃত করে এইজাতীয় নিরাকার-উপাসনাকেও কঠিন ভাষাতেই নিন্দা করেছেন, বলেছেন এও একপ্রকার পৌত্তলিকতা। এই নিরাকারবাদীদের সম্পর্কে আরও বলেছেন—

"এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে।"

'মানুষের ধর্ম', তৃতীয় অধ্যায়

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত মনস্বী আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক মতবিনিময়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্তপ্রকার অভিমতের কথা জেনে আইনস্টাইন বলতে বাধ্য হন—

'Then I am more religious than you are!' অর্থাৎ, 'তা হলে তো আপনার চেয়ে আমি বেশি ধার্মিক!'

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্মমতের কথা আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন—

"My religion is in the reconciliation of the Super-personal Man, the Universal human spirit, in my own individual being."

—*The Religion of Man, Appendix II*

"আমার নিজের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অতিব্যক্তিক মানবের, অর্থাৎ বিশ্বমানবসত্তার, উপলব্ধি করাই হল আমার ধর্ম।"

***The Religion of Man*-নামক হিবার্ট বক্তৃতামালা** এবং 'মানুষের ধর্ম'-নামক কমলাবক্তৃতামালার তারিখ যথাক্রমে ১৯৩০ ও ১৯৩৩ সাল। অতঃপর কবিচিত্তের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা বিভাগে প্রতিফলিত হয়েছে বিচিত্ররূপে ও ভঙ্গিতে। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করব। 'পত্রপুট' কাব্যের একটি রচনায় কবি অতি গভীর উপলব্ধির ভাষায় নিজের অন্তঃস্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আজ আপন মনে ভাবি—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে-মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।· ·

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আজ আমার পূজা সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে,
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে॥"

—'পত্রপুট', পনেরো (১৩৪৩ বৈশাখ)

এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। নিজের অন্তরের বাইরে যে দেবতার স্থান, তাঁর পূজার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে কবির জীবনে। সমস্ত প্রকার বাহ্য পূজার্চনা ও মন্ত্রোচ্চারণ ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে এসেছেন সব দেবালয়ের বাইরে। উপাস্যের দেখা পেলেন বাইরে থেকে মনের মধ্যে, দেবতাকে ছেড়ে মানুষের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যে 'মন্ত্রহীন' বলে বর্ণনা করেছেন তা নিছক কবিসুলভ আলংকারিক উক্তিমাত্র নয়। এর মধ্যে অনেকখানি বাস্তব সত্যও রয়েছে। নিজের ধর্মোপলব্ধির পরিচয়প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it."

—*The Religion of Man (1931), ch. XII, p. 165*

"নির্জনে বসে অসীমের ধ্যানের যে আনন্দ তাতে আর তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। আর আমার নীরব উপাসনার মন্ত্রগুলির প্রেরণাশক্তিও যে কখন ফুরিয়ে গেল তা বলতে পারি না।"

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেও ('মানবসত্য' প্রবন্ধ) তিনি বলেছেন, 'এক সময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম'। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে ওই ধ্যান ও মন্ত্র-আবৃত্তি যে ক্রমে নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়, সে কথাও ওই প্রসঙ্গে অকুণ্ঠ ভাষাতেই বিবৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মানসী কাব্যের 'ধ্যান' কবিতাটি স্মরণীয়।—

'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি।'

—'মানসী', ধ্যান (১৮৮৯। শ্রাবণ)

এই ধ্যানের ছবিই ফুটে উঠেছে সুখ্যাত 'চিত্রা' কবিতাটির শেষাংশে। নমুনা হিসাবে তার থেকে শুধু দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।—

"নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।…
অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তরবাসিনী।"

—'চিত্রা', চিত্রা (১৩০২ অগ্রহায়ণ)

উত্তরকালে এই ধরণের ধ্যানের সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি আর আস্থাশীল থাকতে পারেন নি। এ কথারই স্বীকৃতি পাওয়া যায় 'মানবসত্য' প্রবন্ধটিতে।

এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় নেই যে, সর্বদেশে ও সর্বকালে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ভগবদুপলব্ধি ও উপাসনাপদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে (অন্ততঃ শেষজীবনে) স্বীকার করে নিতে পারেন নি। নিজের অন্তরের মধ্যে ভাগবত সত্তার উপলব্ধিকেই তিনি যথার্থ ধর্মসাধনা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি সব সম্প্রদায়ের মন্দির, দেবোপাসনা, মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মবিধানের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বিশ্বমানবসত্তার উন্মুক্ত আকাশতলে— বিশ্বমানবসত্তাকে উপলব্ধি করলেন আপন অন্তরের মধ্যে। আর এই হল তাঁর পক্ষে ভাগবত উপলব্ধি। এই ভাগবত স্বরূপেরই নাম 'নারায়ণ'। আপন সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার এই যে উপলব্ধি, ভারতীয় ভাষায় তার নাম 'যোগ'। রবীন্দ্রনাথ বলেন,— পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত অনুসারে ভাগবত সত্তা মানুষের আপন সত্তার বাইরে অবস্থিত এবং বাইরে থেকেই মানুষ ভগবৎসমীপে ভক্তি নিবেদন করে; ভারতবর্ষেও এইজাতীয় ধর্মের অভাব নেই। কিন্তু উচ্চস্তরের সাধকেরা আপন অন্তরের মধ্যে নারায়ণ-উপলব্ধির অর্থাৎ যোগসাধনার পথকেই স্বীকার করে নেন।—

"We have such religions also in India. But those that have attained a greater height aspire for their fulfilment in union with *Narayana*, the supreme Reality of Man, which is divine"

—*The Religion of Man (1931), Ch. IV, p. 67*

এই উচ্চস্তরের সাধকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দুইজনের নাম করেছেন, একজন রজ্জব, আর একজন রবিদাস। দুইজনই মধ্যযুগের সন্তসাধক। তাঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই—

Rajjab, a poet-saint of medieval India, says of Man: 'God-man (*nara-narayana*) is thy definition, it is not a delusion but a truth…

Ravidas, another poet of the same age, sings : 'Thou seest me, O Divine Man (*Narahari*), and I see thee, and our love becomes mutual.'

—*The Religion of Man* (*1931*), *Ch. VII*, *p. 112*

অর্থাৎ : রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বলেন সর্বজনীন ও সর্বকালীন 'মানব', তাঁকে সম্বোধন করেই রজ্জব বলেন, 'তোমার নাম নরনারায়ণ, তাতেই তোমার পরিচয় ; এ তো মায়া নয়, এই তো সত্য।' আর তাঁরই সম্বন্ধে রবিদাস বলেন, 'হে নরহরি, তুমি দেখছ আমাকে, আর আমি দেখছি তোমাকে ; তাতেই তো আমাদের প্রেম হয় সফল'।

৬

ভারতবর্ষে ধর্মসাধনার প্রধান তিন পথ। এক, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসরহিত, অবাঙ্‌মনসগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত যোগসাধনের পথ। এই অতীন্দ্রিয় যোগের পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'সে নহে আমার'। দুই, ভাগবত সত্তাকে আপন সত্তা থেকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করে দূরের থেকে ভক্তিনিবেদনের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগসাধনের পথ। এ পথও তাঁর নয়। এরকম উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। তিন, ভাগবত সত্তা ও আপন সত্তার অভিন্নতা উপলব্ধির দ্বারাই তাঁর সঙ্গে যোগসাধনের পথ। এই পথই রবীন্দ্রস্বীকৃত পথ। মানুষের আপন সত্তার মধ্যে বিশ্বসত্তার যে প্রকাশ, সেই তো তাঁর নারায়ণরূপ। সেই নারায়ণ-উপলব্ধিকে নিরন্তর হৃদয়ে পোষণ করে জীবনসাধনার যে পথ, কবীর-রজ্জব-রবিদাস ও বাউলসম্প্রদায়ের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই পথেরই পথিক।

এই নারায়ণ-অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের সাহিত্যে নানাভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই অনুভূতি তাঁর মধ্যে এমনভাবেই আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, তার দ্যুতি তাঁর রচনায় স্বভাবতঃই বিকীর্ণ হয়ে আছে নানাভাবে নানা ভাষায়। অনেক সময় তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই কবিভাবনার স্বতউৎসারিত কিরণরূপে। এই জাতীয় ভাবদ্যুতি সহৃদয় সাহিত্যরসিকের অনুভবগম্য। বিচারকের বিশ্লেষণলভ্য নয়। যেসব ক্ষেত্রে এই ভাবনা স্পষ্ট ভাষায় দানা বেঁধে উঠেছে, শুধু সেসব ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষগোচর ও বিশ্লেষণলভ্য। এ রকম দুএকটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করলেই উক্ত মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হবে।

পূর্বে দেখেছি, যে ভাগবত সত্তাকে মানুষ অন্তরে উপলব্ধি করে তাঁকে তিনি বলেছেন 'মানবব্রহ্ম', আর মানুষের উপলব্ধিজাত যে বহির্জগৎ তাকে বলেছেন 'মানবজগৎ'। এই উভয়বিধ উপলব্ধির মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তা হল 'মানবসত্য'। এই মানবব্রহ্মেরই নামান্তর নরদেবতা বা নারায়ণ। এই নরদেবতার অধিষ্ঠানভূমি হিসাবে এই জগৎকে, এই ধরণীকেও তিনি 'মহাতীর্থ' বলেই গ্রহণ করেছিলেন ('আত্মপরিচয়', পঞ্চম অধ্যায়)। এই শ্রদ্ধানুভূতি জীবনের একেবারে শেষ পর্যন্ত তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে ছিল। তিরোধানের পূর্ব বৎসরে জন্মদিনে বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে তিনি লেখেন—

"এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি' জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।"

—'জন্মদিনে', ৬ (১৩৪৭ বৈশাখ ২৬)

আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে যাকে বলা হয়েছিল 'ধরণীর মহাতীর্থ,' তাকেই এখানে বলা হল 'নারায়ণী এ ধরণী'। মনে রাখতে হবে 'মানুষের জন্মক্ষণ হতে'ই ধরণী 'নারায়ণী' হয়েছে। কারণ মানুষের মধ্যেই নারায়ণের প্রকাশ। তার পূর্বে বিশ্বসত্তার নারায়ণী রূপ কল্পনা নিরর্থক। মানুষের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের যে প্রকাশ তাকেই তিনি বলেছেন 'মানবলোক'। 'মানবলোক' কথাটিকে সাধারণভাবে মানুষের বাসভূমি অর্থে গ্রহণ করলে কবির হৃদয়ানুভূত ভাবব্যঞ্জনার সঙ্গে সংগতিরক্ষা হবে না।

এই ভাবব্যঞ্জনা আরও উজ্জ্বল আভায় ফুটে উঠেছে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে রচিত আর-একটি কবিতায়।—

"রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে।"

—'শেষ লেখা', ১১ (১৯৪১ মে ১৩)

বিশ্বসৃষ্টিপ্রবাহ যেন রূপনারায়ণের স্রোতোধারা, আর তারই কূলে মানবচৈতন্যের জাগরণ— এই কল্পনা, এই উপলব্ধি অপূর্ব। বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যেও বুঝি তার তুলনা নেই।

জীবনসন্ধ্যার ঘনীভূত ছায়ার মধ্যে বিশ্বজগৎ যখন দ্রুত-অপম্রিয়মাণ, তখনও তিনি তাকে স্বপ্নময়, মায়াময় বলে স্বীকার করলেন না। সত্য বলে, সুন্দর বলে, রূপনারায়ণের কূল বলেই স্বীকার করলেন। অনাবিল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন তার নারায়ণী সত্তার রূপময় বিভূতিকে। আর, মৃত্যুর নিষ্ঠুরতম পীড়নের মধ্যেই তাকে অস্বীকার করে নিজের নারায়ণী সত্তার সত্যরূপকেও ঘোষণা করলেন দৃঢ়কণ্ঠে, অকুণ্ঠিত ভাষায়। এই হল রবীন্দ্রনাথের নারায়ণ-ভাবনার পরম পরিণতি ও শেষ পরিচয়।

১৬ বৈশাখ ১৩৭২

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী ও সাহিত্যিক

লীলা মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন— 'পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ সবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত, তারি নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে ; অখণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড টুকরো তো এরা— একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ।'

তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে পৃথিবীর সব শিল্প সব সাহিত্য সহস্র রকম ভাব প্রকাশ করলেও, তারা পরস্পরবিরোধী হয় না, কারণ তারা সকলেই সেই অখণ্ড ও একক রূপের প্রকাশ। এই অর্থ ধরে আরেকটু অগ্রসর হলেই সমস্ত সৃষ্টির অখণ্ডতার কথায় এসে পৌঁছনো যায়। ওয়ার্ডস্বার্থের প্যান-থিইজ্‌ম্ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই একই প্রাণের প্রকাশ দেখেছে ; এ যেন আরো খানিকটা গভীরে চলে গিয়ে, মানুষের হাতের সৃষ্টিতেও সেই এককত্ব খুঁজে পায়।

শিল্পী কেন শিল্পসৃষ্টি করেন, সংগীতকার কেন সুরের জাল বোনেন, লেখক কেন সাহিত্য রচনা করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললে— রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না ?··· তারপর একদিন মানুষ এল ; সে বললে— কেবলি নেব ? কিছু দেব না ? দেব এমন জিনিস যা নিয়তির নিয়মেরো বাইরের সামগ্রী ; তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্মিত নির্মাল্য ধর, এই বলে মানুষ নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয় ঘোষণা করলে।··· পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি— যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।'

বিশ্বসৃষ্টি আর শিল্পসৃষ্টি উভয়ের মধ্যে এমনি গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই অবনীন্দ্রনাথের ছবি এবং লেখা উভয়ের মধ্যে এমন একটা সুগভীর সততা খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও এতটুকু মেকি জিনিস ভরে দেন নি, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যেটাকে উপলব্ধি করেছেন, শুধু সেইটুকুই ঢেলে দিয়েছেন রচনার মধ্যে।

তাঁর নিজের শিল্প ও সাহিত্য সাধনার মধ্যে অন্তরের যে পরম আস্থা বিকশিত করে দিতে পেরেছেন, সেই ছিল তার অন্তরের গভীরতম ধর্মবোধ। যখন বয়স হয়েছে তখন বাড়ির সবাই অনুযোগ দেয়, এখনো কি একটু ভগবানের নাম করবার সময় হল না, পুজোআচ্চায় মন না যায় তো একটু ধ্যানধারণাও তো করে লোকে। শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে একদিন চাকরকে বললেন ছাদে একটা চেয়ার রেখে আসতে, উনি একলা বসে ধ্যান করবেন। গিয়ে বসলেনও চোখ বুঁজে। কিন্তু চোখ বুঁজে বসে থাকা কি যায় নাকি ? কানের কাছে কে যেন খালি বলে— ও কি করছিস ? চোখ বুঁজে বসেছিস্ যে বড় ? চার দিকে এমন সুন্দর সব দেখবার জিনিস, এখন চোখ বুঁজে বসে থাকলেই হল কি না ! ব্যস্, হয়ে গে'ল চোখ বুঁজে ধ্যান করা !

তাঁর লেখার মধ্যে বহু জায়গায় চোখ বুঁজে বসে না থেকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে রূপের বিকাশ, তাকে দেখার কথা আছে। এইই ছিল তাঁর আরাধনা, যা ক্ষণিকের তাকে চিরন্তন রূপ দেওয়া ; যা পরিমিত তাকে অপরিমিতি দান করা।

এ ক্ষেত্রে কোনোরকম জোর খাটে না, মন থেকে তাগাদা না এলে লেখাও হয় না, আঁকাও হয় না। মাঝখানে ছবি আঁকা বন্ধ হয়েছিল, দশ এগারো বছর ছবি আঁকেন নি। তবে সে সময়টা আলস্যেও কাটে নি, লিখেছেন, পড়েছেন, দেখেছেন, অভিনয় করেছেন, অভিনেতাদের সাজিয়েছেন, মঞ্চ সাজিয়েছেন। তাছাড়া অনেকগুলি যাত্রার পালা এই সময় রচনা করেছিলেন।

ছবি আঁকেন না দেখে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন সে গল্প নাতি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা'র কাহিনীতে লিখেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবন, তোমার হল কি? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?' অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'কি জানো রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্য মন ব্যস্ত।'

হাত যখন গড়গড় করে আপনি চলতে থাকে তখন শিল্পীর আর ভালো লাগে না। মনের যেখানে খোরাক মেলে সেই দিকেই যান। সৃষ্টির কাজের মধ্যে হৃদয়ের এই যে তাগাদা এর কথা বহু কাল বাদে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ ছবি 'সাজাহানের মৃত্যু' প্রসঙ্গে বড় সুন্দর করে বলেছেন। বড় আদরের ছোট মেয়েটি প্লেগে মারা গেলে সমস্ত মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। নিজেই বলছেন সেই ব্যথায় তুলি ডুবিয়ে ছবিখানি এঁকেছিলেন। বলছেন—'মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল, সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। সাজাহানের মৃত্যুপ্রতীক্ষাতে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম।'

সে যে কি ছবি একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। আগ্রা দুর্গের বারান্দায় খাট পেতে সাজাহান মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মাথার উপরে কারুকার্যময় মর্মরখিলান, তারো উপরে বিষণ্ণ বিবর্ণ আকাশ, পূর্ণিমার চাঁদ ছাই রঙের মেঘে ঢাকা, ছাই রঙের যমুনানদীর জল, এতটুকু তরঙ্গ নেই তাতে, ছায়ায় ঢাকা অস্পষ্ট গাছপালা, বোধ হয় শীতকাল, মেটে রঙের একটি আলোয়ান জড়িয়ে বালিশে হেলান দিয়ে, পলিতকেশ বৃদ্ধ সাজাহান মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি দূরে ঐ তাজমহলের উপরে নিবদ্ধ, অস্পষ্ট দিগন্তে স্পষ্ট খচিত শুভ্র সুন্দর তাজমহল। জীবনের ব্যর্থতা আর জীবনাতীতের গৌরবের এমন ছবি কজনাই বা আঁকতে পেরেছে।

শিল্পের মূলে এই যে সত্যনিষ্ঠা, এর কথা অবনীন্দ্রনাথ নানান জায়গায় নানান ভাবে বলেছেন। নিজের যৌবনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন—'শিল্প জিনিসটা কি তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত; শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে গাইতে, নাটক লিখতে।'

রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ পেলেন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, আট নয় বছর ধরে শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রাচ্যের শিল্পাদর্শ বলতে কি বোঝায় এমন করে এর আগে বা পরে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নি। শিল্পসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কেবলি সাহিত্যসৃষ্টির কথা মুখে এসে যাচ্ছে, দুই-ই একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অলংকারের সূত্রগুলি যে প্রতি ছত্রে শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে, এ কথা আগে কারো মনে হয় নি। এই বক্তৃতামালার প্রথম দুটি বক্তৃতার বিষয় হল, 'শিল্পে অনধিকার' আর 'শিল্পে অধিকার'। শিল্পে অধিকারের প্রসঙ্গে বলছেন—'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের

হয় না। কেননা শিল্প হল নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা। বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তার কাছে খাটবে না।'

এই কটি কথার মধ্যে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ স্রষ্টিকারদের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের কাছে ধরে দিচ্ছেন। শিল্পই হক, কি সাহিত্যই হক, সে কোনো নিয়মকানুন মেনে চলে না, বিধাতার নিয়মও না। এই কটি কথা দিয়ে শিল্পী সমালোচকদের পায়ের তলা থেকে মাটিটুকু কেটে নিচ্ছেন, তাঁরা আর দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছেন না। ছবিকে কিম্বা লেখাকে এমনটি হতেই হবে, অমনটি হলে চলবে না, ভালো শিল্প ভালো সাহিত্য এই রকম এই রকম হয়ে থাকে, এ ধরণের কথা স্রষ্টির রাজ্যে অচল। শিল্পী যেমনটি দেখেছে, সাহিত্যিক যেমনটি ভেবেছে, সে তাই প্রকাশ করবে। এমন-কি শ্রেষ্ঠ সমালোচকের নির্দেশ মানতে গিয়ে যদি সে নিজের দেখাশোনার কিম্বা ভাবনার বিপরীত কথা বলে বা প্রকাশ করে, তাহলে সে মিথ্যাচারী হয়ে যায়। স্রষ্টির জগতে মিথ্যার স্থান নেই।

মিথ্যারও যেমন স্থান নেই, আনাড়িরও তেমন পদ নেই। স্রষ্টি করা মানেই কেবলি অনুশীলন, কেবলি সাধনা, কেবলি অতৃপ্তি, যা বলতে চাই তা বলা যায় না, যা দেখাতে চাই সে দর্শন দেয় না। বলছেন অবনীন্দ্রনাথ—'শেখা জিনিসটা কি! কিছুই না, কেবলি মনে হবে কিছুই হল না। আমার সেই দুঃখের কথাটাই বলি। শেখা, ও কি সহজ জিনিস?... আর্টিস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের পর বছর শেখাই চলেছে।'

কিন্তু এ শেখার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, এ শেখার মানে কেবলি দেখা, কেবলি চেষ্টা করা, কেবলি মনের দরজা খুলে আপনি বেরিয়ে আসা। বলছেন—'ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টারমশাই তার ভুল ঠিক করে দেবেন কি? তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টারমশাইএর মতো ডাল আঁকতে যাবে কেন?... তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।'

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার সূচনাতে তো রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তবে দুজনার প্রকাশভঙ্গীর আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের লেখা আর আঁকা দুটি আলাদা বস্তু নয়। নিজের মনকে কতক লেখায় প্রকাশ করেছেন, কতক আঁকায় করেছেন। ছবির সঙ্গে লেখার কতই না সাদৃশ্য। ছবিতে হয়তো দেখলাম পটভূমি সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত, সেই আলোর আভা লেগে যেন চিত্রিত রূপখানিও আলোময়। কিম্বা পটভূমি কুয়াশায় আচ্ছন্ন, চিত্রিত রূপখানিও ছায়াময় মায়াময়। সমস্ত ছবির অর্থের পরমার্থ হয়ে মাঝখানের মূর্তিটি ফুটে উঠেছে। 'সাজাহানের মৃত্যুপ্রতীক্ষা'তে যেমন হয়েছে। সাত রঙের ছায়ায় মোড়া ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো যেমন ঝিনুকের সমস্ত মর্যাদা নিয়ে অর্থময় হয়ে টলমল করে তেমনি ছবিতে আঁকা পরিবেশের সমস্ত মানেটুকু নিংড়ে নিয়ে ছবির মূর্তি কায়া ধরে।

লেখার মধ্যেও এই একই রহস্য, চোখে দেখা আর মনে গড়া সব একাকার। যে ঘটনা ঘটছে, যে পরিবেশ তাকে ঘিরে রয়েছে, সবই ঘটনার নায়ক নায়িকার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছে, গাছপালা ঘরদোর জন্তুজানোয়ার সবার সঙ্গে সবাইকে কেমন মানিয়েছে। চোখে শুধু একটু সুন্দরের নিশানা নিয়ে, যা হয় আর যা হয় নি। তার মধ্যে এমন আনাগোনা কে করেছিল?

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির বেলায় এই সামঞ্জস্যের কথা ওঠে না। বরং ঠিক তার বিপরীতটি।

তাঁর ছবি দেখে মনে হয় সযত্নে এদের বহুকাল ধরে তালাচাবি বন্ধ করে সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু একদিন কোথায় একটা দরজা হঠাৎ খোলা পেয়ে, হুড়মুড় করে তারা রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়ে, একেবারে আলোর সারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

গোড়ার সত্যটিকে অবিশ্যি কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক শখ করে ছবি আঁকছেন; ও ক্ষেত্রে শিল্পী শখ করে বই লিখছেন। একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে দেশের লোকে লেখক অবনীন্দ্রনাথকে এত দেরি করে চিনল কেন। এমন তো নয় যে লেখা ধরেছিলেন বেশি বয়সে; শকুন্তলা আর ক্ষীরের পুতুল প্রথম দুটি লেখা অনবদ্য নিখুঁত। তখন লেখকের বয়স বছর তেইশ হবে। শিল্পে তখনো তেমন নাম হয় নি। এমন হওয়ার প্রথম কারণ হয়তো রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল সৌরদীপ্তির এত কাছাকাছি সুন্দর তারাটির দিকে কারো চোখ পড়ে নি। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ হল লেখক অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দেখতে দেখতে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়াতে মালাগুলো সব তাঁর গলায় পড়ল। অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব ধরণের লেখারও হয়তো তখনো সেরকম ভালো সমঝদার তৈরি হয় নি, কারণ এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, স্রষ্টিকার মূলতঃ শিল্পীই হন বা সাহিত্যিকই হন, তাঁর কলমটি তাঁর তুলির চাইতে এতটুকু দুর্বল ছিল না। তবে কলমের প্রতিপক্ষ ছিল; তুলির ক্ষেত্রে তিনিই শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।

তাহলে আরো গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হয়। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি চোখ মেলেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোলের কাছটিতে। কিন্তু সে খুব বেশিদিন আগেকার কথা নয়। অবনীন্দ্রনাথের বাবার আমলেও 'আর্ট' বলতে বিলিতি রুচির জিনিস বোঝাত। এমন সময় দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা ও তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা হিন্দুমেলার মাধ্যমে সেই স্বদেশী ভাবকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী মেলাতে তাঁর প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। তার পরে রবীন্দ্রনাথ সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে বছর দশেকের ছোট অবনীন্দ্রনাথের এই আওতায় পড়ে গেলেন। বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া, ধুতিচাদর পরে খালি পায়ে চটি পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া, এ সবেরি মধ্যে তিনি ছিলেন 'রবিকার' সশ্রদ্ধ সমর্থনকারী।

সময়টাই ছিল সৃষ্টির উপযোগী। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন—'তখন স্বদেশীর চমৎকার একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছুই। সবাই দেশের জন্যে ভাবতে শুরু করলে— দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্যে কিছু করতে হবে।— এই ভাবটিই ছবিতে ফুটে বেরিয়েছিল আমার ছবির জগতে।'

এই কারণেই ছবির রাজ্যে গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের আবির্ভাবের মধ্যে একটা আকস্মিকতার আকর্ষণ আছে, যেটা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো যুগান্তর আনেন নি, সেখানে যুগান্তকারী নায়ক ছিলেন তাঁর 'রবিকা'। এ সময়ের কথা অবনীন্দ্রনাথ বলছেন 'বিলিতি ধরণে পোরট্রেট ছেড়েছুড়ে দিয়ে পট-পটুয়া জোগাড় করলুম।... তারপর দেশী মতে দেশী ছবি আঁকতে শুরু করলুম।'

এই বিলিতি ধরণে শিক্ষানবিশি অনেক দিন আগে থেকেই চলেছিল এবং এ ক্ষেত্রেও অবনীন্দ্রনাথ

'ধীরা দেবী' শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যশস্বী হয়েছিলেন। ছোটবেলায় স্কুলে ছবি আঁকার ক্লাসটি ভালো লাগত, যদিও সে ছিল কেবল নকল করার ক্লাস। বাড়িতে দাদাদের ছবির শখ ছিল, মাস্টার আসতেন তাঁদের তেলরং দিয়ে আঁকা শেখাতে। অবনীন্দ্র বসে বসে দেখতেন। এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে নানান কায়দা শিখতেন; এমনি করে হাতির দাঁতের উপর মিনিয়েচার করতে শিখলেন। তারপর পারিবারিক নিয়মমতো সকাল সকাল বিয়ে থা' হয়ে গেল। বড়দের আসরে গিয়ে বসলেন। ছবি আঁকার হাত ভালো বলে খ্যাতি হয়েছে, দাদাদের উৎসাহে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' বইখানিকে চিত্রিত করলেন। সেই ছবি দেখে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বললেন— তোমাকে ছবি আঁকা ভালো করে শিখতে হবে।

কে শেখাবে ছবি আঁকা? তখন ইউরোপিয়ান আর্ট ছাড়া গতি ছিল না। আর্ট স্কুলের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইটালিয়ান শিল্পী গিলার্ডি, তাঁর কাছেই গেলেন। এক একদিনের পাঠের জন্য কুড়িটা টাকা লাগে, মাসে তিন চারটে পাঠ। প্যাস্টেল, তেলরং, পোরট্রেট আঁকা— তিন মাসের মধ্যে সব শিক্ষা শেষ করে বসলেন অবনীন্দ্রনাথ। তখন নিজের বাড়িতে স্টুডিও হল, পোরট্রেট আঁকা চলতে লাগল।

সি. এল. পামার বলে আর কজন ইউরোপিয়ান চিত্রকরের কাছে আরো কিছু শেখা হল, কিছু তেলরং, তারপরে কিছু জলরং। দৃশ্যের ছবি আঁকতে শুরু করলেন। সবই হল, তবু নিজেই বলছেন— 'ছবি তো এঁকে যাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই?'

ঠিক এই সময়ে বিনয়িনীর স্বামী শেষেন্দ্র একখানি পার্শিয়ান ছবির বই উপহার দিলেন। আর রবীন্দ্রনাথও বললেন বৈষ্ণব পদাবলীতে সুন্দর সব ছবির বস্তু আছে, সেইসব আঁকতে। চণ্ডীদাসের দুটি লাইন,

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ,
চৌ দিকে হিমকর, হিম করে ফন্দ।

ব্যস্, আঁকা হল প্রথম দেশী ধরনে ছবি; তার নাম হল 'শুক্লাভিসার'।

যেন চোখের সামনে অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলে গেল। বলছেন শিল্পী—

'তখন কি আর ছবির জন্যে ভাবি, চোখ বুঁজলেই ছবি দেখতে পাই, তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড্ পর্যন্ত।··· ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর, হাত লাগালেই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।'

এর পরেই কলকাতায় মহামারি লেগেছিল। প্লেগের রুগীদের সাহায্য করতে সিস্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ কেউ বাদ পড়লেন না। কিন্তু ঐ প্লেগ রোগেই অবনীন্দ্রের ছোট মেয়েটি মারা গেল। কিছুদিন বাড়িতে আর মন বসে না। সবাই মিলে চৌরঙ্গিতে একটা বাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁদের বাড়িতে গুণীলোকের নিত্য আসা যাওয়া। আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে অবনীন্দ্রের আলাপ হল। হ্যাভেল তাঁর নিজস্ব ধরণে দেশী ছবি আঁকা দেখে মুগ্ধ। রবি বর্মাও দেশী ছবি আঁকতেন, কিন্তু সে সব ছিল দেশী বিষয় নিয়ে বিলিতি ঢঙে ছবি আঁকা। অবনীন্দ্রের মধ্যে হ্যাভেল নতুন একটা শক্তির সন্ধান পেলেন।

তাঁকে ধরে বসলেন আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তো অবাক। কিছুই জানি না, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হব কি করে? কি শেখাব? হ্যাভেল বলেছিলেন সে-জন্য ভাবতে হবে না। নিজে আঁকো ছেলেদের আঁকাও।

তিন শো টাকা মাইনেতে আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হলেন অবনীন্দ্রনাথ। আর কিছু না হক এ দেশের আর্টিস্ট সমাজটাকে দেখবার সুযোগ হল। দেশী আর্ট নিয়ে উৎসাহী একদল সাহেব মেমদের সঙ্গে আলাপ হল, অনেকগুলি আর্ট ক্লাবের কাজ দেখলেন, নন্দলালকে ছাত্র পেলেন।

শিল্পীর মন কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কেবলি এগিয়ে চলে, কেবলি খোঁজে, কেবলি পরীক্ষা করে। সঙ্গে আরো পাঁচজন শিল্পী জোটে। এমনি করে দেশী চিত্রকলার অনুশীলনের জন্য আস্তে আস্তে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। আর্ট স্কুলের অধ্যাপনা এর মধ্যে এক দিন ছেড়ে দিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ দেখতেন নিখুঁত সব পুরোনো ছবি, পাখির গায়ের প্রত্যেকটি পালক নিখুঁত, কিন্তু কেমন যেন ভাবের অভাব; শরীরটাকে পাওয়া যাচ্ছে, অন্তরটি বাদ পড়ছে। এই কথা মনে করেই ছাত্রদের উপদেশ দিতেন তুলিটি জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে তবে ছবি আঁকতে হয়। বলতেন ছবির রং গুলতে হয় মনের মধ্যে।

ছবি আঁকা ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। বলছেন—'যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি? যে রং, যে রূপ রস মনে থাকত, চোখে ভাসত, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না, তখনকার মনের অবস্থা মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরটা কাল এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি।'

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে অনেকখানি না বুঝলে সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথেরও অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। রসে ডুবে থাকত শিল্পীর মন, কল্পনার আকাশে পাখিটি সদাই ডানা মেলে থাকত। এমন অপরূপ এক একটি গল্প তৈরি করতেন চিত্রশিল্পী যে পড়লে অবাক হতে হয়। তাঁর মনে অতল রসের সাগরের খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় এইসব গল্পে। ঘরকুনো মানুষটি, গোলমাল দেখলেই নাকি সরে পড়তেন, এ কথা নিজেই কতবার বলেছেন, কিন্তু হৃদয়রাজ্যটি আরব্য উপন্যাসের এক সহস্র এক রজনীর উপযুক্ত। 'পথে বিপথে' বইখানির প্রথম গল্প 'মোহিনী'কে উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। প্লট বলতে ঘটনাবহুল কোনো ব্যাপার নেই, একটু নিশানা, একটু ইঙ্গিত, অমনি হৃদয়ে তোলপাড়।

জাহাজে বসে সান্ধ্যভ্রমণের বন্ধু অবিন অবুকে দেখালে একটা আশ্চর্য ছবি, তার সবখানি অন্ধকার, তারি দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে দেখা যায় এক জোড়া সুন্দর চোখ। অবিনদের প্রাচীন সাবেক বাড়ি থেকে আবিষ্কার করা ছবিটি সে বন্ধু মহলের আড্ডা বসত যে বৈঠকখানায় সেখানে টানিয়ে রাখল। বন্ধুরা তখন একে একে মজলিস্ ছেড়ে চলে গেল, ও দুটি চোখ কেউ সইতে পারে না, বন্ধুদের মনে হয় এখানে তারা অনধিকার প্রবেশ করছে।

ছবির নীচে নাম লেখা 'মোহিনী', ছবির অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে ওপারে পৌঁছবার জন্য অবিনের প্রাণ আকুল হয়। সবাই ছেড়ে গেলে একা সে পড়ে থাকে ছবি নিয়ে। 'আমি একলা ঘরে আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দার ওপারে— মোহিনী। যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি।' সেই ছবির মধ্যে ডুবে গেল ছবির একমাত্র দর্শক। বলছে সে 'নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে, সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।'

এমন সময় একজন আর্টিস্ট বন্ধু এসে অবিনকে পাগলামির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। শুধু চোখ দুটি দেখা যায়, বাকি সব অন্ধকারে ঢাকা, সেই বাকিটুকুকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য অবিনকে সে একটি আরক দিয়ে গেল। ছবিতে আরক লাগাতেই ছবিখানা হয়ে গেল ঝাপসা আর দর্শক হলেন অচেতন। সেরে উঠে দেখে ছবিতে মোহিনীর সে দৃষ্টি আর নেই। 'ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

একজন চিত্রশিল্পীর স্বপ্ন এই গল্প; এ ধরণের গল্প বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেছে বলে মনে হয় না। এ ধরণের গল্প লেখা খুব সহজ নয়, এতে প্লট নেই, কথার চাতুরী নেই, সুন্দরী মেয়ের বর্ণনা নেই। শুধু একটা মনের ভাব, একটা ছবির মধ্যে নিজেকে হারানো দিয়ে কজনাই বা গল্প লিখতে পারে। যারা পারে তারা অভাবনীয়কে সঙ্গী করে নিয়েছে, বিস্ময়কে চোখের কাজল করে মেখে নিয়েছে। বৃদ্ধবয়সে নাতিদের নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হীরে খুঁজতে বেরুতেন। মাটিতে কত মাটির ঢেলার সঙ্গে চকমকি পাথর, সাদা নুড়ি আরো কত সুন্দর জিনিস পড়ে থাকে, তারি মধ্যে যদি হঠাৎ একদিন একটা হীরে বেরিয়ে পড়ে, তাই খুঁজতে বলতেন নাতিদের। বলা বাহুল্য মাটিতে হীরে পাওয়া যেত না, সে লুকিয়ে থাকত ঐ খোঁজার মধ্যে। কিন্তু খোঁজাটা তো মাটির চেয়ে এতটুকু কম বাস্তব নয়। এই রকম করে খুঁজতে পারে শুধু রসশিল্পীরা, তাদের কোথাও কিছুর অভাব থাকার উপায় নেই, অভাবের জিনিসটিকে অমনি খুঁজতে লেগে যায়, মন দিয়ে গড়তে লেগে যায়। 'মাসি'র গল্পে জোড়াসাঁকোর সাবেক বাড়ি হারিয়ে অবু যেমন মাসির বাড়িতেই সব কিছুকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল।

আমাদের চলিত ভাষায় 'রস' বলতেই হাসির কথা মনে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের লেখায় কোন্‌টা হাসির কথা কোন্‌টা বা কান্নার গোলমাল লাগে। 'বুড়ো আংলা' পড়লে কেবলি মনে হয় একি ছোটদের জন্যে লেখা নাকি বুড়োদের, একি হাসির গল্প নাকি ভাবনার গল্প। কত রস এসে জমা হয়েছে এই পুরোনো বিদেশী গল্পের খোলে। বুড়ো আংলার হৃদয় গণেশঠাকুরের শাপে ছোট্ট বক হয়ে গিয়ে চলেছে কৈলাস পর্বতের খোঁজে, গণেশঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আবার সে মানুষ হবে। বাড়ির বাইরে পা দিয়েই দেখা তার গুগলির সঙ্গে। গুগলি নাকি গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যাচ্ছে। শুনে হৃদয়ের সে কি হাসি। গুগলি বলে কি না পুকুরের ওপারটাতেই তো সমুদ্দুর! হৃদয় না হেসে পারে না। তবেই হয়েছে, সবজি ক্ষেত, তেপান্তরের মাঠ, গ্রাম, বন, নগর, উপবন ইত্যাদি পার হয়ে দেড় দিন কেন দেড় বছরেও সেখানে পৌছনো গুগলির কর্ম নয়। অতএব ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরাই ভালো।

গুগলি বিশ্বাস করে না রেগে যায়। সে সমুদ্রে পৌছবে না আর হৃদয় ভেবেছে ঐ সরু সরু ঠ্যাং নিয়ে কৈলাস যাবে? পক্ষিরাজ ঘোড়ার পর্যন্ত সেখানে যেতে চার সপ্তাহে কুলোয় না। হৃদয় যেন কৈলাসের আশা ছেড়ে দেয়। হৃদয় বললে— আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই।

গুগলি বললে— আমিও যেহনে যাত্রা করি বাইরেছি এই বেহ্মোকালে, সেহনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মু নি।

ঠিক সেই সময় খোঁড়া হাস পুকুর থেকে ছপ্‌ছপ্‌ করে উঠে এসে টুপ্‌ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল।

ছোট একটি মজার ঘটনা, এমনি শত শত ঘটনায় বইখানি ভরা, কিন্তু কেমন জীবনের সরস করুণ ভাবে

ভরা। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক বলেছিলেন সাহিত্য হল জীবনের সমালোচনা, a criticism of life, কিন্তু এমন নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনাও খুঁজে পাওয়া দায়।

কেমন করে যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের হাতের মুঠোয় শান্তি পাবার চাবিগাছি এসে গিয়েছিল, তাই বিশ্বের সব সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করেছেন, কিন্তু কোনো সময়ে কোনো কিছুকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন নি। একবার মুসৌরিতে শীতের শুরুতে একটা বন্ধ বাড়ি দেখেছিলেন শিল্পী। সে বাড়ির মালি তাঁকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়েছিল। অনেক দেখিয়ে শেষে মালি বললে ঐ যে ভাঙা বাংলোটা, ঐটেই হল এ বাগান যে প্রথম বানিয়েছিল, তার। ওদিকে আরো বাগান ছিল বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

'মালি যেদিকে দেখালে সেদিকে তুষার পর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরি ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলো। ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার পর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে— ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল, পর্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন। বসন্তের বুলবুল নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে শূন্যতার ঐ ওপার থেকে।'

অনন্ত রসের ভাণ্ডারের যারা রসিক, তাদের কাছে ক্ষয় বলে কিছু নেই। এক রূপ ধ্বংস হয়ে গেল তো সেই ধ্বংস থেকে অন্য এক রূপ গড়ে উঠল। রূপের চোখ দিয়ে যারা বিশ্বকে দেখে, তারাও নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক সহস্র চোখ দিয়েই দেখে, তাদের চোখে সুন্দরের কোনো ক্ষয় নেই। এমনি চোখ ছিল অবনীন্দ্রনাথের।

জোড়াসাঁকোর এককালের বৈভবের মধ্যে লালিত এই মানুষটি, সুখের দিনে কৃতজ্ঞ দুটি হাত পেতে ঐশ্বর্যের সামগ্রী যেমন গ্রহণ করেছিলেন, হাত কখনো মুঠো করেন নি। দুঃখের দিনেও তেমনি খোলা হাতে মনের যে সঞ্চয় মনে নিয়ে চলে যেতে পেরেছিলেন, সে সম্পদ কারো নিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে না।

কি যে কোমল স্নেহে ভরা ছিল অবনীন্দ্রনাথের মন, একমাত্র নিপুণ শিল্পীর হাতের কোমল রেখার টানের সঙ্গে তার তুলনা হয়। ছোট ছোট এক একটি বর্ণনা, তারি মধ্যে কি যে পরম স্নেহ পরম কোমলতা ভরে দেওয়া হয়েছে। নালকের গল্পে বটতলায় সিদ্ধার্থকে পুজো দিতে সুজাতা চলেছেন, সঙ্গে তাঁর কুড়িয়ে-পাওয়া আদরের মেয়ে পুন্না আর কোলের ছেলে মনুয়া। 'সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন— তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।… তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে— রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানা চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে।… তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন— বটগাছের নীচে যিনি বসে রয়েছেন, তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।'

এটুকু পড়লেই কি এক মধুময় শান্তির ছবি চোখের সামনে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে; মনে হয় পার্থিব

জীবনের সব জ্বালাযন্ত্রণা ব্যর্থতা নিরাশা সুজাতার জোড় হাতের একটি প্রণামের মতো সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে এসে লয় পেয়ে যাচ্ছে।

শিল্পীদের হৃদয় হয় আশা দিয়ে গড়া, যাদের মনে বিশ্বাস নেই, চোখে দৃষ্টির আলো নেই, প্রাণে আনন্দের হিল্লোল নেই, তারা আঁকতে পারে না, লিখতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের লেখার তলায় তলায় একটা বলিষ্ঠ বিশ্বাস শক্তি জোগাতে থাকে। কেবলি মনে হয় পার্থিব ঘটনারও এইখানেই শেষ নয়, এর পরে আরো উজ্জ্বলতর অধ্যায় সব রয়েছে। বারো বছরের নালক দেবলঋষির সঙ্গে বুদ্ধদেবকে দেখতে পাবার আশায় বিধবা মাকে একা ফেলে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জীবনের তীর্থের ঘাটে ঘাটে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে, বুদ্ধদেবের দেখা না পেয়েই, আবার নিজের গাঁয়ের নদীর ঘাটে নৌকো থেকে নেমে দেখে নদীর জলে একটি ফুল ভেসে এসে, ঢেউয়ের সঙ্গে একবার ডাঙার দিকে একবার জলের দিকে যাওয়া আসা করছে।

'নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝনদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ঐ ফুলটির মতোই ভাসতে ভাসতে তাদের দেশের ঘাটে মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!' স্বার্থশূন্যচিত্তে জীবনের উপরে এই শ্রদ্ধা এই সুগভীর বিশ্বাস শিল্পীমনের প্রথম ও শেষ কথা।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্যরচনার কথা বলতে গেলে, কথায় কথা এমনি বেড়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলবার ভয় থাকে। গোড়ার কথাটি হল অবনীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সব শিল্প ও সব সাহিত্যকে সেই একক ও অখণ্ড রূপের বিকাশ বলে বিশ্বাস করতেন, তাই যা কিছু নকল ও অসত্য কেবলমাত্র তাকেই বর্জন করার কথা বলেছেন। শিল্প ও সাহিত্যসাধনার মূলে বিশ্বপ্রাণের উপরে গভীর আস্থা না থাকলে সৃষ্টিকারের যে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এ কথা অবনীন্দ্রনাথের জানা ছিল। তিনি বলতেন শিল্পীকে বিশ্বরূপের ধ্যান করতে হবে দুই চোখ খুলে, যা ছিল পরিমিত তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তাই মন থেকে তাগাদা না এলে শিল্প বা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি মানে কেবলি অন্বেষণ, কেবলি অনুশীলন, কেবলি যা চাই তাকে না পাওয়া।

শিল্পের ছাত্রকে কেবলি খুঁজতে হবে, নিজের চোখ দিয়ে দেখতে হবে, নিজেকে পেতে হবে। শিল্পী তৈরি করেন বিধাতা, মাস্টারমশাইদের সে সাধ্য নেই। ছবি আঁকতে গেলে শুধু মাস্টারমশাইদের বুকনি দিয়ে কি হবে? ছবি আঁকতে হয় তুলিটি জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে, তারপরে।

তার উপরে অবনীন্দ্রনাথ সেই জাতের শিল্পী নন রুদ্র আবেগে যাদের হাত কাঁপে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোয়, যারা ভাঙতে চায়, নষ্ট করতে চায়। কোমল স্নেহ দিয়ে ভরা এই শিল্পীর মন; এক রকম বলিষ্ঠ আশা, অক্ষয় পৌরুষ দিয়ে গড়া তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। জীবনের নকল খোলসগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলে, অন্তরের অন্তঃকরণকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাই এত শক্তি তাঁর তুলিতে ও কলমে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। দশ টাকা।

বাংলার নবজাগণের কথা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বসুধারা প্রকাশনী। চার টাকা।

রামকমল সেন। প্যারীচাঁদ মিত্র। সম্পাদনা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। সম্বোধি পাবলিকেশনস্। দশ টাকা।

উনবিংশ শতক বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রধান স্মরণীয় শতক। এ দৃষ্টি প্রায় সর্বস্বীকৃত যে কোনো দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তথা প্রগতির আলোচনা করতে গেলে তার ঐতিহাসিক যুগলক্ষণ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উপাদান, উক্ত আলোচনার পরিধিভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তেমনি মনে রাখতে হবে, ঐতিহাসিক যুগলক্ষণ বা যুগচেতনা সূর্যালোকের মতো ছড়িয়ে পড়লেও সকল ব্যক্তির সাধ্য সমভাবে বিধৃত হয় না। বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়েই তার রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি'র 'ভূমিকা' কোনো কারণেই গৌণ নয়। এবং 'ব্যক্তি'র এই বিশিষ্ট আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের বিচ্ছেদ ঘটাল। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের পূর্বার্ধ তারই ইতিহাস।

যোগেশবাবু বাংলা দেশের উনবিংশ শতকের নানা দিক নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে মূল নথিপত্র নিয়ে অনলস ঐতিহাসিক গবেষণায় রত আছেন। এই সূত্রে বিশেষ করে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও উল্লেখ করা কর্তব্য। 'উনবিংশ শতকের বাংলা' গ্রন্থখানি প্রথম ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘকাল বইখানি দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১৯৬৩ সালে পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ বার হওয়ায় উনবিংশ শতক সম্পর্কে জিজ্ঞাসু সুধী ব্যক্তিদের আনন্দের বিষয় হয়েছে। পরিবর্ধিত এই সংস্করণে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রিচার্ডসন, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, বেথুন, ভগবানচন্দ্র বসু, জেমস লঙ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দমোহন বসু ও 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা' সভা প্রসঙ্গগুলি সংযুক্ত হয়েছে। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' নামটি সজনীকান্ত দাস দিয়েছিলেন। নামকরণের সার্থকতা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কেননা, লেখক প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ-বিংশ শতকের কয়েকজন বরণীয় ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বা চরিত্রচিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন, যাঁদের মধ্যে পার্শী ইংরেজ এবং ইউরেশীয়ও আছেন। এখানে ঝোঁকটা প্রধানতঃ কীর্তিমান ব্যক্তিদের জীবনেতিহাসের উপর পড়েছে, দেশের বা সমাজের ইতিহাসের উপর নয়। অবশ্য, যে-কর্মকীর্তি বিশেষ-বিশেষ মানুষকে বরণীয় করে তোলে সেও দেশ ও কালের দ্বারা আবদ্ধ। তাঁদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাসকেও জানা যায়। তবুও নামটির মধ্য দিয়ে গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের সুস্পষ্টতা ধরা পড়ে না।

বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট (মুদ্রিত ও অমুদ্রিত), সমকালীন পত্র-পত্রিকার ফাইল, চিঠিপত্র, দিনলিপি, উইল, ভাষণ, আত্মচরিত প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে তথ্যনিষ্ঠ অর্থাৎ factual বা informative চরিত-প্রবন্ধ রচনা যত বেশি হয় আমাদের সাহিত্যের ততই মঙ্গল। কেননা, আমাদের সাহিত্যে তার অভাব এখনো রয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত তথ্যনিষ্ঠ চরিত-প্রবন্ধ রচনা সম্ভবপর হয় না। যোগেশবাবু

এই ধরণের objective চরিতচিত্র রচনার বিশেষ পক্ষপাতী। তথ্যসমৃদ্ধ জীবনচরিত না থাকলে কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে ভাষ্যমূলক বা শিল্পধর্মী জীবনী? 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে এই objective পদ্ধতি সর্বত্র অবলম্বিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সংকলিত দ্বারকানাথ, ডেভিড হেয়ার বা ডিরোজিও সম্পর্কিত রচনায় লেখকের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃতভাবে কম। কেননা, তাঁদের প্রামাণিক জীবনী পূর্বেই রচিত হয়েছে। কিন্তু 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর' 'রসিককৃষ্ণ মল্লিক' ও 'রাধানাথ শিকদার' রচনাগুলিতে তাঁর দুরূহ অধ্যবসায় ও ঐতিহাসিক সততার পরিচয় উজ্জ্বল। অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও সুরচিত ও তথ্যধনী।

'বাংলার নবজাগরণের কথা' গ্রন্থে 'বাংলার নবজাগরণের কথা' 'বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারীসমাজ' 'বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমান' প্রবন্ধ তিনটি সংকলিত হয়েছে। লেখক প্রথম প্রবন্ধে রেনেসাঁসের সংজ্ঞা স্থির করে নিয়ে দেখাবার প্রচেষ্টা করেছেন যে উনবিংশ শতক যথার্থভাবে বাংলার 'রেনেসাঁসের যুগ'। আমাদের দেশের উনবিংশ শতকের ইতিহাস, জাতির নবজাগরণের ইতিহাস— এ সিদ্ধান্তে আপত্তি তোলা নিরর্থক। কিন্তু আমাদের নবজাগরণের মতো জাতীয় অভ্যুত্থান পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো হয় নি এও যেমন অত্যুক্তি, তেমনি রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কর্ম ও চিন্তা-ধারার নিজস্ব মহিমা কিছু নেই— এ ধরণের মন্তব্যও ঠিক না। আবার ইতালীয় তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে আমাদের দেশকে অক্ষরে অক্ষরে মেলাতে গেলে যে ঠকতে হবে, এও ধ্রুব সত্য। এক দেশের ছক অপর দেশে পড়ে না।

যোগেশবাবু প্রথম প্রবন্ধটিতে উনবিংশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক অবধি বাঙালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চেতনা, শিল্প, সংগীত— সর্বক্ষেত্রে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা দেখা দিয়েছিল তার মোটামুটি একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন। তবে, তিনি renaissanceকে স্বীকার করেছেন কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যে revivalistic tendency বা 'পুনরুত্থান-বাদী প্রবণতা' দেখা দিয়েছিল তাকে অস্বীকার করেছেন। যুক্তিপন্থা যদি রেনেসাঁসের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হয় তা হলে যুক্তিবিরোধী ভক্তিপথ তার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হতে পারে না। 'Reason' এবং 'Faith' সহোদর নয়, পরস্পরবিরোধী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র যে-দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চালিত হয়েছেন, কেশবচন্দ্র সেন, পরমহংসদেব বা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তার বিপরীত পথ অনুসরণ করেছেন। কেশবচন্দ্র যখন যুক্তিবাদী দর্শনের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন: 'The politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosoply Positivism' তখন তিনি রেনেসাঁসের মূল সত্য অর্থাৎ চিত্তের বন্ধনমুক্তিরই বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কাজেই লেখকের সঙ্গে সমালোচকের এক্ষেত্রে মত-পার্থক্য অনিবার্য। এ কথাও বলা দরকার যে ভিক্টোরীয় যুগসুলভ সমাজসংস্কার আর 'রেনেসাঁস' সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।

'বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারীসমাজ' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি নির্ভর। 'বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমান' প্রবন্ধটি অবশ্যই জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখক বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে নবজাগরণের আলোক কেন বিচ্ছুরিত হয় নি তার ঐতিহাসিক আলোচনা সংক্ষেপে করেছেন। সে-আলোচনা আরো তথ্যমণ্ডিত এবং বিচারনিষ্ঠ হলে ভালো হত। পলাশীযুদ্ধের পূর্ব থেকেই দেখি বহু হিন্দু ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তথা ফরাসী ও ওলন্দাজদের

অধীনে কর্মগ্রহণ করেছে এবং তারা চাকরি তেজারতি মহাজনি করে অপরিমিত অর্থ আয় করেছে। পলাশীযুদ্ধের পর বাংলা দেশে যাঁরা নতুন জমিদার বা 'রাজা' হয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু। 'বেনিয়ান' 'হৌসদার' 'মুৎসুদ্দি' প্রভৃতি বৃত্তি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই গ্রহণ করেন, তাঁরাই নব্য 'মধ্যবিত্ত' ও 'উচ্চবিত্ত'। তাঁরা একদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে অর্থোপার্জন করেছেন অন্যদিকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র ফলে নতুন ভূস্বামী হন। তাঁরা কোম্পানীর রাজত্বকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং ইংরেজি শিক্ষার মূল্যও বুঝেছিলেন। তাই ১৮১৭ সালে যে-'হিন্দুকলেজ' তাঁরা গড়েছিলেন, সে তাঁদেরই টাকায়, কোম্পানীর নয়। এই হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল 'an institution for giving a liberal education to the children of the members of the Hindu Community'. এই প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাড়া অন্যধর্মাবলম্বীদের লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল।

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ তখন গড়ে উঠছে, কিন্তু মুসলমান সমাজে ঐ ধরণের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস দেখা দেয় নি। ঐতিহাসিক পোলার্ড তাঁর *Factors in Modern History* গ্রন্থে ঠিকই লিখেছেন: "without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class you had no Renaissance and no Reformation" (page 81)। মুসলমান সমাজে সেকালে এই 'middle class'এর অভাব ছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে হিন্দু-মধ্যবিত্ত যেখানে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উন্মুখ, মুসলমান সমাজ সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে বসে ছিল। সার্ সৈয়দ আহমদ মুসলমান সমাজের মানসিক জড়ত্ব দূরীকরণের চেষ্টা করেন আলীগড়ে 'অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা দ্বারা। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

ওহাবী, ফরাজী আন্দোলনের কথাও যোগেশবাবু বলেছেন। তাঁর সঙ্গে সমালোচক সর্বত্র ঐকমত্য বোধ করেন নি। বিশেষত ১৮৭৩ সালে পাবনার হিন্দু জমিদার ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, সে-সম্পর্কে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত 'Arcyde' ছদ্মনামে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' 'An apology for the Pubna rioteers' নামে এই দাঙ্গা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৮৭৩ সেপ্টেম্বর)। ঐ প্রবন্ধে তিনি হিন্দু জমিদারগোষ্ঠী পরিচালিত তৎকালীন 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের তথ্য ও মন্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন নি। বরঞ্চ তিনি লেখেন জমিদারেরা তাঁদের প্রাপ্য নয় এমন কর ও শস্যভাগ নানা-অছিলায় প্রজাদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে আদায় করেছেন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১৮৫৯এর দশম ধারাকে তাঁরা নিজেদের স্বার্থে অগ্রাহ্য করেছেন। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে দেয় ও প্রাপ্য কর সম্পর্কে একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত অবিলম্বে হওয়া দরকার।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরেজিতে লেখা *Life of Dewan Ramcomul Sen* ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। খ্যাতনামা বাঙালীদের চরিত রচনায় প্রথম সিদ্ধকাম হন তাঁর ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ, রামমোহন রায়, হরিশচন্দ্র মুখার্জি, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ, মতিলাল শীল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত ইংরেজিতে রচনা করেন। প্যারীচাঁদ ডেভিড হেয়ার এবং কোলস্‌ওয়ার্দির জীবনচরিতও প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায়। রামকমল সেনের জীবনীগ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য

ছিল। 'সম্বোধি পাবলিকেশনস্' সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য চরিতগ্রন্থগুলির বাংলা-অনুবাদ টীকা-টিপ্পনী সহযোগে প্রকাশ করছেন।

তাঁরা কিশোরীচাঁদের *Memoirs of Dwarkanath Tagore* এবং প্যারীচাঁদের *A Biographical Sketch of David Hare*ও অনুরূপভাবে প্রকাশ করেছেন। রামকমল সেন উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের একজন বিশিষ্ট বাঙালী। তাঁর জীবনী বাংলায় অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ। অনুবাদ করেছেন শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত। প্রায় সর্বত্র অনুবাদ মূলের যথাযথ ও সুপাঠ্য হয়েছে। তবে দু-একটি জায়গায় ত্রুটি ঘটেছে দেখা যায়, যেমন, 'গায়ত্রী' প্রসঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে— 'এস আমরা দিব্য নিয়ন্ত্রণকারীর পূজ্য আলোর ধ্যান করি, এই ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করুক।' অথবা— 'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি ভক্তিরীতির উপাসনা, যার জন্যে উপযুক্ত গ্রন্থের লেখক তাঁর উপর দোষারোপ করেছেন, তার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা না করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তা এই যুক্তির জন্যে যে, ভক্তি উপাসনা আমাদের সেই পরাজ্ঞান দেয় না, যা আত্মার উপাসনা দিয়ে থাকে।'— এই ধরণের গদ্যরীতি প্রার্থিত নয়।

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। তিনি লিখেছেন 'সংস্কার ও সংরক্ষণের মধ্যেই রেনেসাঁসের পরিপূর্ণ সার্থকতা'। এ উক্তি ঠিক মনে হয় না। মনে রাখতে হবে ডিরোজিওকে বিতাড়নের জন্য দায়ী ছিলেন রামকমল সেন এবং রাধাকান্ত দেব। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনীত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল যে 'ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ' সমর্থন করেছেন ডিরোজিও। ডিরোজিও অভিযোগগুলির যে দৃপ্ত জবাব দিয়েছিলেন, আশা করি, শিক্ষিত মহলের অনেকেই তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। ডিরোজিও যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবিক দৃষ্টি, সাম্য-মৈত্রীর স্বপ্ন, প্রত্যক্ষবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক চেতনা সেদিনকার 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন রক্ষণশীল গোষ্ঠী তার দ্বারা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও যে মত ও পথ সেদিন নির্দেশ করছিলেন সেগুলি রেনেসাঁসেরই লক্ষণ।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদ্, কলিকাতা ৯। মূল্য এক টাকা।

এ যুগের বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক গবেষণায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। অণুর জগৎ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে আজ। এমন দিনে যোগ্য কোনো ব্যক্তি যদি পারমাণবিক বিজ্ঞান নিয়ে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তা স্বভাবতই আশা ও আনন্দের সঞ্চার করে। সুখের বিষয়, শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় এ কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকদের জন্যে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন তিনি।

বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করে বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন ইতিপূর্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা 'বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ' (১৩৫০), 'রসায়ন ও সভ্যতা' (১৩৬৩), 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' (১৩৬৪) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় সম্পদ। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তিনি গভীর মননশীলতা, নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি

ও সরস বর্ণনারীতির পরিচয় দিয়েছেন, এ গ্রন্থটি হল বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। বিষয়গৌরবই শুধু নয়, জীবন ও সাহিত্যিক সত্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের মণিকাঞ্চন যোগও এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। অতিকায় অণু নিয়ে গবেষণার ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক বা দার্শনিক উভয় দিকই আলোচিত হয়েছে এখানে। তা ছাড়া জায়গায় জায়গায় এসেছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান-চিন্তার কথা। যেমন, 'অণুর অনুমান'এর কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক কণাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন যুগই শুধু নয়, একেবারে হাল আমলের গবেষণা সম্বন্ধেও লেখক আলোচনা করেছেন। যেমন, প্রোটিন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কেনড্রুর আবিষ্কারের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রিয়দারঞ্জন। নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রিক, ওয়াটসন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি কিছুদিন আগে সোভিয়েট রাশিয়া পলিঈথিলিনের যে মোটর লঞ্চ তৈরি করেছে, সে খবরও আছে এখানে। আর আছে অতিকায় অণু সম্বন্ধে ভারতীয়দের গবেষণার কথা। তবে তথ্য বা সংবাদই এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়, বর্ণনারীতির সরসতা এবং উপমা-নির্বাচনে অভিনবত্বও এর সম্পদ। উপমার সাহায্যে অতি অল্প কথায় অতিকায় অণুর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন লেখক। বলেছেন, এক-একটি ইট গেঁথে যেমন দেয়াল বা দালান গড়ে ওঠে, সেরূপ বহু একক এক-জাতীয় অণু জুড়ে হয় একটি অতিকায় অণুর উৎপত্তি।

অতিকায় অণু-গঠিত পদার্থকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এখানে :—১. স্বাভাবিক ও ২. কৃত্রিম। স্বাভাবিক পদার্থকে অজৈব ও জৈব নামক দুটি শাখায় এবং কৃত্রিম শ্রেণীকে অজৈব মিশ্র ও জৈব এই তিন উপশাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। অতিকায় অণু-গঠিত বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে সর্বত্রই উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করায় অবৈজ্ঞানিক পাঠকদেরও গ্রন্থটি পড়তে ভালো লাগবে। কারণ, যেসব পদার্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, দৈনন্দিন জীবনে এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমরা পরিচিত। উদাহরণ হিসেবে অভ্র, অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌, শ্বেতসার (starch), রাবার, প্রোটিন, রেশম, পশম, পলিঈথিলিন, নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

এ ছাড়া এ গ্রন্থের আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল পরিভাষা-ব্যবহারে লেখকের সতর্কতা। একই জিনিস বোঝাতে কোথাও দুপ্রকার পরিভাষা ব্যবহার করেন নি তিনি। কোথায় বৈজ্ঞানিক শব্দের বিদেশী নাম ব্যবহার করবেন, আর কোথায় তার পরিবর্তে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করতে হবে, সে সম্বন্ধে লেখক সতর্ক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বায়ুজাতীয় পদার্থ বোঝাতে তিনি ইংরেজি গ্যাস শব্দটি না লিখে লিখেছেন মারুত।

তবে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, প্রিয়দারঞ্জনের চিন্তাক্রম ও রচনারীতিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের এমন একটি দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, 'যা গড়ে তোলবার গবেষণা ; ভাঙবার বা ধ্বংসের নয়'। আজ পারমাণবিক মারণ-অস্ত্রের উদ্ভাবনে যখন বিভিন্ন জাতি মেতে উঠেছে, তখন মানুষ গড়ার পথের সন্ধান পাওয়া গেছে অতিকায় অণু-গঠিত পদার্থের গবেষণায়। তাই এমন দিনে অতিকায় অণু নিয়ে এ ধরণের সুচিন্তিত গ্রন্থ যত বেশি লেখা হয়, ততই মঙ্গল।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ইরাবতী থেকে নায়েগ্রা। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

ইহা মামুলি ধরণের ভ্রমণকাহিনী বা রম্যরচনা নয়।

কর্মব্যপদেশে গ্রন্থকার বহু দেশে গিয়াছেন এবং তাঁহার স্পর্শচঞ্চল মন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ভ্রমণকাহিনীতে নানা দেশের ছোটোখাটো কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে; যে সব আপাততুচ্ছ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয় ইতিহাসদর্শনবিজ্ঞানে পাওয়া যায় না সার্থক ভ্রমণকাহিনীতে তাহারা সজীবতা লাভ করে। রম্যরচনা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির হাল্‌কা প্রকাশ। পরিহাসচঞ্চল সংবেদনশীলতা রম্যরচনাকে রমণীয় করিয়া তোলে। বর্তমান গ্রন্থকারের দৃষ্টি অন্য দিকে। তিনি যেসব জায়গা দেখিয়াছেন— বাড়ির কাছে বেলুড়, ভোটবাগান হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত— সর্বত্রই সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন এবং শিল্পকর্ম বা ধর্মোপাসনার পদ্ধতির অন্তরালে মানবহৃদয়ের গভীরতম জিজ্ঞাসার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিচিত্র, বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। এই গ্রন্থে বর্মী বৌদ্ধধর্মের কাহিনী আছে, তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কাব্যের বিস্তারিত পরিচয় আছে, আধুনিক আণবিক পদার্থবিদ্যার গতি ও প্রকৃতির আলোচনা আছে। কিন্তু সর্বত্রই একটি লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে: মানুষের আত্মার জিজ্ঞাসা যাহা তাহার জৈব প্রয়োজনের তাগিদের চেয়ে বড় তাহা তাহাকে কোন্ রহস্যের সন্ধান দিয়াছে? এই অনুসন্ধানই এই গ্রন্থখানিকে অনন্যতা দান করিয়াছে।

গ্রন্থকারের কল্পনা ও মনন-শক্তি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধানী, তাঁহার ভাষাও ঐশ্বর্যময়। তাই তাঁহার জিজ্ঞাসাও যেমন সুদূরপ্রসারী, বর্ণনাও তেমনি বর্ণাঢ্য। কিন্তু এই বর্ণাঢ্যতাই গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি, কারণ কোনো কোনো জায়গায় ভাষার সমারোহে বিষয়বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভরতভাষ্যম্: প্রথম খণ্ড। শ্রীনান্যভূপাল প্রণীত। ইন্দিরা কলাসংগীত বিশ্ববিদ্যালয়, খয়রাগড়, মধ্যপ্রদেশ। মূল্য আট টাকা।

সংস্কৃত সংগীত সাহিত্যে 'ভরতভাষ্যম্' সুপরিচিত। এই গ্রন্থের অপর নাম সরস্বতী হৃদয়ালঙ্কার। গ্রন্থকার মিথিলারাজ নান্যভূপাল বিদগ্ধ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত। ইনি খৃষ্টীয় সন ১০৯৭ থেকে ১১৩৩ পর্যন্ত মিথিলা শাসন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে। দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিবিধ বিপর্যয় সত্ত্বেও সংগীতসাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করেছে। এই কালের মধ্যেই নান্যদেব, ভোজ, সোমেশ্বর, পরমর্দী, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সংগীতশাস্ত্র রচনা করে প্রাচীন সংগীতের স্বরূপকে পরবর্তী যুগের গোচরীভূত করে রেখে গেছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলির সব স্থান স্পষ্ট বা সুপরিস্ফুট নয়। এই কারণে বর্তমান মুদ্রিতগ্রন্থে কিছু কিছু অংশ যোজনা করা সম্ভব হয় নি এবং অস্পষ্ট শব্দাদি প্রশ্নচিহ্নে বিশেষ করে রাখা হয়েছে।

ভরতভাষ্য ভারতীয় সংগীতের বিস্তীর্ণ অংশ অধিকার করেছে। ভরতোল্লিখিত গীতাদি এবং সংজ্ঞাগুলি

আলোচনার পরেও রাগসংগীতের বিবিধ বিষয় গ্রন্থকার নৈপুণ্য সহকারে সন্নিবেশিত করেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সপ্তদশ অধ্যায়ে রচিত। বর্তমান গ্রন্থে সমুদ্দেশ, শিক্ষা, স্বর, মূর্ছনা এবং অলঙ্কার— এই পাঁচটি অধ্যায় যোজিত হয়েছে। পরবর্তী জাতি, রাগ, সপ্তগীতি, ধ্রুবা, তাল (মার্গ এবং দেশী), সুষির এবং পুষ্কর বাদ্য, ছন্দ এবং ভাষা প্রকরণগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার বীণার উল্লেখও করেছেন। অপ্রকাশিত অধ্যায়গুলির কয়েকটি হয়ত পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে অধ্যায়গুলি মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীচৈতন্য পুণ্ডরীক দেশাই প্রচুর পরিশ্রম সহকারে অধ্যায়গুলির পারম্পর্য রক্ষা করে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং প্রাঞ্জল হিন্দী টীকাও রচনা করেছেন। তবে অলঙ্কার অধ্যায়ে অলঙ্কার এবং গমকের পর অপর অংশগুলি যোজনা না করাই কর্তব্য ছিল, কারণ এগুলি অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ হচ্ছে শিক্ষা অধ্যায়। সুপ্রাচীন স্বরগুলির সংজ্ঞা বর্ণনা দ্বারা কৌতূহলী পাঠক উপকৃত হবেন। এই অংশের টীকাটি প্রচুর অধ্যয়ন ও যত্নের পরিচায়ক। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং সামিক ক্রুষ্টাদি সপ্ত স্বরের উল্লেখ এবং তদীয় টীকা অত্যন্ত মূল্যবান। তবে ভাষ্য বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাংশই উল্লেখমাত্র, সামান্য কয়েক স্থলে এই উল্লেখকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করা হয়েছে। অতএব 'ভরতভাষ্য' বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হয়। প্রাচীন সংগীতগ্রন্থাদিতে এই ধরণের দাবী প্রায়ই করা হয়েছে এবং গ্রন্থকার নান্যভূপালও এর ব্যতিক্রম নন। সপ্তগীতি এবং ধ্রুবা— এই দুটি অধ্যায় প্রকাশিত হলে এই গ্রন্থকে কতটা 'ভরতভাষ্য' বলে স্বীকার করা যায় সেটি বোঝা যাবে, কারণ এইগুলিই নাট্যশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গীতবর্ণনা। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রস্তুত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। আমরা আশা করি বর্তমান খণ্ডের মতো বিদগ্ধ টীকা এবং পরিচয় সমেত এই খণ্ডটিও সংগীতের ইতিহাস নিরূপণে সহায়তা করবে। ইন্দিরা কলাসংগীত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের সম্পাদনায় একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

স্বরলিপি

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে !
সে সুধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায় ।
ছেলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় পাখায় নিল এঁকে ॥
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে ।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে ।
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে ।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গা । গা গা -মা II { পা -না না । না ধা -না I ধা পা -া । -া -া (-ধা I
আ কা শে ০ দু ই হা তে প্রে ম্ বি লা • ০ ০ য়্

I মা -া -া । পা -া -ধপা I মা -পধপা -মপা । গা -া -া I
বি • • লা • •য়্ ও ০০• •• কে ০ ০

I -া -া গা । গা গা -মা) } I -া I -া -া সা । সা সা -া I
০ ০ আ কা শে • য়্ ০ ০ সে সু ধা ০

I রা রা রা । গা গা -া I মা পা -ধা । (ধ)পা মগা -া I
ছ ড়ি য়ে গে ল ০ লো কে ০ লো কে০ ০

I -া -া গা । গা গা -মা II
• • "আ কা শে ০"

-া II -া -া পা । { ধা ধা -র্সা I র্সা র্সা -র্রা । র্সা -র্রর্গা -র্গরা I
• • য়্ গা ছে রা ৹ ভ রে ৹ নি ৹৹ ৹

I র্সা -া -া । -া -া -া I র্সা র্সা -া । না না -া I
ল ৹ ৹ ৹ • ৹ স বু জ্ পা তা ৹

I -া -া না । না না -া I ধা না -া । ধা -নর্সা -র্সনা I
৹ য়্ ধ র ণী ৹ ধ রে ৹ নি ৹৹ ৹

I ধপা -া -া । -ধা -না -ধা I পা ধা -া । ধনা ধপা -া I
ল৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ আ প ন্ মা থা৹ ৹

I -া -া (পা) } । পা । পা পা -া I পা পা -দা । দা দা -া I
৹ য়্ গা ছে লে রা ৹ স ক ল্ গা য়ে ৹

I পা পা -দা । দা পা -া I -া -া পা । পা পা -া I
নি ল ৹ মে খে ৹ ৹ ৹ পা খি রা ৹

I মা পা -া । পা পদা -দপা I মা পা -মদা । পা মগা -া I
পা খা য়্ পা খা৹ য়্ নি ল ৹৹ এ কে৹ ৹

I -া -া গা । গা গা -মা II
৹ ৹ "আ কা শে ৹"

-া II -া -া সা । { সা সা -া I সা ৱা ৱা । ৱা ৱা -া I
০ ০ য়্ ছে লে রা ০ কু ড়ি য়ে নি ল ০

I ৱা গা -া । ৱা -া -গমা I মগা -া গা । গা গা -মা I
মা য়ে র্ বু ০ ০০ কে ০ মা য়ে রা ০

I মা মা -পা । পা পা -দা I দপা পা -দা । পা -দণা -ণদা I
দে খে ০ নি ল ০ ছে লে র্ মু ০০ ০

I পা -া পা । পা পা -া I পা -া দা । পা দা -া I
খে ০ সে যে ও ই দু ক্ খ শি খা য়্

I পা -া দা । পা দা -া I -া -া দা । দা পা -া I
উ ঠ্ ল জ্ব লে ০ ০ ০ সে যে ও ই

I মা -া পা । পা ণদা -পা I মা -া পদা । পা মগা -া I
অ শ্ শ্রু ধা রা০ য়্ প ড়্ ল০ গ লে০ ০

I -া -া (সা) } । পা । { ধা ধা -র্সা I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
০ ০ ছে সে যে ও ই বি দী র্ ণ বী র্

I র্সা র্সা -া । র্সা -নর্সা -র্রর্গা I র্রর্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
হৃ দ য়্ হ ০০ ০০ তে০ ০ ব হি ল ০

I না র্সা -া । না না -া I ধা না -া । ধা -নর্সা -র্সনা I
ম র ণ্ রূ পী ০ জী ব ন্ স্রো ০০ ০

I ধপা -া পা } । পা পা -া I পা পা -দা । দা দা -া I
তে০ ০ সে যে ও ই ভা ঙা ০ গ ড়া র্

I পা পা -দা । পা দা -া I -া -া দা । দা পা -া I
তা লে ০ তা লে ০ ০ ০ নে চে যা য়্

I মা পা -া । পা ণদা -পা I মা পা -মদা । দপা মগা -া I
দে শে ০ দে শে০ ০ কা লে ০০ কা লে০ ০

I -া -া গা । গা গা -মা II II
০ ০ "আ কা শে ০"

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪

পৃষ্ঠা	স্বরলিপি-ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৮	৭	না না না	না র্সা র্সা
		ধ রা র	ধ রা র
৩৬০	৬	রা -া । জ্ঞা	রা -া । জ্ঞা
		ডা ০ লা	ডা ০ লি

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

নূতন বর্ষের এই প্রথম সংখ্যায় আমরা শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সম্মতিক্রমে তাঁকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি প্রকাশ করলাম। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-তিরোধানের বৎসর-খানেক পরে, 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়; উক্ত খণ্ডে প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সংকলিত আছে। ঐ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় নি এরূপ অনেকগুলি চিঠি সম্প্রতি আমরা পেয়েছি: তার কয়েকটি চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল, অবশিষ্ট চিঠিও বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। তার পরে 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ড পূর্ণতরভাবে ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশ করা সহজ হবে।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাধকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের সাধনালব্ধ উপলব্ধির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ও তাঁর ঘটেছে। এবং সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের পূর্বসূরীদের ধ্যানধারণার বিষয়ও তিনি অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর সেই অনুসন্ধানের ফল বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ— 'সীমা ও অসীম'। শূন্যের বিপরীত পূর্ণ কি না, সীমা ও অসীমের মধ্যে কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড়— এসব নিয়ে বিভিন্ন সাধক তাঁদের উপলব্ধি যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান প্রবন্ধে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কথাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে কালিদাস দুইটি তপোবনের বর্ণনা দিয়েছেন। এই দুই তপোবন-বর্ণনায় কালিদাসের শিল্পবোধের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ও তপোবন-দুইটি এই নাটকের পক্ষে কি পরিমাণে উপযোগী হয়েছে, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও দুইটি তপোবন' প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

পৌরাণিক দেবতাকে নয়, একটি বিশেষ ভাবরূপকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় নারায়ণ নামে অভিহিত করেছেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ' রচনায় রবীন্দ্রভাবনার সেই বিশেষ ভাবরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীরূপেই কীর্তিত; কিন্তু তাঁর একটি সাহিত্যিক সত্তাও যে আছে শ্রীলীলা মজুমদারের 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শিল্পী ও সাহিত্যিক' প্রবন্ধটি অবনীন্দ্রনাথের সেই দিকটির বিষয়ে আলোচনা।

স্বী কৃ তি

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত রঙিন চিত্র-দুইটি শ্রীরামকুমার কেজরিওয়ালের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

পুরাতন সংখ্যা

বিশ্বভারতী পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা কিছু আছে। যাঁরা সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের অবগতির জন্য নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল—

¶ প্রথম বর্ষের মাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার চার সংখ্যা, একত্র ১.০০।

¶ তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ অষ্টম বর্ষের প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ নবম বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.০০।

¶ ষষ্ঠ সপ্তম দশম একাদশ ও চতুর্দশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়। প্রতি সেট ৪.০০, রেজেস্ট্রি ডাকে ৬.০০।

¶ পঞ্চদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা ৩.০০, বাঁধাই ৫.০০; তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, প্রতিটি ১.০০।

¶ ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্ত-সংখ্যা, ৩.০০।

¶ অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ঊনবিংশ বর্ষের তৃতীয়, বিংশ বর্ষের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং একবিংশ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যায়, প্রতি সংখ্যা ১.০০।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কলকাতার গ্রাহকবর্গ

স্থানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ক্রেতারূপে নাম রেজিস্ট্রি করবার এবং বার্ষিক চার সংখ্যার মূল্য ৪.০০ টাকা অগ্রিম জমা নেবার ব্যবস্থা আছে। এইসকল কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত হল—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
৩৩ কলেজ রো

ভবানীপুর বুক ব্যুরো
২বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড

যাঁরা এইরূপ গ্রাহক হবেন, পত্রিকার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলেই তাঁদের সংবাদ দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী গ্রাহকগণ তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ডাকব্যয় বহন করবার প্রয়োজন হবে না এবং পত্রিকা হারাবার সম্ভাবনা থাকে না।

মফস্বলের গ্রাহকবর্গ

যাঁরা ডাকে কাগজ নিতে চান তাঁরা বার্ষিক মূল্য ৫.৫০ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ৭ ঠিকানায় পাঠাবেন। যদিও কাগজ সার্টিফিকেট অব পোস্টিং রেখে পাঠানো হয়, তবুও কাগজ রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাতে অতিরিক্ত ২৲ লাগে।

॥ শ্রাবণ থেকে বর্ষ আরম্ভ ॥

নিরহঙ্কার
গর্ব ...
দীন বাউলের গর্ব
তার একতারা।
একতারার তারে যে
সুরের ঝঙ্কার সে তোলে
তা লক্ষ প্রাণে সঞ্চারিত
হ'য়ে অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি
করে। বাউল ও তার একতারা
আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের
সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত
অনাড়ম্বর রেলপথও আমাদের গর্ব।
বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্র গ্রথিত করে,
বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সমগ্র
দেশকে সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
পূর্ব রেলওয়ে
ARTADS

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস   বর্ষ ২১ সংখ্যা ২   কার্তিক-পৌষ ১৩৭১

সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
ফাউণ্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাডসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকু্যরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

একবারও
পুজোয়
বোরোলীন
কিনতে
ভুলিস না
BOROLINE
বোরোলীন
সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন ক্রীম

THE HOUSE OF
NRM
THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA
NRM
NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.
THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY
Inchek Tyres
Limited
NR/G/40

RICHER LIQUOR FULL OF FLAVOUR
A blend of
the finest Assam
and other fine
teas selected for
strength and
flavour.
YELLOW LABEL
LIPTON'S TEA
LIPTON'S
Liptons, blenders
of fine teas for
over 70 years.
LTC-34

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

দুই নারী

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭২ · ১৮৮৭ শক

চিঠিপত্র শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

P. & O.S.N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা, গোপাল নীলমণির যোগে মোটামুটি আমার সমস্ত খবর এতদিনে পেয়ে থাক্‌বে। চিঠিতে খবর দেওয়া ছাড়া আমি সব কথাই লিখি বলে আমার দুর্নাম আছে। আমার মনটা যেন বড়ো বড়ো ফাঁকওয়ালা জাল— তার ভিতর দিয়ে বাইরের দৈনিক খবরগুলো ধরাই পড়ে না, ভিতরকার চিন্তার কথা হয়তো আটকা পড়ে কিন্তু সেগুলো আজ লিখলেও যা কাল লিখ্‌লেও তা। তবু একবার ভেবে দেখি উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেচে কিনা।

গাড়িতে চড়ে প্রথমেই অবাক্ হয়ে ভাবলুম, বি এন্ আরের "কুপে" আমার খাতিরে এতো বড়ো হল কী করে— এ যেন হঠাৎ পুপে পঁচিশবছরের মেয়ে হয়েচে। তারপরে ভাবলুম হয়তো "কুপে" দুর্লভ হওয়াতে বড়ো গাড়ি আমার জন্যে রিজার্ভ করা হয়েচে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এমন ঠেসাঠেসি ভিড় যে কাউকে প্রশ্ন করবার সময় পেলুম না। অবশেষে একে একে সবাই নেবে গেল, কেবল টাকার নাম্‌লে না। গাড়ি ছেড়ে দিলে। এ রকম দ্বন্দ্ব সমাস আমার একটুও ভালো লাগলো না। বোম্বাই পর্য্যন্ত এই যুগলমিলনের কথা চিন্তা করে আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। হাতে একখানা বই ছিল তাও পড়তে ভালো লাগ্‌ল না। গাড়ি এসে দাঁড়ালো খড়গপুরে— আমার অভিভাবক অপূর্ব্ব দেখা দিতেই তার কাছে আমার নালিশ জানালুম। সে বল্‌লে, যথারীতি "কুপে" ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু একটা জনরব উঠেছিল কুপে আমার পক্ষে দুঃসহ সেইজন্যে আরোহীদলকে জুড়ি জুড়ি ভাগ করে সমস্যাসমাধান করা হয়েচে। আমার কোন্‌টা ভালো লাগে কোন্‌টা লাগে না সেটা আমার নিজের জানা নেই বলে লোকের অন্ধবিশ্বাস— সেইজন্যে অন্যলোকের মতানুসারে ভালো লাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়ি। আমি আর বিলম্ব না করে সহকারী অভিভাবক নীলমণির কাছে আপিল জানাতেই সে আমার জিনিষপত্রগুলো কুপেতে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে— আমিও বাক্স তোরঙ্গের অনুসরণ করলুম। তারপর থেকে শেষ পর্য্যন্ত সেই খণ্ড-গাড়ির অখণ্ড আধিপত্য বোম্বাই স্টেশন পর্য্যন্ত একটানা ভোগ করে এসেচি। স্নান শয়ন ধ্যান ধারণা কোনো কিছুর অসুবিধা হয়নি। সে রাত্রে রেল-পাচকের অন্ন স্পর্শ করিনি। মোবারক রুটি-কুক্কুটের সংযোগে পাঁচখণ্ড স্যাণ্ডুয়িচ প্রস্তুত করে দিয়েছিল— তাই আমরা তিন সহযাত্রী ভাগাভাগি করে খেয়েচি। আমার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হয়েছিল। যুবক দুজন সান্ত্বনা দিবার জন্যে স্মিতমুখে বল্‌লেন, তাঁদের সামান্য ক্ষুধার

পক্ষে আয়োজন যথেষ্ট। আমি বিস্মিত হলুম কিন্তু এ নিয়ে আমি অনাবশ্যক পরিতাপ করিনি— কারণ সুধীন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে যথাস্থান থেকে গাড়িতে প্রচুর মিষ্টান্নের আমদানি হয়েছিল; তখন দেখলুম, ক্ষুধা তাদের কম ছিল তা নয়। এলুমিনিয়মভাণ্ডে অনেকগুলি রসনিমজ্জিত গোলাকার ও চপেটাকার পিষ্টক ছিল সেগুলি উপাদেয়। তা ছাড়া জোড়াসাঁকো ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে একত্রীকৃত যে সন্দেশ-সম্মেলন ঘটেছিল আমাদের অন্তর্জঠরে তাদের মিলন সমাপ্ত হল। আহারাবসানে শ্রীযুক্ত নীলমণি জলভাণ্ডটাকে তার কাষ্ঠবেষ্টনী থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে তৃষিতকে জল বিতরণের অনেক চেষ্টা করলে— কিন্তু উভয়েই তারা সুনিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গেছে— দুটির মধ্যে একটি প্রলয়সাধন ছাড়া অন্যটির মুক্তিসাধনের উপায় ছিল না। ভাণ্ডটিকে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা দেবার পক্ষে ব্যবস্থাটি আশ্চর্য্য নিপুণ ছিল কিন্তু তাকে স্বকার্য্যে উদ্যত করার পক্ষে অসহযোগিতার প্রয়োজন সঙ্গত ছিল। অবশেষে হতাশ্বাস নীলমণি দুটিকে একসঙ্গে নত করে কাজ চালিয়ে দিলে।

গাড়িতে আমার দুটি কাজ ছিল। একটি বাইরের একটি ভিতরের। সুরেনের মহাভারতখানা নিয়ে তার খাঁটি গল্পাংশটুকু চিহ্নিত করছিলুম। আমার পেনসিলের দাগের মধ্যে বি এন আর এবং জি আই পি আর রেলবাহিনীর হৃৎস্পন্দন দুই দীর্ঘ দিন ধরে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই কাজটা খুব ভালো লাগ্‌ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মহাভারতের অতিবিপুলতা থেকে আমি তার যে সারভাগ উদ্ধার করেছি সেটা অতি উত্তম হয়েচে। আশা করি ওটা ছাপানো হবে। বাকি সময়টা আমার দীর্ঘকাল সঞ্চিত রুদ্ধ চিন্তা নির্জ্জন অবকাশের উপর দিয়ে উদ্বেল হয়ে চলেচে। আজ পঁচিশ বছর থেকে যে কাজ বহু দুঃখ বহন করে এসেছি তার পরিশিষ্টভাগের অনেক গভীর বেদনা সূর্য্যাস্তকালের প্রলয়চ্ছটার মতো অন্তর থেকে বিস্ফুরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। লোকব্যবহারে তোমরা আমাকে অনেকে নির্ব্বোধ বলেই জানো— আমার সেই নির্ব্বুদ্ধি বেঁকেচুরে নানা আকারে জেগে ওঠে, যেহেতু আমি সাহস করে কাজ করি। কর্ম্মে যদি প্রবৃত্ত না হতুম তাহলে ভাবের জগতে আমার বুদ্ধিভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেত না। কিন্তু তবুও ব্যবহারিক অবিবেচনা সত্ত্বে কেবলমাত্র ভাবের জোরে নানাবিধ ভাঙ্গাচোরা ভুলত্রুটির উপর দিয়েও কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি। কেবলমাত্র কর্ম্মকুশল বুদ্ধি দিয়ে কেউ সৃষ্টি করতে পারেনা, ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির বাইরেকার যে ব্যবস্থা তার খুব বেশি দাম নয়, বড়ো দুঃখের মধ্যে দিয়েও এ গর্ব্ব আমি করতে পারি। একটা ধারা বয়েচে, সে ধারা দুর্গম নির্জ্জন উপরের শিখর থেকেই অবতীর্ণ— সেই ধারাকে স্রোতোহীন বালুকাস্তূপে আবদ্ধ করতেও পারে— সেই বালিকে জম্‌তে দেখেছি— কিন্তু তবু অব্যক্ত যদি কোনো এক সময়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়।

প্রথম দিনের ভোজ থেকে কল্পনা কোরোনা দ্বিতীয় দিনে আমাদের আহার্য্যে কিছু কৃপণতা ঘটেছিল। যাকে ইংরেজিভাষায় বলে, লাঞ্চ্, বলে, ডিনার, বলে টি, তারি রেলগাড়ির বিগ্রহ যথাসময়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার কামরায় আবির্ভূত হয়েচে। তাতে গ্রহণের চেয়ে বর্জ্জনই বেশি ঘটল। আগমনীর চেয়ে বিসর্জ্জন। সে জন্যে দুঃখ কোরোনা— সমস্তই যদি অঙ্গীকার করতুম তাহলেই অনেক বেশি অনুশোচনার কারণ ঘটত।

এবারে একটা সুখের বিষয় ছিল, পথে পথে সম্মানবর্ষণ হয়নি— কৌতূহলী দুই একজন ব্যক্তি আমাদের রিজার্ভ করা গাড়ির বিজ্ঞপ্তিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখে গেছে এবং আর দুই একজনকে ডেকে এনে কানাকানি করেচে এই পর্য্যন্ত। না ছিল মাল্যদান, না ছিল জয়ধ্বনি।

অবশেষে বম্বাই স্টেশনে প্রাতঃকালে গাড়ি এসে থামল। ইতিমধ্যে আমার অভিভাবক আমাকে সুসজ্জিত করবার অভিপ্রায়ে সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করলে চাবি নেই। তবু রথীদাদার সতর্কতার পরে তার বিশ্বাস কিছুতেই টল্‌তে চায় না। অবশেষে সন্দেহ রইল না যে চাবি নেই। আমার প্রসাধনের পেটিকায় সৌভাগ্যক্রমে একটা সাধুবেশ ছিল। সেইটে পরে নিলুম।

স্টেশনে চারিদিকে দৃক্‌পাত করে দেখা গেল মরিস্ উপস্থিত। অম্বালালের সেই সকালেই আমেদাবাদ থেকে আসবার কথা। তাঁর অনুচরবর্গ আমাদের ভার গ্রহণ করলে। বাইরে মোটরযানে ওঠবার মুহূর্ত্তেই অম্বালাল এসে আমাকে অধিকার করে তাজমহল হোটেলে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়েই চাবি তৈরির ব্যবস্থা করা গেল। ইতিমধ্যে রুটিটোস্ট্ ও কফি খেয়ে জানলার কাছে একটি আরাম কেদারায় নিবিষ্ট হয়ে বসলুম। অদূরে ক্ষীণকুহেলিকার আভাসে অনতিস্পষ্ট আকাশের নীচে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্চে— সূর্য্যদেব তখনো ওঠেননি।— আমাদের এই যাত্রার এক অংশের সংবাদ তখন কলকাতার দিকে। আমরা তার প্রতীক্ষায় আছি। অনুমান করলেম অম্বালালের আপিসে কিম্বা আমেরিকান এক্সপ্রেসের জিম্মায় সংবাদ জমা হয়ে আছে।

আমাদের তরফ থেকে আমরা নাগপুরে পাঁচসাতটা টেলিগ্রাম কলকাতায় পাঠিয়েছি। সেখানে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পাবার প্রত্যাশা ছিল পাওয়া গেল না। কলকাতা ছাড়ার দুদিন পরেও কোনো সংবাদ না পেয়ে মনে মনে যতই নানাপ্রকার বিচার করছিলুম ততই অপূর্ব্ব আমাকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, আপনি "ব্বারি" করবেন না। আমার মনে পড়ল একদা পদ্মায় ঘোরতর ঝড়ের দিনে আমাদের মাঝি মাদারি নিকারী বারবার হেঁকে বল্‌ছিল, ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, আল্লার নাম কর। আমার বিশ্বাস তাতে শ্রোতাদের ভয় শান্ত হয়নি।

যাই হোক্ ক্রমে ক্রমে জানা গেল। সুধাকান্তর যাত্রায় বিঘ্ন ঘটেচে। বিঘ্নের কারণ সম্বন্ধে আমাদের নানালোকের বুদ্ধিতে নানারকম বিচার চল্‌তে লাগল। তারি মাঝে মাঝে অপূর্ব্বর অভয়বাণী ধ্বনিত হতে থাক্‌ল আপনি কিছুই ভাববেন না।

স্টেশনেই ক্ষিতীশ সেনের সঙ্গে দেখা। তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে বম্বাই প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটাবার প্রস্তাব করলেন। অপূর্ব্ব যথারীতি বল্‌লে, দেখুন ডাক্তার বিশেষ করে বলেচে ইত্যাদি। আমিও ভালো ছেলের মতো তার প্রতিধ্বনি করলুম। দিনের প্রহরে প্রহরে দর্শনপ্রার্থীর আনাগোনা চলতে থাকল।

পরদিন প্রাতে চাবি ও পত্র হাতে গোপাল ঝোড়োকাকের বেশে এসে উপস্থিত। তখন খবরগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল— অল্প একটু আধটু কুয়াসা রয়ে গেল। যাক্।

ক্লান্তিসমুদ্রের সাত বাঁও জলে তখন ডুবে আছি। আগের রাত্রে কয়েকটি অত্যন্ত নিষ্প্রভ লোকের সঙ্গে ডিনার খেয়ে দেহমনপ্রাণ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। শুতে যাবার সময় চৌকি থেকে বিছানায় যেতে মনে হচ্ছিল যেন পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে যাচ্চি। একে একে সকলেই শুতে গেল— আমিও বহুকষ্টে শয্যা আশ্রয় করে রাত্রি যাপন করলুম। সকালে সহযাত্রীরা বাজার করতে বেরলেন। ফিরে এসে অপূর্ব্ব গর্ব্বোৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে জানালেন যে তিনি আমার জন্যে আশ্চর্য্য সস্তাদামে একটি কুশন্ কিনেচেন। একাত্তর টাকা তার মূল দাম— নিতান্তই কেবল নিজের বুদ্ধিকৌশলে সেটাকে নামিয়ে সাঁইত্রিশ করেচেন।

আমি শান্তিরক্ষার অভিপ্রায়ে তাঁর বুদ্ধিকৌশলের সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করলেম না। এমন সময়ে দুজন মূর্ত্তিমান এমেরিকান এক্‌স্‌প্রেস্ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, ব্যাড নিয়ুস্। ভাবলুম সুধাকান্তর গ্রহ এবার সেখান থেকে ছুটি পেয়ে আমার সঙ্গে লেগেচে। এবার কলকাতায় ফেরবার কুপে সন্ধান করতে হবে। প্রকাশ পেলে যে, আমার ক্যাবিন ডে লুক্‌স্ পরহস্তগত। কিন্তু আমাদের দূত যথাসাধ্য চেষ্টায় দুখানা ক্যাবিনের নানাবিধ রূপান্তর ঘটিয়ে বাসযোগ্য একটা ব্যবস্থা ঘটিয়েছে। এ সম্বন্ধে অধিক হা হুতাশ করা বৃথা জেনে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে রইলুম— বল্‌লুম, সকলি অদৃষ্টের লীলা।

আমার সহকারী অভিভাবক ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড করে বসেছিলেন। তাঁর অভিভাবকত্বমর্য্যাদার গৌরবে ভর দিয়ে তিনি আমার মত না নিয়ে তাঁর মনের মত একখানা কাপড় বের করে রেখে সমস্ত বাক্স প্রভৃতি জাহাজে চালান করে দিলেন। যখন অনুভব করলেন সেই কাপড়খানা আমাদের অনুমোদিত নয়— তখন পুনরায় তাঁর বন্ধু মরিসকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে না জানিয়ে নানা দুঃসাধ্য চেষ্টায় যথোচিত বেশ উদ্ধার করে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হলেম।

ক্রমে সময় আসন্ন হল।

ক্লান্তিভার ও দেহভার একসঙ্গে বহন করে শুভ পয়লা মার্চ্চ তারিখে শুক্রবাসরে অপরাহ্ণ চারটের সময় জাহাজে ওঠা গেল। দেখা গেল আমার ক্যাবিন ভালোই— বোধ হয় পূর্ব্ববন্দোবস্তর চেয়ে ভালো। যখন ষ্টুয়ার্ড দেখা দিলে প্রকাশ পেলে এ আমার পূর্ব্ববন্ধু। মোরিয়া জাহাজে এ দুইযাত্রায় আমার সেবা করেছিল। নীলমণির বদলে শ্বেতমণিকে পেলুম।

তারপরে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী। অকস্মাৎ অপূর্ব্ব চমকে উঠে খবর পেলে ডিনারের সময় সমাগত। দুইবন্ধু তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে প্রবেশ করলে। ডিনারের সময় অতিবাহিত হতে চলল। মনে পড়ল অভিমন্যুর কথা। এরা ক্যাবিনে প্রবেশ করবার বিদ্যে শিখেচে বেরোবার বিদ্যে শেখেনি। তখন টাকারকে নিয়ে আমি নিঃসহায়ভাবেই ভোজনশালায় গেলুম। তখন অর্দ্ধেক ডিনার শেষ হয়ে গেছে। এরা দুজনে যখন এল তখন ডিনার চন্দ্রমার পূর্ণগ্রাসের কেবল এক কলা বাকি। তার পরে ট্র্যাজেডি কি রকম জমল বলবার সময় নেই। আজ সকালে জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিস্ প্রচার করা হয়েছে, আরোহীগণ দয়া করে ডিনার টেবিলে আধঘণ্টার বেশি যেন দেরি না করেন। পিয়ানো কোম্পানির জাহাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

বৌমা আমার এতবড়ো চিঠি পড়ে আশ্চর্য্য হবে। এটা লিখলুম কেবলমাত্র প্রতিকূল জনশ্রুতির বিরুদ্ধে যে আমি চিঠি লিখতে পারি এবং সে চিঠিতে যথাতথ্যের সঙ্কলন না হতেও পারে। পুপুমণি[কে] প্রমাণ করবার জন্যে আমার এক জাহাজভরা ভালোবাসা জানিয়ো। মীরা প্রভৃতি সকলকেই এ চিঠি পড়তে দিয়ো এবং এই ওজনের চিঠি আর প্রত্যাশা কোরো না। ২ মার্চ্চ ১৯২৯

বাবামশায়

ওঁ

P. & O.S.N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা, রথী শান্তিনিকেতনের যে ভার নিয়েচে তার এক অংশ তোমারো নেওয়া উচিত। অর্থাৎ ওখানকার ছাত্রীদের পরে দৃষ্টি রাখা তোমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ হওয়া কর্ত্তব্য। এ অধিকার তোমার স্বাভাবিক অধিকার। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে কেউ না কেউ কর্ত্রী আছেন কিন্তু লেডি বোসের হাতে তার সত্যকার অধ্যক্ষতার ভার। তিনিই সমস্ত জিনিষটাকে চালনা করেন। তোমাকেও তাই করতে হবে। কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে গ্রন্থি ঢের বাধে, অপ্রিয়তারও সৃষ্টি হয়— কিন্তু তাই বলে একটুও সঙ্কোচ করা উচিত হয় না। ওদের নানা অভাব, নানা দুঃখ আছে সে কোনো জায়গায় পৌছয় না বলেই অনেক বিকৃতি ঘট্‌তে থাকে। তা ছাড়া ওদের জীবনযাত্রার উপর তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি পড়ে না বলেই ঢিলেঢালা ব্যবহারে ওরা লজ্জা পায় না। অনেকগুলি খুব ছোট ছোট মেয়ে এসেচে— সকল দিক থেকেই তাদের মানুষ করবার ভার আমাদের উপর। আমরা একটা যন্ত্রের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে উদাসীন থাকি এ কিন্তু আর চল্‌বেনা। যখনি এ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ ঘটে তখনি আমরা মনে মনে স্থির করি বিদেশ থেকে কাউকে আনাতে হবে। তার মধ্যে খুব একটা লজ্জার কারণ আছে। একথা মানতেই হবে, লেডি বোস্ যদিও বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু আসল দায়িত্ব তাঁরই হাতে।

এতদিনে ওদের নাচ শিক্ষার পালা বোধ হয় আবার আরম্ভ হয়েচে। যদি নটীর পূজা ওদের দিয়ে করাতে পারো তো খুব ভালো হয়। রাজা ও রাণী আমি তো ছেঁটে ছুঁটে মেজে ঘষে ঠিক করে দিয়ে এলুম, কিরকম অভিনয় হবে জানিনে। কিন্তু আমি যদি এটাকে তৈরি করবার ব্যাপারে হাত দিতে পারতুম তাহলে এটা খুব ভালো হত। ফিরে গিয়ে যদি সুযোগ হয় দেখা যাবে।

আমার তিন সহচরে মিলে খুব আসর জমিয়েচে। টাকারকে নিয়ে ওদের খুব রঙ্গ চলে। সে ভালোমানুষের একশেষ— মৃদুমন্দ হাসে এবং মাঝে মাঝে মজার উত্তর দেয়। এই দলের ভিতরে সুধাকান্ত কিছুতেই খাপ খেতনা হয়ত মাঝে মাঝে খোঁচাখুঁচি হতে পারত— এদের সঙ্গে ওর সুর মিলত না।

জাহাজ খুব শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেচে— একটুও দোলা নেই। এ কয়দিন গরম ছিল না— আজ থেকে গরম দেখা দিয়েচে— সিঙাপুরে আরো গরম হবে। হংকঙে পৌছবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরকমই চল্‌বে। কিন্তু যাত্রার শেষভাগে উত্তর মেরুর হিম নিঃশ্বাস বইতে থাকবে— সে একটু বেশি ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোনো চল্‌বে না। তার পরে ভ্যাঙ্কুভরে শীত কমে যাবে। দুই একজন বড়দরের আমেরিকানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌চে— কাজ এগোচ্চে। পুপের খবর কি? সহচরী কেউ জুটেচে? ইতি ৭ মার্চ্চ ১৯২৯

বাবামশায়

ওঁ

P. & O.S.N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা, মোজি হচ্চে জাপানের প্রথম বন্দর। কাল এসেছি। আজ দশটার সময় জাহাজ ছাড়বে— পর্শু পৌছবে কোবে। কাল সুধীন্দ্র আর অপূর্ব্ব রেলপথে চলে গেছে। য়োকোহামায় ক্যানাডীয় জাহাজে

গিয়ে উঠবে। আমার সঙ্গে আছে টাকার। এদের তিনজনের মধ্যে সুধীন্দ্রই সব চেয়ে কর্মিষ্ঠ। গুছিয়ে গাছিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে— অথচ এই ওর প্রথম সমুদ্রযাত্রা— খুব হিসাবী হুসিয়ার মানুষ ওর ব্যবহারও খুব চমৎকার। টাকার, অপূর্ব্ব দুজনেই এলোমেলো, অপটু— প্যাক করার হাত একেবারেই নেই। টাকার বলছিল সুধাকান্ত এসব বিষয়ে তারো বাড়া— ভাগ্যিস সে আসেনি— তার বোঝা বইতেই প্রাণ বেরিয়ে যেত। আমার এযাত্রা জাপানে নামা হলনা— জাহাজে আছি কোনো উৎপাত নেই— এবারে ডাঙায় ঘুরে বেড়াবার উপযুক্ত সাহস হচ্চে না। ভ্যাঙ্কুভরে জুটবে এণ্ড্রুজ— অব্যবস্থায় সে এদের কারো চেয়ে কম নয়। সুবিধে এই যে আমার প্রয়োজন খুবই অল্প, কারো উপর বেশি ভার চাপাতে ইচ্ছে হয়না, দরকারও হয়না। কাল পর্য্যন্ত শীত খুব বেশি ছিল, আজ সকালে তেমন নেই। তীরের চেহারা ভালো দেখা যাচ্চেনা, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কোবেতে পৌঁছিয়ে একটু টানাটানির মধ্যে পড়ব। সেখানে অনেক ভারতীয় বণিক আছে— অভ্যর্থনার উপদ্রব প্রস্তুত হচ্চে, সইতে হবে— আমার কোথাও নিষ্কৃতি নেই। আজ ৮ই চৈত্র— কিন্তু হায়রে, মলয় পবন কোথায়? আমের বোলের একটুখানি গন্ধ যদি কোথাও পেতুম খুসি হতুম। ২২ মার্চ্চ ১৯২৯

বাবামশায়

তারিখে ভুল করেছি— আজ ৯ই চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ। পশু সোমবারে আশ্রমে বসন্ত উৎসব। আশা করি এতদিনে পান-বসন্ত উৎসব শেষ হয়ে গেছে।

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এই চিঠিটা পড়লে বুঝতে পারবে। আমার বোধ হচ্চে সৌম্য ওদের উপকার করেছিল। সুবীর হতেও পারে কিন্তু বোধ হয় না। আমি খুব খুসি হয়েছি।

দু তিন দিনের মধ্যে খুব ঠেসে বক্তৃতাদি করতে হয়েচে। কিন্তু এখানে কাজ করে সুখ আছে। তোমরা থাকলে বেশ হত। এরা প্রায় জিজ্ঞাসা করে তোমরা আসবে কিনা। অনেক দেখবার এবং শিখবার আছে। এদের এখানে টানা হেঁচড়া অত্যন্ত বেশি বটে কিন্তু একটা আরাম এই যে এরা যেন আপন লোকের মতো— পাশ্চাত্য দেশে যারা বন্ধু তারা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়, কিন্তু যারা বন্ধু নয় তাদের সঙ্গে কেমন একটা কঠিন দূরত্ব, তাতে অস্বস্তি বোধ হয়। যাকৃগে আজ বিকেলে পাড়ি দিতে হবে। ৯ দিন ভাসতে ভাসতে ডাঙায় পৌঁছব। নল্‌ডেরাতে যত আরামে ছিলুম এ জাহাজে তা পাব না— চলে যাবে। আমার সঙ্গে পুপের এক জায়গায় গভীর মিল আছে— আমাদের উভয়েরই মতে শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা ভূমণ্ডলে নেই। বউমা শুনে হাসবে, ভাববে মাসখানেক যেতে না যেতেই আমাকে ঘরের টানে টেনেচে। কথাটা মিথ্যে নয়— তবু কর্ত্তব্য সাধনে বিঘ্ন হবে না।

২৮ মার্চ্চ ১৯২৯ বাবামশায়

CANADIAN PACIFIC

বৌমা য়োকোহামা ছেড়ে কয়দিন বেশ একটু দোলা লাগিয়েছে। আজ রাত্রে সমুদ্র একটু শান্ত হবার চেষ্টা করচে। শীত রীতিমত। মোটা মোটা কাপড় পরে বেড়াচ্চি। শরীর যতটা, কাপড়-

চোপড় তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি। ঐটে ভালো লাগে না— মনে হয় যেন দেহটাকে মোটা পাঁচিলওয়ালা জেলখানায় পুরেচে। টাকার সাহেব একেবারে শয্যাগত। সুধীন্দ্র অনেকটা অটল আছে। অপূর্ব্বর খাওয়া কামাই যাচ্চে না। য়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথ প্রকাণ্ড লম্বা — যেন বরুণপুরীর চিৎপুর রোড। আজ ৩১শে মার্চ্চ। কাল পয়লা এপ্রেল। সমুদ্র যদি তার নিজের বহরমাফিক ঠাট্টা করে তাহলে অতল পরিহাসের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। তোমরা কোথায় কি ভাবে আছ ভালো রকম আন্দাজ করতে পারচিনে, তার কারণ জল হাওয়া একেবারেই তফাৎ— জল হোলো কালাপানি, বাতাস হোলো কালিয়ে দেওয়া, আর ডাঙার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। সূর্য্য যেন অভিমন্যুর মতো— কয়দিন আগে মেঘের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেচে কিছুতে আর বেরতে পারচে না। আকাশটা যেন শূন্য পেয়ালা, দেবতা কবে সূর্য্যকিরণের সোনার মদ তাতে ঢালবেন তাই অপেক্ষা করে আছি। শান্তিনিকেতনের মানুষ প্রশান্তমহাসাগরের নাম শুনে ভুলেছিল কিন্তু তার ব্যবহারটাতে তোলপাড় করে দিয়েচে।

[৩১ মার্চ্চ ১৯২৯]

বাবামশায়

ওঁ

বৌমা, জলচর এবার ডাঙার দিকে তাকিয়েচে, ভাবচে কি জানি কি গতি হয়। সেখানে শিকারীর আড্ডা, সেই জন্যেই এত উৎকণ্ঠা। বরুণদেব এতদিন করুণ ছিলেন, আশা করি যক্ষপুরীর মালেকদের সঙ্গে সখ্য হবে। লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করচি— পরিণামে আর কিছু না হয়ত হরিনাম সম্বল। মনটাকে নিরাসক্ত নির্লোভ করেই রেখেচি।

ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে দশটার দিকে কাঁটা এগিয়ে এসেচে। কাল সাতটার সময় সকালে জাহাজ ঘাটে পৌছবে— আটটার সময় তীরে উত্তীর্ণ হবো। ইতিমধ্যে ডাক্তার আছে, নানাপ্রকার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর আছে। জানাতে হবে এক স্ত্রী ও এক ঈশ্বরে আমার মতি— বলতে হবে এই মহাদেশে বাস করা, চাষ করা বা ধর্ম নাশ করায় আমার বিশেষ সখ নেই। তাছাড়া বসন্ত রোগের টীকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান পত্র তলব করবে। সে পত্র আমার নেই— ঋতুরঙ্গ বইখানা আছে তার থেকে প্রমাণ করতে পারি বসন্ত ঋতুর টীকা আমার কপালে আছে— কিন্তু ম্লেচ্ছরা তার অর্থ বুঝতে পারবে না। আশা করি আমি ছাড় পাব, কারণ গরজ আমার চেয়ে ওদেরই বেশি। এবার শুয়ে পড়ি— কাল ভোরে উঠ্‌তে হবে। রোজই ভোরে উঠি কিন্তু তাড়াহুড়া ছিল না— আলো জ্বালিয়ে কমলালেবু ও কলা খেতুম— তার পরে আসত চা। তার পরে অপূর্ব্ব। তার পরে ইত্যাদি—

[৫ এপ্রিল ১৯২৯]

ওঁ

বৌমা, বাড়িমুখেই চলেছিলুম। তোমরা আসবে শুনে আবার কিছুদিনের জন্যে মন স্থির করে বসেচি। পাখীটা উড়বে বলেই ডানা মেলেছিল, আবার ঘাড় হেঁট করে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েচে। জাপানের লোকেরা প্রস্তাব করেচে এখানে গ্রীষ্মের কয়মাস অর্থাৎ অগস্টের শেষ পর্য্যন্ত তাদের আতিথ্য গ্রহণ করি। ফস্ করে রাজি হতুম না। কিন্তু জানি তোমার অনেক দিনের ইচ্ছে জাপান দেখতে, এবং

এখানে তোমার পক্ষে দেখবার জিনিষও অনেক আছে তাই রেডিয়োযোগে ওদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছি। জাপান আমার নিজেরও ভাল লাগে, জাপানীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে— তা হোক্ তবু শরীর মন শান্তিনিকেতনের দিকেই ঝুঁকে থাকে— আর দেশ দেশান্তরে বক্তৃতা করে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। চারদিকের টানাটানিতে ভারি অস্থির করে তোলে। আমার মুস্কিল এই যে, আমাকে নানা দলের লোক দাবী ক'রে, সকলের মৎলব বুঝতে পারিনে, পাক খেয়ে বেড়াই। এখানে এসেই ভারতবর্ষীয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি, সবাইকে চিনিনে, বুঝিনে, কাউকে এড়াতেও পারিনে। ওরা আমার পরে দখল দাবী ক'রে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে— চেষ্টা করছি যাতে আজই টোকিয়োতে একটা হোটেলে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারি। তুমি আসবে শুনে এখানে সবাই খুব খুসি হয়েছিল— এলে খুব যত্ন আদর পেতে পারতে। অপূর্ব্বকে বলেছি অমিয় হৈমন্তীকে সহায় করে এখানে তোমার আসবার প্রস্তাব করতে। এখনো তো সময় আছে। শুনলুম একটা জাহাজ আছে যেটা এখান থেকে যাবার মুখে জাভা হয়ে যায়— সেটা পেলে তোমার জাভা দেখাও হয়। এবার দেশ ছেড়ে অবধি দেশের খবর পাইনি বল্লেই হয়। টাকার-এর অব্যবস্থায় বোধ হচ্চে এক দফা চিঠি মারা গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, এসব দেশের খবরের কাগজে ভারতবর্ষের নাম-গন্ধও থাকে না। দৈবাৎ অতি সংক্ষেপে আভাস পাই যে কি সব গোলমাল হচ্চে। এক এক বার ভাবি ভালোই— মনটাকে সম্পূর্ণ ফাঁকা রেখে অবিচলিত চিত্তে নিজের কাজ করে যাওয়াই ভালো। আমার বয়স উনসত্তরের কোঠায় তিন দিন এগিয়েচে, অর্থাৎ সত্তর পৌঁছতে ৩৬২ দিন বাকি— আর কি এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় আছে? বৈশাখ প্রায় শেষ হয়ে এল, শান্তিনিকেতনে নিশ্চয় এখন ছুটি, কুয়োর জল পাঁকের দিকে নেমেচে— অসহ্য গরম— কিন্তু এখানে এখনো যথেষ্ট ঠাণ্ডা— শীতের কাপড় পরে আছি। ইতি ১২ মে ১৯২৯

বাবামশায়

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গোপাল—ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী
নীলমণি—ভৃত্য বনমালী
পুপে—নন্দিনী দেবী
টাকার—বয়েড্ টাকার। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক
অপূর্ব—অপূর্বকুমার চন্দ
মোবারক—বাবুর্চি
সুধীন্দ্র—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রথী—রথীন্দ্রনাথ
অম্বালাল—অম্বালাল সারাভাই
সুধাকান্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
মীরা—কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী
লেডি বোস—জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু
সৌম্য—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুবীর—সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অমিয়—অমিয় চক্রবর্তী
হৈমন্তী—অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী
মরিস্—এইচ্. মরিস। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন পারসী অধ্যাপক

সীমা ও অসীম রজ্জব

ক্ষিতিমোহন সেন

সাধনার জগতে সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা হইল যোগ। ভূতজগতে তত্ত্বজগতে মানবজগতে কত মিথ্যা ভেদ বিভেদই যে হইয়াছে রচিত তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। সীমা অসীমের ভেদ সাধকদের মতে এইরূপ একটি রচিত কৃত্রিম ভেদ। মানুষ যুক্তির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এই মিথ্যা ভেদটি করিয়াছে প্রতিষ্ঠিত। সাধনার প্রথম কথা হইল এই ক্ষেত্রে যোগ স্থাপন করা। সীমা অসীমের যোগ সাধনার বিষয়ে মধ্যযুগের ভক্ত রজ্জবের সব বাণী আছে। তিনি প্রথমেই বলিতেছেন, "মানুষ দেখিতেছি অসীমকে গ্রহণ করিতে গিয়া সীমাকে করে ত্যাগ, যে সীমার সাধনায় রত সে অসীমকে মানে না। যে প্রেমের ধর্মে সীমার মধ্যে অসীমের রূপ দীপ্যমান সেই প্রেমের মরম তো ইহারা জানে না।"

বেহদ গহি হদ তজৈ হদী বেহদ ন মানৈ।
বেহদ রূপ হদ্দ মেঁ প্রেম ময় য ন জানৈ॥ পৃ ৪৪৫

এই উভয়কে যে যুক্ত করিয়া গ্রহণ করে, উভয়ের মধ্যে প্রেম যোগের রহস্য যে জানে সে-ই তো যথার্থ মর্মজ্ঞ জ্ঞানী ও বীরসাধক। যোগসাধনাতে বীর্য ও সাহস থাকা চাই। মূঢ় ও ভীরুর দলই হয় পক্ষগ্রাহী। রজ্জবজী বলেন, "মূঢ় ডরায় নিরাকারকে, ভীরু ভয় পায় আকারকে। কিন্তু দৃষ্টি মুক্ত করিয়া দেখ শিবশক্তির মতো সীমা অসীম উভয়ে মিলিত। আকার যে গ্রহণ করে সে মানব-ধর্মী, নিরাকার যে গ্রহণ করে সে সাধু, শিবশক্তির মতো নিরাকার ও আকারকে যে যুক্ত করিয়া করে গ্রহণ অগাধ তাহার মত।"

মূঢ় ডরৈ নিরাকার কূঁ কায়র সো আকার।
উ ভৈ জুক্ত শিব শক্তি জ্যূঁ দেখু দৃষ্টি উঘার
আকার গহৈ সো মানবী নিরাকার সো সাধ।
শিব শক্তি জ্যূঁ জুক্ত গহৈ তাকা মতা অগাধ॥ পৃ ৫৯

সীমা ও অসীম লইয়া আমরা করি কতরকমের ভয়ঙ্কর সব দলাদলি কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া একেবারে অসম্পূর্ণ। উভয়ের মধ্যে তাহাদের গাঢ় অবিচ্ছেদ্য প্রেম যোগ।

অসীম চাহে সীমাকে, "জ্ঞান চাহে অনুরাগকে, অরূপ যুগল মিলন তবেই তো পূর্ণ হয় ভাব ও ভক্তি।"

বেহদ চাহে হদ্দ কূঁ জ্ঞান অনুরক্তি।
অরূপ রূপ জুগল মিলে পূর্ণ ভাব ভক্তি॥ পৃ ৪৭

আমাদের নিজেদের মহাস্বরূপের মধ্যেও রূপ অরূপ প্রেম যোগ বিরাজমান। সেই প্রেমের বলে মানবের মহাস্বরূপ সীমা ও অসীমা এই উভয়ের অতীত।

"চাহিয়া দেখ স্বপ্ন নহে সত্য তোর নরনারায়ণ মহাস্বরূপ স্বপ্ন। তোর সেই মহাস্বরূপ রূপ অরূপের ভেদের অতীত, তাহা অবর্ণনীয় অগাধ ও অনির্বচনীয়।"

নরনারায়ণ রূপ অপনা, সপনা নহী, সাঁচ দেখ।
রূপ অরূপ ভেদ পারা অকহ অগাহ অলেখ॥ পৃ ৪৭

অসীম তো শূন্যাকার অর্থহীন, সে চাহে প্রকাশ। এই প্রকাশের পরম্পরা আবার হয় পাগলের প্রলাপ যদি তাহার আশ্রয় না হয় সেই এক অসীম। উভয়ের মধ্যে যোগ হইল প্রেমের ও আনন্দের। "চাহিয়া দেখ তাঁহা হইতে সকল রূপের ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে এক আনন্দ ধারায়।"

দেখ্ রূপ সবৈ ঝরৈ তাসৌঁ আনংদ ধার ॥ পৃ ৫৮

এই প্রেমের আনন্দেই উভয়ে নিত্যযুক্ত। এই যোগ উপলব্ধি করাই হইল মানবের সকল সাধনার আসল উদ্দেশ্য।

"সেই অরূপ চাহে রূপ, সেই বোবা চায় ভাষা, হে রজ্জব, তুইও ভাবকে দে' প্রকাশ, এই সাধনাই রাখ তোর অন্তরে। যেখানে প্রকাশ-হীন শূন্যতা সেখানে সৃষ্টির ভাব রূপ প্রকাশ করিয়া, সেখানে যোগ নাই যেখানে যুক্তি (মিলন) করিয়া, ভেদ বিভেদ সব কর্ যুক্ত; তবেই পূর্ণ তোর সাধনা পূর্ণ তোর মুক্তি।"

অরূপ সেদঈ রূপ মাংগে গূংগ সো মাংগে ভাখ
রজ্জব ভাব্ কূঁ প্রগট কর, যহী সাধন অংতরি রাখ ॥
মুষ্টি তহঁ সৃষ্টি করি জোগ নহীঁ তহঁ জুক্তি।
ভেদ বিভেদ সব জুক্ত কর পূরণ সাধন মুক্তি ॥ পৃ ৬৭

সাধনাতেও ঘটুক সেই রূপ সীমা অসীমের প্রেমযোগ নারীর অন্তরে যে প্রেম থাকে তাহাই বাহিরে প্রকটিত হয় সেবার পর সেবায় নহিলে সেই সেবার অর্থ কি? তাহা হয় অশুচি নয় বাতুলতা। আর অন্তরস্থিত যে প্রেমের সেবাতে প্রকাশ নাই তাহাও নিরর্থক। অন্তরের অসীম অচল প্রেমের বাহিরের সচল জপমালাই হইল সেবা। "বাহিরে জপমালা চলে সেবা, চিত্তের মধ্যে (ধ্যানরূপে) রহে অচল প্রেম। এই উভয়ই উভয়কে লইয়া সদা পূর্ণ। সেখানে নাই কোনই বিরোধ।"

জপমালা সেবা চলৈ প্রেম র হৈ চিত মাঁ হিঁ।
উ ভৈ উ ভৈ সৌ পূর্ণ সদা কোই বিরোধ তহঁ গাঁহিঁ ॥ পৃ ৬৫

কূপের মধ্যে যে ঘটীচক্র চলে তাহাতে দেখি ঘটী সব কূপের গভীর তলে পূর্ণ হইয়া উপরে উঠে, সেখানে রিক্ত হইয়া পূর্ণ হইতে আবার নামে নীচে। রূপও তেমনি অরূপের গভীর তল হইতে যে রস লইয়া ওঠে তাহা বিতরণ করিয়া রিক্ত হইলেই তাহাকে নাবিয়া যাইতে হয় আবার অরূপের গভীরতায়। অরূপের মধ্য হইতে রূপের পর রূপের প্রকাশের ইহাই হইল মর্মসত্য। সেই হিসাবে প্রতিরূপের 'আগম নিগম' পরম্পরাতে চলিতেছে অরূপের জপমালা। প্রতিরূপের মধ্যে অরূপের অমৃতরস উপলব্ধি করিতে পারাই হইল সাধনার সার্থকতায় পরখ।

"অতল কূপ হইতে নির্মল অমৃতের পরম পরিপূর্ণতায় ভরপূর ঘটের পর সব ঘট হয় প্রকাশ। রিক্ত হইয়া আবার সেইখানেই সেই সব ঘট যায় নামিয়া। ইহাতেই হয় রূপের আগম ও রূপের নাশ।"

অতল কূপ থৈঁ সুভর ভর্যা সব ঘট হো রৈ প্রকাশ।
রীতা সব উতরৈঁ তহিঁ রূপ আগম রূপ নাস ॥ পৃ ৫৮

অসীমের দুষ্প্রাপ্য দুরধিগম্য গভীরতায় যে অমৃতরস নিহিত, সীমা তাহা সকলের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া সবাকার তৃষ্ণা দূর করিতে দেয় বিলাইয়া। পিতার ঐশ্বর্য যেমন অন্নপূর্ণা মাতা সকলের মুখে সুরস প্রাণপ্রদ অন্নরূপে করেন পরিবেষণ, তেমনি অসীম শিবের ঐশ্বর্যকে আমাদের কাছে সুরস প্রাণপ্রদ করিয়া

উপহৃত করেন মাতৃরূপা সীমা। শিবশক্তির মতো অসীম ও সীমার মিলনেই রহিয়াছে এই বিশ্বের প্রাণ। সীমা ও অসীম তাই শিবশক্তির মতো নিত্য যুক্ত। ইহার একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে পাওয়া অসম্ভব। পাইতে হইলে যুগল মিলনেই হইবে পাইতে।

"শিবকে মেলে (পাওয়া যায়) শক্তির মধ্যে শক্তিকে মেলে শিবের মধ্যে। এমনই তাঁহাদের প্রেম-যোগ যে যুগল হইতে কিছুতেই হয় না বিচ্ছিন্ন।"

শিব কূঁ মিলত শক্তি মধি শক্তি মিলত শিব মাঁহিঁ।
প্রেম জোগ যূঁ নিত্য হৈ জুগল সৌ বিচ্ছুটৈ নাঁহি॥

এই যোগকে যে অন্তরে করিল উপলব্ধি সে-ই তো মুক্ত। তখন সে সর্বরূপে যুক্তভাবে করে বিহার। কোনো বিশেষ রূপের মধ্যে তখন সে হয় না বদ্ধ। তখন তাহার সর্ব (সৃষ্ট ?) রূপে বিহারেই চলে তাহার সহজ পূজা।

"যুক্ত জন রহে মুক্ত, সকল প্রতিমাতেই সে বেড়ায় খেলিয়া, তখন চলে তাহার সহজ যোগ পূজা, হৃদয় তাহার রহে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত যুক্ত।"

জুক্তা জন মুক্তা রহৈ সকল প্রতিমা খেলৈ
সহজ জোগ পূজা চলৈ উর ব্রহ্ম সে মেলৈ॥ পৃ ৩৭

সীমা যেথায় সকল তৃষ্ণা সকল ব্যাকুলতা জানাইতেছে অসীমকে। আপন পরিপূর্ণতার ধারায় সীমার সেই তৃষ্ণা দূর করিয়াই অসীম পরিতৃপ্ত : "পিপাসিত ভূমি আকাশকে জানাইতেছে আপন জ্বালা, নির্মল প্রেমামৃতে ভরপুর চিত্ত প্রভু আসিয়া বিপুল ধারায় করিতেছেন সুবরিষণ। হে রজ্জব, এমন পরমেশ্বরের পায় দে' আপনাকে সঁপিয়া।"

প্যাসা ভূমি আকাশ কূঁ অপনী জ্বাল বতায়।
প্রেম সুভর চিত্ত প্রভু বিপুল সুবরিষৈ আয়॥
রজ্জব আপা সৌপিছে পরমেস্থর কে পায়॥ পৃ ৪৮

সীমা তৃষ্ণা জানায় অসীমের কাছে। আবার অসীমের তৃষ্ণাও তো কম নহে। অসীমের যে নাই প্রকাশ সেই শূন্যতা সেই দারুণ ব্যথা জানাইতে হয় সীমার কাছে। কারণ সীমা ছাড়া প্রকাশ নাই। উভয়েই উভয়ের কাছে প্রেমে বাঁধা। কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারও চলে না।

"ভাব আছে অথচ বাণী নাই তাহা এক বিষম বিপদ! আবার বাণী যদি রহে ভাব বিনা তবে জ্ঞানী লোক বলিবেন পাগল! সাধনাতে প্রকাশহীন যে সত্য তাহা অন্তরকে বড়ো বেদনায় করে ব্যথিত, আবার অন্তরের সত্য-বিনা যে সাধনা, সকলেই মানে তাহা পাগলামী।"

ভাব্ হৈ পণ বাণী নহীঁ বিপতি অহৈ অতি ভারী।
বাণী রহৈ ভাব বিহুনা পাগল কহৈ বিচারী॥
সাধনিপ্রকাশ বিন সাচ জো বহু দুখ অংতরি সালৈ।
পরঘট সাধন সাচ বিনা খেলা সব জন মানৈ॥ পৃ ৬৫

অসীম অপ্রকাশকে সীমার বৈচিত্র্যে প্রকাশ দেওয়াই হইল সৃষ্টির মূল সাধনা। এই সাধনার ধ্বনি সৃষ্টির সর্বত্র বাজিতেছে।

"(অসীম নিরাকার অরূপ পরব্রহ্ম) আপনার মধ্যে আপনিই যদি থাকেন তবে তাহার আর অর্থ কি ; তাহা শূন্যতা মাত্র। বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে, বা মরু বালুকার মধ্যে অরণ্য আছে এ কথার অর্থ কি ? তাহাও শূন্যতা ছাড়া কিছুই নয়। (অসীম নিরাকার পরব্রহ্ম) যদি প্রাণকে (সৃষ্টিলীলায় প্রকাশ না করিয়া) কুম্ভক যোগ করিয়া আপনাকে আপনাতেই বদ্ধ করিয়া রাখেন তবে তাহা এমনি (অপার) মৃত্যু (মরু) যে, তাহাতে হইয়া যাইতে হয় দিশাহারা। সেই (অসীম) মৃত্যুর মধ্যে নাই প্রাণের সঞ্চরণ সেখানে আছে শুধু ব্যর্থ মরুভূমি। সেই বৈরাগ্যের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য, প্রলয় বিযুক্তি হইতে সৃষ্টির যুক্তির মধ্যে আশ্রয় পাইবার জন্য (প্রাণ) করিতেছে ছটফট। প্রাণহীন বালুকাময় মরুভূমির (অথবা রীতি, রেত অর্থ মরু ও রীতি দুই-ই হয়) মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক বৈচিত্র্যের গীত। একাকার শূন্যের মধ্যে হউক পূর্ণতার প্রকাশ। (অন্তরের রাগকে) বাহিরে প্রসারিত কর্ তানে, মিছাকে কর সাচা, শূন্য আকাশের মধ্যে মধ্যে পূর্ণ কর্ সৃষ্টির প্রকাশ ; অরূপকে দে রূপ, মৌনকে দে ভাষা ; বাণী দে বাণী দে, দে দে প্রকাশ দে।"

আপু মেঁ আ পুহী অর্থক্য শূন্য সো।
বীজ মেঁ বৃক্ষ জ্যুঁ রেতি আরণ্য সো॥
প্রাণ কূঁ কুম্ভ কি মীচ হৈরান হৈ।
প্রাণ না সঞ্চরে ব্যর্থ বীয়ান হৈ॥
বৈরাগ্য বন্ধসে তলকৈ মুক্তি কূঁ।
প্রলয় বিজুক্তি সে সৃষ্টি কী জুক্তি কূঁ॥
রেত (রীত) উজাড় মেঁ বৈচিত্র গীত হে।
এক সা শূন্য মেঁ পরকাস পূর্ণ হে॥
বাহরা তান দে ঝূঠ কূঁ সাচ কর।
শূন্য আকাশ মেঁ সৃষ্টি পর কাস ভর॥
গৈব কূঁ রূপ দে মৌন কূঁ ভাস দে।
বাণী দে বাণী দে দে দে পরকাস দে॥ পৃ ৫৮

প্রকাশের জন্য অসীমের এই ব্যাকুলতার কথা মনের রচিত কৃত্রিম শাস্ত্রে কোথাও দেখি না, অথচ বিশ্বচরাচর প্রকাশের এই ব্যাকুলতা দিয়াই রচিত। এই বিশাল বিরাট ব্যথার কথা কি ক্ষুদ্র কৃত্রিম শাস্ত্রের মধ্যে কখনও থাকিতে পারে ? সেখানে তাহার স্থান কোথায়, তাই রজ্জব বলিতেছেন মানুষের রচিত ঝুটা শাস্ত্র সব ফেলিয়া দিয়া ভগবানের রচিত সাচ্চা বিশ্ব শাস্ত্র দেখ।

"হে রজ্জব, বিশ্ব বসুধাই বেদ, সমগ্র সৃষ্টিই কোরাণ। কতকগুলি কাগজের সমষ্টিকে বিশ্ব বসুধা মনে করিয়া পণ্ডিত ও কাজী সত্যকে দিয়াছেন ছন্নছাড়া করিয়া। সৃষ্টিই আসলে সত্য শাস্ত্র, যে জন তাহা উপলব্ধি করিয়াছে সে-ই করিবে তাহার ব্যাখ্যান। ওরে রজ্জব (মানব রচিত ঝুটা শাস্ত্রের) কাগজগুলি আবার পড়িস কি ? (বিশ্বশাস্ত্র চাহিয়া দেখ) নিত্যই তাজা জ্ঞান।

সাধকের অন্তরই হইল কাগজ, তাহার মধ্যে প্রাণ অক্ষরে লেখা সব লিপি; এই পুস্তক কচিতই কেহ পড়ে, মরমসংগীত পায় না শুনিতে। প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ডে (অর্থাৎ অগণিত মানব প্রাণ দিয়া যে ইতিহাসগত মহামানবীয় জগৎ হইয়াছে রচিত) ঝলকিতেছে অনন্ত বেদ, বাহিরের সব আলোক নিবাইয়া দিলে মর্ম্মজ্ঞ (ভেদী) পায় তার মরম (ভেদ)।

হে হিন্দু মুসলমান, সেই প্রাণ পুস্তক দেখ পড়িয়া; সর্বত্র দেখিবে একই বিদ্যা, যে তাহা পড়িয়াছে সেই তো সুপণ্ডিত প্রাণ। মৃত কাগজের মধ্যে মৃত অক্ষর, তাহার পাঠক মিলে অনেক ; ঘটে ঘটে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব, তাহা পাঠ করিয়া দেখ।

রজ্জব বসুধা বেদ সব কুল আলম কুরান।
পংডিত কাজী বৈথড়ৈ দফতর দুনিয়া জান॥
সৃষ্টি শাস্তর হৈ সহী বেত্তা করৈ বখান।
রজ্জব কাগদ ক্যা পঢ়ৈ নিতহী তাজা জ্ঞান॥

সাধন হায়কৌ অংতর কাগদ প্রাণ অক্ষর মাঁহি।
য়হ পুস্তক কোউ বির্লা বাঁচে মর্ম শব্দন সুঁনাহি॥
প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ড মেঁ ঝলকে অনংত বেদ।
বাহরাঁ জোত বুঝায় কে ভেদী পাবৈ ভেদ॥

প্রাণ পুস্তক দেখহু হিংদূ মুসলমান।
সব মেঁ বিদ্যা একহী পঢ়ে সু পণ্ডিত প্রাণ॥
কাগদ মুংবা অক্ষরৈ পাঠক মিলে অনেক।
বেদ ঘট ঘট প্রাণময় রজ্জব বাঁচকে দেখ॥ পৃ ১৪

তবে কি বাণী সংগীত প্রভৃতি মানবের সর্ববিধ প্রয়োগের চেষ্টা সবই মিথ্যা? তাহাই যদি হয় তবে রজ্জবজী কেন বলিলেন "বাণী দে দে দে পরকাস দে।"

সেসব মিথ্যা হইবে কেন, তাহারা তো নিত্য সত্যতার দাবী করে না। রূপ যদি বলে নিত্য সত্য তবেই হয় ঝুটা, যদি সে বলে অরূপের একটি প্রকাশ মাত্র আমার পূর্বে ও পরে অরূপের এইরূপ আরও বহুতর প্রকাশ আছে তবে তাহা একটুও মিথ্যা নয়। তেমনি বাণী সংগীত প্রভৃতি মানব রচনা অনাদি অনন্তত্বের দাবী করিলেই হয় ঝুটা। নইলে মানুষের শিল্প কলা ও সৌন্দর্যের সকল প্রকাশই সত্য। তবে সে-সব নিত্য সত্য বা চরম (final) নহে।

"হে রজ্জব, অনন্ত হইল উপলব্ধির মৃত্তিকা (উপাদান), আর বহু বহু আছেন কবি কুম্ভকার। তাঁহারা বহু বহু সংগীত পাত্র নিয়াছেন গড়িয়া, আরও অপার করিবেন ভবিষ্যতে রচনা। অসংখ্য কাব্য, বহু বহু বাণী,... গীত সকল প্রকাশেই মন হয় মুগ্ধ। কিন্তু রজ্জব, এ কথা কে বলিতে পারে যে আমার বাণী ব্রহ্মেরই সমতুল (অপার অনন্ত নিত্য সত্য)।"

রজ্জব মাঁ মৃত্তিকা অনংত হৈ বহু তৈ কবি কুম্ভার।
শব্দ পাত্র বহু ঘড়ি গয়ে ঘড়কো ঔর অপার॥

অসংখ্য কাব্য বাণী বহুত নিগম গীত কহে মন ভোল।
রজ্জব কো কহে গা ব্রহ্ম সরীখা বোল॥ পৃ ১৪

নিত্য সত্যই যদি মানব না রচিতে পারে তবে বৃথা কেন করে সে অনিত্য আংশিক সব কলা-প্রকাশ? এই প্রকাশ না করিয়া তাহার উপায় নাই। সৃষ্টিকর্তার রচিত সৌন্দর্যে যে মন মুগ্ধ হইয়াছে সেই ঋণ শোধ দিতে হয় নিজে রচনা করিয়া। অবশ্য রচনায় প্রকাশের আর অন্ত নাই। কিন্তু কোনো না কোনো প্রকারে যদি সে কিছুই না করে সৃষ্টি তবে সে এই সুন্দর বিশ্বে জন্মেই নাই। তার কাছে এই বিশ্ব সৃষ্টিই মিথ্যা, সেও বিশ্বের কাছে মিথ্যা।

বিধাতার রচিত বিশ্বের রূপ ও আকারই কি প্রত্যেকে নিত্য সত্য। প্রত্যেকে পূর্ণ সত্য নয় বলিয়াই ক্রমাগত আসিতেছে ও যাইতেছে রূপের পর রূপ ও আকারের পর আকার।

"(পরম সৌন্দর্যের অপরূপ) রূপ লখিয়াছি (দেখিয়াছি) এই কথা তখনই যায় জানা যদি কিছু করা যায় রচনা। না দেখে' না শুনে' এমন করিয়াই যায় সব (অমূল্য) মুহূর্ত বহিয়া। কত কত রীতিতেই তো সকলে করিতে পারে রচনা! কেহ রচে বরণে, কেহ রচে রেখায়, কেহ রচে বাণীতে কেহ রচে ধ্বনিতে (সুর) রীতি ভিন্ন কিন্তু বস্তু একই। ধ্যানে পূর্ণ হইয়া কোনো সাধকজন হয়তো আপনার জীবনের মধ্যেই করিয়া তোলে রচনা, কিন্তু কোনো রীতিতে যে কিছুই না রচিল সে তো কিছু লখেই (দেখেই) নাই।"

রূপ লখ্যা তৌ আনিয়ে জৈ কছু রচি সকায়।
লখৈ নহীঁ সুনৈঁ নহীঁ সহী মহূরত জায়॥
রীত রীত মেঁ রচি সকে লই বরণ অর রেখ।
কৈ রচে বাণী ধুনী সে রীত ভিন্ন বস্‌ত এক॥
ধ্যান ভরি কোই সংতজন রচৈ জীবন মাঁহিঁ।
কোই রীত কছু না রচ্যা সো তো লখ্যাহী নাহিঁ॥ পৃ ৫৫

অসীমই যে কেবল প্রকাশ চাহিতেছেন তাহা নহে এবং তাহাকে প্রকাশ করিয়া আমরাও যে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করিলাম তাহাও নহে। প্রত্যেকের অন্তরে অসীমের জন্য এক দুর্নিবার পিপাসা। সে তৃষ্ণা এমন অপরিমিত যে পরিমিত কিছুর দ্বারাই তাহা শান্ত হইবার নহে। রজ্জব বলিতেছেন, "অসীমের জন্য যে আমাদের তৃষ্ণা তাহার যে পরিমাণ (অথবা প্রমাণ) তাহা কি কেহ জানে? সুখে আরামে যখন আমাদের ঘর পরিপূর্ণ তখনও ব্যাকুল প্রাণ (না-জানি-কিসের জন্য) করে ছটফট্‌!"

জানত হৈ অপারকী তৃষা হৈ কৌন পরমাণ।
সুখ চৈন সব ভরপূর ঘর তড়ফত ব্যাকুল প্রাণ॥ পৃ ৬৭

কেন এত ব্যাকুলতা? তাঁর ব্যাকুল ডাক যে যায় শোনা। অসীম তিনি তবু তাঁর তো রূপ রঙ্গ নাই। তাই একটু সীমা ছাড়া তাঁর খেলা তো জমিবে না। "হোলী খেলার জন্য সন্ধ্যার আকাশে তপন চাহিল একটু মেঘ। একটু বাদল পাইলেই চলিবে তাঁর প্রেম রঙ্গের বিচিত্র খেলা— প্রেম পাইবে রূপে প্রকাশ।"

হোলী খেল কূঁ রবি সাঁঝা।
মাংগে বাদল নভ মাঝাঁ॥

গগন অংগনি খেল হোই।
রূপ লহৈ প্রেম সোঈ॥ পৃ ৬০

প্রাণ আমার ঘরের মধ্যে বসিয়াই অসীম আকাশ হইতে শুনিতেছে তার প্রিয়তমের ডাক। এই ডাক শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াই মুকুলের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া পুষ্প আসে বাহিরে চলিয়া। রজ্জব তাই বলিতেন, "অন্তরের মধ্যে আছে যে প্রিয়তমা, শোনো তুমি তোমায় প্রিয়তম অসীমের ডাক।"

অনহদ পিয়া পুকার সুনু
প্যারী, অংতর মাহীঁ॥ পৃ ৬০

এই ব্যাকুলতা সুলভ নিকটস্থিত পরিমিত কিছুর দ্বারা শান্ত হইবার নহে। তাই তো কমলের "অন্তর নাহি পূর্ণ হয় জলের দ্বারা সদা নিকটে যাহার স্থান। দূর গগনের বংশী শুনি নিশিদিন ব্যাকুল তাহার প্রাণ।"

অংতর ভরে নহীঁ নীর সোঁ সদা নিকট অস্থান।
দূর গগনকী বংশী সুনি নিস দিন ব্যাকুল প্রাণ। পৃ ৬৭

অসীম গগনের এই বংশীধ্বনি শুনিয়াই কমল তাহার পঙ্কের কি জলের কি মুকুল আবরণের সর্ববিধ বাধা অতিক্রম করিয়া আকাশের কাছে আপনার হৃদয় ধরে মুক্ত করিয়া।

"অসীম গগন আসিয়া ভিক্ষা মাগে বীজের দ্বারে, বলে, হে প্রাণ সব বাধা ভাঙ্গিয়া হও বাহির। অমনি সব বন্ধন মুক্ত করিয়া অঙ্কুর হয় বাহির আর দলে দলে বাহির হইয়া আসে পত্র মুকুল ও ফলের আনন্দ মহোৎসব।

"সাগর ভিক্ষা মাগে নদীর বারি, তাই নিশিদিন চলে সে কূল ছাড়ি। সর্বস্ব তাহার নিরন্তর করে সে উৎসর্গ, তবে তো চলে নিত্যধারা।

"(ভিখারী) বসন্ত পবন আসিয়া যেই দেয় দেখা, অমনি মুকুলের অন্তর হইতে বাহির হইয়া আসে ফুল। প্রতি ফুলের কাছে বসন্ত পবন যখন মাগে সর্বস্ব অর্ঘ্য তাহারা তখন ধরে সম্মুখে।"

গগন মাং গৈ বীজ দ্বারা।
নিক সৌ প্রাণ তোড়ি বারা॥
নিক সৈ গাত মুক্তা বংধ।
পা মোল অর্ ফল আনন্দ॥
সাগর মাংগৈ নদী বারি।
নিসাদিন চলৈ কূল ছাঁড়ি॥
সরবস নিজ দেত বার।
চলৈ তবতো নিত ধার॥
বসন্ত পবন জদ জোয়।
মোল অন্তরি ফুল হোয়॥
ফুল ফুল জদ মাঁঙগে।
সরবস ভেট ধরৈ আগে॥ পৃ ৬০

অসীমের জন্য এই যে তৃষ্ণা ব্যাকুলতা দুঃসহ তার বেদনা। তবু এই বেদনা যে জীবনে পাইল না, ব্যর্থ তাহার জীবন। এমন তৃষ্ণাহীন ব্যথাহীন বন্ধ্যা জীবন কেহই যেন না করে প্রার্থনা।

"অসীম অপারের জন্য তৃষ্ণা যদি জনমে অন্তরের মধ্যে তবে তো জীবন ধন্য, নহিলে, হে রজ্জব, সে জীবন বন্ধ্যা। (মাতৃত্বের মধ্যে) ব্যথা, দুঃখ বিপদের নাই অন্ত, দুঃসহ অপরিসীম তাহাতে বিঘ্ন ও বেদনা; তবু এই সব দুঃখ বিনা যে বন্ধ্যার জীবন সকল নারীই তাহা মনে করে অধন্য।"

তৃষা অপরংপারকী জনমৈ অংতর মাঁঝ।
তৌ তো জীবন ধন্য হৈ নাতর জীবন বাঁঝ॥
বহু বিথা দুক্‌খ বিপদ ঘণাঁ দরদ বি-ঘন বহু ভারী।
তৌ ভী বিন সব দুক্‌খকৈ অধন্য মানৈ নারী॥ পৃ ৬৭

বেদনার ভয়ে ভীরু প্রাণ এক এক সময় মনে করে, "কাজ কি অসীমের প্রেমের এত দুঃখ জ্বালায়? অসীম ছাড়াও তো আমাদের প্রয়োজন মত সাংসারিক জীবন দিব্য চলিয়া যায়, তবে কেন এত দুঃসহ দুঃখ ভোগ?"— এই কথা মনে করিয়া অসীমকে যে বিদায় দেয় তাহার "মহতী বিনষ্টিঃ"। তাহার বন্ধনের আর অন্ত নাই। অসীম ছাড়া কে আছে আর মুক্তিদাতা?

"প্রদীপ দিয়াই তো চালান যায় কাজ তাই তপনকে দেওয়া গেল বিদায়। ওমা, মানস সরোবরে, চাহিয়া দেখি কমল গিয়াছে শুকাইয়া। ঘরের মধ্যেই তো আছে বেশ ঠাঁই। সুগম আনন্দ ও আরাম সেখানে বিরাজিত; তাই গগন যোগ যেই করিলাম বন্ধ, অমনি দেখি গোর (কবর) হইয়া উঠিল গৃহধাম। লক্ষ অসীম সাগর কোথায় আছে অগম্য কোন সুদূরে, সে সাগর আবার ক্ষার (লবণাক্ত) অনতিগম্য ও অপার; এই ভাবিয়া নদী যেই বিল বাঁওড়ে আপনাকে দিল বিলাইয়া তখনি সে হারাইল নিজ সার তত্ত্ব। অনন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে যে যোগ তাহাতে অসীম রস থাকিলেও তাহাতে না আছে কোনো বিশেষ রস না কূল না আছে সীমা, তাই দেবালয়ে মসজিদে পূজায় রোজার গেল চলিয়া এই অমূল্য জন্ম।"

কাজ সরৈ তো দীপ সৌ তপন দিয়া বিদাঈ।
মানস সরোবর দেখিয়া কমল গয়া কুম্‌ হিলাঈ॥
ঘরহী মাহিঁ ঠারঁ হৈ সুগম আনংদ আরাম।
গগন জোগ সব বংধ কিয়া গোর ভয়া ঘর ধাম॥
সাগর আগর দূর হৈ খার অগম অপার।
তাল ঝিল কুঁ মিলি নদী খোয়া নিজ ততসার॥
ব্রহ্ম জোগ অনংত রস বার পার তৈহঁ নাহিঁ।
দেব্‌ল মসীত পূজা রোজা জনম অমোলিক জাহিঁ॥

এইজন্যই আমাদের ইহা পরম সৌভাগ্য যে ভাল করিয়া না জানিলেও হৃদয়ে হৃদয়ে অপরিমিত এই ব্যাকুলতা, যদি না অতিরিক্ত বৈষয়িকতা ও কৃত্রিমতার ভারে তাহাকে একেবারে পিষিয়া না নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া থাকি। এত দূর তাহার ব্যাকুলতা যে অসীমের অন্তরস্থিত যে প্রেম যে ব্যাকুল মিলনেচ্ছা তাহার খবর যদি সে নাও পায় তবু সীমার অন্তরের মধ্যে জাগিয়া ওঠে অসীমের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ার জন্য দুর্নিবার ফলাফল বিচারবিহীন আকাঙ্ক্ষা। ইহার জন্য যদি মৃত্যুও ঘটে তবে তাহাতেও সে ভীত নয়। এই মৃত্যুর

দ্বারা তাহার কোনো সার্থকতা আছে কিনা তাহা সে বিচার করিয়া দেখিতেও নারাজ। মৃত্যুর মধ্যেই উৎসর্গ করিয়া সে যায় পরিপূর্ণ প্রেমের পূজাঞ্জলি।

"দেখ, প্রদীপের তো কোন হৃদয়ই নাই তবু তাহাতে পতঙ্গ পড়ে ঝাঁপ দিয়া, আপন হইতেই সে তনুমন দেয় হোমাঞ্জলি, (দাহের ভয়ে) তাহার অঙ্গ একটুও করে না সঙ্কুচিত। দেখ, কমলকোষ অপনিই যায় খুলিয়া, হয়তো প্রিয় সে মধুকরের পায় না সে দেখা; ভ্রমর বিনা চিত্তে তার নিরতিশয় বেদনা, তবু আপনাকে বদ্ধ করিয়া তো যায় না রাখা! ব্রহ্মভ্রমরের সঙ্গে এমন করিয়াই করো প্রেমকমলের যোগ; নদী যেমন সিন্ধুতে সদা এক ধারায় নিরন্তর করে প্রেমে আত্ম বিসর্জন, তেমনি সদা প্রেমে নিরন্তর কর তাঁহাতে আত্ম উৎসর্গ। দেহ প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইলেও সেই প্রেমের হয়না নাশ; বৃক্ষ হইতে লতা বিচ্ছিন্ন হইয়া মৃত্যুর কবলে যখন চলিয়াছে তখনও সে তার মুকুল বিকশিত করিয়া জাতি ফুল কয়টির দিয়া যায় পূজাঞ্জলি।"

দেখু দীপককে দিল নহীঁ তৌ পড়ৈ পতংগা।
তন মন হো মৈ আপ থৈঁ মোড়ৈ নহীঁ অংগা॥
দেখু কমল কোষ আপৈ খুলৈ পিয়া মধুকর নাঁহি।
ভবঁর বিনা চিতে বহু বিথা (বাণ) বন্দ
রহান জাঁহিঁ॥
ব্রহ্ম ভ্‌বঁর প্রেম কমল জোগ
ঐসী বিধি কী জৈ।
নদী সিংধ মেঁ প্রেম জ্যু সদা ইক ধার দী জৈ॥
প্যংড প্রাণ প্যারা ভয়ে সো প্রেম ন নাসৈ।
বেলি কলী জ্যু জাঈ কী টুট্যৌ প্রকাসৈ॥ পৃ ৩২

দেখ দেখ সেই প্রিয় যে আমার ভিখারী হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে আসিয়াছেন ভিক্ষা করিতে: "সব জন-চিত্ত অঙ্গনে আজ ভিক্ষা মাঁগে সেই আমার ফকীর যা কিছু দিবার আজ দে নিঃশেষে, পূর্ণ হউক উৎসব। আজ মিথ্যা বলিস না। কিছুই লুকাইয়া রাখিস না, তাঁকে নিরাশ করিস না। প্রিয় যে আমার ভিখারী; তাঁর মত আর কে আছে, বিত্ত মন আজ সে করিয়াছে আমার ব্যাকুল উদাস। আজ প্রেম মহামহোৎসবের নূতন দিন। আজ যদি আপনাকে না পারিস উৎসর্গ করিতে তবে আজ সবই ব্যর্থ— জনম তবে আজ পরাভব। তবে আজ ব্যর্থ সব মন্ত্র সব জপ সব সাধনা।"

সবজন চিত্ত অংগনে আজি মাংগে ফকীর মোয়। জো কুছ আপন আপি দে পূরণ উৎসব হোয়॥
ঝূন ন ভাখু কচ্ছু নহী রাখু, যা কর তাকুঁ নিরাস।
পিয়া ফকীর মম, নাহি কচ্ছু তা সম চিত মন
বিকল উদাস॥
প্রেম দিস নব মহা মহোৎসব জৈ আজ সৌঁপুন আপা।
ব্যর্থ আজ সব, জীবন পরাভব্ ব্যর্থ সব মন্ত্র
অরু জাপা॥ পৃ ৬০

কিন্তু সর্বস্ব সেই ভিখারীর চরণে-অর্ঘ্যধরা তো সহজ নয়। বড় দুঃখ বড় ব্যথা। কিন্তু কোনো দুঃখকেই প্রেম করে না গ্রাহ্য। তবে প্রেমের মধ্যে একটি ব্যথা আছে তাহা বড়ই অসহ্য, সে ব্যথা বড়ই করুণ। অসীমের নাই কালেও সীমা, কালের জন্য তাহার তো কোনো তাড়া নাই; কিন্তু সীমার যে কাল পরিমিত। তাই যখন সে দেখে তাহার জীবন তাহার যৌবন যাইতেছে ব্যর্থ হইয়া, অথচ তাঁহার নাই দেখা; তখন নিদারুণ সেই বেদনা। তিনি অসীম, স্থযোগ বা অবসর বহিয়া গেলে তাহার আর কি আসে যায়, কিন্তু তাহার ক্ষণস্থায়ী যৌবন যে চলিল বিদায় লইয়া, এই দুঃখ কি রাখিবার ঠাঁই আছে? কবীর, রজ্জব প্রভৃতির মধ্যে এই ব্যথার গানের আর অন্ত নাই। রজ্জব বলিতেছেন, "কমল মুকুল সলিল হইতে মাথা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন তপনের পাইল না দেখা। বড় দুঃখে সে কহিল, একটি মাত্র দিনের পরমায়ু যে আমার, হে প্রিয়তম। আজ তুমি মেঘাবৃত, কাল হয়তো হইবে তুমি মুক্ত, কিন্তু আমার সকল স্থযোগ সকল জনম এই একটি মাত্র দিনেই যে হইয়া গেল অবসান!"

কবঁল কহ্যা তপন কৌ জল সৌ সীস উঠাঈ।
পিব্ অনহদ কদ মিলূঁ ওসর রীতি জাঈ।
আজ বাদর পিব্ তেরো কাল মৃতু মেরী।
এক দিব্সকী অৱধি আই মানত নহীঁ দেরী॥ পৃ ৬০

তবু যত ব্যর্থতার ভয়ই থাকুক আর যত বাধাই থাকুক সেই অসীমের পরশ বিনা সীমার সকল সম্ভাবনা সকল সার্থকতা কিছুতেই হয় না বিকশিত। তাহার সকল মর্মদ্বারের বন্ধন ঘুচিয়া যায় একমাত্র সেই অসীমের ডাকে।

"অরুণ খুলিয়া দেয় কমলচিত্ত, বসন্ত খুলিয়া দেয় বনের ঐশ্বর্যের ভার। অসীম প্রেমের পরশ লাগিতেই খুলিয়া গেল মর্ম দুয়ার।"

অরুণ খোলৈ কমল চিত্ত বসন্ত খোলৈ বনভরে।
বেহদ প্রীত পরস লাগত খুল্যা মর্ম দুআর॥ পৃ ৫০

যে বন্ধন কিছুতে হয় না অপগত সে বন্ধন প্রেম দেয় নিঃশব্দে ঘুরাইয়া। কি অপরিসীম শক্তি এই প্রেমের! কোটি কুঠারের দ্বারাও অরণ্যের যে বসন্ত ঐশ্বর্যের হয় না বাইরে প্রকাশ সেই ঐশ্বর্য অনায়াসে আসে তাঁর পরশে বাহির হইয়া।

অদ্ভুত শক্তি প্রেমের। এই প্রেমের গুণেই কেবল সীমা যে বিকাইয়াছে অসীমের কাছে তাহা নহে, অসীমও আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছেন সীমার কাছে। সীমা অসীম উভয়েরই তাহাতে হইয়াছে সার্থকতা। এই সবই প্রেমের মহিমা।

অনির্বচনীয় রহস্য প্রেমের। "হে রজ্জব, সেই রহস্য যায় না কিছুতে বোঝা। সেবককে এই প্রেম করিয়া তোলে স্বামী আর স্বামীকে ভরপুর মিলাইয়া দেয় তাঁর সেবায়।"

অধিগতি গতি প্রেমকী রজ্জব লখী ন জায়।
সেৱক কো স্বামী করৈ স্বামী সেৱ সমায়॥ পৃ ৪৯১

প্রেমের মধ্যে এক হইয়া যায় আর। কায়ার জন্ম তো প্রেম স্বীকার করে না তাই সে আপন হাতে দেয় অপরূপ এই প্রেমের নব জন্ম। "এই প্রেমের নব জন্ম হইয়া সীমা হইয়া গেল অসীম।"

হেদ বেহদ হো গয়া প্রেম নব জনম হোয়॥ পৃ ৫৮

মৌলানা রুমী (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ) তাই বলিয়াছেন—

মন তূ শুদম্ তূ মন শূদী, মন তন শুদম্ তূ জান শুদী।
তা কস ন গুয়দ বদঁ অজ বনে, মন দীগ্‌র মতূ দীগ্‌রী॥

"আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি, আমি হলাম তনু, তুমি হলে প্রাণ। যেন এর পর আর কেউ বলতে না পারে যে তোমা ছাড়া আমি ও আমি ছাড়া তুমি।"

চরাচরে চলিয়াছে এই প্রেমলীলা। হে সীমা, তুমি সেই অসীমের চরণ কমলে তোমার প্রেমকে কর যুক্ত। তাঁহার প্রেম ও তোমার প্রেম যোগযুক্ত হইয়া চলুক ভক্তে ব্রহ্মে নিত্য প্রেমের নিত্য রাসলীলা। যোগ যদি তুমি না দিতে পার তবে বিশ্বময় এই প্রেমলীলার হইবে ছন্দভঙ্গ, তোমার জীবন হইবে ব্যর্থ।

"চরণ কমলে বাঁধ্ নেহ (প্রেম), জীবন ধন প্রিয়তমকে লও ধ্যানে ভরিয়া, সেই চরণধূলি শরণ করিয়া চাখ্ সেই অমৃতরস। প্রেমের সেবা যোগ চলিয়াছে এই জগতের, এমন অপূর্ব আর কিছুই নাই; চিত্ত অবারিত উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত ভাবে দে তাহাতে যোগ, সকল ভাষণ কর মৌন।

"পরম সত্যে ভরিতেছে চিত্ত, ব্যর্থ মান জ্ঞান চিত্ত প্রেম যুক্ত থাক্ নিত্য, সেই প্রেমের আনন্দে ভরপূর মগ্ন হইয়া দাস হইয়া থাক্ সেখানে! অখিল কল্যাণ স্বামীর সঙ্গ, প্রেম পূরিত সকল অঙ্গ, ভাবগগন ঝরিয়া পড়িতেছে প্রেম গঙ্গারূপে, নিত্য চলিয়াছে প্রেমের রাস! ভকতে ব্রহ্মে চলিয়াছে প্রেমের খেলা। সকল বিশ্ব ভরিয়া উঠিয়াছে সেই রূপে অরূপে। চলিয়াছে মিলন। পূর্ণ মনের আশা! জীবন মূল ভগবানের বাধাহীন প্রত্যক্ষ যোগ, অরূপ রূপের যোগলীলায় পুরিয়া উঠিয়াছে প্রাণ, হে রজ্জব, আজ সকল দুঃখ হইল দূর, আজ অক্ষয় অবিনশ্বর আনন্দ!"

চরণ কমল বাঁধ নেহ
জীবন ধন সুমরি লেহ,
শরণি সোই চরণ খেহ,
অমৃত রস চাখ।
সেবা জোগ জত মাহীঁ
ঐসো কছু ঔর নাহীঁ
নংগ চিত্ত মুক্ত জাহীঁ
মৌন কয় হু ভাখ॥
পরম সত্ত ভরত চিত্ত,
ব্যর্থ জ্ঞান মান বিত্ত,
প্রেমজুক্ত রহহু নিত্ত,
মগন মুদিত দাস।
অখিল কুশল সাঙ্গ সংগ,
প্রেম পূরিত ভুবন অংগ

ভার গগন গলিত গংগ
　　নিত্য চলত রাস ॥
ভকত ব্রহ্ম চলত খেল,
সকল থল ক ভরত কেল,
রূপ অরূপ চলত মেল,
　　পূরণ মন আস।
জীবন মূর হরি হজূর,
অরূপ রূপ প্রাণ পূর,
রজ্জব আজ দুঃখ দূর,
　　আনন্দ অবিনাস ॥

কান্তকবি

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

রজনীকান্তের সঙ্গে রাজসাহী কলেজের সম্পর্ক ছিল। আমার সঙ্গেও এই কলেজের কিছু-কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। এই কলেজের আলোচনা-সভায় রজনীকান্তের স্মৃতি-সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়া ও সেই সভায় আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়া, বর্তমান অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ এই কলেজের পূর্বতন ছাত্রবৃন্দের প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্বতন ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে আমি বার বার ধন্যবাদ করি। আজকার এই সৌভাগ্যে পূর্বকালের অনেক কথা স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে, যেন বাল্যকালের অনাবিল সৌন্দর্য আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

রজনীকান্ত নাই। মৃত্যুর পরপারে গিয়া রজনীকান্ত অমর হইয়াছে, যে কেবল 'আমাদের' ছিল, সে এখন সমগ্র বাঙ্গালার 'সকলের' হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নয়। সমগ্র বাঙ্গালার সকলে তাহাদের 'কান্তকবির' পরলোকগমনে কত ভাবে শোকপ্রকাশ করিয়াছে, আমি কিছুই করি নাই। কেন করি নাই, তাহা বলিবার জন্য অবসর লাভ করি নাই, আজ আপনারা আমাকে সেই অবসর দিয়াছেন। আমি রজনীকান্তের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার জন্য এখনো যোগ্য হইতে পারি নাই। কোনো কথা বলিতে হইলে, বাগ্মীপ্রবর এডমণ্ড বার্কের পুত্রের অকালমৃত্যুর পর তাঁহার বক্তৃতার ভাষায় আমাকে বলিতে হইত,—'যাহারা থাকিবে তাহারা চলিয়া গেল; যাহারা চলিয়া যাইবে, তাহারাই পড়িয়া রহিয়াছে।' আজ রজনীকান্ত আমার জন্য শোক করিবে; তাহা না হইয়া, বিধাতার বিধানে তাহার জন্য আমি শোকপ্রকাশ করিতেছি! আমার পক্ষে ইহা কিরূপ মর্মন্তুদ ব্যাপার, রাজসাহীতে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

যে রচনাপ্রতিভার বিকাশগৌরবে রজনীকান্ত গৌরব লাভ করিয়া আমাদিগকেও চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতৃধন ছিল। তিনি তাঁহার পিতার রচিত হস্তলিখিত খাতানিবদ্ধ কবিতাগুলির আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইতেন। ভাবে ভক্তিতে রচনালালিত্যে সে কবিতা বড় মর্মস্পর্শ করিত। আমার দ্বারা সেগুলি সম্পাদিত হইয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, সেই আশায় রজনীকান্ত খাতাখানি আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভূমিকম্পের অত্যাচারে যখন আমার পূর্বসঞ্চিত গ্রন্থরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সে খাতাখানিও অন্তর্হিত হয়। আর পাওয়া যাইবে না বলিয়া রজনীকান্তের নিকট কত লজ্জিত ছিলাম। রজনীকান্তের পরলোকগমনের অল্পকাল পরে জানিয়াছি, সে খাতা বিনষ্ট হয় নাই, তাহা কুড়াইয়া লইয়া আমারই একজন স্নেহের পাত্র রক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহা হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া 'প্রবাসী'[১] পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন,— রজনীকান্ত কোন্ স্থান হইতে রচনা-প্রতিভার বীজগুলি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বীজগুলি অনুকূল ক্ষেত্র প্রাপ্ত না হইলে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইত কি ফলফুল প্রসব করিত, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু রজনীকান্তের শিক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র সর্বাংশে ইহার অনুকূল হইয়াছিল।

---

১ শ্রাবণ ১৩১৮। 'একখানি অপ্রকাশিত কাব্য': শ্রীজগদীশ্বর রায়।

আমাদের পঠদ্দশায় রাজসাহীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রচনাশিক্ষার আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে যিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন তাঁহার নাম শরচ্চন্দ্র; তিনি এখনও শরচ্চন্দ্রের মতোই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছেন। রজনীকান্ত যখন অধ্যয়ন-নিরত তখনও রাজসাহী কলেজে ইহার স্মৃতি ও আদর্শ বর্তমান ছিল। তাহার পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনাপ্রতিভাবিকাশে যথেষ্ট উৎসাহলাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংগীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্বে আমাকে শুনানো হইয়াছে; মজলিশে-সভামণ্ডপে পুনঃপুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে। ইহা রাজসাহীর পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কথা। তথাপি সংগীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সরলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনাপ্রতিভা ছিল। কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্যজীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা। তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক আছে বলিয়া, আমার নিজের কথাও বলিতে হইবে। ইহাকে কেহ 'আত্মকথা' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, আমাকে ভুলিয়া গিয়া ইহা যে রজনীকান্তের জীবনের কথা, সেই ভাবেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন।

সেবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ডাকিলেন—

'দাদা ঠাঁই আছে?'

তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্পকাল পূর্বে 'সোনার তরী'[২] বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই উপর ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হয়তো আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী,
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি!

আমি বলিলাম, 'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।'

এইরূপে দুইজনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোলপুর যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকটে উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের ইতস্ততঃ দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রজনীকান্ত বলিল— 'সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না!'

মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া নূতন কবির পরিচয় না দিয়া গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সংগীতসুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না; সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর আলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের পরে রজনীর সংগীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আরম্ভ হইল।

---

২ সোনার তরী, প্রথম প্রকাশ ১৩০০

আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সংগীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়া কোন্ পর্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে, এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে— এই সকল শর্তে রজনীকান্ত গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সংগত হইয়াছে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমার পক্ষে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল— বাণী। সংগীতগুলিরও একরূপ নামকরণ হইয়া গেল। শ্রেণীবিভাগও হইল— তাহারও নামকরণ হইল আলাপে বিলাপে প্রলাপে। কিন্তু গানগুলি কোন্ পর্যায়ে সাজাইব, প্রলাপে বিলাপে আলাপে— প্রলাপে আলাপে বিলাপে— বিলাপে আলাপে প্রলাপে— বিলাপে প্রলাপে আলাপে— অথবা আলাপে প্রলাপে বিলাপে? ইহার স্থির করিতে গিয়া আমাকে প্রকারান্তরে সমালোচনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং আমার বিচারে হাস্যরসের গানগুলি নিকৃষ্ট বলিয়া 'প্রলাপ' নাম দিয়া তাহাকে সকলের শেষে ঠেলিয়া, 'আলাপ'কে প্রথমস্থান ও 'বিলাপ'কে দ্বিতীয়স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখনও এবং এখনও বহুস্থানে দেখিয়াছি ও দেখিয়া আসিতেছি— আমি যাহাকে 'প্রলাপ' নাম দিয়া সকলের শেষে ঠেলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাই সমধিক করতালি আকর্ষণ করে। কিন্তু দেশের অশিক্ষিত নরনারী কি ভাবে গানগুলি গ্রহণ করিয়াছে তাহার সন্ধান লইতে গিয়া দেখিয়াছি, সভামণ্ডপে ও শিক্ষিত-সমাজে যাহাই হউক, রজনীকান্তের হাস্যরসের গানগুলি জনসাধারণে তেমন গ্রহণ করে নাই; তাহারা তাঁহার 'আলাপ' ও 'বিলাপ'ই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহা কলাবতদিগের নিকটেও আদর পাইয়াছে। বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করা কত কঠিন তাহা না জানিয়া অনেকেই পদ্যেগদ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। মূল রস চারিটি— শৃঙ্গার রৌদ্র বীর বীভৎস। তাহা হইতে পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়—হাস্য করুণ অদ্ভুত এবং ভয়ানক।

শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেৎ হাস্যং রৌদ্রাচ্চ করুণোরসঃ
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তি র্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥

ইহাই আমাদের দেশের চিরন্তন সংস্কার। সুতরাং হাস্যরস নামে যাহা সচরাচর অভিহিত হইতেছে তাহার অধিকাংশই 'ভয়ানক' রস নামেই কথিত হইতে পারে। রজনীকান্ত ইহা জানিতেন, এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিতেন, এবং কিরূপ বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করিতে পারিতেন তাহা এই সভায় 'দেবলোক-হিতৈষিণী' নামক কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া সকলেই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তথাপি রজনীকান্তের 'আলাপ'ই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার ধারণা তাহা অনাবিল, তাহা মধুময়, তাহা ভাবে ভক্তিতে রচনালালিত্যে অনুপম।

রাজসাহী হইতে সাহিত্যালোচনা অন্তর্হিত হয় নাই। শীঘ্র হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। তাহার প্রমাণ আজ এই সভাস্থলেই প্রাপ্ত হইয়াছি। ছাত্রবৃন্দ যে রচনাপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, কেহ কেহ যে সুন্দর সুন্দর রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আজ রজনীকান্ত পরলোকগত। কিন্তু আজ তাঁহার জন্য উচ্চ কলরবে কতকগুলি অশিক্ষিত লোক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া হায় হায় করিলে, তাঁহার স্মৃতিসম্বর্ধনা হইত না। যাঁহারা সুশিক্ষায় স্বদেশে

বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই সকল অধ্যাপকবৃন্দ ও তাঁহাদের প্রতিভাশালী ছাত্রবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া এই বিদ্যামন্দিরে পরলোকগত কবির প্রতি সমাদর প্রদর্শনের জন্য যাহা করিলেন, ইহাতে আমাদিগের শোক অপনোদিত হইল; পরলোকগত আত্মাও ইহাতে সমধিক তৃপ্তিলাভ করিবে।[৩]

রজনীকান্ত সেন

আনুমানিক ত্রিশ বৎসর বয়সে

রজনীকান্ত সেন

আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে

কবি রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫ - ১৯১০

রথীন্দ্রনাথ রায়

বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রপর্ব শুধু পরিধিতে ও বিস্তৃতিতেই সমৃদ্ধ নয়, এর বহুমুখী বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। রবীন্দ্র-সমকালীন কয়েকজন কবির প্রতিভা মূলত গীতিকারের ও সুরকারের। রবীন্দ্রপর্বের ইতিহাসে এই স্বল্পায়তন ও গীতিসমৃদ্ধ ধারাটিকে কাব্যসংগীতের ধারা বলা যায়। কালানুক্রমিকভাবে এই ধারাটির গতিপ্রকৃতি লক্ষণীয়: রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪)[১]। এই চারজনের মধ্যে কবি, গীতিকার ও সুরকারের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। শুধু বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসেই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবসাধনার ইতিহাসেও তিনি এক ক্ষণজন্মা কবিপুরুষ। গীতিকবিতা ও সংগীত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলেও শেষ দশ বছরে তিনি তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসেছিলেন। এই সময় কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি মূলত নাট্যভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর জনপ্রিয় নাটকগুলির মূলে সংগীতগুলির দান যে অনেকখানি, একথাও মনে রাখতে হবে। কিন্তু রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের ক্ষেত্র একটু আলাদা। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের দানের পরিমাণ বেশি নয়; তা ছাড়া কাব্যসংগীতই তাঁদের প্রতিভার একমাত্র বাহন। অতুলপ্রসাদ তাঁর সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত সুরের রেখায় মিশিয়েছেন লক্ষ্ণৌ ঠুংরির মেজাজ, তিনি অনুসরণ করেছিলেন রাগসংগীতের রীতি। কাব্যের দিক থেকে বিশুদ্ধ লিরিকের আবেদন তাঁর রচনায় কম নেই।

এই চারজন কবির মধ্যে রজনীকান্তই ছিলেন সবচেয়ে স্বল্পায়ু, মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের সীমারেখার মধ্যেই তাঁর কবিজীবনের পরিসমাপ্তি। আটখানি স্বল্পায়তন-কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁর রচনা সীমাবদ্ধ। তাঁর রচনার প্রায় অর্ধাংশ রোগক্ষত দেহে হাসপাতালে বসে লেখা। তা ছাড়া 'বাণী' ও 'কল্যাণী' ছাড়া অন্যান্য কাব্য দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল।[২] এই প্রতিভাবান কবি ও গীতিকার আজ একাধিক কারণে বিস্মৃত। আত্মপ্রচারবিমুখ এই মফঃস্বলবাসী কবির সঙ্গে বৃহত্তর সাহিত্যিক-সমাজের তেমন কোনো দীর্ঘস্থায়ী ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি। জলধর সেন ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁকে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে শততন্ত্রী বীণার সুরবৈচিত্র্য ছিল না, ছিল নিঃসঙ্গ নিভৃত বাউলের একতারা। তাই পাঠকসাধারণের বিচিত্রবিলাসী মন সেই নিভৃত সাধনার সন্ধান রাখে নি। যাঁরা কদাচিৎ কাছে এসেছেন, তাঁরা তাঁর সুরসাধনার অভিনব আস্বাদনে মুগ্ধ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মর্তব্য; রজনীকান্তের কবিতা এতো সরল, সহজ ও নির্ভূষণ যে, সহসা তার দিকে দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা কম। তাঁর কবিতায় এমন কোনো বর্ণ নেই যা বর্ণবিলাসী মনকে

---

১ এই প্রসঙ্গে নজরুলের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি অনেক পরবর্তীকালের। তাই বর্তমান আলোচনায় তাঁর কথা বাদ দিতে হয়েছে।

২ সম্প্রতি দুটি প্রকাশকসংস্থা কান্তকবির রচনাবলী পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

ভুলিয়ে রাখতে পারে, কণ্ঠস্বরে এমন কোনো উত্তেজনা নেই, যাতে হৃদয়ে দ্রুতস্পন্দন জাগে। রজনীকান্ত স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশপ্রেমের গান লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানেও কোনো উত্তেজনার উগ্রতা ছিল না (সে যুগের অনেক গানেই যা লক্ষ্য করা যায়)।

কান্তকবির কবিতার পরিমাণ যেমন বেশি নয়, তেমনি কবিতাগুলিও স্বল্পায়ত। শরৎকালের প্রভাতে ঘাসের উপর শিশিরের মুক্তাকণিকা ছড়িয়ে থাকে। কর্মব্যস্ত পথিকের তা চোখে পড়ার মতো নয়। স্বচ্ছতায় ও শুভ্রতায় শিশিরবিন্দুর সহজ সৌন্দর্যের সঙ্গে কান্তকবির কবিতার একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। যেখানে কড়া রং নেই, চড়া সুর নেই, আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভঙ্গিও নেই— তার সমাদরের অভাব হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তাই অর্ধশতাব্দীরও বেশি কাল হল এই প্রতিভাবান কবির মৃত্যু হয়েছে। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা হয় নি। তবে একমাত্র সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় বারো বছর পর (১৩২৮) একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।[৩]

কান্তকবির সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল-পরিসমাপ্তি মর্মান্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সময়েই জীবন-বিধাতা অলক্ষিতে তাঁকে কবিকীর্তির অক্ষয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আলোকে কবির জীবন ও কাব্য, দুইই মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাঁর শান্তরসের সহজ ও স্বচ্ছ কবিতা এবং গান আসন্ন মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিকায় আত্মনিবেদনে ও পরম-নির্ভরতায় অধিকতর মহিমা লাভ করেছে। এ যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সঞ্চরণশীল বলাকার শুভ্রোজ্জ্বল দীপ্তি!

২

কান্তকবির জীবন ঘটনাবহুল নয়। কর্মের বিচিত্র-সংঘাত অথবা জীবনের জটিলাবর্ত সেখানে কোনো নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে নি। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম হয় (২৬ জুলাই ১৮৬৫)। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সাব্-জজ। ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল; তা ছাড়া ইংরেজিও তিনি ভালো জানতেন। কুলধর্মে তাঁরা শাক্ত হলেও গুরুপ্রসাদ বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণবসাহিত্য তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ব্রজবুলিতে লেখা প্রায় সাড়ে চারশো পদে তিনি তাঁর 'পদচিন্তামণিমালা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরিণত বয়সে ব্রজবুলিতে তিনি 'অভয়া-বিহার' নামে আর একখানি কাব্য লিখেছিলেন। এতে সতীর জন্ম থেকে দক্ষ-যজ্ঞে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবির পিতৃদেব সম্পর্কে এইটুকু তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ কবি পিতার ভক্তিভাব ও কবিত্বশক্তির যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

নিতান্ত অল্পবয়স থেকেই রজনীকান্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন। পরে তিনি নিজেই গান লিখতে শুরু করলেন। কান্তকবির জীবনী লেখক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কবির 'পঞ্চদশ বৎসর বয়সের একটি সংগীতের কিয়দংশ' উদ্ধৃত করেছেন:

নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল।
হায় রানী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল॥

---

৩ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রচিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত'।

উমার ধরিয়া কর, কহে, উমা আয়রে।
এমন করিয়া দুঃখ দিয়া গেলি মায়েরে ॥
সারাটি বরষ তোর মুখপানে চাইয়ে।
আসিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ ধরিয়ে ॥[৪]

কবির বাল্যকালের এই রচনার সঙ্গে পরিণতবয়সের রচনার একটি ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আনন্দময়ী' (৫ ডিসেম্বর ১৯১০) কাব্যের সঙ্গে উদ্ধৃত সংগীতের সম্পর্কের কথা স্মর্তব্য। সংগীত ছাড়া এক সময়ে ভালো অভিনয়ও করতে পারতেন। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[৫] যথাসময়ে বি-এল পাশ করে (১৮৯১) রাজশাহীতে ওকালতি শুরু করেন। সিরাজগঞ্জ থেকে 'আশালতা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই (ভাদ্র ১২৯৭) তাঁর 'আশা' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা।[৬] ১৩০৪ সালের বৈশাখ মাসে রাজশাহী থেকে 'উৎসাহ' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রজনীকান্ত সেন— দুই বন্ধুরই অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়।

রাজশাহীতেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রজনীকান্তের পরিচয় ঘটে। দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে তাঁর হাসির গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন। এরপর থেকে কান্তকবিও হাসির গান লিখতে শুরু করেন। স্থানীয় সভা-সমিতি ও নানা অনুষ্ঠানে রজনীকান্ত স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ; তাসখেলা, দাবাখেলা ও মজলিসী গল্প করতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সুপারিশে রাজশাহীতে জেলা-জজের কর্মচারীর কাজ পান। রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দীনেন্দ্রকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

> আমাদের মেসের দক্ষিণাংশে রজনীবাবুর বাসা ছিল। এজন্য সকালে অবসরকালে রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতাম। অনেক সময় কোর্ট হইতে গাড়িতে বাসায় না ফিরিয়া পদ্মাতীরস্থ বাঁধের উপর দিয়া রজনীবাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে মেসে ফিরিতাম। রজনীবাবু সদা প্রফুল্ল, হাস্যরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। অপরাহ্ণে কাছারির পর তাঁহার বাহিরের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বসিত।…তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে কোনো কোনো দিন রাত্রি একটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার গল্প শুনিতাম।[৭]

রজনীকান্তকে যথার্থই 'রাজসাহী সহরের উৎসবরাজ'[৮] বলা হয়েছে। ওকালতি কোনোদিনই তাঁকে

---

৪ কান্তকবি রজনীকান্ত (১৩২৮) নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৩২।

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৯।

৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৮।

৭ মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪০।

৮ বাংলার কবি : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, পৃ ৯০।

আকর্ষণ করতে পারে নি। এ সম্পর্কে কান্তকবির চরিতকার কবির একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন। চিঠিখানি দীঘাপাতিয়ার শরৎকুমার রায়কে লেখা। কবি লিখেছেন—

কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই।[৯]

রজনীকান্ত আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত ছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ই তাঁর গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনিই কবিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তবুও গ্রন্থ প্রকাশের কুণ্ঠা গেল না, কারণ 'সমাজপতির সমালোচনার' ভীতি। অক্ষয়কুমারের আগ্রহে জলধর সেনের বাসায় সমাজপতি কান্তকবির গান শুনে মুগ্ধ হলেন। সমাজপতির সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' (২৪ আগস্ট ১৯০২) প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণী' (১৯০৫) প্রকাশিত হয় এর তিন বছর পরে।

স্বদেশী আন্দোলনকে যাঁরা বাণীমূর্তি দিয়েছিলেন, রজনীকান্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সে যুগে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

The national songs composed during the period by Dwijendra Lal Roy, Rabindranath Tagore, Sarala Devi Choudhurani, Mr. A. P. Sen and the late Rajani Kanto Sen smote on the heart of the people as a giants' harp, awakening out of it a storm and a tumult such as had never been known through the long centuries of her political serfdom.[১০]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যখন নূতন গৃহের উদ্বোধন হল (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) তখন রজনীকান্ত কলকাতায় এসেছিলেন। নবনির্মিত পরিষৎ-ভবনের একতলায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে রজনীকান্ত দু'খানা গান গেয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেছিলেন। রজনীকান্ত তাঁর 'হাসপাতালের রোজনামচায়' এ সম্পর্কে লিখেছেন :

এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তার পরদিন সকালবেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।[১১]

---

৯ কান্তকবি রজনীকান্ত : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৬১।

১০ *Life and Times of C. R. Das*—The story of Bengal's self expression: Prithwis Chandra Roy, p.p. 41-42.

১১ কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃ ৯৪।

এর কিছুদিন পরে রাজশাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১৮, ১৯ মাঘ ১৩১৫)।[১২] এই অধিবেশনে রজনীকান্ত অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনায় বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

যশ ও গৌরবের মধ্যাহ্নদীপ্তির মুহূর্তেই কবির জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬)। কলকাতায় নিয়ে এসে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হল। গলদেশে অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর বাকশক্তি লুপ্ত হয়। কিন্তু কবির লেখনীর বিরাম ছিল না। এই সময়ে তাঁর 'অমৃত' (২৪ মে ১৯১০) প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কাব্যগুলিরও অধিকাংশ কবিতাই এই সময়ে লেখা। তা ছাড়া হাসপাতালে থাকতে তিনি যে রোজনামচা লিখেছিলেন তাতে ব্যক্তি ও কবি রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সময়ে তিনি আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। 'নিবেদন' ও 'জন্ম ও বংশপরিচয়' লেখার পর আর লিখতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুপথযাত্রী কবির সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করে যে চিঠি লিখেছিলেন (১৬ আষাঢ় ১৩১৭), তাতে কান্তকবির কবিচরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে: 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি।'

১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০) কান্তকবির জীবনান্ত হয়।

৩

কান্তকবির হাস্যরসাত্মক গানগুলি বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। আধুনিক যুগে হাসির কবিতা নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এককালে এই জাতীয় কবিতার সমাদর ছিল। গত শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে হাস্যরসের বিচিত্রধারা নানাভঙ্গিতে উৎসারিত হয়েছে। নাটক-নক্সা-প্রহসন-ব্যঙ্গকাব্য— সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের সরস ধারা প্রবাহিত হয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত একথা অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করেছিলেন: 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।'

হাস্যরসের মূলে থাকে অসংগতি। এই অসংগতির কারণগুলিও বিচিত্র। ব্যক্তিজীবনের আচরণগত অসংগতি, ধর্মসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতি এর অন্তর্ভুক্ত। ভল্‌টেয়ারের মতে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের অবলম্বন হবে সমকালীন সমাজজীবন। কান্তকবির হাস্যরসাত্মক কবিতার অবলম্বনও সমকালীন সমাজ, দেশ, ধর্ম, রাজনৈতিক জীবন, আচার-আচরণ প্রভৃতি। 'বাণী'র 'প্রলাপে' অংশে, 'কল্যাণী', 'অভয়া' ও 'বিশ্রাম'-এর অনেকগুলি কবিতায় রজনীকান্তের অধিকাংশ হাসির গান সংকলিত হয়েছে। তাঁর হাসির গানগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক হাস্যরস; স্যাটায়ারের বিদ্যুৎকশাঘাতের দীপ্তি এই শ্রেণীর হাসির গানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এখানে মূলত সামাজিক অসংগতিগুলিকেই অবলম্বন করা হয়েছে। (খ) বিশুদ্ধ কৌতুকরসের গান—এখানে ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গটাই বড়ো। (গ) আর এক শ্রেণীর হাসির গান আছে, যেখানে হাস্যরসের সঙ্গে বৈরাগ্য ও নীতিকথার মিশ্রণ ঘটেছে। এই শ্রেণীর কবিতার ফলশ্রুতি বিশুদ্ধ শান্তরসে ও ভগবদ্‌বিশ্বাসে। শুধু

---

১২ এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হাস্যরসই নয়, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কান্তকবির কাব্যজীবনের সব ক'টি ধারাই শান্তরসের স্নিগ্ধ-মাধুর্যে পরম চরিতার্থতা লাভ করেছে।

সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে কবি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। সামাজিক জীবনের সামান্য অসংগতিগুলিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। হাকিম-কেরানী-উকিল, নব্যনারী, ভণ্ড ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, কবি-বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যেখানেই তিনি বিকৃতি, অসংগতি ও নৈতিক শৈথিল্য দেখেছেন, সেখানেই নির্মম আঘাত হেনেছেন। ষাট বছরের বৃদ্ধের পঞ্চম পক্ষ গ্রহণ, সম্ভ্রান্ত লোকের মুখোশ-পরা মদ্যপায়ী লম্পট, দেশহিতৈষণার নামে আত্মসুখ-অন্বেষণ, 'লম্বা-দাড়ী গেরুয়াধারী' ছদ্ম-সন্ন্যাসী, অকালপক্ব জ্যাঠা ছেলে, আলোকপ্রাপ্ত নব্যযুবকের আচার-আচরণগত বিকৃতি, পুত্রের বিবাহে মাত্রাতিরিক্ত পণ গ্রহণ প্রভৃতি সমাজ জীবনের রন্ধ্রপথগুলি তাঁর ব্যঙ্গতির্যক দৃষ্টিতে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যখন বিকৃতি দেখা যায়, তখন কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয় শ্লেষের চাপা স্বর—

ধার্মিক বটে সেই, যে দিনরাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে মদ্‌টা আস্‌টা টানে ;
নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট্‌বছরে আছে পঞ্চম-পক্ষ ;
সেই কাজের লোক, চব্বিশঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।

—জেনে রাখ, 'বাণী'

দু'পাতা ইংরেজি পড়ে নব্য যুবকসম্প্রদায় কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল, তার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন কান্তকবি—

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সাদা জামা রাখি শরীরে ;
(আর) 'শ্যাণ্টপো' বলি 'শান্তিপুর'কে
'হ্যারি' বলে ডাকি 'হরি'রে ;

—জাতীয় উন্নতি, 'বাণী'

'বরের দর' (বাণী), 'বেহায়া বেয়াই' (বাণী) কবিতা দু'টি কান্তকবির ব্যঙ্গ কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কবিতা দু'টিতে পণপ্রথার নির্মম ছবি আঁকা হয়েছে। কন্যাদায়-বিব্রত কন্যার পিতার অসহায় অবস্থার সম্মুখে বরপক্ষের মারাত্মক রকমের দাবি তীব্র শ্লেষের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

সোনার চেন ঘড়ী, আইভরি ছড়ি
ডায়মণ্ড কাটা সোনার বোতাম,
দিও এক সেট, কতই বা দাম ?
হ্যাদ্যাখো ধরিনি চশমা— কেমন ভুলো মন।
ছেলে, ঠুলি পেলে খুসি, একটু খাটো-দরশন।

—বরের দর, 'বাণী'

এদিকে বরপক্ষের চাহিদা অন্তহীন, কিন্তু তার পাশে ভাবী বরটির বর্ণনা পড়লে কান্তকবির শ্লেষ-চতুর তির্যক-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বরের পিতা পাত্রের পরিচয় দিচ্ছেন—

যদি দিতেন একটি 'পাশ',
তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠল কম্পন ?

—বরের দর

কান্তকবির কতকগুলি হাস্যরসের কবিতা বিশুদ্ধ কৌতুকরসের, ব্যঙ্গের জ্বালা এখানে অনুপস্থিত। তাঁর সরস পরিহাস-নিপুণ মন বিশুদ্ধ কৌতুক সৃষ্টিতে অধিকতর সার্থক হয়েছে। উদ্ভট ব্যাকরণপ্রিয়তা ও নব দম্পতির প্রেমপত্রের কৌতুককর গ্রন্থনে 'বৈয়াকরণ দম্পতির বিরহ' কবিতা দুটি হাস্যরসের একটি নূতন রসকেন্দ্রের সন্ধান দিয়েছে। বিরহাতুরা বৈয়াকরণ স্ত্রীর পত্রের উত্তরে বৈয়াকরণ-স্বামী যা লিখেছেন, তাতে হাস্যাবেগ সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে—

অধ্যয়ন উঠেছে চাঙ্গে, রেতে যখন নিদ্রাভাঙ্গে,
লুপ্ত 'অ'-কারের মতো মরে থাকি জ্যান্ত।
এ যে, সন্ধি-বিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্তৃবাচ্য,
বিরহ অসমাপিকা ক্রিয়া পাইনে অন্ত।
প্রিয়ে, তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মূলসূত্র
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র, কচ্ছি 'হাহা হন্ত'!

—বৈয়াকরণ দম্পতির বিরহ, 'বাণী'

পুরাতত্ত্ববিদদের আতিশয্যকেও তিনি কৌতুকরসে অভিষিক্ত করেছেন—

আকবর সাহা কাছা দিত কিনা,
নুরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এসব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

—পুরাতত্ত্ববিৎ, 'কল্যাণী'

'কল্যাণী' কাব্যের 'বাঙ্গালের শ্যামাসংগীত', 'বাঙ্গালের বৈরাগ্য', 'বুড়ো বাঙ্গাল', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর' প্রভৃতি কবিতায় কবি পূর্ববঙ্গের ভাষা অবলম্বন করে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছেন। কান্তকবির ব্যঙ্গ কবিতার চেয়ে বিশুদ্ধ কৌতুকের কবিতার সংখ্যাধিক্য থেকেই তার হাস্যরস সৃষ্টির প্রকৃতি অনুমান করা অসংগত নয়।

কান্তকবির আর এক শ্রেণীর হাস্যরসের কবিতা আছে, যেখানে হাস্যরসের সঙ্গে নৈতিক দৃষ্টি ও ভগবদ্-বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এইভাবে তাঁর হাস্যরসও কবিমানসের মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

যত যা করে গেলে, সেইখানে সব উঠবে ঠেলে,
তুমি তা টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে 'Black Book'-এ ?

যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ গাঁজা ভাঙ্গ বারাঙ্গনা
এর মজা বুঝবে সেদিন, যেদিন যাবে শিঙ্গে ফুঁকে !

—আছত বেশ, 'কল্যাণী'

হাস্যরসের তরল-চঞ্চল প্রবাহের গভীরে তিনি আর এক সত্যের পরিচয় পেয়েছেন। তাই অতি সহজেই ব্যঙ্গ-রঙ্গ কবির এক ভাবস্থির উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছে :

ওরে, গীতাপাঠের সভায় কার কি করবে চুরি
ভাবছ কেবল ;
কান্ত কয়, আর বলো না, আর হলো না, হবে
হলে কায়া-বদল।

—হবে, হলে কায়া-বদল, 'অভয়া'

এই সুরই কান্তকবির হাসির গানের পরিণাম।

৪

কান্তকবির হাসির গান যেমন একদিকে ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সুরে পরিণতি লাভ করেছে, তেমনি তাঁর স্বদেশীসংগীতগুলির মধ্যেও গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এইদিক থেকে বিচার করতে গেলে ভক্তিমূলক গান ও দেশপ্রেমের গানের সঙ্গে কান্তকবির হাসির গানের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েই তিনি দেশের দুর্গতির দিকেই অঙ্গুলী-সংকেত করেছেন। কান্তকবির মৃত্যুর পর একজন সমালোচক লিখেছিলেন :

হাসির গানের ব্যপদেশে রজনীকান্ত সমাজের ক্ষতস্থানগুলি নির্দেশ করিয়া তাহাতে ঔষধ-প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে 'বরের দর' সংগীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহসভায় বরকর্তা যৌতুকের ফর্দ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছি। 'বরের দর' কবিতাটির শেষ পংক্তি এই 'দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ।'— এইস্থানে কবি নিজের হৃদয় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি হাস্যরসের আবরণ দিয়া রজনীকান্ত তাঁহার মর্মবেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুকহাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত। কমলাকান্তের ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পারিতেন— 'হাসির ছলনা করি কাঁদি।'[১৩]

দেশের অতীত মহিমা যেমন তিনি স্মরণ করেছেন, তেমনি তৎকালীন অবনতির কথা চিন্তা করে ধিক্কার দিয়েছেন—

১৩ কবি রজনীকান্ত : রমণীমোহন ঘোষ। আর্যাবর্ত, কার্তিক ১৩১৭।

পরপদতল-লেহনপটু স্বজন বন্ধু যারা।
দৈন্য-দুঃখ আনিল গেহে— এমনি লক্ষ্মীছাড়া॥

—অন্ধ, 'শেষদান'

এইখানেই কান্তকবির হাসির গানের সঙ্গে স্বদেশীসংগীতের যোগসূত্র। জাতীয় জীবনের অসংগতি, দুর্বলতা, পরানুকরণ ও ঐতিহ্যভ্রষ্টতার জন্য তিনি শ্লেষবিদ্রূপ অবলম্বন করেছিলেন।

কবির ভাবদৃষ্টিতে বঙ্গজননীর এক মহিমাময় বরমূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে—

নমো নমো নমো জননী বঙ্গ
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য!

—বঙ্গমাতা, 'বাণী'

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশে কান্তকবির দেশপ্রেমের গান অপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। বাঙালির চিত্তবিক্ষোভকে সেদিন যাঁরা বাণীরূপ দিয়েছিলেন, কান্তকবি তাঁদের অন্যতম। বিদেশী দ্রব্য-বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিল্পকে রক্ষা করা ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন তাঁর বহুপ্রচলিত একটি সংগীতে— 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' এই একটি গানেই কান্তকবি বাঙালির চিত্ত জয় করেছিলেন। এ সম্পর্কে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিমুগ্ধ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে-সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ংকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু-কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মতো সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,— নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু— বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোনো গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করি।[১৪]

শুধু এই গানটিতেই নয়, অন্যান্য কয়েকটি গানেও কান্তকবি সেই জাতীয়সংকটের দিনে পথ নির্দেশ করেছেন। গানগুলিতে মাতৃবৎসল সন্তানের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে—

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।

—তাই ভালো, 'বাণী'

---

১৪ কান্তকবি রজনীকান্ত : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৭৩-৭৪

আর-একটি গানে বলেছেন—

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোটো,
তবু, আজি সাতকোটি ভাই, জেগে ওঠো !

—আমরা, 'বাণী'

সেদিনের বিদেশী সরকার অত্যাচার উৎপীড়ন করে নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। নবগঠিত পূর্ববঙ্গের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে শোচনীয়। 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করা অবৈধ বলে ঘোষিত হল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন—

The months that followed the 16th October, 1905, were months of great excitement and unrest. The policy of the Government especially that of East Bengal under Sir Bampfylde Fuller, added to the tension of the situation. . . . . The Partition was followed by a policy of repression, which added to the difficulties of the Government and the complexities of the situation. The cry of *Bande-Mataram*, as I have already observed, was forbidden in the public streets, and public meetings in public places were prohibited. [১৫]

কান্তকবি ফুলারের এই 'হুকুম জারি'র উপরে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সাময়িক ঘটনাকে অবলম্বন করে গান লিখলেও আন্তরিকতায় ও গভীর ভাবাবেগে তা সাময়িকতাকে অতিক্রম করে উচ্চতর শিল্পে পরিণত হয়েছে। সাময়িক বিষয়কে নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এর রস-সংবেদন সাময়িকতার উর্ধ্বে ওঠা চাই। ষাট বছর আগের ঘটনা হলেও তাই কান্তকবির কবিতার আবেদন বিন্দুমাত্র কমে নি— মাতৃবৎসল সন্তানের মাতৃবন্দনা আজো পুলক-বেদনার রোমাঞ্চ জাগায়—

ফুলার কল্লে হুকুম জারি,—
মা বলে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।
মা বলে ভাই ডাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা ?
তবে কি ভাই বাঙ্গলা হতে উঠবে রে মা বলা ?
যে দিয়েছে এমন হুকুম মা কিরে নাই তারি ?
তার মাকে কি ডাকে না সে ? দোষ শুধু বাঙ্গলারি ?

—হুকুম, 'বাণী'

৫

যে আটমাস রজনীকান্ত হাসপাতালে ছিলেন, সে সময়েও রোগক্ষত দেহ নিয়ে তিনি অনলসভাবে সাহিত্যচর্চা করেছেন। এই সময়ে 'অমৃত' (২৪ মে ১৯১০) প্রকাশিত হয়। কতকগুলি চিরন্তন নীতি-বাক্যকে তিনি ছোট ছোট কবিতার আকারে (কবিতাগুলির সবগুলিই অষ্টপদী) রূপ দিয়েছেন। নীতিবাক্যকে অবলম্বন করা হলেও নীরস হয়ে ওঠে নি। কারণ কবি পরিবেশন করেছেন গল্পের ছলে।

১৫ *A Nation in Making* (1963 Edition). Surendranath Banerjea, pp. 202-3).

কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র আদর্শে লেখা হয়েছিল। কান্তকবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে তা স্বীকার করেছেন।[১৬] কিন্তু 'কণিকা'-র আদর্শে রচিত হলেও কান্তকবির শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। সংক্ষিপ্ততা ও গাঢ়বদ্ধতা কবিতাগুলির প্রধানগুণ। সেযুগে অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের আদর্শে কবিতা লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন (এর মধ্যে আবার কেউ কেউ রবীন্দ্র বিরোধীও ছিলেন।) কান্তকবির এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিই তার আদর্শের প্রায় কাছাকাছি পৌছেছিল। কবির পক্ষে এ গৌরব বড়ো সহজ নয়। এর কিছু কিছু কাব্যাংশ লোকের মুখে মুখে প্রায় প্রবচনে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু রজনীকান্তের দ্বিতীয় নীতিকাব্য 'সদ্ভাব-কুসুম' (৩১ মে ১৯১৩) সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। এই কাব্যে দশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ও শেষের কবিতা ছাড়া অন্য সবগুলি নীতিমূলক কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। প্রথম কবিতাটি 'অমৃত'-র কবিতাগুলিরই যেন দীর্ঘতর সংস্করণ। কান্তকবির এই কাব্য প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) 'সদ্ভাবশতক'-এর (১৮৬১) কথা মনে হতে পারে। 'সদ্ভাবশতক' নীতিকবিতা হলেও এক নামকরণ ছাড়া রজনীকান্তের কাব্যটির সঙ্গে অন্য কোনো মিল নেই। 'সদ্ভাবশতক'এর অধিকাংশ কবিতাই বিখ্যাত পারসিক কবি হাফেজের কবিতার মর্মানুসরণ করে রচিত হয়েছে। কবি নিজেই বলেছেন: 'আমি এই প্রসিদ্ধ পারস্যকবির প্রণীত গ্রন্থের অত্যুৎকৃষ্ট কবিতাকলাপের মর্মমাত্র গ্রহণ করিয়া 'সদ্ভাবশতক' নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম।'[১৭] কান্তকবির 'সদ্ভাব-কুসুম'-এর অবলম্বন কতকগুলি নীতিগ্রাহ্য গল্প, গল্পগুলিরও পরিকল্পনা কবির নিজস্ব।

কিন্তু কবিতা হিসাবে 'অমৃত'-র সঙ্গে 'সদ্ভাব-কুসুম'-এর কোনো তুলনাই হতে পারে না। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি দীর্ঘতর, কাহিনী গ্রন্থনের মধ্যে মাঝে মাঝে শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। 'সদ্ভাব-কুসুম'-এর শিল্পগত দুর্বলতার কারণ দুটি। প্রথমত, কান্তকবির প্রতিভা গীতিকারের; এক একটি ভাববিন্দুকে কেন্দ্র করে তাঁর ছোট ছোট গানগুলি দানা বেঁধে উঠেছে। দীর্ঘ কবিতার মধ্যে সেই কেন্দ্রসংহতি লক্ষ্য করা যায় না। বৈচিত্র্যহীন নীরস নীতি-আখ্যায়িকার মধ্যে গীতিকবিতার সহজাত লাবণ্য তিরোহিত হয়। দ্বিতীয়ত, নীতিকথাকে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে এর উপদেশাত্মক নীরস নগ্নরূপ চোখে পড়ে। তাই নীতিবাক্যের মধ্যে সত্য ও কল্যাণ থাকলেও সংক্ষেপে শেষ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একথা বাস্তবজীবনে যেমন সত্য, তেমনি সত্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে। 'অমৃত' যে কারণে সার্থক হয়েছে, ঠিক সেই কারণের অভাবেই 'সদ্ভাব-কুসুম' হয়েছে ব্যর্থ। 'অমৃত'র কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত, স্বল্পায়ত, তীক্ষ্ণতায় লক্ষ্যভেদী— রত্ন-কণিকার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। পরমহংসদেবের 'কথামৃত'গুলিও সংক্ষিপ্ত, প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণে কথোপকথনের ছলে সরসভাবে বিবৃত। এইখানেই এই অলংকৃত ভাষণগুলির শিল্প-মহিমা। তাই 'সদ্ভাব-কুসুম' নীতিসর্বস্ব নীরস বিবৃতিমাত্র, আর 'অমৃত' সার্থক শিল্প, 'কণিকা'-র দোসর।

কান্তকবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত প্রথম কাব্য 'আনন্দময়ী' (৫ অক্টোবর ১৯১০) কবিপ্রতিভার

১৬ কান্তকবি রজনীকান্ত: নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ২০০।

১৭ বিজ্ঞাপন, 'সদ্ভাবশতক'।

আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। গৌরীর আগমন সংবাদে গিরি-মহিষী মেনকার ব্যাকুলতা থেকে শুরু করে দশমী প্রভাতে শঙ্করের সঙ্গে গৌরীর কৈলাস যাত্রা ও মেনকার খেদোক্তি দিয়ে কাহিনী শেষ করা হয়েছে। এই কাব্যের মূলভাব সম্পর্কে কবির একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> ভগবানকে কন্যারূপে আর কোনো জাতি ভজন করে নি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে। বাৎসল্য একটা আকার, যে বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শুধু দাম্পত্য প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, মানে সৃষ্টি হতো, কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্যন্তই থাকতো— পালন আর হতো না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হতো। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার— এই তিনটি অবস্থার (stage) মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে করে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করবো।[১৮]

'শাক্ত পদাবলী'র আগমনী ও বিজয়া অংশটিকেই রজনীকান্ত তাঁর 'আনন্দময়ী' কাব্যে রূপ দিয়েছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ কবি একদা এই গানে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলেছিলেন। কন্যা উমাকে অবলম্বন করে মাতা মেনকার উদ্বেগ-ব্যাকুলতা-অভিমান ও আনন্দ-বেদনা বাংলাসাহিত্যের এক পরম সম্পদ। কান্তকবি সেই প্রাচীন কবিকথাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। শুধু অনুভব করাই নয়, ভাব ও অনেক সময় ভাষাকে পর্যন্তও যেন আত্মসাৎ করেছেন। ভক্তকবির সুগভীর অনুভূতিতে ও আন্তরিকতায় প্রাচীন কবিকথাও 'নূতন সৃষ্টি' হয়ে উঠেছে। দশমীর প্রভাতে কন্যা-জামাতাকে বিদায় দেওয়ার পর 'রাণীর খেদ' করুণ ও মর্মস্পর্শী—

> যদি কেঁদে কেঁদে এমন হয়, তারা,
> আমি নয়ন-তারা-হারা হয়ে
> হারাই যদি নয়ন-তারা ;
>
> —রাণীর খেদ, 'আনন্দময়ী'

এই সংগীতাংশের বাগ্‌বিন্যাস রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ পদকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

> এমন দিন কি হবে তারা।
> যবে তারা তারা তারা বলে,
> তারা বয়ে পড়বে ধারা।

আবার—

> এই বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, ভিক্ষা করেন তিনি,
> চিন্তা করে কিছু বোঝ, মা এর ভাব ?
>
> — গৌরীর প্রত্যুত্তর ২, 'আনন্দময়ী'

---

১৮ হাসপাতালের রোজনামচা, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থের পৃ ২২৬-২২৭ থেকে উদ্ধৃত।

উদ্ধৃত অংশটি যেন ভারতচন্দ্রের একটি সুবিখ্যাত পংক্তির প্রতিধ্বনি—

অন্নপূর্ণা যার ঘরে।
সে কাঁদে অন্নের তরে।
এ বড় মায়ার পরমাদ।

বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে এইভাবে একালের কবি সংযোগ রক্ষা করেছেন।

৬

ভক্তিমূলক গানেই কান্তকবির চরম সিদ্ধি। তাঁর কবিজীবনের গতিপ্রকৃতিও এই সুরেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাঁর জীবনবিধাতা এই সুরেরই স্বর্ণসূত্রে একটি অখণ্ড মালা রচনা করেছে। হাসির গান, স্বদেশপ্রেমের গান, নীতিমূলক কবিতা সর্বত্রই এই সুরটি প্রবাহিত— কখনো পুরোভাগে, আবার কখনো বা নেপথ্য সংগীতরূপে। বাংলাসাহিত্যে ভক্তিমূলক গানের যে ঐতিহ্যধারা, তার বৈভব ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। বৈষ্ণব গীতিকবিতায়, শাক্ত-পদাবলীতে, বাউল গানে, নানা সাধন সংগীতে তা বিচিত্রধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধক কবিরা এই ভক্তি সাধনার ধারাটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশের ভক্তিসাধনা ধারার গভীর প্রভাব ছাড়াও বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে রজনীকান্ত এই রসের রসিক হয়েছিলেন। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ ছিলেন একজন ভক্তকবি। তাঁর 'পদচিন্তামণিমালা' কাব্য ব্রজবুলির ঢঙে লেখা প্রায় সাড়ে চারশো পদের সমষ্টি।

কান্তকবির কাব্যজীবনের প্রথম থেকেই ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অতৃপ্তি, অনুশোচনা ও পাপবোধ থেকেই এর সূত্রপাত—

ধরে তোল, কোথা আছ কে আমার !
এ কি বিভীষিকাময় অন্ধকার !
—আশা, 'বাণী'

আবার বলেছেন—

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী-তাপী, এত আশা করে রয় ?
—পাতকী, 'কল্যাণী'

এর পরেই জেগেছে ব্যাকুলতা। কবি তাঁর একটি বিখ্যাত গানে বলেছেন—

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে প্রভু,
দেখাও তব-চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভালো, কেবল সুখ-আলো,
এপারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক !
—মুক্তিকামনা, 'বাণী'

প্রেমানন্দে কবির অন্তর পুলকাকুল, তাই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে—

যেদিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন-বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;

কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়,
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়
সুন্দর, তব সুন্দর সব
যে দিকে ফিরাই আঁখি!

—প্রেমারঞ্জন, 'বাণী'

কবির দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে যে 'বধির যবনিকা' ছিল তা ক্রমশঃ সরে যায়; অনুভূতি গাঢ় হয়, চিরসুন্দরের রূপজ্যোতিতে বিশ্বপ্রকৃতি 'নন্দন-প্রভাময়' হয়ে ওঠে—

তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময়;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!

—তুমি মূল, 'কল্যাণী'

কান্তকবির ভক্তিমূলক গানের চরম পরিণতি আত্মনিবেদনে। পুত্রের মৃত্যুর পর শোকাহত কবির আত্মনিবেদন একটি বহুশ্রুত সংগীতে ঝংকৃত হয়েছে—

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।

—তোমারি, 'বাণী'

কবি প্রেমরসে বিগলিত হয়ে তাঁর 'পরম দৈবত'-এর সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছেন নিজের জন্য কিছু না রেখে— 'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে'। বিশ্ব-বিধানের বিশালত্ব ও রহস্যময়তার উপলব্ধি রজনীকান্তের অনেকগুলি ভক্তিসংগীতের প্রাণ। বুদ্ধির আলো জেলে তাকে বোঝা যায় না, বৈজ্ঞানিক তাঁর হেতু নির্ণয়ে অসমর্থ। কবি তাই বৈজ্ঞানিককে চ্যালেঞ্জ করেছেন—

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে;
দেখবো সে কেমন উপাধি নিলে,
ক'টা 'কেন'-র জবাব শিখে।

—নিরুত্তর, 'বাণী'

আর-একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
শাস্ত্র যুক্তি করিবে কি তোমার রহস্য ভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারে নি প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

—রহস্যময়, 'কল্যাণী'

'সৃষ্টির বিশালতা' ও 'সৃষ্টির সূক্ষ্মতা' ('অভয়া') কবিতা দুটিতে বিশ্বরহস্যের দুরধিগম্যতার উপলব্ধির সঙ্গে সেই সর্বশক্তিমানের প্রতি কবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ অনুভূতি ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে ধারণা যুক্ত হয়েছে।

কান্তকবির কাব্যজীবনের সবচেয়ে গৌরবান্বিত অধ্যায় হলো তাঁর জীবনের শেষ আটমাসের সাহিত্য সাধনা। কবি তখন রোগক্ষত, জীর্ণদেহ, মৃত্যুবরণের প্রস্তুতিতে প্রশান্ত। কথাটা প্যারাডক্সের মতো শোনালেও তাঁর জীবনে এর চেয়ে বড়ো সত্য আর হতে পারে না। আসন্ন মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে যখন তিনি 'যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য' সমস্তই 'দয়াল'-এর কাছে সমর্পণ করেছেন, সেই সময়েই জীবন-বিধাতা তাঁর কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ বরমাল্য অর্পণ করেছেন। শুধু জীবন সম্পর্কেই নয়, কবির কাব্য সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। এই সময়ে রচিত কবিতা ও 'হাসপাতালের রোজনামচা' আন্তরিকতায় ও ভাব-গভীরতায় বাংলাসাহিত্যের সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে।

কান্তকবির ভক্তিবিহ্বল আত্মনিবেদনের সুর আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে নূতনভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। এ সুর যে কত অকৃত্রিম, আন্তরিক ও উপলব্ধি-লব্ধ তা প্রমাণিত হয়েছে। মনে হয় জীবনের প্রথম থেকেই এ প্রস্তুতি চলেছিল, অনুকূল পরিবেশে তাঁর আশা পূর্ণ হলো। 'রোজনামচা'য় তিনি বলেছেন—

> সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার হলেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেলতে পারে? তাই এই শাস্তি, এই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়লা মাটি আঘাতের চোটে পড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিসটি হব; তখন আমাকে কোলে নেবে। আর মৃত্যুর পর অত বেত মারলে সেখানে তো সেবা-শুশ্রূষার লোক নেই, সেইজন্য এইখানে স্ত্রী-পুত্রের সামনে মারছে যে, কাজও হয়, একটু কষ্টেরও লাঘব হয়। দেখছ দয়া? দেখছ প্রেম? চন্দ্রময়! আমি রাত্রিতে ঘুমাই না, বেশ থাকি, বড় ভাল থাকি। আমি যেন তাকে রাত্রিতে ধরতে পারি— এমনি অবস্থা হয়। আমাকে বড় কষ্টের সময় বড় দয়া করে। আমি এখন বেশ সহ্য করতে পারি। খুব acute painএও আমার কষ্ট হয় না।[১৯]

মৃত্যুপথযাত্রী কবির সংগীতাগুলি মৃত্যুবরণের স্থির প্রস্তুতিতে, অকৃত্রিম ভগবদ্‌বিশ্বাসে ও বিগলিত আত্মনিবেদনে মহিমান্বিত। হাসপাতালে লেখা কবিতাগুলি কবির কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি, তাঁর জীবন-বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান। অকৃত্রিম ভগবদ্‌বিশ্বাসই তাঁকে রোগযন্ত্রণা অতিক্রম করার ক্ষমতা দিয়েছিল। তাই এই সময়ের কবিতাগুলির উপরে মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়া পড়েনি, বরং এক জ্যোতির্লোকের আশ্বাসে তাঁর মন ভরে উঠেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে—

১.
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে—
গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছে দূর।

—দয়ার বিচার, 'শেষদান'

২.
আমি রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?
'ওগো খুলে দাও', বলে আর কত পায়ে ধরিব?

—রুদ্ধ দুয়ার, 'শেষদান'

১৯ হাসপাতালের রোজনাম্চা। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রচিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থের ১৯১-১৯২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

৩. তাই, আনন্দে চলেছি, ভাই রে, কিসের মরণ ভয় ?
ওগো, মা আমার আনন্দময়ী, পিতা চিরানন্দময় ?

—চিরানন্দ, 'শেষদান'

৪. দেখ, কেমন তার ভালবাসা
মিটায় আনন্দ-পিপাসা,
আগে, না পোড়ালে খাদ রয়ে যায়,—
সে আনন্দ পাবে কেমনে ?

—দয়াল আমার, 'শেষদান'

৫. আমার দয়াল অই বসে আছে নিরজনে।
আমারে দিও না বাধা, ভেসে যাই একমনে।[২০]

—শেষদান, 'শেষদান'

মৃত্যুর প্রায় দেড়মাস আগে (১৬ আষাঢ় ১৩১৭) রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তকে চিঠি লিখেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত চিঠিতেই কান্তকবির কাব্যপরিচয় ও কবিমানসের স্বরূপধর্ম চিরকালের জন্য নির্ণীত হয়েছে। চিঠিখানিকে রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা বললে অত্যুক্তি হবে না। কবি লিখেছেন—

> সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই— কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই— পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো তত বেশি করিয়া জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য ![২১]

রজনীকান্তের কাছে মৃত্যুও শোভন সুন্দর হয়ে উঠেছে, কারণ সে তাঁর দয়ালের কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদনা ও মৃত্যুকে জয় করার বলিষ্ঠ প্রত্যয় তাঁকে করেছে এক জ্যোতির্লোকের অভিযাত্রী। অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই তাঁর ললাটে পরিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় মহিমার অক্ষয়-তিলক—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে, তাপিত এ চিত করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

—কবে ? 'কল্যাণী'

২০ এই অংশটি কান্তকবি-রচিত শেষ কবিতার সর্বশেষ দুই পংক্তি।

২১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত রচিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ ২৩৪-২৩৫।

৭

কান্তকবির মৃত্যুর পর একজন সমালোচক তাঁকে বলেছেন—'রাজশাহীর ডি. এল. রায়।'[২২] কবির জীবনীলেখকও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে উভয় কবির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[২৩] এই আলোচনার এক জায়গায় তিনি পূর্বোক্ত সমালোচকের প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গে বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ বাংলার শেলী, মধুসূদন বাংলার মিল্টন প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক পরিচয়ের ন্যায় রজনীকান্ত রাজশাহীর ডি. এল. রায় অবিবেচকের উক্তি।'[২৪] অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে তাঁর সপক্ষে কোনো সুচিন্তিত যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন নি। পরবর্তীকালের সমালোচকেরা কেউই এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেন নি।

কান্তকবির চরিতকার বলেছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন আবগারী বিভাগের পরিদর্শকরূপে রাজশাহীতে আসেন, সেই সময়ে তাঁর হাসির গান শুনে রজনীকান্ত হাসির গান লিখতে থাকেন। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে হাস্যরসের অভাব নেই। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রঙ্গ-ব্যঙ্গের বিচিত্র কবিতা রচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' (১৮ জুলাই ১৯০০) বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তা ছাড়া আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। 'হাসির গান' হাসির গানই, শুধু হাস্যরসাত্মক কবিতাই নয়—এতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাও আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশিষ্ট প্রতিভার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী রজনীকান্ত। 'পুরোহিত' 'দেওয়ানি হাকিম' 'ডেপুটি' 'উকীল' (কল্যাণী), 'মোক্তার' (অভয়া)—এই পাঁচটি গানই দ্বিজেন্দ্রসংগীতের অনুসরণে রচিত। কান্তকবি স্বয়ং গানগুলির সুর নির্দেশ করার সময় লিখেছেন—"সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।'—D. L. Roy." স্পষ্টতঃ নির্দেশ না থাকলেও 'জমিদার' (শেষদান) গানখানিতেও কান্তকবি তাঁর অগ্রজ কবির পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ গানটির অনুসরণ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই কান্তকবি ইংরেজি-বাংলামিশ্রিত কাব্যরীতি প্রয়োগের দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে সরস ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপকরণগুলিকেই কান্তকবি স্বতন্ত্র ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কান্তকবির 'পুরাতত্ত্ববিদ্‌' (কল্যাণী) কবিতাটির প্রেরণামূলে আছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'তানসেন-বিক্রমাদিত্য সংবাদ' জাতীয় কবিতার প্রভাব। পুরাতত্ত্ববিদদের উৎকট গবেষণা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২৫] কান্তকবির 'তামাক' (কল্যাণী) কবিতাটিতে লঘুভঙ্গিতে তামাকের প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে। নেশার মৌতাত নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক হাসির গান লিখেছেন। 'চা' 'ভাঙ্‌' 'সুরা' প্রভৃতি গানে তিনি নেশা নিয়ে নানা রসিকতা করেছেন। কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের বিষয়বৈচিত্র্যের অধিকারী না হলেও অগ্রজ কবির মনোভঙ্গী ও সুরকে যথার্থ অনুসরণ করেছেন। রজনীকান্তের 'ঔদরিক' (কল্যাণী) গানখানি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ'

২২ কবি রজনীকান্ত: রমণীমোহন ঘোষ। আর্যাবর্ত, কার্তিক ১৩১৭, পৃ ৪৬৬।

২৩ কান্তকবি রজনীকান্ত: নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃ ৫৭-৬১, ২৭৫-২৮০।

২৪ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৮০

২৫. বক্তৃতার নমুনা (প্রত্নতত্ত্ব), চিন্তা ও কল্পনা।

গানটির পরিবর্ধিত সংস্করণমাত্র—দ্বিজেন্দ্রলাল যা স্বল্পভাষণে ইঙ্গিত দিয়েছেন, কান্তকবি তাই বিচিত্র 'আখর' সহযোগে পল্লবিত করেছেন। এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষীররূপী 'ভারত-জলধি'-ই কান্তকবির কবিতায় 'ক্ষীর-সরসী'তে পরিণত হয়েছে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ময়রা-দোকানে মাছি' হতে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু তাঁর কবিশিষ্যটি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে 'ক্ষীর-সরোবর ঘন-জলে' গামছা পরে নামতে চেয়েছেন! গুরু-শিষ্যে এইটুকু যা পার্থক্য![২৬]

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' (ডিসেম্বর ১৮৯৯) কাব্যের আদর্শে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ পর্যন্ত তার কোনো আলোচনা হয়নি, শুধু হাসির গানের প্রভাব সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। 'আষাঢ়ে' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম বিদ্রূপাত্মক কাব্য। এই কাব্যে কয়েকটি হাসির গল্প সংকলিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস এখানে পার্বত্য নদীর মতো খরস্রোতা। গল্পগুলির প্রত্যেকটিতে এক-একটি প্রবল 'হাস্যজনক অসংগতি' আছে—সেই অসংগতিই হাস্যরসকে জমিয়ে তুলেছে। 'মিউনিসিপাল্ ইলেক্‌সন' 'আমাদের দেশ' (বিশ্রাম) কবিতা দুটি ভাব ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' কাব্যের কবিতাগুলির আদর্শেই রচিত। 'মিউনিসিপাল ইলেক্‌সন' কবিতার নায়ক 'কালীপ্রসাদ দত্ত, ভারি বিচক্ষণ এম্. এ' মিউনিসিপাল ইলেকসনে দাঁড়িয়েছেন, ক্যানভাস করছেন। করিম বক্স হাজীর বাড়ি ক্যানভাস করতে গেলেন, আর তাঁর হাতে জলখাবারের জন্য দশমুদ্রা দিলেন এবং '(হাজী) হাস্যমুখে চাক্তি ক'টি নিলেন হাত পেতে'। এদিকে সভায় সকলেই বললেন যে, 'হাজী সাহেবকে চাই। দত্তপুত্রের নামগন্ধ কারও মুখে নাই।' দত্তজার মুখে চুনকালি পড়ল। কান্তকবি ক্যানভাস-রত কালীপ্রসাদের কৌতুককর চিত্র এঁকেছেন—

বপুখানি চৌহারা, (আর) জবরজঙ্গ চেহারা,
ছুটতে ছুটতে কাপড় গেছে নাভির নীচে নেমে।
কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ফুলে,
হাঁপ ছাড়বার অবকাশ নেই একটুখানি থেমে।

আর দ্বিজেন্দ্রলাল কেরানি জীবনের দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন—

চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে;
মাংসও গেল ঝুঁলে; সুঠাম শরীর গেল বেঁকে;
দাঁতও হ'ল জীর্ণ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে;
চিবুক গেল উঠে;—এবং নাক গেল নেমে।

—কেরানি, 'আষাঢ়ে'

'আমাদের দেশ' কবিতায় রজনীকান্ত কাপুরুষের বাগাড়ম্বর, স্মৃতির পণ্ডিতদের বৃথা তর্ক ও নিবারণচন্দ্র মাইতি 'এম. এ, বি-এল. এ ডবল এস' উপাধিধারীর 'public speech'-এর কৌতুককর চিত্র এঁকেছেন।

২৬. দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন যে, কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'গুরুদেব' বলে ডাকতেন (দ্রষ্টব্য ৪১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা; দ্বিজেন্দ্রলাল, ২য় সং, ১৩২৮)

বলা বাহুল্য 'কল্কি অবতার' (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রহসনে ও 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' (আষাঢ়ে) কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ জাতীয় চরিত্রের আরো বিস্তৃততর চিত্র এঁকেছেন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের মিশ্র উচ্চারণ রীতি, সাধু ও কথ্যভাষার বিচিত্র সংমিশ্রণ, প্রবহমান পংক্তিবন্ধ প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রতিভার পরিচয় দেয়। কান্তকবি তাঁর অগ্রজ কবির মতো বিচিত্র সৃষ্টির অধিকারী না হলেও তাঁর পন্থানুসরণের চেষ্টা করেছেন।[২৭]

মাত্র হাসির গানেই রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু উভয় কবির মনোজীবন ও কবিমানসের পার্থক্য কম নয়। হাস্যরস দ্বিজেন্দ্র-কবিজীবনের অন্যতম মূল প্রবাহ, অপরপক্ষে এই রস রজনীকান্তের কবিজীবনের একটি শাখামাত্র— আসলে তিনি ছিলেন ভক্ত কবি, ভক্তিরসধারাই তাঁর কাব্যের মূল প্রবাহ। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁর বিপরীত কোটির কবি— যুক্তিবাদী, তার্কিক ও সংশয়বাদী। কান্তকবির কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁর কোনো কোনো ভক্তিসংগীতে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত ও আধ্যাত্মিক রসের কবিতা ও গানের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাছাড়া 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলিরও কিছু প্রভাব কান্তকবির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রজনীকান্তের নিকটতম প্রতিবেশী হলেন রামপ্রসাদ। তাঁর বহু প্রসিদ্ধ ভক্তিমূলক গানগুলি রামপ্রসাদের গানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রামপ্রসাদ যেমন তৎকালীন সমাজ জীবনের বহু উপকরণকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কান্তকবিও তেমনি তাঁর নিজের কালের দৈনন্দিন জীবনের বহু বিষয়কে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মনে হয় সেই অষ্টাদশ শতকের সাধক কবির কণ্ঠই দেড়শো বছর পরে নূতন ভাষায়, নূতন ভঙ্গিতে ভক্তি-ব্যাকুলতায় করুণ-মধুর হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছর কালের বাংলা কাব্যের ইতিহাস রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপক প্রভাবের ইতিহাস। এই যুগের কোনো কোনো কবির রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রভাবও লক্ষণীয়। দ্বিজেন্দ্রকাব্যের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকরস ও ভাষা-ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি-নীতির অস্বীকৃতি তৎকালীন অনেক কবিযশঃপ্রার্থীকে উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালকেও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন শব্দার্থবাদী, তাই রবীন্দ্রকাব্যের আলোছায়া-সংকেত ও পদলালিত্য তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি। (অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের উপরেও যে রবীন্দ্রপ্রভাব পড়েনি, এমন কথা বলা যায় না। তবে সে প্রভাব উত্তর মেরুর উপরে দক্ষিণ মেরুর প্রভাবের মতো)। রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যেও কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল— দুই কবির প্রভাবকে যুগপৎ আত্মসাৎ করে সেকালের কোনো কোনো কবি বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি রজনীকান্ত সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। তাঁর হাসির গানগুলিতে মূলত দ্বিজেন্দ্রপ্রভাবই পড়েছে, কিন্তু স্বদেশী সংগীতগুলিতে তেমন পড়েনি, কারণ সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবের চেয়েও রবীন্দ্রপ্রভাব অধিকতর সক্রিয়। আসল কথা কান্তকবির গীতিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—উভয় কবিরই কাব্যপ্রভাবে লালিত হয়েছে। আর সবার উপরে আছে প্রসাদী সংগীতের গূঢ় প্রভাব।

---

২৭. এই প্রসঙ্গে অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের 'কলিযজ্ঞ' (আষাঢ়ে) কবিতার সঙ্গে ঐ ছন্দেই লেখা কান্তকবির 'সরকারী ওকালতীর আকর্ষণ' (বিশ্রাম) লক্ষণীয়।

রজনীকান্তের গান

সুধীর চক্রবর্তী

রজনীকান্তের গান সম্পর্কে বাঙালির ধারণা এমন সুনির্দিষ্ট ও অসংশয়ী যে দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর শিল্পীমানসের পুনর্বিচার প্রয়োজন হয় নি। অর্থাৎ, তাঁর গান ভক্তিবিনম্র, শুদ্ধশ্রীশান্ত এবং স্বদেশ সংরাগে স্বতোচ্ছল—মোটামুটি এই কথাগুলি বাংলাদেশে এমন সহজ স্বীকৃত যে, রজনীকান্ত সম্পর্কে আমরা নতুন-কোনো-খবরে অনাগ্রহী এবং তাঁর গীতপ্রচারে নিরাবেগ। রজনীকান্ত জীবিতকালে জনপ্রিয়, যশস্বী ও কৃতার্থ ছিলেন। সময়ের অসূয়া বা সমকালীনদের ঈর্ষিত নিন্দা তাঁকে কোনোদিন শিরোধার্য করতে হয় নি, যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। সেইজন্যই রবীন্দ্রশিল্পের মতো তাঁর রচনাকে নিন্দা ও অনীহার পঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'রে সত্যমূল্যে যাচাই করতে হয় নি। বরং অনায়াসে নির্বিবেকে আমরা রজনীকান্তের গানকে শুদ্ধতার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে সেগুলির নিশ্চিন্ত স্থান নির্দেশ করেছি সশ্রদ্ধ নির্বাসন মহিমায়। তাঁর গান আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে পুনর্জন্ম পায় নি, তাঁর ভাবসাধনা আধুনিক বাংলা গানের ভাববৃত্তে তরঙ্গ তোলে নি।

আধুনিককালের বাংলাগানের যাঁরা সংগঠক ব'লে শ্রদ্ধেয় সেই রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) মাত্র দশ বছরের পরিধিতে জন্মেছিলেন। এঁদের মধ্যে রজনীকান্ত ছিলেন সবচেয়ে স্বল্পায়ু। তাছাড়া এই চারজন সংগীতজ্ঞের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিলাত যান নি এবং য়ুরোপীয় সংগীতের স্বরসার গানে প্রয়োগ করেন নি। তাছাড়া একমাত্র তিনিই সংগীত সাধনার সূচনা ও সিদ্ধিকালে মফস্বলবাসী ছিলেন। সেইজন্য তাঁর গানে কলিকাতাকেন্দ্রিক নাগরিকতার বদলে চিরায়ত বাংলাগানের একমুখী সারল্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রসঙ্গে সুদীর্ঘজীবনের নিয়তনিরীক্ষা, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাট্য-সংগ্রাম এবং অতুলপ্রসাদের গানে লক্ষ্ণৌ-ঘরানার সূক্ষ্মতার সঙ্গে তুলনা করলে রজনীকান্তের সংগীত-প্রতিবেশকে গ্রামীণ বলতেই হয়। প্রথমে পাবনার গ্রামে এবং পরে রাজশাহীতে তিনি গানের চর্চা করেন। পুরোদস্তুর গীতচর্চা তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। শৈশবে পিতার কাছে প্রাথমিক গীতদীক্ষার পরে, উত্তীর্ণ কৈশোরে সহচর তারকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে যৎসামান্য তালিম নেন। যৎসামান্য, কেননা, এইসময়ে তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ এবং তারকেশ্বরের আঠারো। তারকেশ্বর চক্রবর্তী প্রসঙ্গত লিখেছেন, 'আমিও তখন সংগীত বিষয়ে কোনো শিক্ষালাভ করি নাই—শুনিয়া শুনিয়া যাহা শিখিতাম, তাহাই গাহিতাম। বৎসরের মধ্যে যে নূতন সুর বা নূতন গান শিখিতাম, রজনীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র, তাহা তাহাকে শুনাইতাম, সেও তাহা শিখিত।··· সে এমন কূট প্রশ্ন করিত যে, আমার অল্পবিদ্যায় কিছু কুলাইত না।'

সুতরাং সংগীতের বিচিত্র উদার জগৎ রজনীকান্তের সংগীতসাধনার সূচনায় সুযোগ্য গীতগুরুর দ্বারা অনর্গলিত হয় নি, যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিষ্ণু বা যদুভট্টর সহযোগে কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃসান্নিধ্যে। রজনীকান্তকে তাই মূলত নির্ভর করতে হয়েছিল স্বমহিম প্রতিভা ও আবহমান বাংলাগানের ঐতিহ্যের উপর। পরবর্তীকালেও তাঁর গীতসাধনা বৈচিত্র্যস্পর্শ বিশেষ পায় নি; তার কারণ প্রধানত মফস্বলবাস

এবং গৌণত সংগীতকে অন্য শিল্পে প্রয়োগ না-করার প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল যদি তাঁদের সংগীতকে নাট্যসংসর্গে না আনতেন তবে তাঁদের সংগীতসম্ভার কতদূর বৈচিত্র্যপূর্ণ হত বলা যায় না। যাই হোক, রজনীকান্ত তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যসম্পাদন করেছেন দু ভাবে। প্রথমত, গানের ক্ষেত্রে সুর ও ফর্মের বৈচিত্র্য বাদ দিয়ে গানের বাণীতে বিষয়গাম্ভীর্য এনে এবং দ্বিতীয়ত, তৎকালীন প্রচলিত নানাসুরে গানের বাণী যোজনা ক'রে।

সুরের দিক থেকে রজনীকান্তের গানে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গীতরূপায়ণে তিনি সুরের বৈচিত্র্যের চেয়ে আন্তরিকতাতে প্রাধান্য দিয়েছেন; সেইজন্য একটি রাগাশ্রিত সুরকে সরলভাবে নির্ধারিত করেছেন। সুরের তীব্র সচকিত ওঠা-নামা, রাগমিশ্রণের চমৎকার নিরীক্ষা, তালফেরের নতুনত্ব বা আড়-ছন্দে সুর বুননের প্রয়াস তিনি বিশেষ করেন নি। গানের সরল অনাহত একমুখী আবেগকে তিনি একক একটি রাগ বা রাগিণীতে মূর্ত করেছেন, যাতে Improvisationএর সুযোগ প্রচুর। তাছাড়া, বাংলাগানে সুরের বৈচিত্র্য সম্পাদনের অন্যতম উপাদান 'সঞ্চারী'-অংশ তাঁর গানে প্রায়শ নেই। গানের তাল সৃষ্টিতেও তিনি অকারণ ঔৎসুক্য দেখান নি। এমনকি, একমাত্র তাঁর গানে চিরায়ত বাংলাগানের স্বভাবানুসারে কখনও কখনও 'ভণিতা' পাওয়া যায়। এসব উদাহরণ থেকে সহজেই নিষ্পন্ন হয় যে, রজনীকান্ত তাঁর গানকে সুরের চেয়ে ভাবের প্রকাশক বলেই মানতেন এবং তাঁর গান সব অর্থেই বাংলা ও বাঙালির গান।

গানকে তিনি ভাবের প্রকাশক ব'লে মানতেন বলেই, বোধহয়, তাঁর গানগুলি কবিতাপ্রতিম। সে কবিতা অবশ্য সমসময়ে লিরিকাল নয়, বহুশই মেটাফিজিকাল। যেমন:

তুমি সর্ব-শকতি মূল হে,
তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে!
যে যাহার কাজ নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ!
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায় তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।

যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে;
এই, পাঁচ ভেঙে, দশ রকম হচ্ছে, মিশছে পাঁচে;

প্রশ্ন ওঠে, যতিচিহ্নকণ্টকিত, যুক্তিনির্ভর, সমাসবদ্ধ এই কি গানের ভাষা? পরমুহূর্তেই মনে হয়, ভাবের উজানেই এমন ভাষার উৎসার। আর-একটি তথ্য স্মরণীয়। রজনীকান্ত যে তারকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছে সংগীতশিক্ষা করেছিলেন, তাঁর কাছেই শিখেছিলেন সংস্কৃত ভাষা। পরবর্তীকালে হয়তো সেইজন্য তাঁর শিল্পীমানসে সংগীত ও সংস্কৃতভাষার একাত্মক কোনো সংস্কার সক্রিয় ছিল। অথচ এই সংস্কৃতপ্রবণতা তাঁর গীতিপ্রবণতায় একটা সমারূঢ় দুর্বলতা বলে মনে হয়, যখন দেখি, বাংলার লৌকিক ভাষায় তাঁর ছিল সহজ অধিকার। যেমন:

যখন, গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে বল্‌তে বিঘত মাটি, প্রহর বল্‌তে পল,
এখন যষ্টি বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।
যখন, বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই দু'শ রগড়, জম্‌তে লাগ্‌ল রস।
জল্‌দি গজায় গোঁফদাড়ী, তাই খেউরি স্বরু ক্ষুরে।

কিংবা আর-একটি গান, যেটি পুত্রের মৃত্যুর পরদিন সহজ অনুভূতি থেকে লিখেছিলেন—

তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।
তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে-নেওয়া
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ-চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।

বাংলাদেশের চিরপ্রবহমান গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে এই গানের মিল আছে। কিন্তু রজনীকান্ত তাঁর সৃষ্টিশক্তির এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাঁর এই জাতীয় গানের অনতিস্ফুট সম্ভাবনা প্রসঙ্গে খেদোক্তি ক'রে তাঁর ভাষাতেই বলতে পারি : 'ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে'।

আগে উল্লেখ করেছি, রজনীকান্ত তাঁর সমকালে প্রচলিত অনেক গানের সুরে বাণীবয়ন ক'রে বেশ ভালো গান লিখেছেন। প্রচলিত গানগুলির মধ্যে দাশরথি রায়ের রচনা থেকে আরম্ভ ক'রে তখনকার যাত্রা-থিয়েটারের নিরুপাধি লেখকের গান পর্যন্ত আছে। এ বিষয়ে আমরা যে-তালিকা প্রণয়ন করেছি আপাতত সেদিকে লক্ষ করা যাক।

মূল সুর	রজনীকান্তের রচনার প্রথম পংক্তি
স্মরগরল খণ্ডনং[১]	আজি শিথিল সব ইন্দ্রিয়
মাতঃ শৈলসুতা	ভারি সুনাম করেছ
রে গঙ্গামাঈ প্রাতে দরশন দে	রে তাঁতীভাই
মধুর! সে মুখখানি	পাদপূরণ
তোর নাম রেখেছি হরিবোলা	ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখি	কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ
হেলে দুলে নেচে চল গোষ্ঠবিহারী	কতভাবে বিরাজিছ
পাখি ঐ তো গাহিলি গাছে	ওমা, এই যে নিয়েছ
তুমি গতি তুমি সার	বেলা যে ফুরায়ে যায়
সোনার কমল ভাসালে জলে	যদি পার হ'তে তোর

১ মূল রচনা : জয়দেব

বাঁশের দোলাতে উঠে	যে পথে মরা ছেলে
নিপট কপট তুঁহু শ্যাম	সাঁঝে একি হরষ তিমিরনাশিনী মা আমার
সদা দয়াল দয়াল ব'লে ভেবে মরি কী সম্বন্ধ তোমার সনে	এমন সোনার বাংলা দুটো একটা নয় রে
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে	জ্ঞানশ্রেষ্ঠ জ্ঞানসেব্য ঐ অভ্রভেদী ধবলশৃঙ্গে
গিরি গৌরী আমার এসেছিল[২]	তখন ব্যাখ্যা করল নারদ সেথা সর্বসত্তা বিদ্যমান
তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না[৩]	আমি সকল কাজের পাই হে সময়
ঐ ভৈরবে বাজিছে বিকট ভয়াবহ[৩]	মধু মঙ্গল গোধূলি
কেন বঞ্চিত হব চরণে[৩]	তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে[৪]	শুনাও তোমার অমৃতবাণী
তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে[৪]	ভীতিসঙ্কুল এ ভবে
উঠ গো ভারতলক্ষ্মী[৫]	আকুল কাতরকণ্ঠে

এই তালিকা অনুধাবন করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মতো গান-ভাঙার প্রবণতা রজনীকান্তেরও ছিল। তবে তিনি সংস্কৃত স্তোত্রসুর, হিন্দি ভজন, যাত্রা-থিয়েটারের গান এমন কি অনুজ গীতকারের (অতুলপ্রসাদ) গান ভেঙেও গান রচনা করেছেন। তাতে তাঁর গানে সুরগত বৈচিত্র্য এসেছে। যেমন, অতুলপ্রসাদের সুরে লেখা গান 'আকুল কাতরকণ্ঠে' মূল সুরের অভিজনতায় তাঁর গানে য়ুরোপীয় সুরসুষমা সঞ্চারিত করেছে। সমকালীন যাত্রা-থিয়েটারের সুরে গান রচনা ক'রে রজনীকান্ত যে অনন্যতা দেখিয়েছেন তা তাঁর সমকালীন গীতকারদের মধ্যে দুর্লভ।

বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চার বছরের ছোট ছিলেন রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে দু বছরের। অথচ তাঁর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব ছিল খুব বেশি, রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল ক্ষীণ। এর অন্যতম কারণ হল, তখনকার কালে নাটক ও হাসির গানের সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলালই অধিকতর প্রচারিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। আর নিন্দা-ঈর্ষার সুদীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন অধ্যাত্ম সাধনার প্রান্তে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বের গান লিখতে শুরু করেছেন তখন রজনীকান্ত মর্তমায়া কাটিয়েছেন। রজনীকান্ত তাঁর যৌবনে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন, মৃত্যুর আগে, 'কণিকা'র নীতিকবিতার আদর্শে অনেকগুলি কবিতা

২ মূল রচনা ও সুর : দাশরথি রায়
৩ মূল রচনা ও সুর : রজনীকান্ত সেন
৪ মূল রচনা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫ মূল রচনা ও সুর : অতুলপ্রসাদ সেন

লিখেছিলেন এবং মাত্র দুইটি রবীন্দ্রসংগীতের সুরে বাণীবয়ন করেছিলেন। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সংসর্গ তিনি পান নি। যদিও গীতাঞ্জলি-যুগের আগে রবীন্দ্রনাথের রবিচ্ছায়া-পর্যায়ের সার্থক গানগুলি বা নাট্যসংগীতগুলি রচিত হয়েছিল তবু সেগুলির রূপায়ণ ও প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রানুরাগী মহলেই। পাবনার গ্রামে বা রাজশাহীতে রবীন্দ্রসংগীতের পরাক্রান্ত পদসঞ্চার সে কালে অকল্পনীয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের বহুপ্রার্থিত সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯১০ সালে, শেষোক্তের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল ১৮৯৫ সালে। দ্বিজেন্দ্রলাল সেইসময় রাজশাহীতে আবগারী পরিদর্শকরূপে গিয়েছিলেন। সে যুগের স্বতঃসিদ্ধ প্রবণতা অনুসারে রজনীকান্তও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের প্রভাবে আত্মহারা হন এবং বহু হাসির গান রচনা করেন। তাঁর জীবিতকালের জনপ্রিয়তার সেইটাই মূল কারণ।

রজনীকান্তের গান ভক্তি-স্বদেশ-হাস্যরস এই ত্রিধাবিভক্ত স্রোতোধারায় উৎসারিত, সকলেই এ কথা মানেন।

রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ পরিচয় উন্মীলিত হয়েছে ঈশ্বরবন্দনায় উদ্বেলিত গানগুলিতে। তত্ত্বাবরণ ও দেহদর্শন বর্জিত সরল বিশ্বাসের অনেক গান তিনি লিখেছিলেন। 'তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে' 'কবে তৃষিত এ-মরু', 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' বা 'কেউ নয়ন মেলে দেখে আলো' প্রভৃতি গানের পরম বিশ্বাসী উচ্চারণ বাঙালি এককালে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে ভক্তির চেয়ে অবিশ্বাস, আত্ম-অর্পণের চেয়ে সংশয় প্রবলতর, সেইজন্য হয়তো রজনীকান্ত উপেক্ষিত।

রজনীকান্ত-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

সুশীল রায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ হয় কয়েক বার, পত্রবিনিময় হয় সম্ভবত একবার। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্যোগে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে শান্তিনিকেতনে। রজনীকান্তের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত কবি-সংবর্ধনায় প্রদত্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষণ[১] থেকে প্রথম-সাক্ষাৎকারের কথা এবং অন্যান্য অনেক তথ্য জানা যায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেছেন, এর "অল্পকাল পূর্বে সোনার তরী বাহির হইয়াছিল"— সোনার তরী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে)। এই সাক্ষাৎ ১৯০১ সালে হওয়া সম্ভব। এর কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় রজনীকান্তের 'বাণী' গ্রন্থ (১৯০২)। এর পরে কলকাতার অ্যালবার্ট হলের এক সভায় "রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের পরে রজনীর সংগীত" হয়, ঐ সময়ে তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব। তৃতীয় সাক্ষাৎকার ঘটে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবগৃহে প্রবেশ-উৎসবের সময়ে ১৩১৫ অগ্রহায়ণে (১৯০৮)। এই উৎসব-সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। "রবীন্দ্রবাবু সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে রজনীকান্তের পরিচয় দিলেন এবং সংগীতালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন।"[২] রজনীকান্ত সে অনুরোধ রক্ষা করে সংগীত পরিবেশন করেন।

রজনীকান্ত তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন "এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশ[৩]কে সঙ্গে করে রবি ঠাকুরের বাড়ি তার পরদিন সকালবেলা যাই।"[২]

এই কয় বার সাক্ষাতের পর আর-এক বার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, সেইটেই শেষ সাক্ষাৎ। রজনীকান্তের মৃত্যুর (২৮ ভাদ্র) অল্পকাল আগে ১৩১৭ সালের ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হয়েছিলেন।

যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন সেই দিনই রজনীকান্ত 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে' গানটি রচনা করেন— ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের পত্রবিনিময় হয় সম্ভবত একবারই। রবীন্দ্রনাথের পত্রে উল্লিখিত আছে 'আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম'। এই গানটি উপরিলিখিত গান বলে অনেকে অনুমান করেছেন।[৪] যে তারিখে রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ ঘটে সেই তারিখেই ঐ গানটি লিখিত হয়েছিল বলে সম্ভবত এই অনুমান।

ঐ সাক্ষাৎকারের পরে রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সন্ধান না পাওয়ায় ঐ ভ্রম হয়ে থাকবে। যে চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ পত্রটি লেখেন রজনীকান্তের সেই চিঠি উদ্ধার করা

১ এই সংখ্যায় 'কান্তকবি' শিরোনামে মুদ্রিত

২ 'কান্তকবি রজনীকান্ত' : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

৩ দীনেশচন্দ্র সেন

৪ 'কান্তকবি রজনীকান্ত' : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। 'রজনীকান্ত সেন', সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গিয়েছে। মূল পত্রের প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হল। দেখা যাচ্ছে যে, রজনীকান্ত যে গানটি রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠান সে গানটি '১লা আষাঢ় তারিখে রাত্রিতে' লিখিত; এবং ২৯৷৬৷১০ অর্থাৎ ১৫ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠির সঙ্গে তা রবীন্দ্র-সমীপে প্রেরিত হয়। গানটির আরম্ভ হচ্ছে—

এই মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে· ·

রজনীকান্তের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ দান' (১৯২৭) গ্রন্থের এটি চতুর্থ গান।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রজনীকান্তের পত্র

শ্রীহরি

Medical College Hospital
Cottage No 12
Calcutta
29|6|10
[১৫ আষাঢ় ১৩১৭]

দেব,

সেই সাক্ষাতের পর আর কোনও সংবাদ জানি না। ভরসা করি শারীরিক সুস্থ আছেন।

যেদিন চরণধূলায় এই কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিল তিল করিয়া যেন ব্যাধির উপশম হইতেছে। এই উন্নতি স্থায়ী হয় না; কতবার মরিলাম, কতবার বাঁচিলাম,—এইরূপেই দিন যাইতেছে। আমি ঠিক বুঝিয়াছি, ভগবৎকৃপা ভিন্ন এই দেহরক্ষায় কোনও উপায় বা সম্ভাবনা নাই।

আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে কিন্তু সাধুসন্দর্শন তো সর্ব্বদা হয় না।

বার বার ঐ কথা মনে হয় যে দয়া করিয়া একটি বালককে[১] বেদ-বিদ্যালয়ে লইয়া তাহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি দুর্ভাগ্য, তাহা হইল না।

১লা আষাঢ় তারিখে রাত্রিতে যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলাম তাহা আপনাকে দেখাইতে ইচ্ছা হইল, পত্রের অভ্যন্তর পৃষ্ঠায় নকল করিয়া দিলাম। পড়িয়া যদি ভাল লাগে—দয়া করিয়া জানাইবেন।

প্রণত
রজনীকান্ত সেন

---

১ রজনীকান্তের পুত্র

যজ্ঞভঙ্গ

"এই, মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিবে কে ?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া উর্দ্ধে ধরিবে কে ?
রক্ত বহিবে মর্ম্ম ফাটিয়া,
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া,
ধর্ম্ম-পক্ষে শর্ম্ম-লক্ষ্যে মৃত্যু বরিবে কে ?
অক্ষয় নব-কীর্ত্তি-কিরীটি মাথায় পরিবে কে ?"

বলিয়া, সেদিন হুঙ্কার ছাড়ি, ছিন্ন করিনু পাশ ;
হায়, ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে করেছি সর্ব্বনাশ !
চেয়ে দেখি, কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তর শুধু মানবের পরিহাস ;
আমি, ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে করেছি সর্ব্বনাশ !

এই, অন্ধ, মত্ত, উদ্যমে, শুধু বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধিদাতারে গণ্ডী-বাহিরে করিনু আসন দান ;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ ;
সকল দম্ভ ধূলায় ফেলিয়া আজ ডাকি ভগবান্ ;
হে দয়াল ! মোর ক্ষমি অপরাধ ; কর তোমাগত-প্রাণ ।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

রজনীকান্তের ১৫ আষাঢ় তারিখের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় তারিখে পত্র দেন—

রজনীকান্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র[১]

ওঁ [বোলপুর]

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় !

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই— কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই— পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য !

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন ; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত

প্রদীপ ও সলতে।

১৭। প্রদীপ বলে, "সলতে ভাই, তুমিত ছার,
তোমার জুড়ি—কাটি—কিছুরের দল,
পারে মাথায় করি' সমুদ্র-প্রহার,
পলায়ন করে, সব ছুটে গিয়ে তার।"
সলতে কহে, "বাঁচালে, করি তা' স্বীকার,
কিন্তু তুমি (~~[illegible]~~ পুনরুপে) স্বাদে তাপ তার,
সে সুখী—আলোকে করি' স্নাত নাহি হয়,
নিজের মাথায় রেখে, ~~নিজে—বুকে রয়~~।"
প্রহার নিলয়।"

১৮। মহত্ত্বের বঞ্চনা। ✓ (omit) 0
পূর্ণিমার চাঁদ—হেরি উঠিল চকোর,
সুধা-আশে, মহানন্দে, হৃদয় বিভোর;
ডেকে ডাকিয়ে উঠে, "কোথা শশধর!
চাঁদে-চোখ, ঢালি দাও,—তৃষ্ণায় কাতর;"
শুনিয়া—শশাঙ্ক নিজে—বদনে ভাবিল,
মেঘ আসি—শশাঙ্কের—পাশে দাঁড়াইল;
মেঘ বলে, "চাঁদ-ভাই,—রহি' পাশাপাশি;
দুজনায় দুজনার সুধা-তৃষ্ণা নাশি।"

রজনীকান্তের 'অমৃত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা। '১৮' সংখ্যক রচনাটি গ্রন্থভুক্ত নয় ও অপ্রকাশিত।

কান্তগীতি : স্বরলিপি

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

মিশ্র। রূপকড়া

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসালো নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি নব ঘন চন্দনে॥
কবে তোমাতে আমি হয়ে, আমাতে তুমি তারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা।
পরান শিহরিবে, আকুল হবে মন,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে॥
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
পরান কাঁদিবে না, চরণ টলিবে না,
চরণ টলিবে না, পরান গলিবে না,
কাহার আকুল ক্রন্দনে॥

রা গা -া II { সা রা রা । গা -া । গা গা -া I মা মা মা । গা -মা । রা সা -া I
ক বে ০ তৃ ষি ত এ ০ ম রু ০ ছা ড়ি য়া যা ০ ই ব ০

I মা মা মা । মা -া । গা গমা রগা I (-রগা -রমা মা । গা -মগা । রা গা -া)} I
তো মা রি র ০ সা লো০ ন০ ●● ●ন্ দ নে ●● ক বে ●

I -রগা -রমা মা । গা -া । গা গা -মা I { পা র্সা না । সা -না । র্রা র্সা -ণা I
০● ০ন্ দ নে ● ক বে ০ তা পি ত এ ০ চি ত ০

I ধা ণা ণধা । পধা -পা । মা গা (-মা)} I -া I মা মা মা । মা মা । গা গমা রগা I
ক রি ব০ শী০ ● ত ল ০ ০ তো মা রি ন ব ঘ ন● চ●

I -রগা -রমা মা । গা -মগা । রা গা -া II
●● ●ন্ দ নে ●● "ক বে ০"

পা পা -ধা II { মা পা পা । পা পা । না না -া I র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সা -া I

ক বে ০ তো মা তে আ মি হ য়ে ০ আ মা তে তু মি তা রা ০

I পা র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্রা র্সা -া I না না ধনা । পা র্সা । র্সা না -া } I

তো মা রি না ম নি তে ০ ন য় নে০ ব বে ধা রা ০

[পা]

I { র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -ণঃ I ধা ণা ধা । পা ধপা । মা গা -া } I

প রা ন শি হ রি বে ০ আ কু ল হ বে০ ম ন ০

I মা মা মা । মা -া । গা গমা রগা I -রগা -রমা মা । গা -মগা । রা গা -া II

বি পু ল পু ০ ল ক০ ম্পা০ ০০ ০ন্ দ নে ০০ "ক বে ০"

পা পা -ধা II { মা পা পা । পা পা । না না -া I র্সা র্সা না । র্সা -না । র্সা র্সা -া I

ক বে ০ ভ বে র সু খ দু খ ০ চ র ণে দ ০ লি য়া ০

I পা -র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্রা র্সা -া I না না ধনা । পা -র্সা । র্সা না -া } I

যা ০ ত্রা ক রি ব গো ০ শ্রী হ রি০ ব ০ লি য়া ০

I র্সা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -ণঃ I ধা ণা ধা । পা ধপা । মা গা -া I

প রা ন কাঁ দি বে না ০ চ র ণ ট লি০ বে না ০

I পা র্সা না । র্সা না । র্সা র্সাঃ -ণঃ I ধা ণা ধা । পা ধপা । মা গা -া I

চ র ণ ট লি বে না ০ প রা ন গ লি০ বে না ০

I মা মা মা । মা -া । গা গমা রগা I -রগা -রমা মা । গা -মগা । রা গা -া II II

কা হা র আ ০ কু ল০ ক্র০ ০০ ০ন্ দ নে ০০ "ক বে ০"

'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ১৩১১ ফাল্গুন

মিশ্র। একতাল

কেন বঞ্চিত হব চরণে,
আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে ॥
আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ, তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,
হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ
ঘাটে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে বসে, 'পার কর' বলে, পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ॥
আমি শুনেছি হে তৃষাহারি !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার,
একি সব মিছে কথা, ভাবিতে যে ব্যথা বড়ো বাজে প্রভু মরমে ॥

সা সা II সা -া গা । গা গা মা । মা পা পা । -া গা গা I
কে ন ব ০ ঞ্চি ত হ ব চ র ণে ০ আ মি

I মা ধা ধা । ধা ধা ধা । মা ধা ধা । ধা ণা ধা I
ক ত আ শা ক রে ব সে আ ছি পা ব

I পা ধা পা । মা গা -মা । গা গা রা । -া সা সা II
জী ব নে না হ য়্ ম র ণে ০ "কে ন"

মা গা II { মা -ধা পা । মা গা মা । গা গা রা । -া (মা গা)} I -া -া I
আ হা তা ই য দি না হি হ বে গো ০ আ হা ০ ০

I { রা ধা ধা । ধা ধা -া । মা ধা ধা । ধা ণা ধা I
পা ত কী তা র ণ্ ত রী তে তা পি ত

I পা ধা পা । মা গা মা । গা গা রা । (-া -া -া)} I -া না না I
আ তু রে তু লে না ল বে গো ০ ০ ০ ০ হ য়ে

I { না না -া । না না -র্সা । র্সা -া র্সা । -া (পা পা I
প থে র্ ধু লা য়্ অ ন্ ধ ০ এ সে

I পা না না । না না না । র্সা -র্রা র্রা । -র্জ্রা র্রা র্সা)} I পা পা I
দে খি ব কি খে য়া ব ০ ন্ধ ০ হ য়ে ঘা টে

I পা না না । না না না । র্সা -র্রা র্রা । -া পা পা I
দে খি ব কি খে য়া ব ন্ ধ ০ ত বে

I { র্সা র্সা র্সা । না র্সা -ণা । ধা ণা ধা । পা মা গা I
পা রে ব সে পা র্ ক র ব লে পা পী

I মা ধা পা । মা গা মা । গা গা রা । -া (পা পা)} I সা সা II
কে ন ডা কে দী ন শ র ণে ০ ত বে "কে ন"

মা গা II { মা ধা পা । মা গা মা । গা -রগা রা । (-া মা গা)} I -া রা রা I
আ মি শু নে ছি হে তৃ ষা হা ০ রী ০ আ মি ০ তু মি

I { রা ধা ধা । -া ধা ধা । মা -ধা ধা । ধা ণা ণধা I
এ নে দা ও তা রে প্রে ০ ম অ মৃ ত০

I পা ধা পা । মা গা মা । গা -রগা রা । -া (রা রা) } I পা পা I
তৃ ষি ত যে চা হে বা ০ রি ০ তু মি তু মি

[না না না]
I { পা পা পা । না -া না । র্সা -া র্সা । র্সা র্সা -া I
আ প না হ ই তে হ ও আ প না র্

I পা -া না । না না না । র্সা র্রা র্রা । (র্জ্ঞা র্রা -র্সা)} I র্রা র্রা পপা I
যা র্ কে হ না হি তু মি আ ছ তা র্ ছ তার্ একি

I { ^প^র্সা -া র্সা । না র্সা র্সণা । ধা ণা ধা । পা মা গা I
স ব্ মি ছে ক থা• ভা বি তে যে ব্য থা

I মা ধা পা । মা গা মা । গা গা রা । -া (পা পা)} I সা সা II II
ব ড়ো বা জে প্র ভু ম র মে ০ এ কি "কে ন"

'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' ১৩১১ চৈত্র

স্বরলিপি দুইটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি'র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যের সত্য

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১

সাহিত্য একই সঙ্গে আমাদের চেতনার নানান্ স্তরকে স্পর্শ করে। তার কোনো স্তরে আমরা লেখক, কোনো স্তরে আমরা পাঠক, কোনো স্তরে তত্ত্বদর্শী, কোথাও-বা সমাজহিতৈষী। এক-এক স্তর থেকে দেখলে সাহিত্যের রূপ এক-এক রকম। এই রূপগুলির কোনোটাই মিথ্যা নয়, আবার এর কোনোটাই সাহিত্যের চূড়ান্ত রূপ নয়। যদিও কোনো মানুষই একান্তভাবে লেখক নয়, একান্তভাবে পাঠক নয়, একান্ত তত্ত্বদর্শীও নয়, তবু সাহিত্যতত্ত্ববিচারে দৃষ্টিকোণের মৌলিক পার্থক্যের কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

একটা দিক পাঠকের নিজস্ব দিক। পড়ার সময় অবশ্য পাঠকও মনে-মনে রচনা ক'রে চলেন, এবং সেই পরিমাণে মনে-মনে লেখক হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে স্বাধীনভাবে নয়। পাঠকের নিজের দিকের আসল কথা হল রসাস্বাদন। রসিকের কাছে, ভোক্তার কাছে আস্বাদ্যমানতাতেই সাহিত্যের প্রধান পরিচয়।

এ যেমন গেল ভোক্তার দিক, তেমনি স্রষ্টারও একটা নিজস্ব দিক আছে। স্রষ্টার পক্ষে ভোক্তা হতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু স্বকীয় দৃষ্টিভূমিতে তিনি একক। সেই স্বকীয় ভূমি হল সৃজনের ভূমি। সৃষ্টির রহস্যলোক।

সাহিত্যের সত্যাসত্যের প্রশ্নটা কোন্ ভূমির? একদিক থেকে সত্যাসত্যের প্রশ্নটা যে তত্ত্বদর্শীর প্রশ্ন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নটার আরো অনেকগুলো দিক আছে। সাহিত্যের সত্য সম্পর্কিত প্রশ্ন কোনো কোনো দিক থেকে লেখক, পাঠক, সমাজ, সকলকেই স্পর্শ করে। সাহিত্যের সত্য কী এবং কী ভাবে তা লেখক-পাঠকের ভূমিকে—বিশেষ ক'রে লেখকের অর্থাৎ সৃজনের ভূমিকে স্পর্শ করে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে কী ভাবে করেছে, এ প্রবন্ধের সেইটেই মূল বিষয়।

২

স্রষ্টার কাছে সব থেকে বড়, সব থেকে প্রত্যক্ষ হল সৃজনের রহস্য। মুখ্যত যিনি স্রষ্টা তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব যে সৃজনকেন্দ্রিক সাহিত্যতত্ত্ব হবে এটা স্বাভাবিক। সুতরাং সৃজনক্রিয়ার রহস্যের মধ্যেই যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ-কে দেখতে পাবেন, এও অপ্রত্যাশিত নয়। তবু, সাহিত্যের স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বার বার সৃজনের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে সত্যের প্রসঙ্গে এসে উপনীত হয়েছেন। এ ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। সৃষ্টির বেগ, প্রকাশের আনন্দ—এর সঙ্গে সাহিত্যের সত্যাসত্যের প্রশ্নের যোগ কোথায়?

সৃজনক্রিয়ার বাইরের দিকটা প্রয়োগ ও নির্মিতির দিক, কৌশল ও অভিজ্ঞতার দিক, উপাদান-উপকরণের উপর আধিপত্যের দিক। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই দিকটা নিয়েও প্রচুর আলোচনা করেছেন।

কিন্তু সে আলোচনা সাহিত্যতত্ত্ব হিসাবে নয়, সাহিত্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে নয়। রবীন্দ্রনাথের আসল আকর্ষণ সৃজনের ভিতরের মহলে, যেখানে প্রেরণা প্রবর্তনা উদ্‌বেজনার শক্তি-সঞ্চার, যেখানে কল্পনার আত্মসম্প্রসারণের ইন্দ্রজাল, যেখানে ব্যক্তিত্বের অর্জন-উৎসর্জনের রহস্য।

এই ভিতরের মহলের দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বলেছেন লীলা, বলেছেন অ-প্রয়োজনের আনন্দ। বলেছেন বাহুল্য, surplus— উদ্‌বৃত্ত।

সৃজনের আনন্দ প্রকাশের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ হল 'আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল' করবার ইচ্ছা, 'কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি'-র আবেগ।[১] এর কোনো কেন নেই। এ আনন্দ আপনাতেই সম্পূর্ণ। তাই এর নাম লীলা। 'অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান'[২], এই হল সৃষ্টিলীলা।

কিন্তু যে আনন্দ অহেতুক এবং অবাধ, যা কিনা বিশুদ্ধ লীলা, তার প্রসঙ্গে সত্যাসত্যের প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? সৃষ্টি যদি প্রকৃতই সৃষ্টি হয়, তা কি লৌকিক বা জাগতিক সত্যের উর্ধ্বে নয়? তার কি নিজের বাইরে অপর কোনো আদর্শ থাকতে পারে যার নির্দেশ যার নিয়ম সে মানতে বাধ্য? লীলার উপর কি কোনো নিয়ম-কানুন খাটে?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে সাধারণভাবে লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। লীলাবাদের একটা পাশ্চাত্য সংস্করণের সঙ্গে আমরা সকলেই সুপরিচিত। এর প্রথম পর্বে অবশ্য সত্যের দাবিকে মোটেই অস্বীকার করা হয় নি। কিন্তু এর ঐতিহাসিক পরিণতি যে 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক'— মতবাদে, সেখানে এসে দেখতে পেলাম, কার্যত সত্যের দাবিটা অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর-এক ধাপ এগিয়ে এসে 'ইস্থেট'দের যে শিল্পকেন্দ্রিক জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ পেলাম, সেখানে কিন্তু সত্যের দাবিকে প্রায় পুরোপুরিই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের কোনো-কোনো শাখার কোনো-কোনো দিকের সঙ্গে লীলাবাদের সমধর্মিতা খুব দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানে কবিদের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'-র উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে অপার কাব্যসংসারে কবিরাই প্রজাপতি। তাঁরা ইচ্ছাসুখে সৃজন করেন। সে সৃষ্টি বিষয়ান্তর-স্পর্শশূন্য। যে জগৎ তাঁরা সৃজন করেন তা অ-লৌকিক। তা প্রকৃতিকৃতনিয়ম-রহিত, তা লৌকিক সত্যের অধীন নয়। জোরটা কবির স্বাধীনতার উপর। সত্যের অধিকার যে এখানেও খুব সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তা সহজেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে এমন কথা বলা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ সত্যের অধিকারকে সামান্য পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হতে দিতে ইচ্ছুক নন। এইখানেই সমস্যার উদ্‌ভব।

নানা প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষে কীট্‌সকে স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন: Truth is beauty, beauty truth।— এই ট্রুথ, এই বিউটি, এরা কি আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত ট্রুথ, পরিচিত বিউটি নয়? নতুবা— ট্রুথ কেন বিউটি হতে বাধ্য আর বিউটিই বা কেন ট্রুথ হতে বাধ্য? সুন্দর মিথ্যা অথবা

---

১ সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে।

কুৎসিত সত্য, এ কি আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কখনো পাই না? তা যদি পাই, তাহলে সাহিত্যের সত্য সাহিত্যের সুন্দর, এরা কি মন-গড়া বস্তু? কল্পনার সত্য কি জীবন-সত্যের বিকল্প?

কীট্‌সের নিজের মনোভাব সম্পর্কে এরকম সন্দেহ হয়তো একেবারে অমূলক নয়। কীট্‌সের কাছে Beauty is truth—এই কথাটাই প্রথম কথা। সম্ভবত প্রধান কথাও এইটেই। হয়তো সুন্দরকেই তিনি সত্য নামে আখ্যাত করেছেন, সত্যের স্বতন্ত্র কোনো মান তাঁর কাছে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যই প্রাথমিক। সুন্দর সত্যেরই একটি অভিধা। সুন্দর হল সত্যেরই আনন্দরূপ। কীট্‌সের সৌন্দর্যভাবনার মধ্যে কেউ কেউ একটি করুণ কামনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার আভাস আছে, কিন্তু পরিণত রবীন্দ্রনাথে তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় কীট্‌সীয় সৌন্দর্যভাবনা বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে বিপরীত ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।[৩] রবীন্দ্রনাথের সত্য জীবন-সত্যের বিকল্প নয়। বিশিষ্ট-অনুভবের সত্য নয়,— ঋজু অরুগ্ন অলজ্জিত সত্য, সাধারণ-উপলব্ধির সত্য। সমস্ত আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও তা প্রবলভাবে প্রাণস্পন্দিত সত্য।

রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য সাহিত্য বলেই সত্য। জীবনের 'অসুন্দর'-সত্যগুলোও সত্য বলেই গ্রহণীয়। সত্য বলেই— সাহিত্যে তারা সুন্দর। কেননা সেখানে তাদের সেই আনন্দরূপ উদ্‌ঘাটিত, জীবনে যা আবৃত ছিল। সুন্দর মিথ্যা— যদি সত্যিই মিথ্যা হয়, সর্বৈব মিথ্যা হয়, তাহলে মিথ্যা বলেই তা অগ্রাহ্য। কিন্তু 'সুন্দর মিথ্যা' এ কথাটাই স্ববিরোধী।

৩

লীলা আর সত্য, এরা যেন বিপরীতমুখী দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। এদের দুজনকেই স্থান দেওয়া, সমান উচ্চাসন দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় সৃষ্টিরই আর-এক নাম প্রকাশ, আর সেই প্রকাশের একটা মুখ লীলার দিকে, আর-একটা মুখ সত্যের দিকে।

লীলা হল ইচ্ছার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা— অবাধ ইচ্ছাশক্তি। পিছনে তার কোনো হেতু নেই, সামনে তার কোনো লক্ষ্য নেই, কোথাও তার কোনো মানা নেই। স্রষ্টার ইচ্ছার কোনো সীমানা নেই, যেমন সীমানা নেই লীলাময় বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছার। লীলা মানেই মুক্তি। আনন্দময় মুক্তি। অথবা বলি, মুক্ত আনন্দ। সৃষ্টি— সে অনুসন্ধানও নয়, আবিষ্কারও নয়, সে হল আবির্ভাব। যা আছে তাকে দেখা নয়, এ যেন যা নেই তাকে আনা।

প্রকাশের সত্যের-দিকের-মুখটা কিন্তু মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়েছে, মাটিকে যেন ছুঁয়ে আছে। প্রকাশ যখন মানবপ্রকাশ, মানববিশ্বের প্রকাশ— সত্য-হয়ে-ওঠার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ, তখন মানতেই হবে যে, মানবসত্যের সীমানায় সে সীমাবদ্ধ। জীবনের সীমানাই প্রকাশের নিত্য-নির্ধারিত সীমানা। প্রকাশ যদি জীবন-সত্যের প্রকাশই হয়, তাহলে সাহিত্য একে রচনা করে না, আবিষ্কার করে। অন্তত সত্যের ক্ষেত্রে কবিরা স্রষ্টা নন, কবিরা দ্রষ্টা।

সমস্যাটা স্পষ্ট। সৃষ্টি যদি নিজের বাইরে অপর কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনো রকম শর্ত-সম্পর্কে আবদ্ধ

---

৩ সাহিত্যের পথে-র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

থাকে, তার উপর যদি সত্য হবার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, সে যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, তাহলে কবিকল্পনাকে যথার্থভাবে মুক্ত বলে দাবি করা যায় না। আর কবিকল্পনা যদি যথার্থই মুক্ত হয়, তবে তার প্রসাদে যা সৃষ্ট হল, তা সত্য কি অসত্য এ প্রশ্ন অবান্তর। অর্থাৎ সাহিত্য যদি লীলাই হয়, তাহলে তার মিথ্যা হতে বাধা নেই, সত্য হবার দায় নেই। আর সাহিত্য যদি সত্য হয়, তাহলে তার লীলা হবার উপায় নেই। এ অবস্থায়, সাহিত্য যে একসঙ্গে দুই-ই হবে, তার পথ কোথায়?

একটা পথ অবশ্য আছে। লীলা যদি প্রকৃত লীলা না হয়, অথবা সত্য যদি প্রকৃত সত্য না হয়। সত্যের কথাই বলি। সত্য বলতে যদি জগৎ ও জীবনের সত্যকে না বুঝি, তাকে সত্য না বলে যদি আর-কিছুকে সত্য বলি— এমন একটা-কিছু যা নির্মম অনমনীয়তায় অমোঘ নয়, যা নমনীয়, নির্বিষ এবং বশংবদ, তাহলে সমস্যাটা অনেক সহজ হয়ে আসে। সত্য যদি কেবলই কল্পনার সত্য হয় আর কল্পনা যদি নিছকই কাল্পনিকতা হয়, তাহলে তেমন সত্যের সঙ্গে লীলার মিলতে কোনো বাধা থাকে না। পাশ্চাত্য রোমান্টিসিষ্টদের অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা এ রকম প্রবণতার সাক্ষাৎ পেয়েছি। পূর্বেই বলেছি, তরুণ রবীন্দ্রনাথে কোথাও-কোথাও এর আভাস থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-পরিণত সাহিত্যভাবনায় এরকম বিকল্প-সত্যের কোনো স্থান নেই। যিনি বার বার সাহিত্যে 'জীবনের স্বাক্ষরে'র কথা বলেছেন, তিনি যে জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত কোনো সত্যকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন এটা স্বাভাবিক মনে হয় না।

প্রশ্নটা কাকে সত্য নাম দেব তা নিয়ে নয়। লোকপ্রচলনকে অগ্রাহ্য করলে মিথ্যাকেও সত্য নাম দিতে পারি, সত্যকেও মিথ্যা নাম দিতে পারি। সাহিত্যে 'জীবনের স্বাক্ষর'-কে কতোটা মূল্য দেব, রিয়ালিটির দাবিকে কতোটা স্বীকার করব, বা আদৌ করব কি না— প্রশ্নটা তাই নিয়ে।

সাহিত্যের সত্য জীবনের সঙ্গে কী ভাবে সম্পর্কিত? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে পৌঁছুবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় 'সাহিত্যের সত্য' কথাটার যথার্থ অর্থ কী, সেটা একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার।

৪

প্রথমেই 'সাহিত্যের সত্য' এই কথাটার প্রয়োগের দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রকে আলাদা করে নিতে হবে। দুটি প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের। সাহিত্য নিজে কতোটা সত্য অর্থাৎ কতোটা সত্তাবান্ বা অস্তিত্বশীল, এ হল এক ধরণের প্রশ্ন, আর সাহিত্য যে-কথা বলে সে-কথা কতোটা সত্যকথা, সে হল সম্পূর্ণ আর-এক ধরণের প্রশ্ন। একটা সত্তার প্রশ্ন, অপরটা সত্যবাদিতার প্রশ্ন। যদিও দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা 'সত্য' কথাটাকে প্রয়োগ করে থাকি, তা হলেও দুটো ক্ষেত্রে কথাটার অর্থ আলাদা। প্রথমটি হল সাহিত্যবস্তুর বস্তুগত অস্তিত্বের কথা— যা গড়ে' উঠল তা কোথায় আছে, কী ভাবে আছে, কতোটা আছে, সেই কথা। দ্বিতীয়টি হল সাহিত্যের সত্যবাদিতার কথা। প্রথমটি শিল্পবস্তুর রিয়ালিটির প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়টি শিল্পবাণীর ট্রুথের প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের সত্যের কথা বলেন, সাহিত্যে জীবনের স্বাক্ষরের কথা বলেন, তখন সত্য কথাটার প্রসঙ্গভূমি কোন্‌টি?

আমাদের জীবনযাপনকে ঘিরে আছে— তাকে ধারণ করে আছে যে-বাস্তব, আমার নিজের অস্তিত্ব যার অস্তিত্বের সঙ্গে এবং যার অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, আমাদের কাছে যে স্বয়ংসিদ্ধ, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিক ছাড়া আমরা সকলেই নিঃসংশয়, সে হল দেশে-কালে-অধিষ্ঠিত

বাস্তব। তার পারমার্থিক সত্তা যা-ই হোক না কেন, আমাদের কাছে সে-ই পরম সত্তা। তাকেই বলি রিয়ালিটি। তারই নিকষে স্বপ্ন মিথ্যা, ভ্রান্তি ভ্রান্তি। সে রিয়েল, এই অর্থে সে সত্য। ট্রুথ কথাটা তার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমাদের চেতনার কাছে সমস্ত ট্রুথের দাবির সে-ই হল চরম নিরসন। তাকে বাদ দিলে ট্রুথ কথাটা অর্থহীন।

রিয়েল অর্থে যে সত্য, সে আছে।— আমাদের অব্যবহিত চেতনায় আছে মানেই হল দেশে-কালে আছে। সাহিত্য-নামধেয় যে বস্তুটি সৃষ্ট হল, একটি কবিতা কি একটি নাটক,— বস্তু হিসাবে তার অধিষ্ঠান কোথায়? 'মিথ্যাবাদী' হোমার ভাষার ইন্দ্রজাল দিয়ে যে কল্প-জগৎকে গড়ে তুললেন, সে ভূগোল-ইতিহাসের মাধ্যাকর্ষণের বাইরে, সে কোথায় আছে? ঠিক সেই অর্থে তাকে সত্য বলা চলে কি, যে অর্থে গ্রীস দেশটা সত্য, গ্রীকদের ইতিহাসটা সত্য?

যে সীতা কখনো ছিল না তাকে হরণ করল সেই রাবণ যে কখনো ছিল না, নিয়ে গেল সেই স্বর্ণলঙ্কায় যে স্বর্ণলঙ্কা কোথাও নেই, কোথাও ছিল না। একটা গোটা জগৎ মন্ত্রবলে গড়ে উঠল। তারপর সেই মন্ত্রের জগৎ আমাদের চোখে-দেখা বাস্তবকে মলিন করে দিল তার উজ্জ্বল প্রত্যক্ষতা দিয়ে। ঔজ্জ্বল্যই যদি থাকার মাপকাঠি হত, তাহলে একে সত্য বলতে দ্বিধার কিছু ছিল না। কিন্তু থাকার সরল সুপরিচিত মাপকাঠি দিয়ে যদি মাপি, তাহলে দীনতম পতঙ্গটিও যে অর্থে সত্য সে অর্থে সে সত্য নয়। ছবির ফ্রেমটা যে অর্থে আছে, ক্যানভাসটা যে অর্থে আছে, ক্যানভাসের গায়ে রঙের ছোপগুলো যে অর্থে আছে, ছবিটাও কি ঠিক সেই অর্থে ঠিক ততখানি পরিমাণেই আছে? বইয়ের পাতাটা, পাতার গায়ে অক্ষরের দাগগুলো, পাঠ-নিরত আমি— যে ভাবে দেশে-কালে সত্য, কবিতাটাও কি তাই? আমার পড়া নামক ঘটনাটা যে অর্থে দেশে-কালে ঘটমান, কবিতাটাও কি সেই অর্থে দেশে-কালে ঘটমান?

সাহিত্যের জগৎ চতুর্মাত্রিক অস্তিত্বের জগৎ নয়। সে যেন সদসদ্‌বিলক্ষণ। থেকেও নেই, না থেকেও আছে। এ যেন মায়ার জগৎ। দর্পণে প্রতিবিম্বিত অগ্নির মতো এতে দীপ্তি আছে কিন্তু দাহ নেই। রূপ আছে, রক্তমাংস নেই। দেশকালকে স্পর্শ করে, কিন্তু দেশকালের আলিঙ্গনে ধরা দেয় না। অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু অবিকল নয়। স্বপ্ন বাস্তবের দ্বারা বাধিত হয়, ভ্রান্তি বাস্তবের দ্বারা খণ্ডিত হয়। এ তা হয় না। বাস্তবের পাশাপাশি বিরাজ করে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে জানি না। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে জানলে তার শক্তি চলে যায়। এর ক্ষেত্রে উল্টো। আর্টকে আর্ট বলে না জানলে, আর্টের মায়া-জগৎকে মায়া বলে না জানলে তা আর আর্ট থাকে না। সাহিত্যকে জীবন বলে জানলে সে ব্যর্থ হল। সাহিত্য জীবন নয়। সে স্বপ্নের মতো মিথ্যাও নয়, জীবনের মতো সত্যও নয়। একে কী বলব?

বহুকাল পূর্বে প্লেটো এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে অবশ্য দেশকালের বাস্তবও সত্য নয়, তার স্থান সত্য থেকে এক ধাপ নীচে। সাহিত্যের জগৎ সত্য থেকে দু' ধাপ নীচে। আসলে তা মিথ্যার জগৎ।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেছেন, দেশকাল-অনালিঙ্গিত এ জগৎ লৌকিক সত্যের জগৎ নয়। এ জগৎ অলৌকিক।

সাহিত্যের জগৎ যে মায়া-জগৎ তা রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, রূপের জাদু।

দেশে-কালে অধিষ্ঠিত জগৎ যে অর্থে সত্য, এই জাদুর জগৎ সে অর্থে— ঠিক সেই অর্থে সত্য নয়। তবে কি মিথ্যা? জাদু বলতে তিনি আপত্তি করেন নি, কিন্তু মিথ্যা বলতে তিনি আপত্তি করেছেন। দেশকালগত সত্তার কথা তিনি বলেন নি, তিনি অন্যতর সত্যতার দাবি তুলেছেন।

সাহিত্যের জগৎটাকে তিনি বলেছেন, রূপের জগৎ। বিষয়ের নয়, রূপের। রূপটা রিয়ালিটির, কিন্তু হুবহু রিয়ালিটিরই নয়। সুবিন্যস্ত, সংহত, তীব্রতাপ্রাপ্ত— তার সুডৌল প্রত্যক্ষগোচরতা রিয়ালিটিকে ছাপিয়ে যায়। রূপের যে ঐক্য রিয়ালিটিতে বহুলতার ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকে, সাহিত্য সেই রূপ-মহিমাকে অনাবৃত করে দেয়। রূপের বহুলতা এখানে সুগভীর তাৎপর্যের ঐক্যে বিধৃত। যেখানে ঐক্য আছে, সুষমা আছে, সামঞ্জস্য আছে, সেখানে সত্যও আছে। রিয়ালিটিতে সে সত্য প্রচ্ছন্ন। সাহিত্যে তা প্রকাশিত।

সাহিত্যের মায়া মিথ্যার মায়া নয়। যাকে জাদু বলি সে কি রিয়ালিটিতেই কিছু কম? কোথায় জাদু নেই? সাহিত্যের জগৎটা যদি অলৌকিক হয়, তাহলে বাস্তব জগৎটাই বা অলৌকিক নয় কেন?

অলৌকিকতার এই ভাষ্যে অলৌকিকতাবাদীরা খুশি হবেন না। কিন্তু আসল কথা এখানে নয়। আসল কথা— রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবস্তুর সত্তার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলেন। এড়িয়ে গেলেন, না বলে বলা উচিত, অগ্রাহ্য করলেন। সঙ্গতভাবেই করলেন, কারণ সাহিত্যের বস্তুগত সত্তার প্রশ্নটা একান্তভাবেই দার্শনিকের প্রশ্ন। প্লেটোর যা নিয়ে দুশ্চিন্তা, রবীন্দ্রনাথের তা নিয়ে কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। নেই এই জন্যে যে রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের সত্যতা তার রূপে ও তাৎপর্যে, বস্তুসত্তায় নয়।

এরিষ্টটল-ও এ-প্রশ্নকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। প্লেটোর অভিযোগের প্রথম আধখানাকে— অর্থাৎ সাহিত্যের বস্তুগত মিথ্যার দিকটাকে তিনি নির্ভাবনায় মেনে নিয়েছেন। তাঁরও মতে সাহিত্যের সত্যতার উৎস বস্তুগত সত্তায় নয়, অন্যত্র। সে সত্য এতই মূল্যবান যে তা সাহিত্যের বস্তুসত্তার অভাবের ক্ষতিপূরণই মাত্র করে না, প্রচুর উদ্‌বৃত্তও দিয়ে যায়। প্লেটোর অভিযোগ সেই সত্যের প্রসাদে সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়ে যায়। সেই অন্যতর সত্যটির পরিচয় কী? যদি সত্তাগত না হয়, তাহলে সেই সত্য কোন্ সত্য?

৫

সাহিত্য কতটা অস্তিত্বশীল, এ প্রশ্ন সাহিত্যগত প্রশ্ন নয়। সাহিত্যের মূল্যকে তা স্পর্শ করে না। সাহিত্যতত্ত্বে এ প্রশ্ন অবান্তর। সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বকথিত দ্বিতীয় প্রসঙ্গটাই সঙ্গত: সাহিত্য কতটা সত্য কথা বলে।

সাহিত্যের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— রূপের জগৎ। তার সত্যতা রূপের সত্যতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'শেষ কথা হচ্ছে, Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ,···।'[৪]

কিন্তু রূপের সত্যতা অর্থ কী? এ রূপ কিন্তু আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, সাহিত্যে রূপের মধ্যে দিয়ে আরো কিছু বলা হয় যা কেবল রূপ নয়, যা 'অরূপ'। তাই, 'রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে

৪ সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের স্বরূপ

হবে ··।'[৫] সেই জন্যেই রূপের সংযম মূল্যবান্। রূপের মধ্যে যার আবির্ভাব সেই রূপকে সার্থক করে। রূপ শেষ কথা নয়: তাকে ছাড়তেও হবে, ছাড়াতেও হবে। কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বলেছেন—

'···রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়।'[৬]

'রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব' আর রূপের সত্যতা একই কথা।···এ রূপ তো জগতেরই রূপ, তাহলে রূপের সত্যতা অর্থ কি আক্ষরিক যথাযথতা? দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন মূলের রূপের আক্ষরিক যথাযথতা রক্ষা করে সত্য হয়? সাহিত্য কি রিয়ালিটির প্রতিকৃতিরচনা, প্রতিবিম্ব-নির্মাণ, অনুকৃতি? বলা বাহুল্য, তা নয়। তার উপায়ও নেই, তার প্রয়োজনও নেই।

প্রথমত, রিয়ালিটির জটিল চলিষ্ণু সীমাহীন বহুলতার যথাযথ প্রতিবিম্ব রচনা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যথাযথ প্রতিবিম্বে বা তার চেষ্টায় রিয়ালিটির অন্তর্নিহিত সুষমা ও ঐক্য ধরা পড়ে না, তার যথার্থ তাৎপর্যটাই বাদ পড়ে যায়। রূপের সত্য যদি রূপের যথাযথতাই হবে, তাহলে সাহিত্যে যে পুনর্বিন্যাস ঘটে তার দ্বারা, সংহতির দ্বারা, তীব্রতার দ্বারা, অনুরাগের স্পর্শের দ্বারা সেই যথাযথতার হানি হবারই তো কথা। তা হয় না, সাহিত্যে সে রূপ বরং আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যতার কথা বলেছেন, তা রূপের আক্ষরিক যথাযথতা নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে 'কেবল-রূপের' কথাও বলেন নি তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কেবল-রূপ হল অর্থহীন রূপ, নির্বিচার রূপ। রবীন্দ্রনাথ তার অর্থগত ঐক্যের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। তাছাড়া, সাহিত্য যদি নিছক রূপেরই শোভাযাত্রা হবে, রূপের মধ্যে যদি গুণগত ভেদের অবকাশ না-ই থাকবে, তাহলে মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পদাতিক সাহিত্যের ভেদ করব কী দিয়ে? সব রূপই তো রূপ, নিছক রূপ হিসাবে সবাই তুল্যমূল্য— তাহলে কোনো কোনো সাহিত্যকে যে মহৎ বলি, তা নিশ্চয়ই মাত্র রূপের কারণে নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের একথা স্মরণ করানো নিতান্তই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মহৎ কীর্তিগুলিকে তাদের অগভীর ত্বক-পেলবতার জন্য শ্রদ্ধা জানান নি, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের সুগভীর তাৎপর্যের জন্য। এ তাৎপর্যকে নৈতিক তাৎপর্য বললে হয়তো একটু খাটো করা হয়, কিন্তু জীবনের তাৎপর্য বললে কিছু ভুল বলা হয় না।

রূপ যদি কেবল যথাযথই হত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ 'অনুকরণ' কথাটিতে তেমন আপত্তি করতে পারতেন না। রূপ যদি শুধু রূপই হত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ গোঁড়া ফর্মবাদীদের মতো কেবল রূপের কথাই বলতেন, সত্যের কথা বলতেন না। রবীন্দ্রনাথ সেই রূপের কথাই বলেছেন যার মধ্যে দিয়ে জীবনের সুগভীর তাৎপর্য অভিব্যক্ত হয়। সৌষম্য সঙ্গতি ঐক্য— এও সেই তাৎপর্যেরই ইঙ্গিত।

তাৎপর্য জিনিসটা অস্তিত্বমাত্রের ধর্ম নয়। তাৎপর্য চেতনাগত, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কের বিশিষ্টতাতেই তাৎপর্যের সঞ্চার। এ তাৎপর্যের মূল জীবন-যাপনের গভীরে। রূপ যখন কথা বলে, রূপ যখন অর্থ হয়ে ফুটে ওঠে, তখন সে আর নীরব অস্তিত্বমাত্র নয়। তখন সে বাণী। সাহিত্যে রূপের

---

৫ সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে

৬ সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে

এই বাণীই— এই রূপবাণীই— সাহিত্যবাণী। সাহিত্যের সত্যতা এই রূপবাণীর সত্যতা। সাহিত্যের পক্ষে অন্য কোনো রকম সত্যতার দাবি অর্থহীন। সাহিত্যের সত্য হল সাহিত্যবাণীর সত্যতা, তার ট্রুথ।

৬

অতঃপর সত্য কথাটাকে এখানে কেবল ট্রুথ অর্থেই ব্যবহার করব। কিন্তু যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে ট্রুথ কথাটার অর্থও তার সুনির্দিষ্টতাকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। ট্রুথ কাকে বলব?

তাৎপর্যের মতো ট্রুথ জিনিসটাও চেতনা-নিরপেক্ষ নয়। যা বিষয়ী-নিরপেক্ষ, সে থাকলে আছে না থাকলে নেই— হয় সৎ না হয় অসৎ, সেইখানেই শেষ। তার সম্পর্কে ট্রুথের কথা ওঠে না। ট্রুথ সত্তার নিজস্ব গুণ নয়, ট্রুথ বিষয়ীর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে, ট্রুথ অর্থে সত্য হল সত্য বচন, সত্য চিন্তা, সত্য জ্ঞান। সত্য জ্ঞান না বলে শুধু জ্ঞান বলাই সঙ্গত, যাকে বলা হয়েছে প্রমা।

এই জ্ঞানের পরিধি কতোদূর? এ কি শুধু বচন-সীমাতেই সীমাবদ্ধ? জ্ঞান কি শুধুই ডিস্‌কার্সিভ জ্ঞান? রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। সত্য শুধু বুদ্ধির অবধারণের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ একে জ্ঞান বলেন নি। বলেছেন, উপলব্ধি। বলেছেন— ভাব, অর্থাৎ হওয়া— হওয়ার-মধ্যে-দিয়ে-জানা, যার নাম পাওয়া। এখানে আধুনিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মতের অমিল ঘটবে।

আধুনিক তত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই মনে করেন যে, বচন বা বাক্যই সত্যের একমাত্র প্রয়োগক্ষেত্র। অর্থাৎ সত্যতার দাবি (truth-claim) একমাত্র বাক্যের— বিশুদ্ধ বুদ্ধি-সৃষ্ট বাক্যের। পরীক্ষায় সে দাবি টি঳কলে বাক্যটি সত্য, না টি঳কলে তা মিথ্যা। পরীক্ষা সোজাসুজি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের পরীক্ষা। যার এই পরীক্ষাযোগ্যতা নেই, তা বচনই নয়। তার সম্পর্কে সত্যাসত্যের প্রশ্নই ওঠে না।

রিচার্ড্‌স-প্রমুখ কোনো কোনো সাহিত্যশাস্ত্রী সাহিত্যবাণীর সত্যতার দাবিকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। যা 'জ্ঞান' নয়, যা আবেগাত্মক, তার কোনো সত্য মিথ্যা নেই। বস্তুত সাহিত্যের কোনো বাণীই নেই। কেননা আবেগ বাক্য নয়। নয় এই জন্য যে তার পরীক্ষাযোগ্যতা নেই।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের পরীক্ষাই যে সত্যের চরম পরীক্ষা তা রবীন্দ্রনাথ মনে করেন না। এমন কি বচনগত সত্যেরও যে এইটেই চরম মানদণ্ড সম্ভবত এ কথাও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত হবেন না। কিন্তু এখানে সে প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সাহিত্যের বাণী ন্যায়শাস্ত্রসম্মত বাক্য বা বচন নয়। নিতান্ত বচনগত 'জ্ঞান' সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তা যদি হত— যেমন মারিতাঁ বলেছেন— 'if art were a means of knowledge, it would be widely inferior to geometry!' সাহিত্যের কাছ থেকে আনন্দ ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি যদি আমাদের হয় তো তা সংকীর্ণ অর্থে 'নলেজ' নয়, তাকে বরং প্রজ্ঞা বললেও বলতে পারি। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, 'Poetry begins in delight and ends in wisdom'। এই কবিবাক্যকে সম্পূরণ করে নিয়ে আমরাও বলতে পারি, আরম্ভে যা শেষেও তাই, সর্বত্রই প্রজ্ঞাঘন আনন্দ। 'বাচনিক জ্ঞান' কোথাও তার নাগাল পায় না।

যে-ট্রুথের অর্থ বচনগত সত্যতা, সাহিত্যের সত্য সেই জাতীয় ট্রুথ নয়। বচনের একমাত্র লক্ষ্য তথ্যপ্রকাশ। তথ্য সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য এমন একটা কিছুর প্রকাশ যা আরো অনেক

ব্যাপক, অনেক গভীর, অনেক ব্যঞ্জনাময়। এবং অনেক মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ যাকে ট্রুথ বলেছেন, পরাক্ষাপন্থীরা তাকে ট্রুথ বলবেন না। এ মতবিরোধ চূড়ান্ত। চূড়ান্ত— কিন্তু অনেকখানি পরিমাণে নাম-ঘটিত।

রবীন্দ্রনাথ যাকে সাহিত্যের সত্য বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতার দাবি উপলব্ধির কাছে। উপলব্ধি শুধু ইন্দ্রিয়জ্ঞান নয়— শুধু দৃষ্টি নয়, দৃষ্টি এবং বোধ। তাৎপর্যের বোধ, মূল্যের বোধ, বিষয় ও বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার বোধ। এমন এক সুপরিব্যাপ্ত ঐক্যের বোধ, এমন এক সশরীরী সমগ্রতার বোধ— এমন জীবন্ত জ্বলন্ত অনন্য বোধ যে তা কখনো বাক্যে অনূদিত হতে পারে না। বাক্যের— বুদ্ধি-সৃষ্ট বচনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে।' 'মানবের জীর্ণ বাক্যে-'র সম্পত্তি যে শীর্ণ ট্রুথ, তার প্রতি সাহিত্যের কোনো লোভ নেই।

বলা বাহুল্য, সাহিত্যদেহ বাক্য দিয়েই গড়া। সেই সব বাক্যের কেউ সত্য, কেউ মিথ্যা। কেউ বাচ্যার্থে আবদ্ধ, কারো ব্যঞ্জনা দূর-প্রসারী। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরনির্ভর, সাহিত্যে তাদের কারো কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তারা সমগ্রে সমর্পিত। তাদের সমস্ত নিজস্বতা, সমস্ত সত্যতা মিথ্যাত্ব সবই সমগ্রের মধ্যে গলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সাহিত্যের বাণী সেই সমগ্রের বাণী। সেটা বাক্য নয়। 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে' গড়ে-তোলা সে এক আশ্চর্য 'মানসী-প্রতিমা'।

কিসের প্রতিমা? হৃদয়ের জগতের। কিন্তু প্রতিমা কেমন করে বাণী হয়? প্রতিমা কেমন করে ভাষা হয়? হয়, যদি ভাষা কথাটাকে ব্যঞ্জনার্থে গ্রহণ করি। ভ্রূবিলাস গ্রীবাভঙ্গী যে অর্থে ভাষা, ছবি যে অর্থে ভাষা, গান যে অর্থে ভাষা, সাহিত্যের বাণী-প্রতিমাকে সেই অর্থে ভাষা বলতে বাধা কোথায়? 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বাল্মীকির মুখে এই ভাষার প্রশস্তির কথা আমরা শুনেছি: 'প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ', 'যামিনীর শান্তিবাণী…বাক্যহীন পরম নিষেধ', 'নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা'। এ ভাষা সংকেতের ভাষা, কিন্তু তা প্রত্যক্ষ। 'সেই মতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ কোথা মানবের বাক্যে?' সাহিত্যে মানসী-প্রতিমার ভাষা সেই প্রত্যক্ষ-প্রকাশের ভাষা।

সাহিত্যের ভাষা সংকেতধর্মী। কিন্তু সে সংকেত রূপময়: প্রত্যক্ষ-প্রকাশই তার স্বলক্ষন। এ হল রূপের সাংকেতিকতা। যে রসিক এই রূপের সংকেতকে চিনতে পারে, এ শুধু তার কানেই কথা বলে। অপরের কাছে নীরব।

শুধু সাহিত্য নয়, সমস্ত আর্টের ভাষাই এই প্রত্যক্ষ-প্রকাশের ভাষা। এর খানিকটা পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দিতে চেষ্টা করছি। বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মন্দির'-শীর্ষক রচনার গোড়ার দিকটা স্মরণ করা যাক।—

> 'উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে… ।
>
> 'ঋক্‌রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন; এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।…
>
> 'এই দেবালয় শ্রেণী তাহার নিগূঢ়-নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণে সহসা যে

ভাবান্দোলন উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, প্রকাশ করা কঠিন— বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে; পাথরকে পরে পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে সমস্ত একসঙ্গে বলে, এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে··· ।'[৭]

এ কথা সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যদিও সাহিত্যকে পরে পরে বাক্য গাঁথতে হয়, কিন্তু সমগ্রতার মধ্যে তারা পরে পরে দাঁড়িয়ে থাকে না, এক হয়ে যায়। সেই সমগ্রতা হয় তো 'স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না' কিন্তু একসঙ্গে 'সমস্ত মনকে অধিকার করে'।

৭

সাহিত্যের সত্য কী এবং কী নয়, এইবারে সেই হিসাবটা একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক।

প্রথমত, তা সাহিত্যের অর্থাৎ নাটক উপন্যাস কবিতার সত্তা-ঘটিত নয়। তা বস্তুগত নয়, বাণীগত। দ্বিতীয়ত, তা বিশিষ্ট অর্থে বা সংকীর্ণ অর্থে জ্ঞান নয়। তৃতীয়ত, তা সাহিত্যদেহের অন্তর্গত বা সাহিত্যদেহে পরিব্যাপ্ত কোনো বচন বা বচন-পরম্পরা নয়। তথ্য নয়।

সাহিত্যের বাণী সংকেতের বাণী। সে সংকেত রূপের সংকেত। রূপটা জগতের— বলা বাহুল্য 'হৃদয়ের জগতের'। সে রূপ মানবিক তাৎপর্যের সূত্রে গ্রথিত। এই তাৎপর্যের পিছনে মানুষের মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল। এই মূল্যবোধের উৎস—শেষ পর্যন্ত— জীবন। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে মূল্যবোধ ও জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[৮]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ'।[৯] কথাটাকে একটু বদলে নিয়ে অনায়াসে বলা চলে যে, তথ্যের মধ্যে মূল্যের প্রকাশ— ভ্যালু-র প্রকাশ, এই হল যথার্থ প্রকাশ। কিন্তু সে ভ্যালু তত্ত্ব নয়। বিশিষ্ট, মূর্ত, প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সাহিত্যের সত্য হল— তথ্য রূপ আর মূল্যের এক আশ্চর্য সমন্বয়। এমন এক সজীব ঐক্য যার মধ্যে এদের কাউকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। এই সমগ্রতাই সাহিত্য। তার বাণীকে এবং সেই বাণীর সত্যকে পৃথক করা যায় না। সাহিত্য সত্তা আর তার মূল্যকে অভিন্নভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্য সত্তা ও সত্যের যুগনদ্ধ রূপ।

সমগ্রতা কথাটার মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সত্য ভাবনার মূল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাচ্ছি। যা-কিছু

৭ এই সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানদৃষ্টি সুজান ল্যাঙ্গারের শিল্পতত্ত্বের একটি মুখ্য প্রত্যয়। রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তি সুজান ল্যাঙ্গারের বহু পূর্বগামী। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য একে জ্ঞান বলেন নি। নিছক জ্ঞান তাঁর মতে একটা abstraction মাত্র। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি একে বলেছেন, ভাব অর্থাৎ হয়ে-ওঠা। রবীন্দ্রনাথের মতে এ হল সম্যক্ দৃষ্টি, জ্ঞান-অনুভূতি-বাসনা-সমন্বিত যে উপলব্ধি, তার সমগ্র দৃষ্টি।

৮ শুধু সাহিত্যের সত্য নয়, ভারতীয় মতে সমস্ত সত্যই। ভারতীয় চিন্তায় সত্য এবং মূল্য অচ্ছেদ্য। মনু থেকে মহাভারত আমাদের সকল শাস্ত্রেই এ কথার সমর্থন মিলবে। সত্য এবং ঋত আমাদের কাছে এক। অল্প বয়সে, সম্ভবত পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথ এক সময় বাক্যের যাথার্থ্যকেই সত্য বলে বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্য সম্পর্কিত ধারণার প্রতিবাদ করেছিলেন। সে আজ ইতিহাসের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তায় সত্য প্রায় সব সময়ই একটি ভারতীয় প্রত্যয়, ইংরেজি ট্রুথ কথাটার অনুবাদ নয়।

৯ তথ্য ও সত্য, সাহিত্যের পথে

খণ্ডিত, যা-কিছু অবচ্ছিন্ন বা abstract, তা ঠিক সেই পরিমাণে অসত্য যে পরিমাণে সে খণ্ডিত, যে পরিমাণে সে অবচ্ছিন্ন। বিশ্বের কোনো-কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, বিশ্লিষ্ট নয়, সব-কিছুই অপর সব-কিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ। সত্য হল জীবন্ত মূর্ত অনবচ্ছিন্ন সমগ্রতা।

রবীন্দ্রনাথ সত্যের তিন রকম দাবিদারের কথা বলেছেন। শিথিল ভাষা-ব্যবহারে তাদের তিনটিকেই সত্য বলি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য তাদের একটিই। অপর দুটিকে বরং তথ্য বলা চলে, সত্য নয়।

এদের একটি হল আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রের সত্য। প্রাণধারণের তাগিদ আমাদের দৃষ্টিকে যে-একটা সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, বিষয়কে যখন সেই সীমানার মধ্যে দেখি, তখন তার একটা তির্যক বিকৃত রূপকেই মাত্র দেখতে পাই। কেননা সে দেখা স্বার্থসম্পর্কের ফ্রেমের মধ্যে আটকে নিয়ে দেখা, লাভক্ষতির ঘোলাটে চশমার মধ্যে দিয়ে দেখা। তখন বিষয়ের যে-রূপটা আমরা দেখতে পাই তা আমাদেরই আসক্তির ছাঁচে-গড়া রূপ। সমগ্রতা-অভিমুখী তার যে নিত্য রূপ, সেটা ঢাকা প'ড়ে যায়।

সত্যের আর-এক দাবিদার বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সত্য নীরক্ত নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক সত্য— অমূর্ত অবচ্ছিন্ন সত্য। সেও সমগ্র নয়, অতএব জীবন্ত নয়। বিজ্ঞানের দেখা নিছক জ্ঞানের দেখা, জ্ঞান-অনুভব-বাসনা-সমন্বিত উপলব্ধির দেখা নয়। 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করা নয়। যা অবিশ্লেষ্য তাকে চিরে চিরে দেখা। বিষয়কে মানব-সম্পর্কের বাইরে ফেলে দেখা।— তাৎপর্যের জগৎ থেকে, মূল্যের জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলে দেখা। বিষয়কে তার প্রাণের ভূমি থেকে উপড়ে নিয়ে বীক্ষণাগারের মরা-আলোয় দেখা। এও সত্যদৃষ্টি নয়।

আরো এক দেখা আছে। মানব উপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, মূল্যের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে নয়, কোনো কৃত্রিম সীমানা টেনে দিয়ে নয়, দেয়াল ফ্রেম গণ্ডী সমস্ত ভেঙে দিয়ে, সমস্ত ছদ্ম-আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে— বিষয়কে সত্তা ও চৈতন্যের মহাসমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসীমের মধ্যে দেখা'।

ব্যবহারিক দৃষ্টি যেমন একটা বিশিষ্ট-দৃষ্টি, বিজ্ঞানের দৃষ্টি যেমন বিশিষ্ট-দৃষ্টি, এ দৃষ্টি তেমনি তৃতীয় কোনো বিশিষ্ট-দৃষ্টি নয়। এ হল আমাদের সত্তার সমগ্র দৃষ্টি। এ দৃষ্টি বিশিষ্ট-দৃষ্টিকে খণ্ডন করে না, নিজের মধ্যে সমীকৃত করে। তাই সাহিত্যে তথ্য খণ্ডিত হয় না। তথ্যের পাত্রেই সত্য প্রকাশিত হয়।

এ দৃষ্টি ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন। এ দৃষ্টি নিরাসক্ত অথচ ভালোবাসায় উদ্দীপিত। এর সামনে অবচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়, ছদ্মবেশ খসে পড়ে, বিষয়ের 'আবরণ-ভঙ্গ' হয়। জগৎ সংসারের সঙ্গে তার ঐক্য প্রকাশিত হয়।

তথাকথিত বাস্তবে এই ঐক্য অপ্রকাশ থাকে; সাহিত্যে তার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতিহাসের রামের থেকে এই কারণেই বাল্মীকির ধ্যানদৃষ্টির রামচন্দ্র সত্যতর। রাম নামে কেউ না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। রামায়ণের মর্মগত সত্যতার তাতে হানি ঘটতো না। বাল্মীকির রাম কোনো তথ্যবিশেষের প্রতিকৃতি নয়। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র যে মানব-উপলব্ধির প্রতীক, উপলব্ধির জগৎ-ই তার সত্যতার মানদণ্ড। হৃদয়ের জগতের বাইরে আর কোথাও তার সমর্থনও নেই, খণ্ডনও নেই।

৮

'হৃদয়ের জগৎ' ব্যাপারটা ঠিক কী? রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই একথার উত্তর দেওয়া যাক।—

'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।... হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।'[১০]

মনের মধ্যে এই জগৎটাই হৃদয়ের জগৎ। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, মনের মধ্যে এ-জগৎ আপনা-থেকে গজিয়ে ওঠে নি।—

'নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে.
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।'[১১]

—'বাহিরের জগৎ'-ই মনের মধ্যে এসে 'হৃদয়ের জগৎ' হয়ে উঠেছে। এ হল স্বী-কৃত জগৎ।

কিন্তু যে-মন স্বীকার করে নিল, সে-ই বা কী?—

'আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল-মিলন।...আমি আছি এবং না-আমি আছে, এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে...।'[১২]

তাছাড়া, এ জগৎ কার মনের মধ্যের জগৎ? কোনো একলা মানুষের প্রাইভেট জগৎ নয়, সব মানুষের— সমগ্র মানবতার মনের জগৎ। তাই রবীন্দ্রনাথ কখনো একে বলেছেন মানুষের জগৎ, কখনো বলেছেন মানব-বিশ্ব, কখনো বলেছেন— বিশ্বমানবমনের জগৎ।

সাহিত্য শুধু হৃদয়ের প্রকাশ নয়, হৃদয়ের জগতের প্রকাশ। জগতের প্রকাশ বললেই কি খুব ভুল হবে? 'জগৎ' এবং 'হৃদয়ের জগৎ' এরা কি একান্তই পৃথক্?—

'বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।'[১৩]

—সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রের ভাবমূর্তি। মানবচরিত্র যেহেতু প্রকৃতিরই অঙ্গ, সেই হেতু একথা সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, সাহিত্য প্রকৃতিরই প্রকাশ — জগৎ ও জীবনেরই মানসী প্রতিমা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মন প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে, আর সাহিত্য মন থেকে সঞ্চয় করে। যদি

১০ সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য

১১ উপহার, মানসী

১২ সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে

১৩ সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য

সরাসরি প্রকৃতি থেকে আহরণ করতো, যদি মানসী-প্রতিমা না হয়ে শুধু প্রতিকৃতিই হত, তাহলে হয়তো একে অনুকরণই বলা চলতো। কিন্তু মাঝখানে রয়েছে মন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> 'প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।'[১৪]

দূরবর্তী হতে পারে, কিন্তু নিঃসম্পর্কিত নয়। মাঝখানে একটি মাত্র ধাপ, হৃদয়। ধাপটা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধাপে প্রকৃতির মর্মসত্যের কিছু বদল ঘটে কি?

ঘটবার কথা নয়, কারণ একমাত্র হৃদয়ই তো প্রকৃতির মর্মসত্যকে চিনতে পারে।

তাছাড়া, মানব-হৃদয়ে প্রতিফলিত নয়, এমন প্রকৃতির সন্ধান কে জানে? আমাদের দেখার বাইরে প্রকৃতির কোনো 'রূপ' আছে কি? তেমন প্রকৃতি আমাদের পক্ষে একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব ছাড়া আর কী?

কবিদৃষ্টি যদি সত্যিই সত্যদৃষ্টি হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাহলে হৃদয়ের মধ্যে যে-রূপটা ধরা পড়ে সেইটেই প্রকৃতির সত্যতম রূপ। কবির কাব্যে যদি 'হৃদয়ের জগতে'র মর্মসত্যটা সত্যিই ধরা পড়ে থাকে, তাহলে তার মধ্যে তথাকথিত বহির্জগতের সত্যটাও অবশ্যই ধরা পড়বে। কারণ সত্য তো আর দুটো নয়, একটাই। সন্দেহ নেই, সাহিত্য অনুকরণ থেকে দূরবর্তী; কারণ প্রকৃতি সম্পূর্ণ অননুকরণীয়। দূরবর্তী, কারণ সাহিত্যের বাণী— বাণী বলেই— প্রতীকধর্মী, অনুকরণধর্মী নয়। তার সত্যতা প্রত্যক্ষ সাংকেতিকতায়; এ সত্যতা প্রতীকের সত্যতার সমগোত্রের।[১৫]

কিন্তু প্রতীকও প্রতীকায়িতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ কথাটায় আপত্তি করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে রিয়ালিটির নিত্য-সংযোগের কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। অনুকরণবাদী এরিস্টট্‌ল-ও কিন্তু এর থেকে খুব বেশি দাবি করেন নি। সংগীতকে যখন তিনি প্রকৃতির অনুকরণ ব'লে— অত্যুত্তম অনুকরণ ব'লে— গণ্য করেন, তখন বুঝতে হবে অনুকরণ কথাটা তাঁর কাছে নিতান্তই একটা পারিভাষিক শব্দ। কাব্যকে তিনি ইতিহাসের থেকে মহার্ঘতর মনে করেন, যা ঘটেছে তার হুবহু বর্ণনার থেকে, যা ঘটতে পারে তাকে তিনি সাহিত্যে বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের মতো এরিস্টট্‌লের কাছেও ইতিহাসের রামের থেকে বাল্মীকির মনোভূমির রাম সত্যতর। তাহলে একথা কি ভাবতে পারি না যে, রবীন্দ্রনাথ যাকে সত্য ব'লে আখ্যা দিয়েছেন, এরিস্টটল তাকেই অনুকরণ ব'লে অভিহিত করেছেন? দু'য়েরই মাপকাঠি যখন জীবনের স্বাক্ষর, তখন— এমন কি হতে পারে না যে, অভিধা দুটো ভিন্ন হলেও, অভিধেয় প্রায় একই বস্তু?

বস্তুত, সত্যকে রাখতে হলে রিয়ালিটির অধিকারকে স্বীকার করে নিতেই হবে। হয়তো সে রিয়ালিটি মানবিক রিয়ালিটি। হয়তো কেন, নিশ্চিতই— তা-ই স্বাভাবিক। মানবিক রিয়ালিটিই মানুষের কাছে একমাত্র রিয়ালিটি, অপর-কিছুর পরিচয় মানুষের জানা নেই। আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলোচনায় এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তা সকলেরই সুবিদিত। মানুষের কাছে জগৎ-ও মানবিক,

---

১৪ সাহিত্যের বিচারক, সাহিত্য

১৫ এ প্রসঙ্গে আর্ন্‌স্ট কেসিরের-এর বিভিন্ন আলোচনা স্মরণীয়। কেসিরের মনে করেন আমাদের 'হৃদয়ের জগৎ'-টা পুরোপুরিই প্রতীকের জগৎ, মানুষের জানা কখনোই তার বাইরে যেতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের জগতের প্রতীকধর্মিতার সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলেন নি। আর্টের প্রতীকধর্মিতার সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য সুজান ল্যাঙ্গারের গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

সত্যও মানবিক। মানবিক জগৎ মানেই হৃদয়ের জগৎ। আসলে জগৎ দুটো নয়, জগৎ একটাই। হৃদয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করি, উপলব্ধিতে তাকে স্বীকার করি, ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সে হয়ে-ওঠে, তাই তাকে বলি হৃদয়ের জগৎ।

এই মানবিক রিয়ালিটিরই নাম জীবন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> 'জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে।...জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে।'[১৬]

সাহিত্যের উপর জগৎ ও জীবনের অধিকারের কথা এর থেকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আর কী ভাবে বলা চলতো? তিনি বলেছেন, সাহিত্যে 'যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই।...যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।'[১৭] সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি।'[১৭] বলেছেন, 'আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত।'[১৭]

উক্তিটি সরল ও স্বচ্ছ; কোনো নিগূঢ় ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে নি। অতঃপর নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে সত্য জীবনেরই সত্য, আমাদের সুপরিচিত সত্য। জীবন সাহিত্যের অনুকরণের আদর্শ নয় বটে, কিন্তু সে-ই সাহিত্যের মৌল উদ্‌বেজক, সে-ই সাহিত্যের উপাদান, সাহিত্যের সামগ্রী। এবং সে-ই সাহিত্য-রূপের চরম নিয়ামক। জীবনই সত্যের উৎস।

৯

এইবারে আমরা আবার সেই পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি: লীলা আর সত্যের সঙ্গতির প্রসঙ্গ। সাহিত্য যদি সত্যিই রিয়ালিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আর তার মধ্যে স্রষ্টার সত্যিকারের মুক্তির অবকাশ কোথায়? সাহিত্যকে যদি কোনো রকম বাইরের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে আর লীলা বলব তাকে কোন্ জোরে?

বলতে পারি, নিয়ন্ত্রণটা যদি বাইরের না হয়। বলতে পারি, লীলা আর সত্য দুই-ই যদি এক হয়; সত্যলাভই যদি মানুষের মুক্তিলাভের পথ হয়। লীলা যদি জীবনেরই স্বধর্ম হয়।

এই উত্তরই রবীন্দ্রনাথের উত্তর। আমি আর না-আমি যুগলে মিলিত: এই যুগনদ্ধ রূপই সাহিত্যরূপ। স্রষ্টা আর রিয়ালিটি পৃথক্ নয়। রিয়ালিটির নিয়ন্ত্রণ স্রষ্টারই আত্মনিয়ন্ত্রণ। তারই নাম মুক্তি, তাকেই বলি লীলা।

সাহিত্য হল 'সহিত-ত্ব', যার অর্থ মিলন। কার সঙ্গে কার মিলন? ভামহ বলেছেন, শব্দের সঙ্গে অর্থের। ওটা বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সকলের সঙ্গে সকলের। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্য যে মিলনে, সাহিত্য সেই মিলনেরই আনন্দরূপ। সেই আনন্দের মধ্যে বিশ্বের মানবরূপ ও মানুষের বিশ্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

---

১৬ সাহিত্যের মূল্য, সাহিত্যের স্বরূপ

১৭ সাহিত্যে চিত্রবিভাগ, ”

মিলনের পিছনে মিলনের আনন্দ ছাড়া যখন আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই তখন একে লীলা ছাড়া আর কী বলা যায়? এই অহেতুক আনন্দই মানুষের স্বধর্ম, জীবনের স্বধর্ম। স্বধর্মপালনেই মানুষের সত্যলাভ, স্বধর্মপালনেই তার মুক্তি।

১০

অনেকের কাছেই এ সমাধান সন্তোষজনক বলে মনে হবে না। আসলে এটা সমাধানই নয়। তার কারণ এতে সমস্যাটাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু যাঁর কাছে জীবনই লীলাময়, যিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যই লীলা, লীলাই সত্য, তাঁর কাছে এখানে আদৌ কোনো সমস্যা নেই।

পাশ্চাত্য লীলাবাদীরা সাধারণত অতদূর যেতে ইচ্ছুক নন। তাঁদের কাছে এটা একটা দুরূহ উভয়-সংকট। হয় তাঁদের বলতে হবে, সাহিত্য সত্য-অসত্যের ধার ধারে না। যেমন ইস্থেট্‌রা বলেছেন। অথবা আধুনিক কালে যেমন রিচার্ড্‌সরা বলে থাকেন। আর না-হয় তাঁদের বলতে হবে, কবিরা সত্যদ্রষ্টা, সত্যস্রষ্টা নন। এবং কাব্য সেই দৃষ্ট-সত্যেরই প্রকাশ। যেমন রিয়ালিস্টরা বলেন। প্রথম বিকল্পে সাহিত্যের গৌরবহানি। দ্বিতীয়তে রোমান্টিকতার গৌরবহানি।

দুই কূল রক্ষার মানসে কেউ কেউ এক তৃতীয় পন্থাও অবলম্বন করেন। সে হল শ্রুতিমধুর অস্পষ্টতার ধূম্রজাল রচনা, গম্ভীর অর্থহীনতার বাগাড়ম্বর। তাতে সত্য, সাহিত্য এবং রোমান্টিকতা তিনেরই গৌরবহানি।

ভারতীয় লীলাবাদ স্রষ্টা ও সৃষ্টির, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদাভেদকে এমন রমণীয়ভাবে একাকার করে দিয়েছে যে, পাশ্চাত্য রোমান্টিসিস্টদের কাছে যা ছিল দুস্তর সংকট, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা-ই হয়েছে স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গের উল্লাস। রোমান্টিসিস্টদের কেউ কেউ অবশ্য শেলিং অথবা হেগেলের হাত ধরে সংকট পার হতে চেষ্টা করেছেন। তাতে সংকটের সুরাহা যদি বা হয়, সাহিত্যের শেষরক্ষা হয় কিনা বলা কঠিন।

সে যা-ই হোক, ঔপনিষদিক মিস্‌টিকতায় উদ্‌বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের আমি ও না-আমির ডায়লেক্‌টিক্‌স্ দৃষ্টি ও সৃষ্টির যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সেখানে সাহিত্যতত্ত্বের কোনো সমস্যাই আর সমস্যা নয়।

সহজেই মনে হতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের এই উত্তর একটি বিশেষ পরাতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই কঠিন এই সমস্যাটির সমাধানকে এমন অভাবিত রকমের সরল করে দিয়েছে। কিন্তু এই পরাতত্ত্ব সম্পর্কে যদি আমরা নিঃসংশয় হতে না পারি? রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ঐক্যতত্ত্বকে যদি আমরা গ্রহণ না করি? তাহলে কি লীলা আর সত্যের জোড় খুলে যায়? তাহলে কি ওদের যে-কোনো একটাকে আমাদের ছাড়তেই হয়? অথবা— এমন কি হতে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথের পরাতত্ত্বকে বাদ দিয়েও, আধ্যাত্মিক ভাবপরিমণ্ডলের বিশিষ্টতা থেকে সরিয়ে এনেও, সত্য আর মুক্তিকে মেলানো যায়— মানুষের স্বভাবের মধ্যেই তাদের সমন্বিত করা যায়?

বিষয়টি চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস
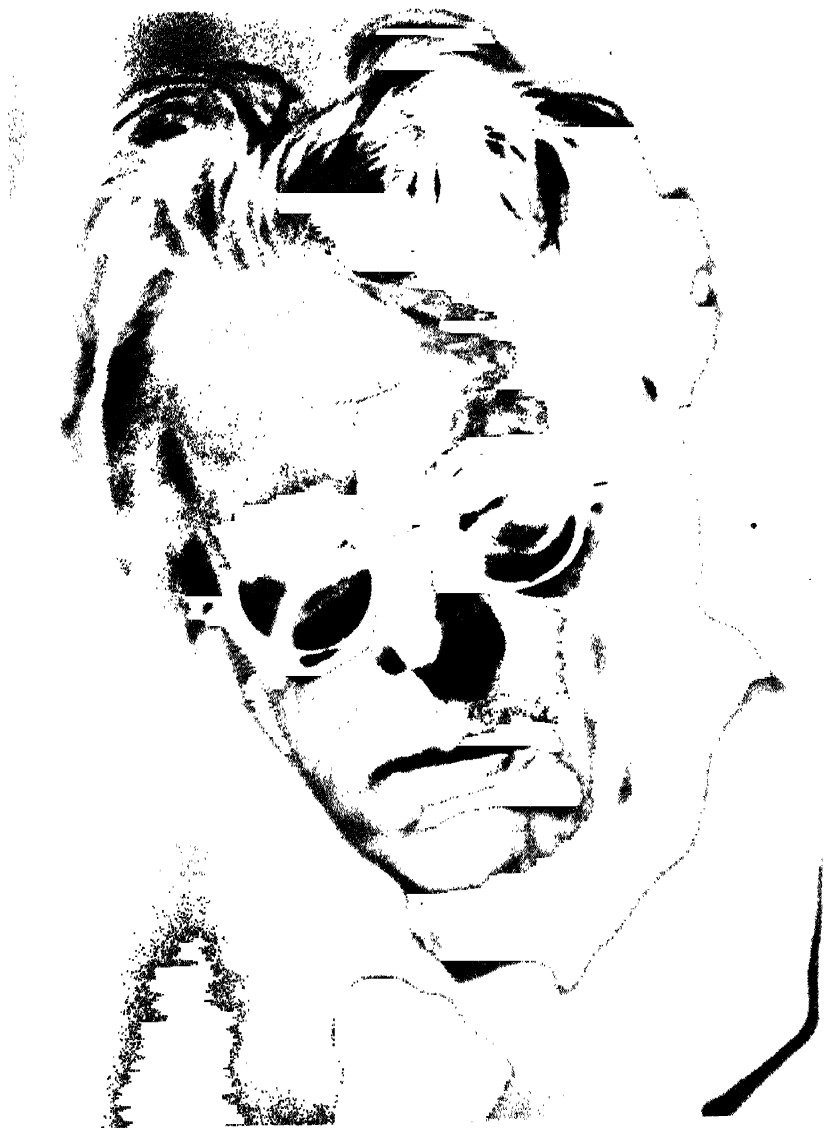
১৮৬৫ ১৯৩৯

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস ১৮৬৫-১৯৩৯

শিশিরকুমার ঘোষ

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, ইংরাজি ভাষায় তো বটেই— এলিয়টের প্রশস্তি অনেকেই মেনে নিয়েছেন, হয়তো এলিয়ট বলেছেন বলেই, কেননা ঐ সম্মানের অধিকারী তো তিনি নিজেই। শ্রেষ্ঠত্বের দাবির কথা বাদ দিলেও ইয়েটসীয় কবিকাহিনীর নানা পালাবদল, এবং পরিবর্তনের মধ্যেও স্বকীয়তা— কি ভাবে কেল্টিক পুরাণ, আইরিশ লোকগাথা, শৃঙ্গার রসের কৈশোর স্বপ্ন, কুহেলিজড়ানো পরিবেশ, নায়কনায়িকা ও ভাবমণ্ডল, সেই ভিক্টোরীয় যুগকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে এসেছেন এক তীব্র, কখনো বা নিরাভরণ, ভাষণের, কঠিনের আকর্ষণে ("the fascination of what's difficult") *terribilita*-এর দিকে— সেই অদম্য গতিময়তা, জটিলতা ও সচেতন আত্মবিরোধের কাহিনী বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যজগতের অন্যতম বিস্ময়।

দু-একটি নমুনা থেকেই সেকথা স্পষ্ট হবে :

> O sigh, o flattering sigh, be kind to me ;
> Flutter along the froth lips of the sea . .
> Flutter along the froth lips of the sea
> And home to me again . .
> And tell me that you found a man unbid,
> The saddest of all men.

বা

> The woods of Arcady are dead
> And over is their antigue joy

থেকে আরম্ভ করে

> But all is changed, that high horse riderless,
> Thought mounted in that saddle Homer rode
> Where the swan drifts upon a darkening flood

বা শেষের দিকের লেখা

> Marbles of the dancing floor
> Break bitter furies of complexity,
> These images that yet
> Fresh images beget,
> That dolphin-torn, that gong-tormented sea.

কারয়িত্রী প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন সন্দেহ নেই। কিন্তু, নির্মোহ বিচারে, তাঁর অসামান্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের

কথা বাদ দিলে ইয়েটসকে প্রবীণ কবি বা প্রজ্ঞাবান বলা অনেক সময় বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। প্রজ্ঞা বা প্রবীণতার দাবি তাঁর সাজে না, সেকথা কবির অজানা নয় :

> No matter what I said,
> For wisdom is the property of the dead,
> A something incompatible with life.

আবার :

> Bodily decripitude is wisdom : young
> We loved each other and were ignorant :

অভিজ্ঞতা বা রূপরীতির পরিবর্তনে, যে-কোনো অভিজ্ঞতাকে যে-কোনো ভাবে বলবার স্বাধীনতা সকল শিল্পীরই আছে, কিন্তু ইয়েটসের কবিধর্মে, সন্দেহ না হয়ে যায় না, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, কিছুটা খাদ মিশেছে যেন। অবশ্য কবির বিবৃতিতে এ জাতীয় আপাতবিরোধ বা নাটকীয়তা বড় রকমের অপরাধ নাও হতে পারে। আর ইয়েটসের পক্ষে এই ভঙ্গী যেমন অপরিহার্য তেমনি স্বেচ্ছাকৃতও বটে।

ভারতীয় পাঠকের কাছে ইয়েটসের অন্য আবেদনও আছে। আধ্যাত্মিক ভাবধারা, বিশেষ করে অতীন্দ্রিয় ক্রিয়াকলাপে, প্রধানতঃ থিয়সফিস্ট সোসায়েটির মারফত, তিনি এককালে যথেষ্ট আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীপুরোহিত স্বামীর সাহায্যে তিনি কয়েকটি উপনিষদের অনুবাদে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া— সে কাহিনী বাঙালী পাঠকের অবিদিত নয়— একদা তিনি ইংরাজি "গীতাঞ্জলি"র মুখর ভূমিকা লিখেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সত্য বলতে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি লেখা সম্পর্কে, তাঁর সম্পূর্ণ অন্য ধারণা হয়েছিল। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর পত্রাবলী হতে সেকথা স্পষ্ট জানা গিয়েছে।

ইয়েটসের প্রথম দিকের লেখার বিষণ্ণ স্বপ্নাভ মায়াময়তা, যা এক সময় অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছিল, আজ দুর্বল বলে নিন্দিত ও অবহেলিত। এমনকি ইয়েটস নিজেও সেকথা মেনে নিয়েছেন : 'আমার সে যুগের লেখায় কোনো গুণই ছিল না' "Nothing I did at the time had merit"। অন্যত্র, সমালোচনার সুরে তাঁকে বলতে শোনা যাবে, 'আমার আগেকার কয়েকটি লেখায়, যাদের আমি পরে বর্জন করেছি, এক ধরণের অসোয়াস্তিকর ভাবালু ভোগবিলাসী মনের পরিচয় মেলে', "I have felt in certain early works of my own which I have long abandoned ··· a slight sentimental sensuality which is disagreeable"। তাঁর এই জাতীয় লেখা সেকালীন (মুখ্যতঃ ফরাসী) নান্দনিক ও প্রতীকীবাদীদের সঙ্গে এক করে দেখা যেতে পারে। নান্দনিকদের বিষয়ে ইয়েটসের দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক, আর্থার সিমন্স প্রণীত "দ্য সিম্বলিস্ট মুভমেণ্ট" তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে 'একমাত্র আন্দোলন যার মধ্যে নূতন কথা শোনা যাবে', "the only movement that is saying new things" উক্তি করা সত্ত্বেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ১৮৯১ সালে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে : 'ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের কাছে শিল্প ও কাব্যকলা এক নূতন নন্দনতত্ত্বের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার জন্য ফ্রান্স বহুলাংশে

দায়ী।' কিন্তু প্রতীকীবাদের দুর্বলতা ও একদেশদর্শিতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি, এমনকি, বাওরার মতে, ইয়েটসের ও কাব্য জীবন সেই সম্প্রদায় বা আন্দোলনের টীকা ও ফলশ্রুতি।

অথচ তাঁর প্রথম যুগের স্বপ্নাবেশের মধ্যেও ("Dream, dream, for this also is sooth") এক বৃহত্তর বাস্তব, এমনকি গণমানসের আভাস রয়েছে। আইরিশ গাথা ও লোকসাহিত্য নিয়ে রচিত তাঁর কাব্য এক সামাজিক সার্থকতার সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে তিনটি প্রধান সুর লক্ষণীয়: গ্রামীণ পরিবেশ, ঐতিহ্যবোধ ও রাখালিয়া বিশ্বাসের জগৎ। শেষেরটিই অধিকতর স্পষ্ট, যদিও ইয়েটসের লেখায় আঞ্চলিকতা (regionalism) তেমন প্রত্যক্ষ নয় এবং 'প্রকৃতির কাব্য' নেই বললেই চলে। আর, তখনো, ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। অবশ্য পরবর্তী কালে সে-ধারণার বিপুল বিস্তৃতি—অনেকের মতে বিভ্রান্তি বা পলায়নী মনের পরিচয়—দেখা যাবে। তবে প্রথম থেকেই ইয়েটস মনে করতেন যে, জনচিত্তের বিশ্বাস ও অনুভূতির মাধ্যমে কাব্যের পুনরুজ্জীবন সম্ভব, "As you know, all my art theories depend just upon this—rooting of mythology in the earth"। সত্তা ও সংস্কৃতির ঐক্য ("unity of being and unity of culture") সম্পর্কে তাঁর ভাবনার সূত্রপাত এইখানে। এই ঐক্য, বা অনৈক্যকে, আয়ত্তে আনবার উদ্দেশ্যে ইয়েটস আজীবন একাধিক উপায় বা রীতি অবলম্বন করেছেন এবং হয়তো কখনোই সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। বিবাদী ভাব বা সুর তার চিরসঙ্গী। ঐক্যের কথা বলাই যথেষ্ট নয়। অনুভবে, জীবনে, বিশ্বাসে ও ব্যবহারে সংগতি না থাকলে কাব্যে তার প্রতিফলন হওয়া কঠিন। এবং হলেও সে হবে রীতি বা বচন-সর্বস্ব, এক ধরণের কাব্যিক ঔদ্ধত্য বা অলংকার। ইয়েটস সম্পর্কে এই ধরণের ধারণা বা সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য স্বতোবিরোধ ইয়েটসের, বলতে গেলে আধুনিক কবিমাত্রের, নিত্যসহচর। বিশুদ্ধ 'সাহিত্যে'র দ্বারা সে শাপমোচন হবার নয়। সে দিক দিয়ে তিনি অবশ্যই যুগবেদনার, ব্যর্থতার প্রতীক।

নানা রঙ্গের রঙ্গী এবং যথেষ্ট মাত্রায় খামখেয়ালী কবি ইয়েটস প্রথম হতেই বহু প্রকারের ঠাটঠমক জানতেন। মুখোশ (Mask) ও আত্ম-বৈপরীত্য (Anti-self) যে তাঁর আত্মদর্শনের অঙ্গ হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। লীলার ধারাপাতে এ নামতাও মুখস্থ করার মত। কবির নিজের কথাতেই, নিজেকে প্রতিবাদ করাই মুখোশের ধর্ম: "the anti-self is the Mask", "a being in all things opposite to the natural state"। ইয়েটস জানতেন তিনি কেবলই নিজের বিরুদ্ধে কান্না কেঁদেছেন: "I cry continually against my life"। (বোধহয় আইরিশ লেখকমাত্রেই তাই, বলেছিলেন বার্ণার্ড শ।) ব্যাপারটির গুরুত্ব আছে, অন্ততঃ ইয়েটসকে বোঝার পক্ষে। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে: 'আমরা নিজেরা যা যদি তা হতে বিপরীত কিছু কল্পনা করতে অসমর্থ হই, এই দ্বিতীয় সত্তাকে গ্রহণ করতে না পারি, তা হলে আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হব, যদিও অপরের কোনো নিয়ন্ত্রণ সে ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া সম্ভব। নির্দিষ্ট বিধানের নিষ্ক্রিয় সমর্থন থেকে স্বতন্ত্র যে সক্রিয় গুণাবলী তা স্বভাবতই কৃত্রিম, স্বচেতনভাবে নাটকীয়—এ যেন এক ধরণের মুখোশ ধারণ। "If we cannot imagine ourselves as different from what we are, and try to assume that second self, we cannot impose a discipline upon ourselves though we

may accept one from others. Active virtues, as distinguished from passive acceptance of a code, is therefore theatrical, consciously dramatic, the wearing of a mask"।

মুখোশ বা নাটুকেপনা কিন্তু একই সঙ্গে দুটি কাজ করে থাকে ; সে যেমন নিজেকে আড়াল করে তেমনি প্রকাশও করে, এবং যাকে সে আড়াল এবং প্রকাশ করছে তা হল, এলম্যান ঠিকই ধরেছিলেন, কবির খণ্ডিত সত্তা বা মানস। এক কথায়, ইয়েটসের কাব্য ও শিল্প আগাগোড়া এক বৈপরীত্য, সংগ্রাম ও অভিনয়ের কাহিনী। মিস্ স্টকের মতে কাল ও কালাতীতের অনিঃশেষ দ্বন্দ্ব তাই হল ইয়েটসের কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। কিন্তু সদসতের এই দ্বন্দ্ব তো কাব্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, মায় বিজ্ঞান, সবেরই আধার ও উপজীব্য, 'জগৎ' শব্দের অর্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ কি তাই স্পষ্ট করে নি ? এদিক দিয়ে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে, কোনো কবিই বোধহয় মৌলিকত্বের দাবি করতে পারেন না। যা করতে পারেন তা হল রীতি বা প্রকাশের বিশেষত্ব, স্বকীয়তা। ব্যথিত হৃদয়েই জাগে অক্ষয় শিল্পের স্বপ্ন, "Only an aching heart conceives a changeless work of art—বক্তব্যে নূতনত্ব বা অসাধারণত্ব নেই, তবে ভঙ্গীটি অবশ্যই কবির নিজস্ব। একই কথা, ধুয়া, ইয়েটস নানাভাবে বলেছেন, সকল কবিই বলেছেন, বলতে বাধ্য :

> What's the meaning of all song?
> 'Let all things pass away.'
>
> The innocent and the beautiful
> Have no enemy but time.
>
> In all poor things that live a day
> Eternal beauty wandering on her way.

ইয়েটস সারাজীবন একাধিক মুখোশ ব্যবহার করেছেন, ভোল পালটেছেন—বক্তব্যকে প্রবল করার আগ্রহে কখনো আশ্রয় নিয়েছেন লোকগাথায়, রাজনীতি বা আভিজাত্যের আড়ালে ; ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব পুরাণ, মিথ্, আবিষ্কার বা আরোপ করেছেন ইতিহাসের বিশেষ ধারা ও বিবর্তন। বলতে গেলে সবটাই মুখোশের মেলা।

রচনার আদি পর্বে, প্রতীকবাদের আচার্য মালার্মের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে যুবক কবির কণ্ঠে : শব্দই সার, "words alone are certain good"। জীবনের প্রান্তভাগে নানা বিরোধী ভাবনার মধ্যে আবার উচ্চারিত হয়েছে শিল্পের অমরাবতীর সপক্ষে বিবৃতি, করুণ অথচ দৃপ্ত : "the artifice of eternity", "monuments of unageing intellect"। আদিতে ও অন্তে তাঁর শিল্পের সংজ্ঞা ও প্রেরণা এক ও অভিন্ন। পার্থক্য কেবল রীতির, দুর্বল ভাষণের পরিবর্তে এসেছে সুদৃঢ় ঘোষণা। তবে অনুরাগীর দল উচ্চগ্রামে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ জনের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ইয়েটসের স্বকপোলকল্পিত শিল্প-অমরাবতী—যাকে তিনি বলেছেন বীজানটিয়াম (Byzantium)—কীটশীয় কবিতার ("ওড টু দ্য গ্রীসন্ আর্ন") হেরফের, আর সেই স্বপ্নলোকের আকর্ষণে ইতিহাস ও কাল উভয়কেই তিনি অস্বীকার করতে

চেয়েছেন, নেতিবাদকেই ধরে নিয়েছেন কল্পলোকের ছাড়পত্র হিসাবে। "Once out of nature," প্রকৃতির রাজ্য থেকে নির্বাসন সে কি এক ধরণের বার্ধক্যজনিত ভয়প্রসূত বিশেষ এক মনোভাবের পরিচায়ক নয়? "That is no country for old men"? মহৎ কবির রূপান্তর সাধনা একে বলব কি করে? যৌবনের ইনিস্‌ফ্রি স্বপ্নপ্রয়াণ ("I will arise and go to Innisfree"), প্রতি কাব্য সংকলনে যার অবধারিত উপস্থিতি অনেককেই তার প্রতি বিরূপ করেছে, "The Lover Tells of the Rose in his Heart" এবং শেষ জীবনের বহুব্যাখ্যাত বীজানটিয়াম কবিতা দুটির মধ্যে কবিপ্রেরণার বড় বেশি বদল হয় নি, একই স্বপ্নসৌধের বিভিন্ন সংস্করণ এরা, পলায়নী মনের রাজসংস্করণ, সেই গজদন্ত-মিনার বা "tapestry empyrean—এর এপিঠ-ওপিঠ। উভয়েই চোখ ফিরিয়েছে রক্তমাংসের পৃথিবী হতে।

একটি পার্থক্যের সাহায্যে ব্যাপারটিকে বোঝা সহজ হবে। সাধুসন্তদের, যাঁদের জীবনশিল্পী বলতে পারি, প্রসঙ্গে ইয়েটসকে বলতে শোনা গিয়েছে :

> The intellect of man is forced to choose
> Perfection of the life or of the work.

ইয়েটস নিজের জন্য কোনটি বেছে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বীজানটিয়ামকে তিনি পবিত্র নগরী ("holy city") বলে বর্ণনা করেছেন বটে; এই প্রসঙ্গে "O sages standing in God's holy fire"-এর কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্রতাবোধ ও প্রজ্ঞাবানদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিয়ে সন্দেহ করা চলে। এ এক ধরণের মেজাজ বা শিল্পকৌশল। দ্রব্যগুণ বা অ্যালকেমি নিয়ে তাঁর পূর্ব অনুরাগ সত্ত্বেও রূপান্তরের রহস্য জানা নেই চিরচঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত কবির। "ড্রামাটিস পার্সনী" গ্রন্থে লেখকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কাল্পনিক স্বর্গের মরীচিকা সৃষ্টি করার কাজ থেকে তিনি কখনোই বিরত হতে পারেন নি, "the deliberate creation of a Kind of Holy City of the imagination."। কিন্তু কালকে এড়িয়ে যেতে চাইলেই তো কালজয়ী হওয়া যায় না। অর্থাৎ মহাকালের বিচারে তিনি, আশ্চর্য কবি, মহৎ শিল্পী বলে পরিগণিত নাও হতে পারেন। ইয়েটসীয় কাব্যজগৎ, তার বিশিষ্ট ধ্বনি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও বৃহৎকে স্পর্শ করেছে কি না সন্দেহ করা চলে। ডি. এস. স্যাভেজ ব্যাপারটিকে নিষ্ঠুরভাবে ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, ইয়েটসের শিল্পচাতুর্য আদতে শূন্যগর্ভ, বাস্তববোধ-বর্জিত, "development in a vacuum"। কথাটি শুনতে খারাপ কিন্তু ভেবে দেখবার মত।

তবুও স্বীকার করতেই হয় যে কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনকে ব্যবহার করে—"using his feeling of multiple personality he created peoms"—তাঁর কাব্যরূপায়ণ সহজেই একটি বিশিষ্টতা দাবি করতে পারে :

> The note they waken shall live on
> When all this heavy history's done . .

সেদিক দিয়ে অসংখ্য ব্যক্তিগত ঘটনা ও বিরোধকে প্রয়োগ বা অতিক্রম করে ইয়েটসের সমগ্র কাব্যরচনা একটি আশ্চর্য সংহতি লাভ করেছে। তাঁর সমস্ত কবিতা মিলিয়ে যেন একটি কবিতা। স্বতোবিরোধ? সে তো প্রকাশের, আত্মপরিচয়ের আর-এক উপায়। মুখোশের সপক্ষে ইয়েটসের বক্তব্য ছিল যে সত্যকে পেতে হলে এ একটি অপরিহার্য উপায় : "The other self, the anti-self or the antithetical

self comes but to those who are no longer deceived, whose passion is reality."। শেষের কথাটি লক্ষ্য করবার মতন। তবে বহুরূপী অভিনেতার স্বর্গে বিবেকের বা সংগতির বালাই নেই।

প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে বিশ্বপ্রপঞ্চকে এক আত্মকেন্দ্রিক রঙ্গমঞ্চের কোঠায় নামিয়ে আনলেও নাট্যকারের অনুরূপ প্রতিভা ইয়েটসের ছিল না। তাঁর প্রতীকী নাটক আপনা হতেই রঙ্গমঞ্চ হতে বিদায় নিয়েছে। প্রবল অহংবোধ তাঁকে নিস্পৃহ আত্মসমালোচনা ও নাট্যকারের উপযোগী নঙর্থক সামর্থ্যের ("negative capability") হাত থেকে রেহাই দিয়েছে। একই কারণে আধুনিক কাল ও তার সমস্যা বোঝার ব্যাপারেও তিনি বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছেন। যুগজীবন ও বেদনার মধ্যে থেকে তিনি নৈতিক সার্থকতা খুঁজে পান নি, স্টিফেন স্পেণ্ডারের এ অভিযোগ খণ্ডন করা কঠিন। ইয়েটসের বক্তব্য অনেক সময় রমণীয়, কখনো বা আশ্চর্যরকম চমকপ্রদ, কিন্তু তার পিছনে সত্যদৃষ্টির চেয়ে "প্যাসন"-এর পরিমাণই বোধহয় বেশি। যেমন ইয়েটস যখন বলেন :

Things fall apart, the centre cannot hold
And mere anarchy is let loose upon the world

ভারি অবাক লাগে : কি সংহত, দৃঢ়, প্রবক্তার ভাষা! কিন্তু আসলে তিনি সমকালীন সংকটের কথা মোটেই ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাসদর্শনের কথা, যার জটিল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে "এ ভিজন্"-এর চক্র, বলয়, শঙ্কু-জ্যামিতি ও কুণ্ডলীর সাহায্যে, সেই নব্য ভৃগুসংহিতার সাহায্যে অনাগত যুগের দৈবী ঘোষণায়। অর্থাৎ পরিপার্শ্বিকের অবলম্বনে কাব্যরচনার কাজে তিনি ততটা সফল হন নি। তাঁর বাস্তবনির্ভর রচনা অনেক সময় অসার, উদ্ভট বা অযথা রঙচড়ানো মনে হতে পারে। পরিবেশের প্রতি আক্রোশ ("Indignation at Public Affairs") সব সময়ে মহৎ কাব্যরচনায় সাহায্য নাও করতে পারে। তাঁর অনুরাগীবৃন্দ ইয়েটসের প্রজ্ঞার প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু এর অনেকটাই, তিনি নিজে সেকথা জানতেন না এমন নয়, বুড়ো মানুষের গোঁ, মেজাজি ঔদ্ধত্য ও অনেক সময় অশোভনতার আর এক নাম।

তাঁর কয়েকটি 'রাজনৈতিক' কবিতায় ইয়েটসের নৈতিক শিথিলতা লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ইস্টার বিদ্রোহের কথা বাদ দিচ্ছি, সেখানে, ক্ষণিকের জন্য হলেও,

All changed, changed utterly.
A terrible beauty is born.

কিন্তু হেনরি জেমস তাঁকে একটি যুদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখতে অনুরোধ করলে তিনি কতকটা রসিকতার সুরে যা লিখলেন তা এই :

On Being Asked for a War Poem

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman right;
He has had enough meddling who can please
A young girl in the insolence of her youth
Or an old man upon a winter's night.

'পলিটিকস' শীর্ষক কবিতাটি আরো চমৎকার :

> How can I, that girl standing there,
> My attention fix
> On Roman or on Russian
> On Spanish politics? . .
> But O that I were young again
> And hold her in my arms!

কোনো দায়িত্বসম্পন্ন বয়স্ক লেখক এই জাতীয় বিবৃতি দিতে পারেন ভাবতে অবাক লাগে। হয়তো আসলে মানসিক দৈন্য ঢাকবার এ এক উপায়। এর সঙ্গে তুলনা করুন হার্ডির সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ "At the Time of Breaking of Nations" বা উইলফ্রেড ওয়েনের "Greater Love"। লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবার্ট গ্রেগরিকে ("our Sydney and our perfect man") নিয়ে লেখা কবিতাটিতে ("In Memory of Major Robert Gregory") যুদ্ধের কোনো উল্লেখ নেই, যেন তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। অথবা, অন্য একটি কবিতায় :

> Aeroplane and Zeppelin will come out,
> Pitch like Billy bomb-balls in
> Until the town lies flat.

অথবা "weasels fighting in a hole"— এ জাতীয় রচনায় অন্তর্দৃষ্টির চাইতে দায়িত্ববোধের অভাবই চোখে পড়ে।

প্রসঙ্গতঃ সমসাময়িকদের বিচার করার ব্যাপারে ইয়েটস একাধিক পক্ষপাতের এ হেন উদাহরণ রেখে গেছেন যা অনুমোদন করা অসম্ভব। যেমন তাঁর দ্বারা সম্পাদিত "অকসফোর্ড বুক অফ মডার্ন ভার্স"-এ উইলফ্রেড ওয়েনকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া এবং ওয়াল্টর পেটারের মোনা লিসা শীর্ষক গদ্যে লিখিত কাব্যিক অংশটিকে ("purple patch") প্রথম আধুনিক কবিতার নজির হিসাবে ব্যবহার করা। এ সমস্ত অসংগতির মধ্যে বিচারের চাইতে মেজাজের অংশই বেশি।

অসংগতি তাঁর আদিতে, মধ্যে, অন্তে। এমনিতে তিনি লোক-সংস্কৃতির ও প্রাচীন ঐতিহ্যের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। নিজে না গিয়ে সিঙ্গকে অ্যারন দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আদতে ইয়েটস নিঃসঙ্গ লেখক, যিনি নানা রকম উপায়ের সাহায্যে, চেয়েছেন এক বৃহত্তর ইতিবাচক সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত হতে। যদিও শেষবয়সে তিনি বলেছেন : "And say my glory was I had such friends," "Friendship is all the house I have," তিনি জানতেন শিল্পীর নিঃসঙ্গ বেদনা ও অসহায়তা, জানতেন শিল্প একাকীর একতারা : "Art is solitary man"। তিনি যে আইরিশ সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু যে চিরন্তন আয়র্লণ্ডের কথা তাঁর নানান কবিতায় দেখা যায় তা নিঃসন্দেহে মনের মাধুরী মিলায়ে রচিত, সেখানে ইতিহাসের চেয়ে কল্পনা ও কিম্বদন্তীর পরিমাণই অধিক। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে অদ্ভুত অশরীরী নায়কের দল : কুকুলেন, ফার্গাস, ইঙ্গাস

প্রভৃতি যাদের বাদ দিয়ে ইয়েটসের মনোজগৎ বিকল। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি আইরিশ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বটে, পরাধীন দেশের সাহিত্য-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এর কোনোটির সঙ্গেই তিনি সম্পূর্ণ একাত্ম নন। তিনি বরাবরই একক ও বেপরোয়া, অন্ততঃ এই দুটি ভূমিকায় তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে। নিজেকে বেমানান মনে করার রোমান্টিক মনোভাব তাঁর যথেষ্ট মাত্রায় ছিল: "We were the last romantics"। বিশেষণের অত্যুক্তি বাদ দিলে কথাটি সত্য। সামগ্রিক ও সামাজিক জীবনের, জীবনবোধের অভীপ্সা ইয়েটসের হয়তো ছিল, হোক তা অতীতের বা অসংখ্যের, শাস্ত্র, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে, তবুও ইয়েটস আদতে একাকী, নিঃসঙ্গ হৃদয়ের কবি, কখনো করুণ কখনো রৌদ্র। এবং যেহেতু এই একাকিত্বের বিবর্ণ ছায়া সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র, তিনি— ও তাঁর মতন আরো অনেকে— অনায়াসে বিদগ্ধ অর্থাৎ ছিন্নমূল সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং মহৎ কবি হিসাবে রঙ্গমঞ্চ দখল করে বসে আছেন। এও সিম্বলিজমের ও কাব্যকৈবল্যের জের।

নিঃসঙ্গ নায়কের বেদনা, বিদ্রোহ বা ঔদ্ধত্যের ভঙ্গী ("the lonely impulse of delight") প্রকাশ করার ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত, জীবনে মরণে এই ভঙ্গী বা 'পোজ'টি তাঁর একান্ত নিজস্ব:

> Some moralist or mythological poet
> Compares the solitary soul to a swan . .
> The wings half spread for flight
> The breast thrust out in pride
> Whether to play or ride
> Those winds that clamour of approaching night.

অথবা যবনিকার ঘনায়মান আভাসে:

> But all is changed, that high horse riderless,
> Though mounted on that saddle Homer rode
> Where the swan drifts upon a darkening flood . .

অবাক লাগে— না, লাগে না?— কেন তিনি, একাকীর কবি, সঙ্গীহীন বলাকা, এত অধীর হয়ে যত্রতত্র সন্ধান করেছেন বিশ্ববীক্ষা, জীবনদর্শন ও ইতিহাসের সারাৎসার ও কার্যকারণসূত্র। অনেকেই সন্দেহ করেছেন স্ত্রীকে 'মিডিয়াম' করে তিনি "এ ভিজন্" নাম দিয়ে নানা আজগুবি ইতিবৃত্ত দিয়ে ভর্তি যে ব্যাখ্যান-যন্ত্রটি নির্মাণ করেছেন তার কতটুকু তিনি নিজে সত্যি বিশ্বাস করতেন অথবা তাঁর কাব্যকে বোঝার পক্ষে এই সুবৃহৎ টীকাটিপ্পনী কতখানি প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। আন্তরিক বিশ্বাস হতেই প্রতীকী শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভব, "All symbolic art should arise out of a real belief," ইয়েটসের এ উক্তি মেনে নিলে তাঁর নিজের শিল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এ-বিষয়ে তাঁর নিজেরই অন্যান্য উক্তি রয়েছে: 'অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন চন্দ্রসূর্যের গতিবিধির বিবরণ ইত্যাদি যা আমার বইয়ে দেখা যায় সে সব আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি কি না। এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, অভিজ্ঞতার এক সংহত রূপ হিসাবেই আমি এদের গ্রহণ করে

থাকি, একটি ঐক্যদৃষ্টির সন্ধান দিতে এরা আমাকে সাহায্য করেছে', "Some will ask whether I believe in the actual existence of my circuits of sea and moon. To such a question I can but answer that···now that the system stands out clearly in my imagination I regard them as a stylistic arrangement of experience···. They have helped me to hold in a single thought reality and justice." অন্যত্র তিনিই আবার বলেছেন, এ সমস্তই তাঁর চিন্তার পটভূমিকামাত্র, পটে আঁকা ছবি, "just a background for my thought, a painted scene." আবার: 'আমার পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল এমন একটি বিচারসম্মত দর্শনের যা আমার কল্পনাকে অনায়াসবিহারের স্বাধীনতা দেবে', I had a practical need. I wished for a system of thought that would leave my imagination free to create as it chose." কিন্তু এই 'ক্রিয়েশন্' কি ধরণের হবে তার ইঙ্গিত অন্য একটি ব্যাখ্যানের সাহায্যে পাওয়া যাবে। ভৌতিক পরীক্ষানিরীক্ষার কালে যে সব অশরীরীরা ইয়েটসের কাছে আবির্ভূত হতেন, কবি নিজেই স্বীকার করছেন সেকথা, তাঁকে কেবল কাব্যের উপমা— "metaphors for poetry"— সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করার জন্য। বিশুদ্ধ কবির পক্ষে তাই হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু বিশ্বাসের সমস্যার সদুত্তর এতে নেই।

অথচ যথার্থ ধর্মকেন্দ্রিক বা ভবিষ্যদ্বক্তা না হয়েও ইয়েটসের শেষের দিককার লেখায় গাম্ভীর্যপূর্ণ বিবৃতির অভাব নেই, এদের ভাব ও ভাষা কবির একান্ত নিজস্ব, যার প্রসঙ্গে লিপিকুশলতার অতিরিক্ত কিছু। ধরা যাক "লেডা অ্যাণ্ড দ্য সোয়ান" কবিতাটির কথা। সনেটের ক্ষুদ্র কলেবরে সংহত হয়েছে সভ্যতা ও ইতিহাসের পালাবদলের বিদ্যুৎবহ্নি, ইয়েটস নিজেই একে বলেছেন, "a classic enunciation", ধ্রুপদী বিবৃতি, নব্য ধ্রুপদী, যৌন, যুদ্ধ ও মৃত্যুর যুগান্তকারী কাব্যোজ্জ্বল টীকা:

> A shudder in the loins engendered there
> The broken wall, the burning roof and tower
> And Agamemnon dead.

অথবা "দ্য সেকেণ্ড কামিং"-এর ভয়াবহ আসন্নতার কাসানড্রাসুলভ দ্রুত ও নিবিড় অনুমান:

> Surely some revelation is at hand,
> Surely the second coming is at hand;
> The darkness drops again; but now I know
> That twenty centuries of stony sleep
> Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
> And what rough beast, its hour come round at last,
> Slouches towards Bethlehem to be born?

পালাবদলের আতঙ্ককে কাব্যরূপ দিয়েছে যাঁর কল্পনা তাঁর একটি প্রধান আশ্রয় ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের ("Ancestral Houses") রেওয়াজ ও আচার, পারম্পর্য, লেডি গ্রেগরির সঙ্গে পরিচয় যার রসদ ও প্রতীক জুগিয়েছে। কিন্তু এও তাঁর আর একটি মুখোশ। তাঁর কয়েকটি লেখা পড়লে মনে

হয় রাজকবি হবার চাইতে রাজমিস্ত্রী বা আলংকারিক হতে পারলে তিনি যেন সব চেয়ে খুশি হতেন। অবশ্য আভিজাত্যের বন্দনা নান্দনিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা এই তো তাঁদের আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা, কল্যাণরাষ্ট্র। কন্যাকে উপলক্ষ্য করে কবির মনের এই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে :

And may the bridegroom bring her to a house
Where all is accustomed, ceremonious,
For arrogance and hatred are the wares
Peddled in the thoroughfares.
How but in custom and ceremony
Are beauty and innocence born?

এ কিন্তু একটি বিশেষ ভাব বা 'মুড'-এর কথা। তার অন্যান্য বহু রচনায় আচারনিষ্ঠতার, এমনকি সাধারণ শালীনতাবোধের যথেষ্ট অভাব দেখা যাবে। তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি :

We were the last romantics— chose for theme
Traditional sanctity and loveliness

নির্ভরযোগ্য নয়। 'লাভলিনেসে'র অংশটুকু ঠিক হতে পারে, 'স্যাংটিটি' হয়তো নয়। অবশ্য কবির অভিধানে 'লাভলিনেস' ও 'স্যাংটিটি' এক হতে বাধা নেই। প্রথম জীবনের প্রেয়সী, মড গনকে তিনি কখনো ভোলেন নি অথচ তদীয়া কন্যার পাণিগ্রহণের উদ্ভট ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন প্রৌঢ় কবি। এক কবিতায় মড গনের সঙ্গে তিনি হেলেনের যে তুলনা দিয়েছেন তাতে পবিত্রতার (sanctity) নাম গন্ধ নেই, যা আছে, এবং প্রচুর মাত্রায় আছে, তার চিরাচরিত নাম প্যাসন। এই বর্ণনা বা তুলনাকে ঐতিহ্যবাদী (traditional) বলে মেনে নিতে হলে ইয়েটসের নিজের ব্যাখ্যাই মেনে নিতে হয়।

Why should I blame her that she filled my days
With misery, or that she would of late
Have taught to ignorant men most violent ways,
Or hurled the little street upon the great? . .
Why, what could she have done, being what she is?
Was there another Troy for her to burn?

এ যে কবির ভাষা, অসাধারণ বাক্‌পটুতা, সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে অন্যান্য অনেক লেখায়— কায়কল্পের ফলে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক না কেন— ইয়েটস, "wild old wicked man", শালীনতার তোয়াক্কা করেন নি। ফলে তাঁর শেষ বয়েসের আদিরসাত্মক লেখায় এক আশ্চর্য তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা দেখা দিয়েছে, যা রুচিবাগীশকে বিব্রত করবে। "There's more enterprise in walking naked"— এ তার পূর্বাভাস। তাঁর এই ধরণের কবিতাগুচ্ছের— যথা "Crazy Jane", "A Man Young and Old," "A Woman young and Old"— জীবনকে, অর্থাৎ যৌনজীবনকে, খোলাখুলিভাবে স্বীকার করার ফলে তিনি অনায়াসে নোংরা কথা বলতে পেরেছেন, কেননা এখন তাঁর এই জ্ঞান হয়েছে যে—

But love has pitched her mansion in
The place of excrement.

অতীতের সেই স্বপ্নঘেরা ভাবলোক—"Tread softly because you tread on my dreams"—আর এই! কিন্তু রূঢ় বাস্তব ও নগ্নতাকে স্বীকার করার ফলেই উদ্দীপনার মুহূর্তে আজ ট্র্যাজিডিও তাঁর কাছে উল্লাসের নামান্তর মনে হয়েছে। খানিকটা নীটশের ঢঙে ট্র্যাজিডির নায়ক সম্পর্কে তিনি অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন: "Hamlet and Lear are gay"। সমস্ত কিছু ভাঙাগড়ার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে সৃষ্টির আনন্দধারা। পেয়ালাখানা যায় যদি টুটে যাক না!

All things fall and are built again,
And those that build them again are gay.

একথা তিনি বিশেষ করে জেনেছেন জীবনের শেষ ভাগে। নিজের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার কালে তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, জরাই তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। মানুষের মুখ্য ভয় মৃত্যুভয়, বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দিককার একটি লেখায়। বইয়ের প্রুফ দেখার কালে প্রিয় বান্ধবী ওলিভিয়া সেকসপীয়ারকে এক পত্রে (জুন ৩০, ১৯৩২) ইয়েটস লিখছেন: 'অবাক লাগে এই ভেবে যে লোকটা একই বিষয় কতভাবে বলেছে···বার্ধক্য নিয়ে আমার আক্রোশের কথা লিখেছিলাম "দ্য ওয়াণ্ডারিংস অফ উশেন" তখন আমার বয়েস কুড়ি পেরোয় নি···এই বইয়ের শেষ দিকে সেই কথাই আবার ফিরে এসেছে, "I keep saying what man is this who···says the same thing in so many different ways. My first denunciation of old age I made in 'The Wanderings of Ushen' before I was twenty and the same denunciation comes in the last page of the book." একই কথা, তবে রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর কি পার্থক্য! ইয়েটস লক্ষ্য করেছেন সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী হয়েছেন চঞ্চলা। ইয়েটস লিখছেন, এখন আমার বয়েস হয়েছে, বেতো রোগী, চেহারার নেই কোনো ছিরি অথচ কাব্যলক্ষ্মী নবীনা, "And now I am old and rheumatic, and nothing to look at, but my Muse is young"! তাঁর একালীন অনেক রচনাই বার্ধক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশের নিখুঁত ছবি: "Quarrel in Old Age"। অবশ্য বিষয় হিসাবে এটি নূতন নয় (কাব্যের বিষয়বস্তুর বড় একটা পরিবর্তন হয় না), কিন্তু ইয়েটসের বক্তব্য অর্থাৎ অনুভবের রীতি সম্পূর্ণ নিজস্ব, আধুনিক।

What shall I do with this absurdity—
O heart, O troubled heart—this caricature
Decriepit age that has been tied to me
As to a dog's tail?

অপূর্ব উপমা সন্দেহ নেই! এ-হেন পরিস্থিতিতে কবির ("old bellows full of angry wind") অভিনব প্রার্থনা:

Grant me an old man's frenzy,
Myself I must remake ...

Till I am Timon and Lear
Or that William Blake.

ইয়েটসের বহু শ্রেষ্ঠ কবিতাই যে বার্ধক্যের ফসল সেকথা না মেনে উপায় নেই। ব্যাপারটিতে সমবেদনা প্রকাশ করে— "To what honest man, old enough, can these sentiments be entirely alien ?"— এলিয়ট এই কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

You think it horrible that lust and rage
Should dance attendance upon my old age ;
They were not such a plague when I was young :
What else have I to spur me into song?

আশ্চর্য জবানবন্দী সন্দেহ নেই। তবে ইয়েটসীয় ভাষ্য অনুসারে, আদিম পাপই তো ছিল হোমারের প্রেরণা ও বিষয়বস্তু : "What theme had Homer but Original sin ?" তাই বুঝি বীজানটিয়াম কবিতার শুদ্ধিনৃত্যের— "dying into a dance/an agony of trance"— পরও আছে "ক্রেজি জেন"-এর যৌনউল্লাস। এর কারণ কি ব্যক্তিগত ? একটি পত্রে তিনি জানিয়েছেন : "I was ill but full of desire", আমি অসুস্থ অথচ কামনায় উদ্বেল ছিলাম। আর তাই কি পণ্ডিতি টীকাকারদের ("Scholars") প্রতি হেনেছেন দুর্বর্ষ শ্লেষ ?

Bald heads, forgetful of their sins,
Old, learned, respectable bald heads
Edit and annotate the lines
That young men, tossing on their beds,
Rhymed out in love's despair
To flatter beauty's ignorant ear.
All shuffle there ; all cough in ink ;
All wear the carpet with their shoes ;
All think what other people think ;
All know the man their neighbour knows.
Lord, what would they say
Did their Catullus walk that way?

সব মিলিয়ে ইয়েটসের কবিকীর্তি, বা মহৎ কবি হিসাবে তাঁর অধিকার নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েই যায়। তিক্ততা যে তাঁর পক্ষে এক ধরণের বিলাস— "content to be bitter"— একথা মনে না হয়ে যায় না। কবিচিত্তে একাধিক উভয়সংকট, কখনো বা বিজয়ীর দৃপ্ত ঘোষণা কখনো বা স্বপ্নাভ বিষণ্ণতা : "self-delighting reverie", "hate of what's to come", "pity for what's gone"— এবং, সবার শেষে, "coming emptiness"।

ইয়েটসের লেখায় একই কালে পাওয়া যাবে কাব্যচাতুর্য ও মহিমোজ্জ্বল উদ্দীপ্ত কাব্য, বিশ্বসংসারের সকল অসংগতির বিরুদ্ধে শেষ আঘাত : "last defence against the chaos of the world"। অনেকের মতে আমাদের এই অকাব্যিক যুগে প্রতিকূল পরিবেশে কবির একলা চলা— "walk alone", "There's no truth save in thine heart"— সার্থক করেছেন কবিকুলের প্রতিভূ, ইয়েটস। আবার অপরে মনে করতে পারেন যে তাঁর আপাত-চমক-লাগানো বক্তব্যের বেশির ভাগই যাদুমন্ত্রে বিশ্বাসী খেয়ালী কবির রচনা, এ কাব্যের মহত্ত্বের অনেকটাই শব্দনির্ভর, "the magic is only in the words", খতিয়ে দেখলে বিশেষ কিছুই থাকে না : "The poems···superficially so full, dwindle on acquaintance and interrogation to a very small residue"। তাঁরা বলবেন কোনোরকম স্থৈর্য বা সর্বজনীনতার সন্ধান মিলবে না এই ক্ষয়িষ্ণু আত্মকেন্দ্রিক অভিনেতার সুদীর্ঘ ভূমিকা পরিবর্তনের কাহিনীতে ; এর মধ্যে কখনোই ধরা দেবে না একটি সমগ্র জাতি বা যুগের দৃষ্টি, "the vision of a whole life"। অর্থাৎ ইয়েটসের কাব্য একাধারে সতর্কতা ও আশ্বাসের বাণী, কবিসুলভ ঢঙ ও সৎ কবির দুঃসাহস দুইই তাঁর মধ্যে দেখা যাবে। পাঠকের নির্বাচনের দায়িত্ব রয়েই যায়, কবির নিজের বেলায়ও ঠিক তাই : "the dilemma of personal choice is the underlying essence of all Yeats' poetry"। ইয়েটস হলেন সেই কবি যিনি একই সঙ্গে পরীর রাজ্যে বিচরণ করেন ("The Man Who Dreamed of Fairyland") অথচ নিজেকে "tattered coat upon a stick" বলে বর্ণনা করতে যাঁর কোনো দ্বিধাসংকোচ নেই ; যিনি সকল মানব-অনুভূতির উৎস খুঁজে পেয়েছেন ("The Circus Animals' Desertion") আদিম বাসনার জগতে, "in the foul rag-and-bone shop of the heart" ; তিনি সেই রাখালিয়া কবি যিনি আবার শিল্পের অমরাবতীতে "সোনার পাখি" হবার সাধ পোষণ করেন, অথচ যিনি বিশ্বাস করেন, বা করতেন, গ্রামীণ সরলতায়, "wisdom comes of beggary" ; আবার উন্নাসিক সুরে নিজেই বলেছেন : "And I may dine at journey's end / With Landor and with Donne" ; প্রত্যয়ের সুরে যিনি বলেছেন যে ইন্দ্রিয়ের জগতে অন্ধের মত বেঁচে থাকাই তাঁর কাম্য :

> I am content to live it all again
> And yet again, if it be life to pitch
> Into the frog-spawn of a blind man's ditch
> A blind man battling blind men—

ঐ একই কবিতায় কিছু পরে তিনিই আবার বলতে পারেন :

> When such as I cast out remorse
> So great a sweetness flows into the breast
> We must laugh and we must sing,
> We are blest by everything,
> Everything we look upon is blest.

তিনিই সেই কবি যিনি এককালে যাদুবিদ্যা ও মরমীবাদের সপক্ষে এই ঘোষণা করেছিলেন, অধ্যাত্ম-

জীবনই তাঁর প্রাণের কথা, বা একমাত্র আদর্শ, "the mystical life is the centre of all that I do and all that I think and all that I write"। অথচ শেষ বয়সে "On the Boiler" প্রকাশ করার কালে পূর্বের রম্য রচনার তুলনায় বাস্তবের বর্বরতাকেই কাম্য মনে করেছেন, "lay aside the pleasant path I have built up for years and seek the brutality, the ill-breeding, the barbarism of truth"। অন্যত্র একটু ভিন্নভাবে সেই কথাই বলা হয়েছে নাটকীয় আশাভঙ্গের সুরে :

Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flowers in the sun ;
Now I may wither into the truth.

বয়সের সঙ্গে প্রজ্ঞার আশা করেছিলেন কবি ("The Coming of Wisdom with Time")। কিন্তু, উদাহরণ থেকে ভিন্ন এক প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে।

সব মিলিয়ে স্বতোবিরোধ, আত্মকলহের কাহিনী ইয়েটসের কাব্যে। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে, অপরের সঙ্গে যে কলহ তার থেকে আমরা পাই অলংকার (rhetoric), আত্মবিরোধ থেকে পাই কাব্য, "We make out of the quarrel with others rhetoric, but of the quarrel with ourselves poetry"। তাঁর নিজের কাব্যে এই দুইয়ের ভেদরেখা সব সময়ে স্পষ্ট নয়। ইয়েটস আশা করেছিলেন, নানা আশার মধ্যে এটিও একটি, তিনি কাব্যরচনা করবেন জাতি ও সত্যের তরফে :

to write for his race and reality.

সেই কাজে, সমগ্রকে প্রকাশ করার কাজে—"a vision of reality that satisfies the whole being"—তাঁর সফলতার কথা বাদ দিলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে এই বহুবিচিত্র কবি চেয়েছেন ও পেয়েছেন তাঁর নানা ঢঙ, ব্যক্তিগত আবেগ ও আক্রোশকে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে ("personal utterance") মূর্ত করতে, যে কবি কখনো রহস্যময়তায় নিবিড় বা অপরিণতমনস্ক, "the dove-grey edge of the sea," "the dewy, forest alleys" নিয়ে ব্যস্ত ; আবার কখনো তার মধ্যে নেমেছে শ্লেষ, উল্লাস বা তীব্র বক্তব্যের, এমনকি প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর অবিস্মরণীয় ঝংকার। এমনিতে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত কবি অথচ, যেমন অডেন লক্ষ্য করেছেন, অনেক সময় তিনি হালকা কবিতার মধ্যেও এমন এক গভীরতার স্বাদ এনে দিতে পারেন যা জীবনী বা খোশগল্পের পদ্যরূপ নয়। এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ "Among School Children" কবিতাটি। ষাট বছরের বৃদ্ধ কবি ("a sixty-year-old smiling public man…a comfortable kind of scarecrow") মেয়েদের স্কুল দেখতে গেছেন। সন্ন্যাসিনীরা তাঁকে সব বুঝিয়ে দেখাচ্ছেন। স্বভাবতই কবির স্মৃতিপথে এল প্রেয়সীর বাল্যলীলার কথা :

I look upon one child or t'other there
And wonder if she stood so at that age—
She stands before me as a living child.

অতীত থেকে মন আবার ফিরল বর্তমানে, প্রৌঢ়া রমণীর ও নিজের বার্ধক্যের বাস্তবতায়। সন্তানের এই দুর্গতি হবে জানলে কোন্ মা জন্মযন্ত্রণা ভোগ করতেন, "would think her son,…a compensation

for the pang of his birth" ? দার্শনিকেরা, প্লেটো, পিথাগোরাস, সন্তুষ্ট থাকুন তাঁদের অরূপ সাধনা নিয়ে, সন্ন্যাসিনীরা তাঁদের সব পূজারতি নিয়ে, বর্তমান ও বাস্তবকে এড়াবার তাঁদের নিজ নিজ কৌশল নিয়ে। সে পথে কবির তৃপ্তি নেই। তিনি চেয়ে দেখলেন প্রাণলীলার ছন্দে কাল পরাহত, দেহ-আত্মার দ্বন্দ্ব নিরসিত। আনন্দিত চিত্তে তিনি গ্রহণ করলেন সেই সত্যকে, বৃক্ষবন্দনার প্রতীকের মাধ্যমে, সেই অচ্ছেদ্য শাশ্বতীকে, 'Eternal Now' :

O chestnut-tree, great-rooted blossomer,
Are you the leaf, the blossom or the bole?
O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dancer from the dance?

স্বভাব ও সিদ্ধ -কবি না হলে আপাততুচ্ছ বিষয়কে এভাবে, এত দ্রুত, সহজ ও নিশ্চিত ভাবে রসোত্তীর্ণ করা সম্ভব হত না।

তা হলে দেখলাম ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, মুখোশ ও মেজাজের বৈচিত্র্য তাঁর বরাবরের : "Yeats has, obviously, a tremendous range of gait," বলেছেন কোনো সমালোচক। সংক্ষেপে দু-একটি ভঙ্গীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। এ কাজে আমাদের সব চেয়ে বড় সহায় কবি স্বয়ং। তাঁর সর্বশেষ সমাধি-রচনা নেওয়া যাক। বেন বালবেন পাহাড়তলীতে কবির আদেশমত তাঁর সমাধিক্ষেত্রের জন্য লেখা ও পরে ক্ষোদিত হয় এই তিনটি স্মরণীয় সদর্প পঙ্‌ক্তি :

Cast a cold eye,
On life, on death.
Horseman, pass by.

অশ্বারোহী—হয়তো বা বাস্‌ভর্তি টুরিস্ট—অবশ্যই সশ্রদ্ধ ও বিস্মিত অভিবাদন জানাবেন উইলিয়ম বাটলার ইয়েটসকে, সেই সতেজ অদম্য দুর্নিবার কাব্যকৃতির স্মরণে, বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অদ্বিতীয় যার দক্ষতা সেই দুর্জয় প্রতিভার প্রতি। কিন্তু আত্মবিরোধে পীড়িত—না, প্রাণবন্ত ?—কবির স্মৃতিসৌধের জন্য কবিতা নির্বাচনের ভার আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলে আমরা হয়তো নির্বাচন করতাম :

And I, that after me
My bodily heirs may find
To exalt a lonely mind
Befitting emblems of adversity.

ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম রটেনস্টাইনের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ইংরিজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন তখন রটেনস্টাইন তাঁর টাইপ-করা পাণ্ডুলিপির কপি কয়েকজন লেখকের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই লেখকদের মধ্যে ইয়েটস ছিলেন অন্যতম। সেই প্রথম রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয়। অন্য যাঁরা এই টাইপ-করা কপি পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন ব্র্যাডলে ও স্টপফোর্ড ব্রুক। যাই হোক, সেই কপি পড়ে গীতাঞ্জলির কবির সম্বন্ধে ইয়েটসের গভীর শ্রদ্ধা জাগে। তিনি পরে সেই গীতাঞ্জলির পড়ার কথা স্মরণ করে লেখেন[১] :

> I have carried in the manuscript of these translations about with me for days, reading it in the railway trains, or in the top of omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me.

একদিন রটেনস্টাইনের বাড়িতে (৩০শে জুন ১৯১২) এক সান্ধ্যবৈঠকে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। ব্যক্তিগত পরিচয়ও হল। তারপর রটেনস্টাইনের মতো ইয়েটসও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যাপক প্রচারে উদ্যোগী হলেন। ১২ই জুলাই ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রকে-ডারো হোটেলে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সোসাইটি কয়েকমাস পরে গীতাঞ্জলির প্রথম বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ ক'রে য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত ক'রে দেয়। তখনকার অনেক বড় বড় মনীষী ও সাহিত্যিক এই সংবর্ধনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন ইয়েটস। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে প্রতিভার আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে তিনি সেই আবিষ্কর্তার আনন্দ পেয়েছেন। তারপর টমাস-এ-কেম্পিসের 'খৃষ্টের অনুকরণ'-এর সঙ্গে এর তুলনা ক'রে তিনি বলেন :

> ইহার (রবীন্দ্রনাথের) সকল কবিতার একটিমাত্র বিষয়— ঈশ্বরের প্রেম। আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কী গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল 'খৃষ্টের অনুকরণ'-এর কথা। ইহারা সদৃশ বটে কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কী আকাশপাতাল প্রভেদ। পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস-এ-কেম্পিস কিরূপ গুরুতররূপে অধিকৃত— কী ভীষণ উপমার সাহায্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যে শিশু লাটিম লইয়া খেলা করিতেছে, সে যেমন পাপের চিন্তা জানে না— ঠিক তেমনই এই কবিও পাপ সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। টমাস-এ-কেম্পিসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাঁহার কঠোর চিত্তের মধ্যে সেরূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক—

১ ইয়েটসের লেখা গীতাঞ্জলির ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম রেখাপাত হইয়াছে, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও গভীর প্রেমেরই পরিচায়ক।[২]

এই বক্তৃতার পর ইয়েটস গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই গদ্যানুবাদ। একটি হল 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে' এবং 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'—এ দুটি এক-করা ইংরেজি অনুবাদ। অপরটি হল 'শ্রাবণঘনগহন মোহে গোপনে তব চরণ ফেলে'।

ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কের ফলে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, গীতাঞ্জলির অনুবাদ ইয়েটস অনেকটাই সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসকে লেখাগুলি মার্জিত করবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে ইয়েটস বলেন :

> এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে, তবে সে সাহিত্য কী তাহা জানে না।[৩]

কিন্তু আশ্চর্য এই যে পরিণত বয়সে (১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্‌গারের একটা কারণ অন্তত এই ছিল যে, তিনি চাইতেন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনাগুলি তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হোক, এবং যে কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন নি।[৪] এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে গীতাঞ্জলি প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং এও জানা গেল যে সোসাইটির সদস্যদের জন্য কয়েক কপি অতিরিক্ত ছাপানো হচ্ছে। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯১২) ইয়েটস্ রটেনস্টাইনকে আয়ারল্যাণ্ড থেকে লিখছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুচ্ছের জন্য এক ভূমিকা লিখেছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই তা তাঁকে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু 'some facts may be given wrongly, and yet I don't want anything crossed out by Tagore's modesty.'[৫]

এই সেপ্টেম্বর মাসেই ইয়েটস লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকদিন বসে পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন করলেন। ইয়েটস এই সংশোধনের কাজে কতখানি সাহায্য করেছিলেন তা রটেনস্টাইনের আত্মজীবনী থেকেই পাচ্ছি।[৬]

> I knew that it was said in India that the success of *Gitanjali* was largely owing to Yeats's re-writing of Tagore's English. That this is false can easily be proved. The original MSS. of *Gitanjali* in English and in Bengali are in my possession. Yeats did here and there suggest slight changes, but the main text was printed as it came from Tagore's hands.

২ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৬১-৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯ পৃ ৫৬৬ দ্রষ্টব্য।

৪ Three Mystic Poets: 1945 Abinash Chandra Bose পৃ ৩৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ The Letters of W. B. Yeats: Ed. by Allan Wade. রটেনস্টাইনকে লেখা চিঠি পৃ ৫৬৯-৭০

৬ Men and Memories: William Rothenstein Vol. II Page 301.

সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনের দিনগুলিকে স্মরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ রটেনস্টাইনকে যে চিঠি লেখেন তাতে বোঝা যায় ইয়েটসকে তিনি কত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন,[৭] এবং গীতাঞ্জলির প্রচার ও প্রকাশের ব্যাপারে রটেনস্টাইন ও ইয়েটসের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতেও তিনি কতখানি অকপট :[৮]

> Then came those delightful days when I worked with Yeats and I am sure the magic of his pen helped my English to attain some quality of permanence. It was not at all necessary for my own reputation that I should have my place in the history of your literature. It was an accident for which you were responsible and possibly most of all Yeats. But yet sometimes I felt almost ashamed that I, whose undoubted claim has been recognised by my countrymen to a sovereignty in our own world of letters, should not have waited till it was discovered by the outside world in its own true majesty and environment, that I should even go out of my way to court the attention of others having their own language for their enjoyment and use. At least it is never the function of a poet to personally help in the transportation of his poems to an alien form and atmosphere, and be responsible for any unseemly risk that may happen to them.

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের সময় ইয়েটস যে ভূমিকা লেখেন তার জন্য কেউ তাঁকে অনুরোধ করে নি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও নয়। ইণ্ডিয়া সোসাইটি যখন ঠিক করলেন গীতাঞ্জলি প্রকাশ করবেন তখন ইয়েটস নিজে থেকেই এই পরিচিতি লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন :[৯]

> . . . he had previously gone carefully through the translations, respecting Tagore's expressive English too much to do more than make slight changes here and there. Indeed, Yeats was as keen over the issue of the book of poems as he would have been over a selection of his own lovely verses.

ইয়েটসের ভূমিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :[১০]

> সেটা পড়েছি। পড়ে লজ্জা বোধ হয়। এটা আমার বহুমূল্য অলংকার সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে বলে অতিশয়োক্তি অলংকার।

৭ শ্রদ্ধা করার আরও কারণ ইয়েটসের সাহিত্যিক আন্তরিকতা, আয়ারল্যাণ্ডের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার চিত্তস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও এই হৃদয়ের আন্তরিকতা, নিজের দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় চিত্তস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশের চেষ্টা রয়েছে। এই সহমর্মিতারই ফল ঠিক এই সময়কার লেখা (১৯ ভাদ্র ১৩১৯) 'কবি য়েট্‌স' প্রবন্ধ। পরে 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮ Men and Memories.

৯ Men and Memories, Vol. II, Page 266.

১০ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১ পৃ ৪ দ্রষ্টব্য।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন এবং চিত্রাঙ্গদা, মালিনী ও ডাকঘরের অনুবাদ করে ফেলেন। ১৮ই অক্টোবরের (১৯১২) একটি চিঠিতে পাওয়া যায় :[১১]

কাল রাত্রে ইয়েটসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। 'ডাকঘর'এর তর্জমাটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। ওটা তিনি তাঁদের আইরিশ থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন। এখানকার একজন ছাত্র 'রাজা' তর্জমা করে দিয়েছেন, সেটাও কাল রাত্রে ইয়েটসকে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস এইটেই আমার সকল লেখার চেয়ে এঁদের ভালো লাগবে।

এর পর দেখতে পাচ্ছি কবি একটি বিচিত্র ধরণের লিরিকসংগ্রহ করেছেন। এই সংগ্রহ ১৯১২-তেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল ১৯১৩ সালের অক্টোবরে। বইটির নাম *Gardener*। উৎসর্গ করলেন ইয়েটসকে।

১৯১২ সালের খুব সম্ভব ২৫শে নভেম্বর ইয়েটস এডমণ্ড গসকে একটি চিঠি লেখেন। উল্লেখযোগ্য বলে চিঠিটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করছি :[১২]

Dear Mr. Gosse: I have asked the India Society to send you a copy of Tagore's poems. Will you please read it, and think over a suggestion I now make. I think it would be an imaginative and notable thing for us to elect him to our Committee. He is the great poet of Bengal though eligible for election because of his English translation of his work alone. I think from the English point of view too it would be a fine thing to do, a piece of wise Imperialism, for he is worshipped as no poet of Europe is. I will not tell you what page to turn to for though he is unequal and there are dull pages, you will not read far without coming to great beauty. I believe that if we pay him honour, it will be understood that we honour India also for he is its most famous man to-day.

এই চিঠি থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমত দেখা যাচ্ছে, নোবেল প্রাইজ পাবার এক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এ কথা ইংরেজরা জেনেছেন এবং তাঁকে সম্মান দিতেও প্রস্তুত হয়েছেন। (অবশ্য চিঠিতে উল্লিখিত Academic Committee-তে, যে কোনো কারণেই হোক, রবীন্দ্রনাথকে সভ্য করা যায় নি।) দ্বিতীয়ত এই সম্মানদানের মধ্য দিয়ে যে ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী নীতি কিছুটা সিদ্ধ হতে পারে এমন কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন ইয়েটস। যোগ্য ভারতীয়ের প্রতি সম্মানদানে শিক্ষিত ভারতবাসী যে ইংরেজদের 'উদার নীতি'র প্রতি নতুন ক'রে শ্রদ্ধান্বিত হবে তাতে আশ্চর্য কি। যাই হোক, গসকে প্ররোচিত করবার জন্য ইয়েটস যাই লিখুন তাঁর মনের কথা উদ্ধৃত চিঠির শেষ পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতে ফিরে-আসার আগে রবীন্দ্রনাথকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানোর জন্য প্রথমে একটি পাবলিক ডিনারের আয়োজন হয়, পরে ইয়েটস ও রটেনস্টাইন

১১ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪১ পৃ ৭৫২ দ্রষ্টব্য।

১২ The Letters of W. B. Yeats: Ed. by Allan Wade. পৃ ৩৩ দ্রষ্টব্য।

আর একটি ভোজসভায় তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দেন।[১৩] প্রথম সভাটিতে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। রটেনস্টাইনকে লেখা ডবলু. এইচ. হাডসনের একটি চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাচ্ছি। হাডসন অসুস্থতার জন্য সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পেরে দুঃখ ক'রে চিঠিটি লেখেন। তাতে এক জায়গায় তিনি লেখেন :[১৩]

> I should have liked to hear Yeats read the Tagore poems; I hope he has got a poet to translate them.

এই চিঠিতে হাডসন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে গীতাঞ্জলির ইংরেজি গদ্য-অনুবাদ করেছিলেন তার থেকেই ইয়েটস তাঁর মাতৃভাষায় নতুন কাব্যরূপ ফোটাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি Blunt-এর Seven Golden Odes of Arabiaর কথা তুলেছিলেন। সে কবিতাগুলি মূল আরবি থেকে অনূদিত নয়। Lady Bluntএর ইংরেজি গদ্যানুবাদের অপূর্ব কাব্যরূপ।

নোবেল প্রাইজ পাবার পর একটি ঘটনা থেকে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র-ইয়েটস-সম্পর্কের প্রসঙ্গ আবার এসে পড়েছে। রবার্ট ব্রিজেস যখন *The Spirit of Man* নামে এক সংকলনে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির একটি কবিতাকে কিছু সংশোধন করে প্রকাশের অনুমতি চেয়ে পাঠালেন তখন রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হলেন। তখন রটেনস্টাইনকে তিনি যে চিঠি লিখলেন তাতে দেখা যাচ্ছে সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে তিনি ইয়েটসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ওই চিঠিতেই তিনি লিখছেন :[১৪]

> . . . it is different about Yeats. I think Yeats was sparing in his suggestions—moreover, I was with him during the revisions.

ওই চিঠিতেই তিনি বলেছেন যে যদি এই কথাই সত্য হয় যে ইয়েটসের কিছু কিছু পরিমার্জনাই গীতাঞ্জলি সাফল্যের মূল কারণ তাহলে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বারবার অন্যলোকে পরিমার্জন করলে নিজের নির্ভেজাল লেখাকে সাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে না এবং নিজের সত্যরূপ আচ্ছন্ন করা অন্যায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ব্রিজেসের পরিবর্তনকে তিনি মেনে নেন এবং কবিতাটি *The Spirit of Man* সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু ইয়েটস-রবীন্দ্রনাথের পরস্পর শ্রদ্ধার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত থাকে নি। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে কোনো অপ্রীতিকর লিখিত উক্তি পাওয়া যায় নি, সে আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু ইয়েটস বৃদ্ধবয়সে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন রটেনস্টাইনকে লেখা একটি চিঠিতে (—*The Letters of W. B. Yeats* Ed. by Allan Wade p. 834-835) তাকে আত্মাবমাননা ও

---

১৩ এই সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে Men and Memories Vol. IIতে। পৃ ২৬৯

১৪ Men and Memories Vol. II Page 300.

বার্ধক্যের বিকার বলতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।[১৫] আজকে তার জন্মশতবর্ষপূর্তির এই ক্ষণে মানুষ ইয়েটসের সেই প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে কবি ইয়েটসকে স্মরণ ক'রে বলতে পারি :[১৬]

> You were silly like us: your gift survived it all;
> The Parish of rich women, physical decay,
> Yourself: mad Ireland hurt you into poetry.
> Now Ireland has her madness and her weather still,
> For poetry makes nothing: it survives
> In the valley of its saying where executives
> Would never want to tamper: it flows south
> From ranches of isolation and the busy griefs.
> Raw town that we believe and die in; it survives,
> A way of happening, a mouth.
>
> (In memory of W. B. Yeats by W. H. Auden)

১৫ এই সম্পর্কে আগে আলোচনা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : 'ক্রান্তি' বৈশাখ ১৩৬২ ইয়েটস-রবীন্দ্রনাথ সংবাদ : আদিত্য ওহদেদার। এ ছাড়া The Letters of Yeats Ed. by Allan Wade : পৃ ২৯৮ দ্রষ্টব্য এবং রবার্ট ব্রিজেসকে লেখা ইয়েটসের একটি চিঠিতেও Three Mystic Poets by A. C. Bose ইয়েটসের এই বিরূপতার উৎস পাওয়া যাবে বলে ধারণা।

The Collected Poetry of W. H. Auden 1940.

বাংলার বৈষ্ণব দর্শন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা-৬। সাত টাকা।

ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক বলিতেছেন 'প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শিরোনামায় মুদ্রিত হইলেও সমস্ত লেখার মধ্যে বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের বিবৃতি যোগসূত্ররূপে বর্তমান। ভারতবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বিষয়ের ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধগুলি সংকলিত করিয়াছেন।'

সম্ভবত বটুকনাথই সংকলনের নামকরণ করিয়াছেন 'বাংলার বৈষ্ণব দর্শন'।

মুখবন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলা দেশের বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের একটা গভীর মমতা ছিল। তাঁহার সর্বশাস্ত্রে পরিশীলিত চিত্তকে শেষের দিকে তিনি বাংলার বৈষ্ণব দর্শনের চর্চায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্তের সকল মতামতের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, অন্যদিকে পুরাণ-সংহিতাদির সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও ছিল প্রচুর; আবার গোস্বামিগণ-রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র এবং সাহিত্য ছিল প্রায় তাঁহার নখদর্পণে।"

সুতরাং বলিতে হয় প্রবন্ধগুলি সংকলন করিয়া অধ্যাপক বটুকনাথ পাঠকগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অশেষ শাস্ত্রনিষ্ণাত উদারধী প্রমথনাথকে যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহার বক্তৃতা অথবা শ্রীমদ্‌-ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিবেন লেখক কিরূপ মনীষার আধার ছিলেন, তাঁহার লিখনশৈলী কত সুন্দর, কেমন প্রাঞ্জল, সরস, যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহারা দেখিবেন সেই অফুরন্ত জ্ঞান ও ভক্তি -প্রবাহের অতি সামান্য অংশই এই সংকলনে অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই জন্যই তাঁহাদের বিষাদক্লিষ্ট চিত্ত নূতন করিয়া স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিবে। স্মৃতি বলিয়া দিবে ক্ষণ-পরিচয়েই তিনি মানুষকে কত আপনার করিয়া লইতেন। পরিচিত সকলেই তাঁহাকে একান্ত নিজ জন বলিয়াই মনে করিত। তাঁহার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলিলেই হৃদয় প্রশান্তিতে ভরিয়া উঠিত। তথাপি আমাদের সান্ত্বনা এই যে, এই লেখার মধ্য দিয়াই আমরা আর একবার তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার অনুসরণ করিতে গিয়া প্রমথনাথ প্রথমেই আচার্য শঙ্করের নাম করিয়াছেন। বাস্তবিকই আচার্য শঙ্কর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার এক সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ প্রতিরূপ। লেখক বলিতেছেন শঙ্করাচার্য "জৈন ও বৌদ্ধমত নিরাকরণপূর্বক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার দ্বারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মেরও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।” আমার মতে এই তথাকথিত মায়াবাদী সন্ধ্যাসীর সমাজসচেতন মন সমাজকেও নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। আচার্য শঙ্করের পূর্বে বৌদ্ধধর্মের বিধানে সকলেরই সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, এবং গৃহী কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। বৌদ্ধ ভিক্ষুণী যুবতীর প্রলোভনে পড়িয়া ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী নন্দনগণ, অথবা ঐশ্বর্যশালী রাজবল্লভ তনয়েরা যখন সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাদের অংশের সম্পদ্‌রাশিও সঙ্ঘের কুক্ষিগত হইত। আচার্য শঙ্করই নিয়ম করিলেন যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, সমাজের চক্ষে তিনি মৃত। সমাজের সঙ্গে তাঁহার আর কোনো সম্বন্ধই থাকিবে না। সন্ন্যাসী মরিলে কেহ তাঁহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না। সন্ন্যাসী আপনার সমস্ত উত্তরাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইবেন। আচার্য শঙ্করের ইহাও এক মহত্তর অবদান।

শঙ্করের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইল। কিন্তু তাঁহার মতবাদ সমাজ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ইহা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ বলিয়া মনে হইল। “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”—নানা অর্থাৎ দ্বৈত বলিয়া কিছুই নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য মায়াবাদিগণ বলিলেন সত্য চারিপ্রকার— পারমার্থিক, ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক এবং তুচ্ছ। পারমার্থিক সত্য অদ্বৈত ব্রহ্ম। ব্যাবহারিক সত্য, যাহা জগৎরূপে পরিদৃশ্যমান। প্রাতিভাসিক সত্য শুক্তিতে রজতভ্রম। আর তুচ্ছ সত্য হইল আকাশকুসুম। ইহা দ্বারা সংসারিগণকে জগৎ আছে বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হইলেও, অনেকের মন প্রবোধ মানিল না। আস্তিক হিন্দু পণ্ডিত, সাধক এবং নৈষ্ঠিক ভগবদ্ভক্তগণও এই মত মানিয়া লইতে পারিলেন না। দাক্ষিণাত্য হইতেই প্রতিবাদ উঠিল, প্রতিবাদ করিলেন আচার্য রামানুজ। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডনপূর্বক সবিশেষ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামানুজের মত বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

দাক্ষিণাত্যেই সগুণ ব্রহ্মবাদী অপর তিন জন আচার্যের অভ্যুদয় ঘটে। আচার্য মধ্ব দ্বৈতবাদী, বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, আর আচার্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। রামানুজ বলিলেন কোনো প্রমাণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। ব্রহ্মের রূপাদির অভাব বলিতেছ, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে নিরর্থক! অনুমানও চলিবে না, ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হয়। ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক। ব্রহ্ম যদি এক এবং অদ্বিতীয় হন, তাহা হইলে কে কাহার ব্যাপ্য, কে কাহার ব্যাপক? উপমান সাদৃশ্যনিষ্ঠ, দুইটি বস্তু না থাকিলে কে কাহার সদৃশ হইবে? সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপমানেও প্রমাণিত হইলেন না। আর শব্দ প্রমাণ? শব্দের শক্তি জাতিতে, কিংবা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে থাকে। “নিত্যানেকসমবায়িনী জাতিঃ”। জাতি একটি বস্তুতে থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মের কোনো জাতি নাই। কারণ তোমরা বলিতেছ ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য। ব্রহ্মকে অপ্রমেয়ও বলিতে পার না। ব্রহ্ম বেদবাক্যের প্রমেয়। বেদ ব্রহ্মকে ঔপনিষদপুরুষ বলিয়াছেন, অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে বেদবাক্যেরও স্থান নাই। এই সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া রামানুজ বলিলেন—

“ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ”— শ্রীহরিই সগুণ ব্রহ্ম। পদার্থ তিন প্রকার— চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর। শ্রীবাসুদেবই ঈশ্বর। পর, ব্যূহ, বিভব, অর্চা ও অন্তর্যামিরূপে তাঁহার প্রকাশ। চিৎ শব্দে জীবাত্মা, অচিৎ— জড় পদার্থ। স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন, অচেতন শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মই ঈশ্বর। পরবর্তী সকলেই

এই সগুণ ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্ব ভেদবাদী অর্থাৎ দ্বৈতবাদী। জীবে ও ঈশ্বরে, জড়ে ও ঈশ্বরে, জীবের সঙ্গে জীবের, জড়ে ও জীবে এবং জড়ের সঙ্গে জড়ের ভেদ, সত্য ও অনাদি বলিয়া তিনি এই পঞ্চভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বমতে শ্রীহরিই পরম তত্ত্ব, জগৎ সত্য, জীব শ্রীহরির সেবক। বিষ্ণুস্বামী বলেন শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, ভগবদ্ভজনের পরিপাকে জীব শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করে। ইনি জীবকে ব্রহ্মের অংশ এবং নিত্য শুদ্ধ বলিয়াছেন। এই জন্যই বিষ্ণুস্বামীর মত শুদ্ধাদ্বৈত নামে অভিহিত হয়। আচার্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জীবে ব্রহ্মে ভেদও আছে, অভেদও আছে। নিম্বার্ক শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। তাঁহার বামে স্থিতা সখীসহস্রপরিসেবিতা, সকল-অভীষ্টদায়িনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাই নিম্বার্কের ইষ্টদেবী। নিম্বার্কের মতেও চিৎ, অচিৎ, ব্রহ্ম— তত্ত্ব এই ত্রিবিধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তবে তাঁহাদের মতে জীবে ও ব্রহ্মে এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য; এই জন্যই গৌড়ীয় মত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত।

শঙ্কর হইতে নিম্বার্ক পর্যন্ত আচার্যগণ প্রস্থানত্রয়ের উপরেই আপন আপন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদ্, স্মৃতিপ্রস্থান গীতা, আর ন্যায়প্রস্থান বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার চরণানুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ গরুড় পুরাণের বচন তুলিয়া এই মত সমর্থন করিলেন।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ— কারণ ভাগবতে বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ্ আস্বাদিত রসব্রহ্ম, মধুব্রহ্ম, আনন্দব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রকাশিত পুরুষোত্তম। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে প্রস্থানত্রয়ের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই ভাগবতের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান্ স্বয়ং। ভারতার্থবিনির্ণয়— এই উক্তির মধ্যে আরও গূঢ়রহস্য আছে। মহাভারতের সারাংশ হইল গীতা। ভারতপঙ্কজের সৌরভ গীতা। সর্বোপনিষদ্সুরভির ক্ষীরধারা গীতা। এই গীতায় ভক্তির যে বর্ণনা আছে শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিগ্রহের দর্শন পাইয়াছি। গীতায় ভগবদ্ভক্তের যে লক্ষণ নির্ণীত রহিয়াছে, ভাগবতে বহুভক্তের জীবনে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। আর গীতার সর্বশেষ বাণী 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' আকারপরিগ্রহ করিয়াছে ব্রজবধূগণের মধ্যে। গীতার সারাংশ সাকার ও সাবয়ব হইয়া শ্রীরাধারূপ ধারণ করিয়াছে। গোপীগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা এবং শ্রীমতী রাধা তাঁহাদের ভাববৈভবের পুঞ্জিত প্রতিরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্য। গায়ত্রী বেদমাতা, সমগ্র বেদ গায়ত্রীতে বিধৃত রহিয়াছেন। গায়ত্রীর আদি অন্তে প্রণব। গীতা ওঁকারকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তৎসবিতুঃ মন্ত্রাংশ ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিত-রতঃ" শ্লোকাংশে প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, সেই হিরণ্ময় পুরুষই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। সবিতা জগৎ প্রসবিতা; সবিতা স্থিতি, লয়েরও হেতু। গায়ত্রীর "দেবস্য" ভাগবতের "বরেণ্যং ভর্গঃ"— "সত্যং পরং" শব্দের সঙ্গে একার্থবোধক। "ধীমহি" উভয়তই এক। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এবং "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"

সমার্থক। ভাগবতের "সত্যং পরং ধীমহি" পদের "পরং" শব্দ গায়ত্রীর "বরেণ্যং" পদের প্রতিনিধি। "ভর্গই সত্য, সত্যই ভর্গ" উভয় পদই ব্রহ্মবাচক। যিনি স্বপ্রকাশ তিনিই স্বরাট্, যিনি দীপ্তিমান্ তিনিই দেব। প্রকাশ ও দীপ্তি জ্ঞানবাচক। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করুন, করিতেছেন ও করিবেন। যে সগুণ ব্রহ্ম গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য, তিনিই শ্রীভাগবতে মূর্তরূপে প্রকাশিত। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিলেন এই ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন ভগবান্ মাধুর্যের ঘনীভূত বিগ্রহ, রসস্বরূপ, সচ্চিদানন্দময়, এবং তিনি ভক্তিলভ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তিরূপ সুদুর্লভ রত্নকে কিরূপ অনায়াসে পাওয়া যায়, জনসাধারণের মধ্যে সেই কথা প্রচারের জন্য যে অভিনব প্রস্থান রচনা করিলেন, তাহারই নাম রসপ্রস্থান. ইহাই চতুর্থ প্রস্থান। প্রমথনাথ এই রস-প্রস্থানের কথাই বলিয়াছেন।

প্রমথনাথ দেখাইয়াছেন আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, এমন কি মধ্বাচার্যও মোক্ষকেই মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণও মুক্তিকে অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে মুক্তি হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সমধিক। ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ। প্রমথনাথ বলিয়াছেন, "বঙ্গের এই বিলক্ষণ ভক্তিতত্ত্ব শ্রীরূপসনাতন গোস্বামিদ্বয় প্রচার করিয়া বঙ্গীয় দার্শনিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামীও ভক্তিতত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ দ্বারা মোক্ষবাদী ভারতবর্ষকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিনব রসসম্ভার দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হইতে শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মোক্ষবাদ-প্লাবিত ভারতবর্ষ এইরূপ অপূর্ব শিক্ষার সন্ধান পায় নাই।" তিনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

"যতদিন মনুষ্যহৃদয়ে ভোগস্পৃহার মত মুক্তিস্পৃহা পিশাচীতুল্য বাস করিবে, ততদিন পর্যন্ত ভক্তিসুখ তাহাতে প্রবেশ করিবে না।" শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, তাই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মুক্তিকে পিশাচী বলিয়াছেন। এমন কথা পূর্বে কেহ বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাসও মোক্ষবাঞ্ছাকে কৈতবধর্ম বলিয়াছেন— "তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান"।

পারমার্থিক রসের আলোচনায় প্রমথনাথ আপনার স্বভাবসিদ্ধ রসগ্রাহিতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য ভরতের "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" এই সূত্রটির তিনি অতি নিপুণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রমথনাথ দেখাইয়াছেন যে সাহিত্যের রস পারমার্থিক রস নহে। সাহিত্যের রসাস্বাদে যে তন্ময়তা, যে আনন্দ তাহা স্থায়ী হয় না। এই রস মানুষকে দিব্য মানুষে রূপান্তরিত করিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তিনি বলিয়াছেন "এই কবিকল্পনাপ্রসূত প্রাকৃত রসকে অপ্রাকৃত রসরূপে পরিণত করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধন দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ভাবমন্দাকিনীর প্রথম প্রবাহ যিনি বহাইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ শ্রীরূপ গোস্বামীর অসাধারণ কল্পনা ও ধীশক্তির পরিণতিস্বরূপ গ্রন্থনিবহের সহিত এখনো আমাদের রসসাহিত্যের লেখকবৃন্দের পরিচয় নিতান্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে আমাদের যেভাবে দেখা উচিত তাহা আমরা

বড় কেহই দেখিতেছি না। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের প্রকৃত উপাদেয়তা কি, তাহা আমরা ভালো করিয়া পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাই বাঙ্গালীর বর্তমান কালোপযোগী আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের বিকাশ সুশৃঙ্খলার সহিত হইয়া উঠিতেছে না। বাঙ্গালী নিজের সমাজকে ভাঙিতেছে, কিন্তু গড়িতে পারিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাহার একমাত্র হেতু এই যে, এখনো বাঙ্গালী বাহিরের রসতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সে তৃষ্ণা মিটাইবার আশায় পরের মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। তাহার গৃহে যে রসামৃতসিন্ধু রহিয়াছে তাহার খবর এখনো সে ভালো করিয়া পাইতেছে না।"

এই মনস্বী চল্লিশ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন আজিও তাহা সমান সত্য হইয়াই রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যদি একজনও নিজের গৃহে ফিরিয়া আসেন, আপনাকে চিনিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে। এই গ্রন্থের কুড়ি পৃষ্ঠা হইতে একশত উনচল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পারমার্থিক রসের বিচার আলোচনা আছে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা, তাঁহার ত্রিবিধ শক্তির কথা, অলঙ্কারশাস্ত্র ও পুরাণের কথা, দ্বৈতাদ্বৈতবিচার ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নানা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কোনো বিষয়কেই উপেক্ষা করেন নাই, কোনো প্রসঙ্গই এড়াইয়া যান নাই, প্রত্যেক বিষয়েরই সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভায় ও রসজ্ঞতায় সকল আলোচনাই সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। একশত চল্লিশ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে মুক্তি ও ভক্তি বিচার। শেষ হইয়াছে দুইশত একষট্টি পৃষ্ঠায়। মুক্তি ও ভক্তির কথায় বিভিন্ন দর্শনের আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বিভিন্ন দর্শনের আলোচনায় আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "শ্যামের বাঁশী" দুইশত বাষট্টি পৃষ্ঠা হইতে দুইশত পঁচাশী পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দুইশত ছিয়াশী হইতে "সাহিত্যে শ্রীরাধা" শুরু হইয়াছে, শেষ হইয়াছে তিনশত পনের পৃষ্ঠায়। "রথযাত্রা" প্রবন্ধে গ্রন্থের উপসংহার। গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠককে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। পড়িয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করিতে বলিতেছি। গ্রন্থখানি জটিল দার্শনিক তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। কিন্তু পড়িতে কোথাও কটমট মনে হইবে না। লেখকের সাবলীল লেখনী অতি জটিল বিষয়কেও স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করিয়া দিয়াছে। "শ্যামের বাঁশী" বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব। ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনার লেশমাত্র নাই। সাহিত্যে শ্রীরাধার কথা বলিতে গিয়া লেখক আনন্দবর্ধন ও ক্ষেমেন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্রের সঙ্গে পুরাণাদির বিরোধও দেখাইয়া দিয়াছেন। আর একটি বিষয়ে লেখক আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ পঞ্চরাত্র আগম। পঞ্চরাত্র আগমের অধিকাংশ গ্রন্থই অপ্রকাশিত। তিনি কয়েকটি দুর্লভ পঞ্চরাত্র গ্রন্থের আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন— গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনেক সিদ্ধান্ত পঞ্চরাত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের সংখ্যা ও নামগুলি জানিতে পারিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমসাহিত্য-পাঠ। হরপ্রসাদ মিত্র। বি. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১২। দশ টাকা।

প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথের রচনার সমান না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার পরিমাণ কম নয়। যদি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকরে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশের সময় থেকে হিসাব করা যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক-জীবন হয় প্রায় বিয়াল্লিশ বছরের। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) এবং 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের সময় (১৮৭৩) থেকেই অবশ্য তাঁর লেখার পরিমাণ দ্রুত বেড়ে ওঠে। আগে তিনি ইংরেজিতে গল্প লিখে এবং তারও আগে 'ললিতা ও মানসে'র কবিতাগুলি লিখে তিনি সাহিত্যরচনার শিক্ষানবিশি করছিলেন, একালের সাহিত্যগবেষকদের কাছে সেসব উপেক্ষণীয় নয়। আলোচ্য গ্রন্থে হরপ্রসাদবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনাগুলির সাহিত্যমূল্য আলোচনা করে এবং নানা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেখিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অসাধারণ মনীষী, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক জটিল সময়ে চিন্তায় এবং কল্পনায় নেতৃত্ব করে গেলেন, তাঁর যে কোনো রচনাই পর্যালোচনাযোগ্য। সাহিত্য হিসাবে সব রচনাই সমান সার্থকতা অর্জন না করলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গতি ও নানা সূত্র বোঝবার পক্ষে তারা সহায়ক।

বঙ্কিম-সাহিত্যকে নানাভাবেই পড়া যেতে পারে। কেউ তাঁর উপন্যাসগুলিকেই প্রধান করে দেখবেন, কেউ তাঁকে দেখবেন চিন্তানায়ক হিসাবে, কেউ দেখবেন নীতিনিষ্ঠ লেখক হিসাবে, কেউ দেখবেন বিশুদ্ধ রোমান্সের রচয়িতা হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে 'রাজসিংহ' উপন্যাসখানির চমৎকার সমালোচনা করলেও শেষ দিকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে কৃত্রিম রোমান্সের স্রষ্টা হিসাবে বঙ্কিমকে বর্ণনা করেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'-সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও বাংলাদেশের আধুনিক চিন্তাভাণ্ডারে ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা বিশেষ বলেছেন বলে মনে পড়ে না। নীতিবাদী ঔপন্যাসিক বলে অনেকেই তাঁকে দোষারোপ করেছে আবার মোহিতলাল মনে করেন বঙ্কিমের সুগভীর জীবনজিজ্ঞাসার কাছে নীতি গৌণ। কেউ মনে করেছেন আধুনিক বাংলার জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আবার বঙ্কিমের চিন্তার 'অপরিচ্ছন্নতা' এবং প্রগতি-বিরোধিতার জন্যেই নাকি বাংলার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, এমন মতও একালে শোনা গিয়েছে। এই মতবৈচিত্র্যের কথা ভাবলে বঙ্কিম-সাহিত্যকে ক্রমেই দুরবগাহ মনে হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা পড়তে গিয়ে একটি কথা মনে না হয়ে পারে না। সেটি তাঁর লোকহিতসাধনের চিন্তা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি 'মুকার্জিস ম্যাগাজিন' পুনরুজ্জীবিত করা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লেখেন—

I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This I think, is not exactly what it ought to be.

বস্তুত দেশ এবং জাতির মুখ চেয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস খেয়ালি কল্পনার সৃষ্টি নয়, তাঁর প্রবন্ধও কেবলই রম্য নয়। গভীর জীবনচিন্তার থেকে তাঁর উপন্যাস এবং প্রবন্ধের সৃষ্টি। ভাবনার এই সূত্রগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে নির্ণয় অনুসরণ ও তুলনা করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি অধ্যবসায়-সাপেক্ষ কাজ।

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র এই বইখানিতে সেই কঠিন কাজ করেছেন। গ্রন্থকার সত্যসত্যই বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করেছেন। কিন্তু অবসরপ্রিয় অলস পাঠকের মতো নয়। তিনি পাঠ করেছেন বৈদগ্ধ্যপূর্ণ অনুসন্ধানী মন নিয়ে। গদ্য-পদ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কয়টি রচনার বিষয় গ্রন্থকার এক এক করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দীর্ঘকালব্যাপী বিপুল বঙ্কিম-সাহিত্যের বিষয় ও ভাববস্তুকে খুঁটিয়ে দেখানো শৌখীন সমালোচনা মাত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক ভাবসূত্রগুলিকে প্রত্যেক রচনা থেকে খুঁজে বের করা, এবং এদের বিস্তার দেখানো প্রায় ভালো বিবলিওগ্রাফি রচনার মতোই কঠিন কাজ। এই ধরণের কাজে গ্রন্থকার অভ্যস্ত। তাঁর প্রথম দিককার বই 'সাহিত্য-পাঠকের ডায়েরি'তে তিনি সমালোচনার যে-রীতি আয়ত্ত করেছিলেন, বলতে গেলে সেই রীতিরই প্রয়োগ আছে এই বইটিতে। নানা প্রাসঙ্গিক এবং ভাবানুষঙ্গিক চিন্তার দ্বারা বিস্তারিত করাই এই সমালোচনারীতির বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষত কোনো কিছু তত্ত্ব বা বক্তব্যকে সাজিয়ে প্রমাণিত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবগত ও বিষয়গত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করতেই তিনি চেয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে তুলনীয় ও সদৃশ ভাব ও উক্তি চয়ন, নানা সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ ও উদ্ধৃত করতে তাঁর ক্লান্তি নেই। এ ধরণের ভাবানুষঙ্গিক উক্তি কখনো কখনো দূরাকৃষ্ট মনে হয়েছে, সে কথা স্বীকার করি। যেমন, ১০০ পৃষ্ঠায় 'হনুমদ্বাবু সংবাদ' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' গানটির উদ্‌ধৃতি না দিলেও হয়তো হত। তেমনি 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কথা বলতে গিয়ে বায়রনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ২৪৩ পৃষ্ঠায় কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি অনুবাদ-কবিতার উদ্‌ধৃতি আকস্মিক। ৩৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলছেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও না— নীটশের সঙ্গে এদেশের চিন্তার মিল নেই। তবু সংক্ষেপে মনুষ্যত্বের সাম্য সম্প্রসারণের আদর্শগত ভাবনা ভাবতে গেলে তার আনুকাল আর মতামতের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।' এর পরেই নীটশের জীবনী ও রচনার আলোচনা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবশ্যক। সন-তারিখ উল্লেখের ব্যাপারে গ্রন্থকার অতিশয় মনোযোগী। যখনই যা উদ্‌ধৃত বা সংকলন করেছেন তার উৎসনির্দেশ করেছেন। এ অভ্যাস আদর্শ-সম্মত। তবে প্রধানত লেখকের আলোচনা বিষয়-বিশ্লেষণেই আবদ্ধ, তারিখ বা তথ্য নির্ণয় জাতীয় ঐতিহাসিক গবেষণায় নিবদ্ধ নয়। এইজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অসতর্কতা থেকে গিয়েছে। ৬৫ পৃষ্ঠায় তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিম-সমালোচিত 'মানসবিকাশে'র গ্রন্থকার মনে করেছেন। এই ভুলের সূত্রপাত হয় মন্মথনাথ ঘোষের রাজকৃষ্ণের জীবনীতে। বস্তুত দীনেশচরণ বসু ছিলেন এই কাব্যের লেখক। ১২৯ পৃষ্ঠায় যে তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, তার প্রথমটির প্রকাশকাল প্রকাশস্থানে ভুল আছে। The Study of Hindu Philosoply প্রবন্ধটির বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। এতে 'স্বদেশের এবং স্বজাতির ইতিহাস অনুসন্ধানের ব্যগ্রতা' ছিল না, ছিল পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে হিন্দু দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিগত তুলনা এবং হিন্দু দর্শনকে আধুনিক পদ্ধতিতে কিভাবে পড়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তাব। বস্তুত মধ্যযুগীয় হিন্দু দর্শনের উপযোগিতা

বিষয়েই তিনি সন্দিহান ছিলেন। বঙ্কিম-মানসের বিচারে তাঁর এই মনোভাবের নিশ্চয়ই গুরুত্ব আছে। যাই হোক সমালোচ্য বইতে এ রকম অনবধানতা সামান্যই।

'বঙ্কিমসাহিত্য-পাঠ' সাহিত্যকে পাঠই— মূল্যনির্ধারণ-প্রয়াস নয়। এই বইয়ের অধ্যায়ের নামকরণ -রীতিতেই তা বোঝা যায়; আদি কথা, লঘু প্রবন্ধের গুরু ইঙ্গিত, গুরু প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব, পদ্যলেখক ও কবি, কথাসাহিত্যের ধারা (প্রথম পর্ব), কথাসাহিত্যের ধারাবসান, শেষ কথা। এই বিবরণাত্মক আলোচনা আরও ব্যাপকতা অর্জন করেছে বিভিন্ন সময়ে সমালোচকেরা যত বই লিখেছেন, সম্ভবত তার সব কয়খানার অবতারণায়। সবিনয়ে বলি, এদের মধ্যে সবাই উল্লেখযোগ্য বা উদ্‌ধৃতিযোগ্য নন। এর মধ্যে আর-একটু বিচার থাকলে ভালো হত। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করি লেখক শুধু বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গেই নয়, বঙ্কিম সমালোচনা-সাহিত্যের সঙ্গেও পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যের আহরণে বইখানি প্রায় একটি কোষগ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকখানি ভালো বই লেখা হয়েছে। হরপ্রসাদবাবুর বইখানা তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এই বইয়ের মতো ব্যাপক কোনো বইকেই বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের বইটি স্মরণীয়। বইটি উৎকৃষ্ট কিন্তু হরপ্রসাদবাবুর বইটি আলোচনায় ব্যাপক। হরপ্রসাদবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অজস্র উদ্‌ধৃতি দ্বারা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকত্ব এবং অগ্রগামিত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এত উদ্‌ধৃতির অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, অনেক জায়গায় রেফারেন্স মাত্রই যথেষ্ট ছিল। বাংলা দেশের আধুনিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও দান সম্বন্ধে নানা বিপরীত মত আছে। কিন্তু এই সব মতে আসবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা দরকার, হরপ্রসাদবাবুর এই গ্রন্থরচনায় সেই বিশ্বাসই প্রেরণা দিয়েছে। যে-সব স্থল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, সে-সব ক্ষেত্রে তাঁর সাবধানতা লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৮৫তে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—

'সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

এই বিরোধের ইতিহাস রচনা করতে গেলে সাধু সমালোচকেরা সোজাসুজি কোনো পক্ষ অবলম্বন করবেন না। তাঁর কাজ হচ্ছে এই বিরোধের ভাবগত ও ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে বোঝানো। বাংলা দেশের নতুন চিন্তাভঙ্গির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এ বিরোধ ব্রাহ্ম ও হিন্দু আদর্শের বিরোধ নয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বিরোধকে ব্রাহ্ম-হিন্দু আদর্শের দিক দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। সরলাদেবীর সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি বঙ্কিমের মতের সমর্থক ছিলেন (দ্রষ্টব্য 'জীবনের ঝরাপাতা' পৃ ৩৫)। হরপ্রসাদবাবু প্রভাতকুমারের মন্তব্য উদ্‌ধৃত করেছেন ১৯৯ এবং ২০০ পৃষ্ঠায়। কিন্তু প্রভাতকুমারের মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব এবং আদর্শ সবটুকু প্রকাশ পায়নি। হরপ্রসাদবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করে দেওয়ায় পাঠকেরা নিজেরাই মত গঠন করতে পারবেন। হরপ্রাসাদবাবু কোনো

মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে-সব ধারণা আজকাল চলে আসছে তার অনেকটাই অপ্রচুর তথ্যের দ্বারা বিভ্রান্ত। এই বইখানি সে দিক থেকে পাঠকের কাছে অজস্র তথ্য মেলে ধরেছে।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের তিন শো পৃষ্ঠাই বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনায় পূর্ণ। এখানেও গ্রন্থকার বঙ্কিমকে 'নীতিবাদী' বা তদনুরূপ কোনো লেবেল এঁটে না দিয়ে তাঁর উপন্যাসের কলারূপটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যে-পদ্ধতিতে তিনি আলোচনা করেছেন তার বৈশিষ্ট্য এই যে গল্পটি ধারাবাহিক পরিচ্ছেদক্রমে পুনর্বর্ণিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে প্লট-রচনাকৌশল, চরিত্রবিকাশ, ভাষা ও বর্ণনানৈপুণ্য দেখিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই রীতিতেই উপন্যাস-আলোচনার প্রবর্তন করেছিলেন। হরপ্রসাদবাবুর আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সারাংশ-বর্ণনার ধার ঘেঁষে গিয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সম্ভবত সেটা অনিবার্য। এই রীতিতে তত্ত্বের দিকে না গিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পগুণটিই উদ্‌ঘাটিত হয় সন্দেহ নেই। বিষবৃক্ষের উপসংহার-অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর অভিমত উদ্‌ধৃত করলেই লেখকের সমালোচনারীতি বুঝতে পারা যাবে—

'এই শেষ কথাটিতে এ উপন্যাসের সমাজ-কল্যাণ সম্পর্কিত উদ্দেশ্যচেতনা একটু বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এ কথা তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন; অতএব, এই অন্তিম মন্তব্যটি বাহুল্য তো বটেই,—তা ছাড়া সৃজনধর্মী এই রচনার রসেরও কতকটা বিঘ্ন বলে মনে হয়। বোধহয় তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পাঠকের কাছে কোনো অনির্দিষ্টতা রাখতে চান নি। পাপের প্রতি শুধু তাঁর সহজ বিতৃষ্ণা ছিল [কথাটা অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের] বললেও তাঁর আসল মনোভাব ঠিক-ঠিক বলা হয় না। সংসারে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চেতনার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। তাঁর এই বিমুখতা তাঁর শিল্পী হিসেবে তীব্র সক্রিয়তারই উদাহরণ।'—পৃ ৪০৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-কল্পনা ও ঘটনা-সংস্থাপন সেকালে ও একালে নানা সমালোচককেই নানা মন্তব্য করতে প্রণোদিত করেছে। হরপ্রসাদবাবু সমালোচকদের মতামত নিবদ্ধ করেছেন। তিনি অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসের পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্‌ধৃতির সার্থকতার আলোচনাটি উপভোগ্য। সন্ন্যাসীচরিত্রের শ্রেণীভাগ, বঙ্কিমের কতকগুলি প্রিয় প্রসঙ্গ—এই সব অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচিত বিষয়ে লেখকের মনোযোগ এবং চিন্তা পাঠকের সাধুবাদ আকর্ষণ করবে। পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে উপন্যাসবিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যোপভোগনীতি দিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করেছেন। আজকালকার নানা ইজ্‌ম-প্রভাবিত সমালোচনায় এই অনুরাগ দুর্লভ।

ভবতোষ দত্ত

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবস : শ্রদ্ধাঞ্জলি। অধ্যাপক এস. এন. বসু ৭০তম জন্মদিবস উৎসব সমিতি, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মনোরঞ্জন গুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ৬। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যে তিনটি বইএর আলোচনা এখানে করা হচ্ছে, বোসের জীবনী ও কার্যকলাপের পরিচয়দানই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনোটির কাহিনীই বিশেষ দীর্ঘ নয়। তাই কোথাও প্রাক্-বোস যুগের বিজ্ঞানের নব-জাগরণের ইতিহাসের বিশেষ বিবৃতি নেই। সেখানে উল্লেখ নেই কেন ও কেমন করে শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছিলেন নতুন বিজ্ঞানের বীজ বাংলার বুকে বপন করতে, বোস বা তাঁর ঠিক পূর্ববর্তীদের অভ্যুত্থানের হেতু কোথায়।

একদিকে শাসকগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নবসভ্যতার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অল্প সংখ্যক দূতের প্রাদুর্ভাব: কেরী, মাক্, ইয়েট্স্, ইস্ট, মার্শম্যান, হালে ইত্যাদি; এঁদের দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা কতটা ফলবতী হয়েছিল বাংলা দেশে বিজ্ঞানের প্রাথমিক সোপান স্থাপনে? আর সেই সাফল্যের কারণই বা কী? কেমন করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পতিত জমিতে সার্থকভাবে আবাদ করতে সক্ষম হল?

পরবর্তীকালের ইতিহাস রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির প্রচেষ্টার কাহিনী: কেমন করে বিজ্ঞানকে সহজ করে সরল ভাষায় সাধারণের সামনে তুলে ধরা যায়। বাংলা-ভাষার দ্রুত বিকাশ এই মহতী প্রচেষ্টাকে কতটা সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছে?

এইসব নানান প্রশ্নের সঙ্গে কি বিংশ শতাব্দীর বাংলার বিজ্ঞানের বিকাশের কোনো সম্পর্ক নেই? কোনো ঐতিহাসিক কি এই সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন? বাংলার বিজ্ঞান-জগতে নব আলোড়নের গভীর প্রভাব পরবর্তীকালে কী আকারে প্রকাশ পেল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বোসের জীবনী রচনা সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হল? বাংলার ইতিহাস, বাংলার বুকে জীবনের জোয়ার-ভাঁটা, যে বিশাল-আয়তন সুন্দর পট দিয়েছে, জীবনী-রচয়িতারা তারই ভিত্তিতে জীবনী-চিত্রাঙ্কণে কেন পেছপা হবেন? অবশ্য রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী বিশ্লেষণের পথ ধরার প্রয়াস পেয়েছে; তাই আংশিকভাবে সাফল্য অর্জনও করেছে আশানুরূপ হতে। মনোরঞ্জন গুপ্তের বইএর সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলে সুবিধা হত। অবশ্য দুটো জীবনীই, এক অর্থে, একে অন্যের পরিপূরক।

দুটো লেখনীই জীবনী-চিত্রাঙ্কণে একই ধরণের কয়েকটি দোষে দুষ্ট। যে ধরণের অভিযোগ উপস্থাপন করার কথা হচ্ছে তা জীবনী-রচয়িতাদের রচনাকে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তবে যাদের জন্য এই জীবনীর অবতারণা তাদের উপর এইসব দোষাবলীর প্রভাব পরিমেয় হতে পারে। অভিযোগ আরও স্পষ্টতর করা যেতে পারে। অর্থাৎ, মানুষ-সত্যেন্দ্রনাথ কী ধরণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে মানুষের দুর্লভ গুণাবলী আহরণ করতে পেরেছেন তার বিশদ প্রকাশ নেই। অন্যদিকে, বিজ্ঞানী বোস মানুষ তো বটেন। তাই তাঁর সমকালীন সামাজিক কাঠামোর মানুষের স্বভাবজ নানা দুর্বলতার হাত

থেকে যে তিনি রেহাই পান নি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানী বোসের বিকাশ যে নানান মানুষসুলভ দোষ-গুণের সংমিশ্রণে তার কথা কে উল্লেখ করবে? তরুণ অনভিজ্ঞ অনুসন্ধানীর দলকে কার্যকরীভাবে, সত্যকারের মানব-সুলভ পথে, উদ্বুদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন সত্যেন্দ্রনাথের সামগ্রিক বিশ্লেষণ। শুধু মাত্র গুণ নয়; শুধু মাত্র কীর্তি নয়।

কোন্ জীবন-দর্শনের কোন্ দিক থেকে বোসের কার্যকলাপের যথার্থ ও উপযুক্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর তার আভাস থাকলে ভালো হত। বোসের জীবন কর্মবহুল। সেখানে নানা গুরু ঘটনা আছে যা তর্কাতীত নয়। সেইসব ঘটনার সঠিক তর্কমূলক অবতারণা উত্তর-বোস যুগের মানুষকেও নানা উপায়ে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয় সংক্ষেপে উত্থাপন করা যেতে পারে। যথাসম্ভব অল্প আয়াসে বিজ্ঞানের মোদ্দা কথা দেশের লোকের কাছে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা সেই ভাষায় শিক্ষাদান, যে ভাষায় মানুষ শিশুকাল থেকে ভাবতে শেখে, যে ভাষায় জীবনকে চিনতে শেখে, যে ভাষায় প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে শেখে। সেই ভাষারই অপর এক নাম মাতৃভাষা। এই সত্য বাংলার অনেক মনস্বী অনেক আগেই উপলব্ধি করেছেন। বোসের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টা এই সত্যকে চিনতে সহায়তা করেছে; এই সত্যকে দেশের লোকের আরও কাছে নিয়ে এসেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবনী দুইটির কিছু ত্রুটি আছে যা উপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলির বেলায় তারাই নতুন ও গুরু তাৎপর্য লাভ করে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল বাংলার বাইরে বিদগ্ধ সমাজে নিজের বক্তব্য পরিবেশন করা। সুতরাং এটা অন্যায় আশা নয় যে সেখানে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও উদ্যোক্তারা যত্নবান হবার চেষ্টা করবেন।

বোসের বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রকাশবর্ষ সাধারণতঃ সঠিক নয়। শুধু তাই না। Hydrogen atomএর লেখা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে Paper on Hydrogenation বলে (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা 10 লাইন 17)। বলবিদ্যায় Horpolhode রূপান্তরিত হয়েছে Horopolbadeএ (পৃঃ 10, লাইন 21)। পাউলির ব্যাতিরিক নীতির প্রকাশবর্ষ দেওয়া হয়েছে 1915 (পৃ 8, শেষ লাইন)। ফলে প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য বিকৃত হয়েছে ও অবান্তর মনে হবে। আবার পাঠকরা যখন দেখবেন যে তথাকথিত বোসনরা বিভিন্ন ফোটনদেরও সমষ্টি ("different kinds of photons," পৃ 18, লাইন 7), তখন তাঁরা যতটা চিন্তিত হয়ে পড়বেন তাই হবে তাঁদের জ্ঞানের মাপকাঠি।

সব কিছু মিলিয়ে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' যখন বিদগ্ধজনের কাছে গিয়ে পড়বে তখন আশঙ্কা হয় পাঠকরা দেশের, বিশেষ করে বিজ্ঞানসেবীদের, সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে শুরু করবেন। সে ধারণা সম্বন্ধে এখানে বিশদভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু উল্লেখ করা যায় যে সেই অন্ধকারেও আংশিক আলোর আভাস পাওয়া যাবে। এই আলোকসম্পাত করছে মূলতঃ বোসের কিছু স্বরচিত প্রবন্ধ-সংকলন, যদিও বোসের বিখ্যাত মৌলিক প্রবন্ধ এখানে স্থান পায় নি।

পূর্ণাংশু রায়

সম্পাদকের নিবেদন

রজনীকান্তের প্রথম বই 'বাণী' বের হয় ১৯০২ সালে, এবং এর আট বৎসর পরে, ১৯১০ সালে, মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে রজনীকান্তের মৃত্যু হয়। "রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সংগীত"— 'বাণী' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এই কথা বলে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সাধারণের কাছে রজনীকান্তের পরিচয় দেন। সেই পরিচয়ে অবিলম্বেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং সেই পরিচয়ে আজও তিনি পরিচিত। কিন্তু বাণীর সাধনা করার বা সংগীতসাধনা করার সুযোগ তাঁর জীবনে বেশি দিন হয় নি। কিন্তু ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যা রচনা করেছেন দেশবাসী তার মর্ম মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছেন কেবলমাত্র এই জন্যেই যে রজনীকান্ত ছিলেন হৃদয়বান্ কবি।

তাঁর জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁকে নূতন করে জানবার ও নূতন ক'রে পাবার জন্যে এই সংখ্যায় রজনীকান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি আলোচনা এবং সেই সঙ্গে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -কৃত রজনীকান্তের দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের পরিচয় ঘটে কি ভাবে তার বিবরণ জানা যায় রজনীকান্তের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিক সভায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষণ থেকে; সে ভাষণটি এই সংখ্যায় মুদ্রণ করা হল, এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য বিবরণও দেওয়া হল।

এই বৎসর বিদেশী কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস'এর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস'এর অন্তরঙ্গতার কথা সর্বজনবিদিত। আমরা এই সংখ্যায় ইয়েটস'এর সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ ক'রে তাঁর প্রতিও আমাদের শতবার্ষিক নমস্কার নিবেদন করলাম।

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রজনীকান্ত সেনের পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

রজনীকান্ত সেনের একটি চিত্র ও 'অমৃত' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনের এবং অপর-চিত্রটি কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমনোরমা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ইয়েটস্'এর চিত্র ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

রাজনৈতিক সাহিত্য

আত্মচরিত ॥ জওহরলাল নেহরু ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥ ১২·০০

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসংগ ॥ জওহরলাল নেহরু ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ১৫·০০

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ॥ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ ৮·০০

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগে ॥ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ ২·৫০

রবীন্দ্র-সম্পর্কিত রচনা

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ পঞ্চম মুদ্রণ ॥ ২·৫০

রবীন্দ্র-মানসের উৎস সন্ধানে ॥ শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ॥ ৩·৫০

জীবন চরিত

বিবেকানন্দ চরিত ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ একাদশ মুদ্রণ ॥ ৬·০০

শ্রীগৌরাংগ ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ৩·০০

চার্লস চ্যাপলিন ॥ আর. জে. মিনি ॥ ৫·০০

বিবিধ প্রসংগ

চিন্ময় বংগ ॥ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ॥ তৃতীয় মুদ্রণ ॥ ৪·০০

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥ ৪·০০

রমণীয় রচনা

চণক সংহিতা ॥ কালিদাস রায় ॥ ৩·৫০

সম্পাদকের বৈঠকে ॥ সাগরময় ঘোষ ॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ ॥ ৬·০০

ইন্দ্রজিতের আসর ॥ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ৩·০০

ঠগী ॥ শ্রীপান্থ ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ৫·০০

শিবঠাকুরের আপন দেশে ॥ রাণু সান্যাল ॥ ৪·০০

অভিযান-কাহিনী

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ॥ গৌরকিশোর ঘোষ ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ৫·০০

রহস্যময় রূপকুণ্ড ॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ৩·৫০

এভারেস্ট ডায়েরী ॥ ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস ॥ ৯·০০

খেলাধুলা

ফুটবলের আইনকানুন ॥ মুকুল দত্ত ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ ৫·০০

নট আউট ॥ শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ ৬·০০

কবিতা

অর্ঘ্য ॥ সরলাবালা সরকার ॥ ৩·০০

সুর ও সুরভি ॥ সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৩·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন : কলকাতা ৯

THE RALEIGH
ASANSOL
INDIA
র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল
কারখানায় সেন-র‍্যালের তৈরী
SRC-88 BEN

টুথ
পেস্ট
একমাত্র
ডেণ্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
'ফ্লুয়োরাইড' প্রভৃতি
বহুবিধ আধুনিক
ভেষজ
এর প্রচুর ফেনা দাঁত
সাদা ঝকঝকে করে আর
মুখে আনে মধুগন্ধময় স্নিগ্ধতা।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
CNC-3A BEN

বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩

লক্ষ লক্ষ প্রাণ একই সূত্রে গাঁথা।
ছোট ছোট অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেন বিরাট এক নদীতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে।

নানা ধর্ম্ম ও নানা মতের লোক এই দেশে স্বাধীনভাবে
শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ,
এই শান্তি ও সম্প্রীতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত
এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে হলেও তা বরণীয়।
মনে রাখবেন যে ভারতের এই ঐক্যবদ্ধ সমাজে
আপনার মতো, আপনার প্রতিবেশীও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এক মহান দেশের
এক মহান জনসমাজ

সুলেখা
ড্রইং এর
কালি
সুলেখা
প্রতিদিনের প্রয়োজনে
সুলেখা
ফাউণ্টেন পেন-এর
কালি
অ্যাভসল
অফিস
পেস্ট
ও গাম
সিকুরিটি
সিলিং
ওয়াক্স
সুলেখা
স্ট্যাম্প প্যাড
সুলেখা
ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা—৩২

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ · ১৮৮৭-৮ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্রাম — শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ · ১৮৮৭-৮ শক

চিঠিপত্র শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল পয়লা বৈশাখের উৎসব হয়ে গেল। বাইরে থেকে বেশি লোক আসেনি—আশ্রমের সবাইকে নিয়েই একরকম জমেছিল। তোমরা চলে যাওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন বেশ একটু রীতিমত শীত পড়েছিল। একবার বৃষ্টি হয়েও গেল তার পরে গরম পড়েছে। কিন্তু এমন কিছু কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে না। ফুল অপর্য্যাপ্ত ফুটচে— বেল ফুল টগর মধুমঞ্জরী কাঞ্চন কুড়চি অজস্র।

নীতু চলে গেল। বুড়ি তার বন্ধুদের নিয়ে হো হো করে বেড়াচ্চে। টাকাগাকিরা গরমে হাহুতাশ করে মোলো। কিন্তু হোচিসান কোনোমতেই হার মানতে চায় না। আজ সন্ধে বেলায় সে চা-উৎসব করবে উদয়নের পশ্চিম প্রাঙ্গণে। Flatulence-এর জন্যে রথীকে Lycopodium 30 দিয়ো। আমার বিশ্বাস পাহাড়ের জলটা রথীর পক্ষে পথ্য নয়। [২ বৈশাখ ১৩৩৮ 15 April 1931]

বাবামশায়

পুপুর 'সে' একেবারেই নিরুদ্দেশ। হয়তো দার্জ্জিলিঙে চলে গেছে। এখানে তার একটা কুকুর তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। আমার বিছানার নীচে রাত্তিরে শুয়ে থাকে।

ওঁ

উদয়ন
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমার টেম্পেরেচারে বাড়াবাড়ি তেমন কিছুই নয় যেমন গুজবটাতে। কি করে সুরু হল শুন্‌লেই বুঝতে পারবে জিনিষটার ওজন কি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেহে তাপনল প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছিল, উত্তাপের পরিমাণ আটানব্বই ডিগ্রির পাঁচ ছয় ফোঁটা উর্দ্ধে। বিনা কারণে উদ্বিগ্ন হতে যাদের সখ তারা বল্‌লে এ'কেই তো বলে জ্বর। তারপর থেকে লোকসমাজে প্রকাশ, আমার শরীর ভালো নেই। অথচ শরীরের চালচলন সম্পূর্ণ সহজ লোকের মতোই। অবশ্য বৈশাখমাসে গ্রীষ্মকালের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। মধ্যাহ্ন কালটা যথোপযুক্ত উত্তপ্ত বোধ হয়—তোমার গন্ধরাজের গাছগুলো অত্যন্ত বিমর্ষ। পাখীরা ঠোঁট ফাঁক করে জল খুঁজে বেড়াচ্চে। আকাশে একটা নীলিম লঘু কুহেলিকা। রোজ আশা করে থাকি উত্তর পশ্চিমে সজল জলদের আশ্বাস পাওয়া যাবে কিন্তু দিগন্ত একেবারে দেউলে। যাই হোক যা আশঙ্কা করা যায় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

মুটুদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেচি। তিনি কিছুমাত্র অপ্রসন্ন নন। অনুষ্ঠান কি রকম হওয়া কর্ত্তব্য সেই প্রশ্ন করে তিনি প্রমথনাথ তর্কভূষণকে পত্র লিখবেন বলেচেন। উত্তর এলে তার পরে আলোচনা করব কারদ্বারা কাজ সমাধা করা যেতে পারে। ছুটির মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন হবে এই কথাই এ পর্য্যন্ত স্থির আছে। কোনো বিঘ্নের আশঙ্কা করচিনে।

তোমাদের সব্‌জিক্ষেতের কোণে একটা কুয়ো খোঁড়া সুরু করা হয়েচে। এইটে আমার সত্তর বছর বয়সের একটা দানস্বরূপ রইল। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

বাবামশায়

হোচি সান্‌কে দিনুরা দার্জ্জিলিঙে নিমন্ত্রণ করেছিল। গরম তার পক্ষে অসহ্য হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্মোৎসবের আগে কোনোমতেই যেতে রাজি হলো না। কিন্তু তার পরেও না গেলে ও তো বাঁচবে না। বড়ো আশ্চর্য্য ভালো মেয়ে ও।

কল্যাণীয়াসু

কাল অনুষ্ঠান খুব ভাল করে সম্পন্ন হয়েচে। তুমি নিশ্চয় মনে করচ আমি মুটুর বিয়ের কথার উল্লেখ করচি। কিন্তু যদি নিজের জন্মদিনের ব্যাপারটাকে তার পূর্ব্বেই বসাই তবে আশা করি সেটাকে অহঙ্কার বলে গণ্য করবে না। সকলে সবসুদ্ধ খুব খুসি। এ রকম অনুষ্ঠান কলকাতায় কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

মুটুর বিয়ের আগ্যন্ত বিবরণ নিশ্চয় কোনো লেখিকার পত্রে পেয়েচ। সমস্ত বাধা অতিক্রম [করে] কাজ সমাধা হয়েচে। এই ব্যাপারে কুমার মহলে চাঞ্চল্য জন্মেচে। মুকুলও সুরেনের পথ অবলম্বন করতে উৎসুক, গোরাও।

তোমরা থাকলে সকলেই খুসি হোত কিন্তু এই ডব্‌ল টানাটানি রথীর সইত না সে নিশ্চিত। কিন্তু আশ্রমে দিনুর যে সব বহুতর ভক্ত ও ভক্তা আছে তারা নিশ্চয় ঠিক করে রেখেছিল কালকের মত দিনে দিনু কখনই নিষ্ঠুরভাবে দূরে থাকতে পারবে না। তারপরে তারা যখন শুন্‌লে দিনুর সদয় হৃদয় বিচলিত হয়েছিল কেবল দিনুনীর কঠিন শাসনে সংকল্প অপরিণত রইল তখন তারা মনে মনে সান্ত্বনা পেল। অথচ দিন এখানে স্নিগ্ধ, একটুও গরম নয় এমন কি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডার আক্রমণে দ্বার বন্ধ করে গায়ে কাপড় দিতেও হয়েচে। —অনেক রকম উপহার এসেচে তার অধিকাংশই তোমার ভাণ্ডারে যাবার যোগ্য। সেই যে আঙটি তোমাকে দিয়েছি সেটা থাকলে বর-বরণের উপকরণ সুন্দর হতে পারত। প্রশান্তরা এসেচে। হাজার হাজার চিঠি লিখতে হচ্চে এবং প্রত্যহ বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ চলচে— বোধ হচ্চে আগামী বৎসরের জন্মদিনটা এই বৎসরেই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, নীলরতনবাবুর মত এই যে টেম্পেরেচার আর একটুখানি স্বাভাবিক হওয়া পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং যাওয়া আমার পক্ষে ভালো হবে না। এখন ৯৭ থেকে ৯৯-এর নীচে পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্যে ওঠা নামা করে। ক্রমে সহজ অবস্থায় আসচে। দার্জ্জিলিঙে বৃষ্টিবাদল দেখা দিয়েছে বলে আমার শরীরে ওটা

স্বাস্থ্যকর হবে না। তারপরে যখন তোমরা খবর দিলে আমার জন্যে আলাদা বাড়ি ভাড়া করবে তখন থেকে আমার উৎসাহ চলে গেছে। তাহলে তোমাদের বাড়ি বোধ হয় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। অনিশ্চিত ফলের প্রতি প্রত্যাশা করে আমার জন্যে অনর্থক অর্থনাশ করবে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির দিনে এটা আমার সহ্য হবে না। আজ কলকাতায় যাব জোড়াসাঁকোর ছাদের উপরে। ডাক্তার আছে, পথ্য আছে, পাখা আছে, পত্তুলাল আছে, ছাদে পায়চারি আছে— চলে যাবে।

··· অত্যন্ত চঞ্চল। কাল তার সম্ভবপরা বধূর ভাইয়ের আসবার কথা ছিল— স্টেশনে কেবলি ট্যাক্সি পাঠিয়েচে। ···র প্রাণ বেরিয়ে গেল— সুরেনকে ঘুমতে দিচ্চে না— সাতটার গাড়ি বৃথা চলে গেল— এগারোটার গাড়িতেও কারো দেখা নেই— ···র বারান্দায় তক্তাপোষে শুয়ে রাত কাটিয়েচে। থেকে থেকে সকলকে হেঁকে হেঁকে বলচে, আমার মন নিরাসক্ত— আবার পরক্ষণেই পরামর্শ করচে ঘরে যে সাইনবোর্ড আছে তাতে কি কি আসবাব রাখা আবশ্যক। এদিকে আমরা ভাবচি সুদীর্ঘ দশ বৎসরের পরে হঠাৎ কী এমন দুর্নিবার কারণ ঘটতে পারে যাতে মেয়ের অভিভাবকদের আর সবুর সইচে না। ওদিকে ··· তার বন্ধুদের কাছে জানাচ্চে যে যে মেয়ে একদা ক্ষণকালের জন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র করে এই দশ বৎসরকাল কঠোর কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে বোলপুরের উদ্দেশে তাকিয়ে বসে আছে তাকে নিরাশ করা মহাপাপ। বন্ধুরা বলচে নিশ্চয় তোমার কপাল ভাল, নইলে কপালে অত বড়ো একটা আব ফুলে উঠল কেন? এদিকে ···র আত্মাভিমানে গুরুতর আঘাত লেগেচে— কারণ সে ছিল সাত বৎসর তপস্যায়, এ মেয়ের তপস্যা দশ বছরের, তা ছাড়া তার পূর্ণ দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল সুপরিচিত বরের মুখে, এর শূন্য দৃষ্টি অনিমেষ স্থাপিত অপরিচিত বরের অভিমুখে। প্রজাপতির দুই পাখা এখন এইভাবে দ্বিধাকম্পিত— দেখা যাক ক্রমশ কি ঘটে ওঠে। এটা বোঝা যাচ্চে আশ্রমের হাওয়ায় একটা ছোঁয়াচ লেগেচে— এমন কি ···র জন্যেও মনে ভাবনা ধরেচে। যুদ্ধে যাকে casualty বলে তার সূত্রপাত হয়েচে। আজ এই পর্য্যন্ত। রবিবার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা পুপের পোষ্টকার্ডে সংক্ষেপে তোমাদের ভ্রমণের ইতিহাস পাওয়া গেছে। আর যাই হোক শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না। গাড়িতে তোমাদের একটা গয়নাও গেল না, তোমার আয়ার নাক ভেঙে যায় নি— ভালো করে গল্প জমে উঠল না। আমাদের এখানে বরানগরের ইতিবৃত্ত ছাড়িয়ে গেছে—এখন চলচে পুলিসের আনাগোনা— বাসুদেব লালধারী, গোরুগুলো বাদে তাদের আত্মীয়স্বজন সব এখন থানায়। ছুটির আরম্ভভাগ সরগরম হয়ে উঠচে— সকলের চেয়ে হাঁকডাক করে বেড়াচ্চে সুধাকান্ত— সকাল বেলায় যখন চা খেতে আসে তার মুখে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শুনতে পাই— খুসিতে আছে।

মাঝে ইচ্ছা হয়েছিল জাহাজে চড়ে বজ্বার ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গা উজিয়ে যাই। কল্পনা করতে খুব ভালো লাগে কিন্তু সাহসে কুলোলো না। জাহাজে একবার চড়ে বসলে ভাবনা নেই কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিকাটা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই এক পা বাড়িয়ে দিয়ে আবার সেটা ফিরিয়ে নিয়েছি। শ্যামলী

থেকে কোনার্কের কোণ পর্য্যন্ত আমার ভ্রমণের সীমা— ইহ জীবনে তার বেশি আর অগ্রসর হতে পারব না— ইতিপূর্বে যা পরিক্রমণ হয়ে গেছে মনে মনে তারি জাওর কেটে বাকি দিনকটা অতিবাহিত করব।— আজকাল ছুটিতে এখানে আর সব শান্ত গাঙ্গুলির কণ্ঠস্বর ছাড়া। মাঝে মাঝে দর্শনার্থীর দল ভিড় করে, তখন আবার গঙ্গাবক্ষে ভেসে পড়বার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। ওড়বার জন্যে ডানা ঝাপটাতে গিয়ে দেখি ডানা ভাঙ্গা। তোমার অবর্ত্তমানে মাখনের মাত্রা কমে গেছে কিন্তু রোজ আধ গ্লাস ঘোল পেয়ে তোমাকে স্মরণ করি। ইতি লক্ষ্মীপূর্ণিমা ১৩৪২

বাবামশায়

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গাঙ্গুলি—প্রমোদলাল গাঙ্গুলি

দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলরতনবাবু—ডাক্তার নীলরতন সরকার

মুটু—রমা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী

পুপু—শ্রীনন্দিনী দেবী, রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা

পুপে—শ্রীনন্দিনী দেবী

প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

বুড়ি—শ্রীমতী নন্দিতা দেবী

মুকুল—শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

রথী—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাস্ত্রীমশায়—মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী

সুধাকান্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ কর

মহাকবি দান্তে

১২৬৫ ১৩২১

বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচে (Beatrice)। বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রীচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবনকাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে— তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র। বিয়াত্রীচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র (Vita Nuova) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচেরই আরাধনা; ইহার কিয়দ্দুর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল— তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রীচেকে দূর স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

"এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম— সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে— যে পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রীচে) জানিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছুদিন যদি বাঁচিয়া থাকি তবে তাঁহার বিষয়ে এমন লিখিব যাহা এ পর্যন্ত কোনো মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনো লেখে নাই।"

এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'ডিভাইনা কামেডিয়া' (Divina Commedia) লিখেন, ও বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন যাহা কোনো মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখনো বলে নাই।

দান্তে তাঁহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান-প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরবপ্রেমের উত্তরপ্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ— দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতিদূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন। অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রীচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত। বিয়াত্রীচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রীচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রীচেকে মানুষ হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়। তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্তও স্থান পায় না। যদিও 'ভিটা নুওভা' কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রীচে। কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রীচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই।

বিয়াত্রীচে সর্বদাই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রীচেকে দান্তে এমন-একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, "যে ব্যক্তিই বিয়াত্রীচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।" দান্তে বলেন, যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত "তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।" দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রীচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের ডিভাইনা কামেডিয়ার নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়াই অমনি সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে— দেবতারা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছে। বিয়াত্রীচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই 'ভিটা নুওভা'র আরম্ভ।

"যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য তাঁহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহান মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন…তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি কটিবন্ধ ও বাল্যবয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলঙ্কার। সত্য বলিতেছি তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায় শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম) কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথাগুলি বলিল, ঐ দেখো। আমা-অপেক্ষা সরলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন;… সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়রাজ্যের অধিপতি হইল।… দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রীচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রসংশনীয়, তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে।" বিয়াত্রীচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান। সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রীচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয়: "উপরি উক্ত মহান মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-বসনা, সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়জনক মহিলা আর-এক বার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম সেইদিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।…এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে, সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নের বিষয় সেই সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া ও তাঁহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত

অর্থ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেমবন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার।
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্ মোরে অর্থ কি ইহার?
যেকালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ।
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয়-প্রদেশ
দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন ;
মোর হৃদ্পিণ্ড রহে করতলে তাঁর।
বাহু 'পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার।
তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ আকার।

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। আবার যে-গূঢ় কথা সকল কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—'কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ?' আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রীচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কি আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা "সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িতা, পুণ্যের রাজ্ঞী স্বরূপা"র কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, "এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন আমার সুখের একমাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা-কিছু দোষ করিয়াছে সমুদায় মার্জনা করিতাম।" এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন। জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জন স্থান

পাইলেন সেইখানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম উচ্ছ্বাসবেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জন গৃহে গিয়া "কাতর শিশুর" ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবার কোনো বন্ধুর বিবাহসভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নববধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রীচে। তিনি এমন এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রীচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "যদি এই মহিলা (বিয়াত্রীচে) আমার অবস্থা জানিতেন তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাঁহার দয়া হইত।"

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এ পর্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাঁহাকে তুমি ভালোবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রেই তুমি যদি অমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালোবাসিবার ফল কি?" তিনি উত্তর দিলেন "তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এ পর্যন্ত আমার ভালোবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কারই আমার ইচ্ছার একমাত্র গম্যস্থান ছিল— কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক— প্রেম আমাকে এমন আর-একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোনো কালেই শেষ হইবে না।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোন্ সুখ? দান্তে কহিলেন "আমার মহিলার প্রশংসাগান"। তাঁহার মহিলার প্রশংসাগান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

রমণি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
ব'লে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাঁহার—
মন খুলে ব'লে তবু জুড়াইবে মন।
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান—
তাহা হতে মহত্তর চরিত তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরান,
চির-বল অর্পিয়াছে বচনে আমার।
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশোগান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আনি—
কিন্তু থাক— গাব না কো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কি জানি।
আমার এ ভালোবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভালো তোমাদের কানে।

স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
'দেখো প্রভু, দেখো চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে!
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ।
তাই দেব অনুনয় শুন গো আমার,
দেবতার মাঝে তারে করো আনয়ন।'
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন, 'ধৈর্য ধরো, আসুক সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা তার ভয়।'

...

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

...

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন।
মুকুতার মতো পাণ্ডু বরণ তাহার—
প্রকৃতির পূর্ণতম শিল্প সেই জন,
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার।
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক-আঁখি করায় মুদিত—
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
একদৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি তো যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব কোরো না কভু, বলো তাঁহাদের—
'দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহাযশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।'
যদিবা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখো যেন রহিও না তাহাদের কাছে—

অসাধু যাদের জানো, মন ভালো নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিও হে গীত তুমি তোমার হৃদয়!
মহিলা আমার বসি আছেন সেখানে
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তাঁরে মোর কথা তুমি দিও বুঝাইয়া।

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে হইল, বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইবে। কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে "তোমার মৃত্যু হইবে", কেহবা কহিতেছে "তুমি মরিয়াছ"। তিনি দেখিলেন, যেন সূর্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারিদিকে পাখিরা মরিতেছে ও পড়িতেছে—এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে কহিল "জান না তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?" তিনি যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুকালীন প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন।

একদিন তিনি মনে করিলেন, এ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে সয়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ বলে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার।
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরান,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে।
প্রেমের প্রসাদে মোর হেনশক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ-ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীনভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল— সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল "যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কি নির্জন হইয়াছে? সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তম ছিল সে জাতি আজ কি বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে?" বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইয়াছে— এই সংবাদ

শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সংগীত থামিয়া গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর চলিত ভাষায় লিখা যায় না। গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার আর কি সান্ত্বনা হইতে পারে? তিনি বিয়াত্রীচের মৃত্যু ও জন্ম তিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ-গণনার অনুসারে স্থির করিলেন— বিয়াত্রীচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ত্রিমূর্তির (Holy Trinity) কোনো-না-কোনো যোগ আছে।— এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল। তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে নগরের কি দুর্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন— তাঁহার বিশ্বাস হইল যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য কর্ম।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল— যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়
জীর্ণ হয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া,
নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়
(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া;
ক্রমশঃ এ দেহ মোর কবরের পানে,
তবে তাহা মৃত্যু; কিম্বা প্রকাশি এ ব্যথা!
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্মের কথা,
হে রমণী তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক অশ্রুজল—
তখন যা কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণী বলিব গো তোমাদেরি কাছে।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন— বিয়াত্রীচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন— ঈশ্বর দেখিলেন— এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সংগীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সংগীত আমার,
যাও যেথা যেইখানে রমণীরা আছে,

আগে তুমি যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে!
এখনো তাদেরি কাছে করো গো প্রয়াণ।
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান!

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কি না তাহাই দেখিবার জন্য চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন— একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল। অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল। সেদিন চলিয়া গেলেন, কিন্তু আবার তাহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর-একদিন সেইখানে গেলেন— আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন— দেখিলেন— দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রীচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে 'প্রেমের বর্ণ' নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন "আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।" পরক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "চক্ষু! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে, যে মহিলার (বিয়াত্রীচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস, সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ঐ রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন।" কিন্তু ঐ তিরস্কার বৃথা। আপনাকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যে দিকে মন ধাবিত হয় তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না। অবশেষে স্থির করিলেন,— প্রেম তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্যই উক্ত মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এইরূপে নূতন প্রেম যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে একদিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিত-বসনা বিয়াত্রীচেকে দেখিতে পাইলেন— ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল।

'ভিটা নুওভা' কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছ চলি, ওগো যাত্রীদল,
যেন কোন দূর বস্তু করি কল্পনা,—
মোদের দহিছে সেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশে নি যেন সে যাতনা
তোমাদের নিজ দেশ এতই কি দূরে?
এ শোকার্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জান না এ পুরে
কি মহান্ শোকানল দহিতেছে হিয়া!
তবু যদি একবার দাঁড়াও হেথায়,

কিছুক্ষণ মোর কথা শুন মন দিয়া—
তা হলে বিদায়কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর।
সেই বিয়াত্রীচে-হারা অভাগা নগর।

'ভিটা নুওভা' কাব্যে ইহার পরে আর-একটি মাত্র গীতি আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রীচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রীচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, ভাবিলেন তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয় যে, সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া 'ভিটা নুওভা' কাব্য শেষ করিলেন।

বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য 'ডিভাইনা কমেডিয়া' (Divina Commedia) 'ভিটা নুওভা' লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে দান্তের কবিতার বহির্ভূক্ত জীবনের বিষয়ে দুই-এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী, ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, একদল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। 'ভিটা নুওভা' কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোনো বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন— মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই— কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা। যখন তিনি বিয়াত্রীচের প্রতি-হাস্যে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দরিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্যশাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যাল্‌ডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েলফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে একদলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর শাসনকার্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনো কার্য ছিল না। রাজকার্যে নগরীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসক-দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মতো নির্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল— তখন ফ্লোরেন্সবাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্তবেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি

দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্বাসনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যখন বিয়াত্রীচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজবিপ্লব-ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রীচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি-মান-যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন—

জীবনের মধ্য পথে দেখিনু সহসা
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কী ভীষণ অতি দারুণ গহন—
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত।
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক।

জীবনের মধ্যপথে, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন, তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে, সে তাঁহার রাজশাসনকার্য, খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অর্ধ অজ্ঞানের মতো হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন—এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র। চিতাব্যাঘ্র সুখতৃষা, সিংহ দুরাশা, ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এইরূপে এই সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

হেনকালে সহসা দেখিনু একজন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—
'জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও না কেন
দয়া করো মোরে' আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে!

ইনি আর কেহ নহেন—কবি বর্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

মহাছায়া কহিলেন, 'মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হয়েছে তব বৃথা অভিভূত—
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া, তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হতে হয় গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম তথায়—
প্রথমে কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হল মোর কহি তোরে তাহা।

পরলোকে থাকে যারা সংশয়-আঁধারে—
তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পুণ্যময় মূর্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
দেবতার স্বরে সুর বাঁধি কহিলেন—
অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ—
বন্ধু এক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা-বিঘ্ন পেয়ে—
ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি।
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি।
উদ্দীপনা— বাক্যে তব, যে কোনো উপায়ে
ফিরাইয়া আন, তবে লভিব বিরাম!
আসিয়াছি স্বর্গ হতে বিয়াত্রীচে আমি
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ।

বর্জিল সেই বিয়াত্রীচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জিলের সহিত নরক দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় সর্গে দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে ;
মোর মধ্য দিয়া যাও চিরদুঃখ ভোগে ;—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে।
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের।
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত—পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন— সেখানে দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—

তারকা অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি— কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চারিদিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণু সম ফিরিছে সতত!

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফের্নো, অর্থাৎ নরক— ক্রমাগত নরকের বর্ণনা, পরে পর্গেটরী— অর্থাৎ যাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি— পরে স্বর্গ।

ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনার বিবরণ পাঠকদিগের নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম। পর্গেটরী কাব্যের শেষভাগে বিয়াত্রীচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল।—বর্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য রথে বিয়াত্রীচে আসিতেছেন। সুরবালারা তাঁহার চারিদিকে এমন পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন যে তাঁহার আকার অতি অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই, তিনি কহিতেছেন—

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারে নি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র পুণ্য-জ্যোতি,
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু
কবি বর্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিম্বা শোক ভারে হলে বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে!
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়,
পুরানো সে অগ্নি পুন উঠেছে জ্বলিয়া।'
হা বর্জিল কোথা— হয়েছেন অন্তর্ধান।
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জিলের এই সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রীচে কহিলেন যে, "দান্তে কাঁদিও না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।" সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রীচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন "চাহিয়া দেখো, আমি বিয়াত্রীচে"। বিয়াত্রীচের সেই "অটল মহিমায়" দান্তে "জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের" ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রীচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্প বয়সে দান্তের হৃদয় ধর্মে ভূষিত ছিল। বিয়াত্রীচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্তদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালোবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রীচের তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু-বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ-বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গদর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গনরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,
তেমনি আমারো হল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে।

ভারতী ১২৮৫ ভাদ্র

মহাকবি দান্তে ও আধুনিক মন

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারকে আদিকবি বলা হয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আদি সংকলক। আদিযুগের গাথা ইতিহাস ও এপিক-চক্র থেকে সংকলিত বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যান তাঁরা এক-একটি দীর্ঘসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। সেই সূত্রে শুধু কাহিনী-পরম্পরাই নয় যুগ ও জন -মানসও বাঁধা পড়েছে। সংকলক বলে আদিকবিদের লঘু করা আমার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এ কথা না বললে তাঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালের মহাকাব্য-রচয়িতাদের মৌল পার্থক্য সূচিত করা সহজ হয় না। মহাভারত ও ইলিয়াদ সাহিত্যে মহাদেশতুল্য, প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীস এদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিধৃত। এত বড় ভার একা বহন করতে পারেন এমন 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' শিল্পী অসম্ভব। ব্যাস বা হোমারের মতো ভার্জিল, দান্তে বা মধুসূদন বিস্ময় সৃষ্টি করেন না সত্য, কিন্তু এঁদের কাঁধে দায়িত্বভার গুরুতর। এই অর্বাচীন মহাকবিদের ভারোত্তলনের সাহস আমাদের চমকিত করে, কারণ একক ক্ষমতায় এঁরা এক-একটি দেশ বা মহাদেশ, যুগ বা যুগপর্ব বহন করতে অগ্রসর। এঁরা কোনো কিংবদন্তীর বল্মীকস্তূপে নিজেদের আড়াল করেন না, স্বেচ্ছায় স্বনামে স্বমহিমায় স্বীয় দায়িত্বে ব্যাস ও হোমারের অনুরূপ ক্ষেত্রে স্বরাট্‌ হতে চান। এই স্পর্ধার জন্যই এঁরা আধুনিক। আদি মহাকাব্যের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, কারণ কোনো একক রচয়িতার কণ্ঠ তার পশ্চাতে শব্দিত নয়। কিন্তু অর্বাচীন মহাকাব্যমাত্রেই ব্যক্তিত্ববান ও বিবেকী, এবং ঠিক এই কারণে আধুনিক মনের জটিলতাও এতে বর্তমান। তাই এলিয়ট যখন দান্তের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাম একসাথে উচ্চারণ করেন, তা অসমীচীন মনে হয় না।[১] শেক্সপীয়রের বিচিত্র কাব্য ও নাটকের মধ্যে যেমন শেক্সপীয়রীয় ঐক্যবোধ অনুভব করা যায় তেমনি দান্তের বিভিন্ন রচনার মধ্যেও এক দান্তে-চিহ্নিত ঐক্যবোধ আমরা অনুভব করি। এই ঐক্যবোধের পশ্চাতে রয়েছে শিল্পীর ক্রিয়াশীল একক মন। যখন দেখি, ইনফের্নো পুর্গাতোরিয়ো পারাদিসো প্রত্যেকটিরই অন্ত 'তারকা'-চিহ্নিত, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মহাকবি দান্তে একই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে অগ্রসর হয়েছেন; বুঝতে পারি যে দিভিনা কোম্মেদিয়া শুধু কল্পিত নয়, পরিকল্পিতও।[২] ভিতা নুয়োভার শেষে কোম্মেদিয়ার ইঙ্গিত এবং কোম্মেদিয়ায় ভিতা নুয়োভার পূর্বস্মৃতিও এই ব্যক্তিমনের ঐক্য ও আধুনিকবোধের পরিচয় বহন করছে।[৩]

এলিয়টের মতে, দান্তে ও শেক্সপীয়র আধুনিক জগতের দুই দিকপাল, তৃতীয় কেউ নেই যিনি এঁদের শরিক বা সমকক্ষ।[৪] অথচ আমরা জানি দান্তে মধ্যযুগের কবি (১২৬৫-১৩২১) এবং শেক্সপীয়র রেনেসাঁস-

---

১. 'Shakespeare gives the greatest width of human passion; Dante the greatest altitude and greatest depth. They complement each other.' T. S. Eliot: *Dante*. p. 52.

২. প্রত্যেকটিরই অন্ত্যশব্দ stelle.

৩. Purgatorio, XXX; Vita Nuova, উপসংহার।

৪. 'Dante and Shakespeare divide the modern world between them; there is no third.' T. S. Eliot: *Dante*. p. 51.

যুগের নাট্যকার (১৫৬৪-১৬১৬)। নিশ্চয়ই এলিয়ট যে অর্থে আধুনিক, দান্তে বা শেক্সপীয়র সে-অর্থে আধুনিক নন। দান্তে ও শেক্সপীয়রের মধ্যেই আধুনিক জগৎ বিধৃত, এ কথার মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দান্তে বা শেক্সপীয়রকে দুভাবে দেখা যায়, এক : তাঁদের স্ব-স্ব যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে, দুই : যুগোত্তীর্ণ বিশ্বজনীন শিল্পী হিসাবে। এঁরা যুগোত্তীর্ণ বলেই প্রত্যেক পরবর্তী যুগে আবার নূতন করে অবতীর্ণ হতে পারেন, এবং এঁদের নূতন করে আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রত্যেক যুগ নিজেকেও আবিষ্কার করে। এঁরা জীবনের মধ্যে, জীবন্ত সাহিত্যের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বেঁচে থাকেন, এই কালজয়ী জীবনীশক্তিরই অন্য নাম ক্লাসিকতা। মনে রাখা দরকার, এঁদের কারো রচনাই আধুনিক সাহিত্যের বিকল্প নয়, আধুনিক সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন ক্লাসিক সাহিত্যে মিটাবার কথা কেউ কখনো ভাবে না। ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বা পরিপূরক নয়, পোষক ও পরিমাপক। কিন্তু ক্লাসিক বলেই ক্লাসিক সাহিত্যকে অতীত যুগের দুর্গে বা মন্দিরে রেখে যদি আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করি, তাদের মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ যদি না খুঁজি, না পাই, তবে আমাদের সাহিত্যচেতনাই তাতে দরিদ্র প্রমাণিত হবে। শেক্সপীয়রকে ষোড়শ শতকে এবং দান্তেকে ত্রয়োদশ শতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্তহীন প্রচেষ্টা আধুনিক ভাবনার এই দীনতারই পরিচায়ক। শেক্সপীয়রকে দিয়ে হয়তো ষোড়শ শতকের ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু ষোড়শ শতক দিয়ে শেক্সপীয়রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। শেক্সপীয়র ও দান্তে তাঁদের জন্মভূমি ও জন্ম-শতক অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই আজ ক্লাসিক, এবং ক্লাসিক বলেই সার্থক আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও যুক্ত। ত্রয়োদশ শতকের ক্যাথলিক চার্চ ও ধর্মবুদ্ধি দান্তের খুবই কাজে লেগেছিল সত্য। অ্যাকুইনাসের সুম্মা থিয়লগিয়ে শুধু নয়, মরমিয়া সন্ত বনাভেনতুরে রচিত ইতের মেনতিস অ্যাদ দেয়ুমও তাঁর আয়ত্ত ছিল। ধর্ম তত্ত্ব ও কাব্যে পূর্বসূরীদের কাছে ঋণগ্রহণে দান্তের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু কাব্যের অনুরোধে এবং স্বকীয় প্রেরণায়, ধর্ম ও কাব্যের তত্ত্বাংশে তিনি যেসব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তারও তাৎপর্য কম নয়। এইসব পরিবর্তনের পশ্চাতে যুগের পীড়ন ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই, ছিল শুধু এক আয়ত দৃষ্টি ও আয়ত হৃদয়ের বিশাল অনুভব। দান্তের নামের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দী ও মধ্যযুগ যুক্ত থাকলেও আমরা যখন তাঁর কাব্য উপভোগ করি—যতখানি করতে পারি—আমাদের অনেক কাছে তাঁকে আমরা দেখতে পাই, যেমন পাই চসারকে, শেক্সপীয়রকে। ত্রয়োদশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃৎ ছাড়াও তিনি আরো কিছু, এবং এই অতিরিক্ত কিছুর জন্যই তাঁর দীর্ঘ ছায়া সাতশো বছর পার হয়েও আমাদের মুখে এসে পড়ে।

দিভিনিয়ার পুর্গাতোরিয়ো অংশে মাতেলদা কাহিনীই ধরা যাক। মধ্যযুগীয় কাব্যধারা দিয়ে একে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। এটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে দান্তের মনের ব্যক্তিগত বিস্ময়টিই সঞ্চারিত হয় :

e là m' apparve, sì com' elli appare...
ond' era pinta tutta la sua via[৫]
এবং সেখানে আমার সামনে দেখা দিল, যেমন অকস্মাৎ
কোনো কিছু দেখা দিলে, মন থেকে অন্যসব চিন্তা
বিস্ময়ে চলে যায় তেমনি—

৫. Purgatorio, XXVIII, 37-42.

এক নির্জন নারী সে চলেছে
গান গেয়ে গেয়ে, ফুলের পর ফুল তুলে,
পথ তার কুসুমে কুসুমে রঞ্জিত।

চোখে দেখার এই মায়াভীলিয়া বা বিস্ময় যেন মধ্যযুগের কুহেলিকে অনেকখানি বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। দান্তের প্রায় শতাব্দীকাল পরে ইংরেজ কবি চসার ক্যান্টারবেরি টেলসের নাইটের আখ্যানে এমিলির বর্ণনা এখান থেকেই ধার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের কবি হয়েও জফ্রে চসার এমিলির মধ্যে কোনো প্রেমই সঞ্চার করতে পারেন নি। এমিলির গান ও পুষ্পচয়ন কণ্ঠ ও অঙ্গুলির কয়েকটি শোভন-মুদ্রা মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়:

Till it fil ones, in a morwe of May…
And as an aungel hevenysshly she soong.[৬]

প্যালামন এমিলিকে দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু এমিলির মনে কারো জন্য কোনো অনুরাগ ছিল না। এমিলি নিজের জন্য মালা গাঁথে, অন্য কারো গলায় মালা পরাবার স্বপ্ন সে দেখে না। দান্তের মাতেলদা কিন্তু প্রেমেরই প্রতিমূর্তি। ২৮শ সর্গের প্রথম ২২টি শ্লোকে দান্তে যেন মাতেলদার আবাহনই রচনা করেছেন। প্রকৃতি এখানে সুরেলা মুখর স্পন্দিত; নদীর জল উপছে পড়ছে ঘাসের উপর, ফুল ফুটে আছে বিচিত্র ভঙ্গিমায়। মাতেলদা যেন এই ফুল্লকুসুমিত কাননে প্রেমের প্রথম পদার্পণ। তার গান প্রেমেরই গান। দান্তে এখানে ঐশ্বরপ্রেমকে এমনভাবে অচিহ্নিত রেখেছেন যে মর্তপ্রেমের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ করা যায় না। যেন মর্তপ্রেমের এমন-কি দেহকামনার আভাসই বাকপ্রতিমায় ফুটে উঠেছে। মাতেলদাকে দেখে দান্তের প্রসার্পিনের কথা মনে পড়ছে:

Tu mi fai rimembrar dove e qual er a
Proserpina nel tempo che perdette
la madre lei, ed ella primavera.[৭]
তুমি স্মরণ করালে প্রসার্পিনের কথা
সেই স্থান এবং কাল, যেখানে হারিয়েছিল
মা তার প্রসার্পিনকে এবং প্রসার্পিন বসন্তকে।

প্রসার্পিনকে যখন প্লুটো তার মা ও সঙ্গিনীদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে যান তখনকার কথা দান্তের মনে পড়ছে। এখানে প্রিমাভেরা বা বসন্ত বলতে বসন্তের ফুল বুঝতে হবে। প্লুটো যখন বলপূর্বক প্রসারপিনকে রথে তুলে নিয়ে যান তখন এই ফুলগুলি প্রসারপিনের শরীর থেকে ঝরে পড়েছিল। অর্থাৎ প্লুটোর মতো দান্তেরও মনোবাসনা মাতেলদাকে হরণ করবেন, সম্ভোগ করবেন। তিনি মাতেলদার চোখে সেই আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন যা আদনিসকে দেখে ভীনাসের চোখে একদিন জ্বলে উঠেছিল:

---

৬. The Canterbury Tales, 1034-1055.

৭. Purgatorio, XXVIII, 49-51.

non credo che splendesse tanto lume
sotto le ciglia a venere, trafitta
dal figlio fuor di tutto suo costume.[৮]
বিশ্বাস করি না যে এমন তীব্র আলো ঠিকরে পড়েছিল
ভীনাসের চোখ থেকে যখন আচমকা
মদনদেবের তীর বিঁধেছিল তাকে।

আমরা শেক্সপীয়রের পাঠকরা অন্তত জানি সেই স্প্লেন্দেস্সের অর্থ কী :

Here come and sit, where never serpent hisses
And being set, I'll smother thee with kisses.[৯]

দান্তে ছবিটি আরো একটু স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলছেন, লেয়ান্দার যেমন তার প্রেমিকা হেরোর সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল তেমনি ব্যাকুল তিনি মাতেলদার সঙ্গে মিলনের জন্য :

Tre passi ci facea il fiume lontani[১০]
আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান— নদী— মাত্র তিনটি পদক্ষেপ।

হেরোর জন্য লেয়ান্দারের কামনা কি বিশেষভাবেই দেহজ কামনা নয়? যে-নদী মাতেলদাকে এপার-ওপার পৃথক করে রেখেছে সে-নদীও দান্তের কাছে অসহ্য লাগছে। নদীর ব্যবধানটুকু না থাকলে তিনি মিলিতই হতেন। অথচ একটু আগেই দান্তে পুর্গাতোরিয়োর শেষচূড়া অতিক্রম করেছেন, যে আগুনে সব মর্তকামনা পুড়ে ছাই হবার কথা সেই আগুনের মধ্য দিয়ে পূত হয়ে এসেছেন। তাঁর গাইড ভার্জিল বলে গেছেন যে, দান্তের ইচ্ছা এখন মুক্ত শুদ্ধ স্বাধীন এবং এই ইচ্ছাকে তিনি নির্ভয়ে অনুসরণ করে যেতে পারেন।

come la scala tutta sotto noi···
per ch'io te sovra te corono e mitrio.[১১]
যখন সব সিঁড়ি পড়ে রইল আমাদের পায়ের নীচে
এবং আমরা সব চেয়ে উঁচু সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে,
ভার্জিল আমার চোখে তাঁর চোখ রাখলেন,
বললেন : পার্থিব এবং অপার্থিব আলো
দুইই তুমি দেখেছো বৎস, এমন জায়গায় এসেছো
যেখান থেকে আমি নিজেই আর দূরে ঠাহর করতে পারছি না।
তোমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি অনেক বুদ্ধি ও নৈপুণ্য খাটিয়ে;
এর পর প্রদর্শকের আনন্দ তুমি নিজেই নাও;
পার হয়ে এসেছ সংকীর্ণ খাড়া সব পথ।

---

৮. Purgatorio, XXVIII, 64-66.

৯. William Shakespeare : Venus and Adonis, 17-18.

১০. Purgatorio, XXVIII, 70

১১. Purgatorio, XXVIII, 124-142.

দেখো সূর্যের কিরণ পড়েছে তোমার কপালে
দেখো ঘাস, ফুল এবং বৃক্ষরাজি
যাদের জন্ম দিয়েছে মৃত্তিকা একাই।
সেই মধুরাক্ষী নারী হাসিমুখে যতক্ষণ না এসে পৌঁছায়
—যে নারী চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছিল—
তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো, অথবা ঘুরে বেড়াও।
আর আমার কাছ থেকে কোনো কথা বা ইশারা আশা কোরো না :
মুক্ত, শুদ্ধ, স্বাধীন এখন তোমার ইচ্ছা
ভুল করবে যদি একে অনুসরণ না করো :
এই আমি তোমার শিরে মুকুট পরিয়ে দিলাম।

মুক্ত শুদ্ধ স্বাধীন যদি তাঁর মন তবে কেন সেখানে মর্তকামনা, যে-কামনা হেরোর প্রতি লেয়ান্দারের? দান্তের বর্ণনায় দ্বিতীয় অর্থের অবকাশ কোথায়? দান্তের যুগে পাস্তোরেল্লা নামে যে কাব্য প্রচলিত ছিল তাতেও ঠিক এই ভাবেই নরনারী প্রথম দর্শনেই দেহমিলনের জন্য উৎসুক হত। দান্তের বর্ষীয়ান বন্ধু কবি গুইদো কাভালকান্তির বালাতা বা ব্যালাডের প্রারম্ভে দেখি কবি বলছেন :

In un boschetto trova' pasturella
più che la stella— bella al mi' parere.[১২]
এক বনের মধ্যে রাখালিয়া মেয়ের সাথে দেখা হল
মনে হল তারকার চেয়ে দেখতে সুন্দরী।

বালাতার উপসংহারে :

Per man mi prese, d'amorosa voglia,···
che dio d'amore— parvemi vedere.[১৩]
সে আমার হাত ধরল কামনার বশে
এবং বলল হৃদয় দিয়েছে আমাকে :
নবপত্রালির নীচে আমায় নিয়ে গেল
যেখানে ফুটে রয়েছে ফুল রঙে রঙীন
যেখানে পেলাম সুখ, পেলাম মাধুর্য
মনে হল প্রেমের দেবতার সাথে দেখা হয়ে গেছে।

কাভালকান্তির প্রেমিক-প্রেমিকা এবং দিভিনা কোম্মেদিয়ার দান্তে-মাতেলদা একই মর্তকামনার প্রস্ফুটন। উভয়ের কাব্যদেহে একই দ্যুতি।

দান্তের কোম্মেদিয়ায় মর্তের জন্য কোনো অংশ পৃথক নেই। কিন্তু এক হিসাবে ইনফের্নো, পুর্গাতোরিয়ো, পারাদিসো সর্বত্র মর্তই নানাভাবে ও নানা আদর্শে রূপায়িত। নরকের মধ্যেও দান্তে

---

১২. Guido Cavalcanti : 'In un boschetto trova'.
১৩. Guido Cavalcanti : **উপসংহার** : Per man mi prese . . . parvemi vedere.

তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ফ্লোরেন্সের জয়গান করতে ভোলেন নি। ইনফের্নোর ষড়্‌বিংশ সর্গের আরম্ভে এক আধুনিক দেশপ্রেমী মন গেয়ে উঠেছে :

Godi, Fiorenza, poi che se 'si grande,
che per mare e per terra batti l'ali,
e per lo 'nferno tuo nome si spande ![১৪]

ফ্লোরেন্স, আনন্দ করো, কী বিরাট তুমি বিপুল—
সমুদ্র ও পৃথিবীর উপর তোমার ডানার ঝটকানি
এবং পাতালেও তোমার নাম পরিব্যাপ্ত।

এই একই সর্গে দান্তে হোমারের ওদিসিয়ুস বা ইউলিসেসকে সম্পূর্ণ আধুনিক এক মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। ইউলিসেসের অন্তিম সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দান্তের নিজস্ব অপরূপ সৃষ্টি। স্মৃতি-রোমন্থক ইউলিসেসের উক্তির মধ্যে যে আত্মগত আবেগ ও আত্মাভিমান তার তুলনা হয় না। নরকের লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে তার দর্পিত কণ্ঠ উচ্চারিত। বিনা মুখবন্ধে, বিনা সম্বোধনে, ইউলিসেস মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, অন্বেষা ও ঈপ্সার এক স্মরণীয় ইস্তাহার যেন পাঠ করে গেছে। ক্যাথলিক ধার্মিক দান্তে পৌত্তলিক ইউলিসেসকে পাপী বলে নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সত্যবান মহাকবি দান্তে আবার সেই ইউলিসেসকেই এমন পৌরুষ ও মহত্ত্বে মণ্ডিত করেছেন যে পাপী ইউলিসেসের পাপের কথা আমরা ভুলে যাই, পাপীর মহত্ত্বের কাছেই আমাদের মাথা নত হয়। ক্রোচে বলেছিলেন, দান্তের কালে দান্তের মতো এমন জ্ঞানতৃষ্ণ আর কেউ ছিল না এবং সেই মহৎ তৃষ্ণার প্রকাশ ইউলিসেসের মধ্যে তিনি যেমন ঘটিয়েছেন তেমন আর কোথাও করেন নি। ক্রোচের এই উক্তি সর্বতোগ্রাহ্য। দান্তে ইউলিসেসকে নরকে নিক্ষেপ করেও আধুনিক গরিমার উচ্চতম চূড়ায় তাকে তুলে ধরেছেন। এই দুই বিপরীত টানের স্পর্শ পাওয়া যায় বলেই দান্তের মহাকাব্য আধুনিক মনের কাছে বরেণ্য। দান্তের কবি-কল্পনা ধর্মদ্বেষী না হয়েও ধর্মবিশ্বাসের বাঁধন এইভাবেই অজ্ঞাতে ছিন্ন করেছে বারংবার। ভার্জিল তাঁর নায়ক ঈনিয়াসের সমর্থক বলেই ট্রয়ের ধ্বংসকর্তা ইউলিসেসকে তিনি শয়তানচক্রী বলে বর্ণনা করেছেন। পারাদিসোর দান্তে— ধর্মপ্রাণ দান্তে— ইউলিসেসের অন্বেষণকে পাগলামি বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু ইনফের্নোর ষড়্‌বিংশ সর্গে জলন্ত মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানান্বেষণা ইউলিসেসের চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইউলিসেসের উদ্দীপ্ত স্বগতোক্তিটি :

nè dolcezza di figlio, nè la pièta···
picciola dalla qual non fui diserto.[১৫]

না অপত্যস্নেহ, না বৃদ্ধপিতার প্রতি
কর্তব্য শ্রদ্ধা, না প্রেমের প্রতিদান
পেনিলোপিকে খুশিতে ভরে দেবো বলে,
না, কোনো কিছুই জয় করতে পারে নি আমার ভিতরের সেই আবেগকে

১৪. Inferno, XXVI, 1-3.

১৫. Inferno, XXVI, 94-102.

যা পৃথিবীর জ্ঞান মানুষের উৎকর্ষ এবং
অপকর্ষের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উন্মুখ।
আমি সীমাহীন সমুদ্রে পাড়ি দিলাম,
সঙ্গে একটিমাত্র জাহাজ, এবং ছোট্ট একদল সহযাত্রী
যারা কখনো আমাকে ছেড়ে যায় নি।

তারপর :

'O frati', dessi 'che per cento milia···
ma per seguir virtute e canoscenza.'[১৬]
আমি বললাম, ভাইসব, শত সহস্র বাধার ভিতর দিয়ে
তোমরা পশ্চিমে এসে পৌঁছেচ এখন,
আর যে সামান্য জাগরণ,
যে স্বল্প ইন্দ্রিয়শক্তি এখনো অবশিষ্ট,
এসো অভিজ্ঞতা-অর্জনে পরাঙ্মুখ না হয়ে তাই নিয়ে
জনশূন্য দেশে সূর্যের পথ অনুসরণ করি।
কী বীজ থেকে তোমাদের উদ্ভব সে কথা স্মরণ করো;
পশুর মতো জীবনধারণের জন্য নয়, তোমরা জন্মেছ
ন্যায় ও জ্ঞানের পথ অনুসরণ করবে বলে।

টেনিসনের ইউলিসেস ঠিক এরই প্রতিধ্বনি করে বলে :

To follow knowledge, like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought.
··· My mariners,
Souls that have toil'd, and wrought, and thought with me—
That ever with a frolic welcome took
The thunder and the sunshine, and opposed
Free hearts, free foreheads— you and I are old;
Old age hath yet his honour and his toil.[১৭]

সাধারণভাবে বলা যায়, দান্তে মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের রীতিমত সমর্থক। কিন্তু তিনি অ্যাকুইনাস, বনাভেনতুরে, পেত্রুস, ঈগিদিয়ুস কাউকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। তেমনি বলা যায়, ধর্মীয় প্রেমতত্ত্ব সাধারণভাবে মেনে নিলেও দান্তে তাঁর কাব্যের জন্য আলাদা একটি প্রেমতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এই তত্ত্বে জাগতিক ও স্বর্গীয় প্রেমকে মিলানো হয়েছে, দেখানো হয়েছে যে, জাগতিক প্রেম থেকেই আত্মনিবেদনের ভাব অঙ্কুরিত হয় এবং এই নিবেদিত জাগতিক প্রেমই স্বর্গীয় প্রেমের পথ দেখায়। বলা

---

১৬. Inferno, XXVI, 112-120.

১৭. Alfred Lord Tennyson: *Ulysses.*

বাহুল্য, বিয়াত্রিচের প্রতি লক্ষ রেখেই দান্তেকে এই তত্ত্বটি গড়তে হয়েছে। প্রচলিত তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু তত্ত্বের জন্য বিয়াত্রিচেকে খর্ব না করে বিয়াত্রিচের জন্যই তিনি তত্ত্বটি ঢেলে সেজেছেন। ঐতিহাসিক বিয়াত্রিচে ও রূপক বিয়াত্রিচের সমন্বয় ঘটিয়েছেন দান্তে। সিমোনে-দে-বার্দির স্ত্রী, ফ্লোরেন্স-সুন্দরী বিয়াত্রিচে-পোর্তিনারিকেই সংস্কার করে ভার্জিলেরও উচ্চে আসন দিয়েছেন। দান্তের ভার্জিল যেমন প্রাচীন ভার্জিলের দান্তে-সংস্করণ, দান্তের বিয়াত্রিচেও তেমনি ফ্লোরেন্সীয় বিয়াত্রিচের পুনর্নিমাণ। এটি খুব সহজ কথা যে আর যাই হোক, বার্দির স্ত্রীকে কিছুতেই কোম্মোদিয়ায় 'কুমারী' বলে চিহ্নিত করা চলে না। সিংগ্‌লটন দেখিয়েছেন যে ক্রবাদুরদের পুরোনো সমস্যারই নিজস্ব ধারায় সমাধান করেছেন দান্তে তাঁর ভিতা নুয়োভা ও দিভিনা কোম্মোদিয়ায়, সমস্যাটি দেহজ প্রেম ও খ্রীষ্টীয় করুণার বিরোধ নিয়ে।[১৮] ক্রবাদুর কবিরা আরাধ্যা নারীকে দেবীতে পরিণত করবার পর অনুতাপ করেছেন যে তাঁদের প্রথম গীতিকাগুলিতে দেবীকে মানবী মনে করা হয়েছিল। কাভালকান্তির লা দোন্না আঞ্জেলিকাতা এক স্বর্গের দেবী, তাকে ধরা ছোঁয়া অসম্ভব, অতএব শেষ পর্যন্ত কবি তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য। দান্তে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটালেন বিয়াত্রিচের বেলায়। ভিতা নুয়োভায় দেখি বিয়াত্রিচে ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়, তার দৃষ্টি মনোরম, কিন্তু ঐহিক। দান্তে মানবী বিয়াত্রিচের দৃষ্টিসুখে সুখী। দ্বিতীয় দর্শনে যখন এই নারী কবির কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল তখন প্রাচীন ক্রবাদুরদের মতোই তিনি কাব্যে তার গুণগান করলেন, তাকে দেবী বলে স্তুতিও করলেন, কিন্তু ক্রবাদুরদের মতো প্রথম প্রেমগীতিকার জন্য কোনো অহেতুক অনুশোচনা করলেন না।

যে ঐতিহ্য দান্তে অনুসরণ করতে করতে বর্জন করেছেন তার কথা নিজেই একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। দান্তের পূর্বে ও সমকালে তিনটি ধারা ছিল। এক, প্রভাঁসাল ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত সিসিলীয় ধারা— যার প্রধান প্রবক্তা হলেন ইয়াকোপো দা লেন্তিনো, বোনাজিয়ুন্তা উর্বিচিয়ানি ও গুইত্তোনে দারেৎস্‌সো ; দুই, দার্শনিক ধারা— যার প্রধান কথক গুইদো গুইনিচেল্লি ; তিন, ফ্লোরেন্সীয় ধারা— যার দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী গুইদো কাভালকান্তি ও দান্তে আলিগিয়েরি। ফ্লোরেন্সীয় বা ফ্লোরেণ্টাইন কবিদের রচনা-রীতিকে দান্তে দোলচে স্তিল নুয়োভা বা মধুর নব্য রীতি এই নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভিতা নুয়োভাও এই দোলচে রীতির মধ্যেই পড়ে। ভিতা নুয়োভা একটি গদ্যপদ্যমিশ্রিত চম্পূ ; এর তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করি। প্রথম স্তরের কাব্যাংশ বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি, বিয়াত্রিচে ও অন্যান্য যুবতীর সঙ্গে দান্তের লৌকিক অনুরাগ, বিরাগ ও বিরহের কাব্যবিবরণী। দ্বিতীয় স্তরে রচিত কবিতাগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু পরে রচিত, কিন্তু লৌকিক আবেগের মাধুর্য সেখানেও উপস্থিত। তৃতীয় স্তরের রচনা সম্পূর্ণ গদ্য, এগুলি অনেক পরে, বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পরে রচিত ; এতে প্রথম দুই স্তরের রচনাগুলির মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই বিভিন্ন স্তরগুলির সুর সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে নি। তার কারণ, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের প্রথম স্তর তত্ত্ববিচারের তৃতীয় স্তরে অনেক ক্ষেত্রেই বর্জিত হয়েছে। দান্তের কাব্য স্বতঃস্ফূর্ততার জন্যই প্রথমে পাঠকের চিত্ত জয় করেছিল। দোলচে স্তিল নুয়োভার আবিষ্কর্তা অবশ্য দান্তে নিজে নন। পুর্গাতোরিয়োর ২৪শ সর্গে বোনাজিয়ুন্তা উর্বিচিয়ানির সঙ্গে বিখ্যাত সাক্ষাৎকারে দান্তে বলেছেন বোনোজিয়ুন্তাই নূতন

১৮. Charles S. Singleton : *An Essay on Vita Nuova.*

কাব্যরীতির আবিষ্কারক এবং তাঁর 'দোন্নে কা ভেতে ইন্তেলেত্তো দামোরে' (যেসব নারী প্রেমের বুদ্ধি ধরে) নামক কান্‌ৎসোনে হচ্ছে এই রীতির প্রথম কবিতা। এই রীতির মূল কথাই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বচ্ছন্দ আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনা। বোনাজিয়ুন্তার মুখ দিয়ে দান্তে বলিয়েছেন :

'I' mison un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch' e' ditta dentro, vo significando.'[১৯]

আমি এমন একজন যে
প্রেমের প্রেরণা যখন ভিতরে আসে তখনই খেয়াল করে,
ভিতর থেকে যেমন প্রত্যাদেশ পায় তেমনি করেই লিখে যায়।

যেখানে দার্শনিকতা ও নব্যরীতির সংগম ঘটেছে, সেখানে দান্তের উপর গুইনিচেল্লির প্রভাব খুব স্পষ্ট। গুইনিচেল্লির বিখ্যাত কান্‌ৎসোনে আল কোর জেন্তিল রিপারা (শান্ত হৃদয়ের মধ্যে)-র শেষে কবির আত্মা প্রেম বা প্রেমিকার সমর্থনে বলছে, এই প্রেম স্বর্গীয়, দেবদূতের মুখ যেন প্রেমের মুখের মধ্যে বসে গেছে। ভিতা নুয়োভার তিনটি বিশেষ পরিচিত সনেট এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। এক, তান্তো জেন্তিলে এ তান্তো (এমন শান্ত, এমন পবিত্র); দুই, নে লি ওকি পোর্তা লা মিয়া দোন্না আমোরে (আঁখিতে প্রেম বয়ে বেড়ায় আমার প্রিয়া); তিন, আমোরে এ কোর জেন্তিল সোনো উনা কোজা (প্রেম ও শান্ত হৃদয় দুইই এক)। এই তিনটি সনেটই গুইনিচেল্লির আদর্শে অনুপ্রাণিত, তফাৎ শুধু এই যে, দান্তের শব্দসুষমা ও লালিত্য অনেক বেশি। আগেই বলেছি, ভিতা নুয়োভার তিনটি স্তরের মধ্যে বিরোধের সুর মাঝে মাঝে খুবই স্পষ্ট; প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে রচিত সনেটের পরবর্তী বিলম্বিত ব্যাখ্যা অনেক সময় কষ্টকল্পিত। এলিয়টের মত অনুযায়ী যদি কোম্মেদিয়া পড়বার পর ভিতা নুয়োভা পড়তে হয়, তাহলে অনুরূপ যুক্তিতে, ভিতা নুয়োভাতেও সন্থ আবেগের বহু পরে রচিত গন্থ ব্যাখ্যাগুলি আগে পড়ে নিয়ে তারপর সনেট বা কান্‌ৎসোনেগুলি পড়া উচিত।[২০] এ যেন কষ্টকল্পনার সাহায্যে কল্পনা উদ্ধার করবার প্রস্তাব! একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। দান্তে যখন তাঁর প্রিয়তম সুহৃৎ কাভালকান্তির প্রেয়সী জিয়োভান্না এবং বিয়াত্রিচেকে পথ দিয়ে যেতে দেখলেন, তাঁর মনে হল ওরা তাঁর দিকেই আসছে। যে-সনেটে এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন সেটি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের এক চমৎকার নিদর্শন। এখানে দুই নারীকে কবি সৌন্দর্য ও সম্মোহনের পরিবেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু বহু বৎসর পর রচিত গদ্যে জিয়োভান্না ও বিয়াত্রিচেকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সন্ত জন ও যিশুখ্রীষ্ট হিসাবে। এজন্য তিনি সুন্দর নাম প্রিমাভেরা (বসন্ত)কে ভেঙে প্রিমা ভের্‌রা (সে প্রথমে আসবে) এই অর্থ করতে চেয়েছেন, কারণ সন্ত জনের পর এসেছিলেন যিশু। অথচ সনেটের শেষে দ্ব্যর্থহীনভাবেই বলেছেন, প্রথম জন বসন্ত, দ্বিতীয় জন প্রেম। এই স্ব-বিরোধ আছে বলেই ভিতা নুয়োভা বেঁচে আছে; এইজন্যই

---

১৯. Purgatorio, XXIV, 52.54.

২০. 'It is, I repeat, for several reasons necessary to read the *Divine Comedy* first. The first reading of the *Vita Nuova* gives nothing but pre-Raphaelite quaintness.' T. S. Eliot: *Dante*. p. 68.

মল্লিনাথ-দান্তে কালিদাস-দান্তেকে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি। আত্মিক স্তরে দান্তের উত্তরণ যাই হোক না কেন, প্রেমের মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যা বা বিদ্যা ও সুন্দরের দ্বন্দ্বটি দান্তের কাব্যকে যুগোত্তীর্ণ করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি সনেট আমরা উল্লেখ করতে পারি :

Due donne in cima de la mente
venute sono a ragionar d'amore.
দুই নারী আমার হৃদয়ের উচ্চচূড়ে আরূঢ়,
এবং প্রেমের বিতর্কে রত।

এখানে সত্য ও সুন্দরের যুগপৎ আকর্ষণের কথা কবি স্বীকার করেছেন, একটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেবার কথা চিন্তা করেন নি। শুধু বিয়াত্রিচে নয়, কোমল ও কঠিন দুরকম হৃদয়েই তিনি বিচরণ করেছেন, এবং প্রেমের বিপরীত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সঙ্গে তাঁর কবিতা রিমে পিয়েত্রোজে স্মরণ করা উচিত। পিয়েত্রা বা পাথর এই শব্দটি বারংবার কবিতায় ব্যবহার করে দান্তে নিষ্ঠুর হৃদয় তরুণীর নির্মমতা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জানি না শেক্সপীয়রের যুগলপ্রেম বিষয়ক সনেটটির উৎস দান্তের এই সনেট ও কবিতা কি না ; হলে আশ্চর্য হব না :

Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still :
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman, colour'd ill.[২১]

দান্তে তাঁর ইনফের্নো—এবং কিছুটা পুর্গাতোরিয়োর ধারণাও ভার্জিলের ঈনিদ থেকে পেয়েছিলেন।[২২] সেজন্য ভার্জিলকেই তিনি তাঁর আত্মিক পদযাত্রার গাইড বানিয়েছেন। ঈনিয়াস ও দিদোর মর্মস্পর্শী কাহিনী ভার্জিলকে স্পর্শ করে না, কিন্তু দান্তে ও বিয়াত্রিচের কাহিনী বিশেষ করে দান্তেকেই স্পর্শ করে। ভার্জিল-কল্পিত দিদোর নীরব প্রতিবাদের মধ্যে যে অপরূপ গরিমা আছে দান্তের প্রতি বিয়াত্রিচের ভাষিত ভৎসনাতে তা নেই। কিন্তু ভার্জিল দিদোকে ঈনিয়াসের সঙ্গী করে রাখতে পারেন নি, তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য ব্যবধান থেকে গেছে ; ঘৃণা ও অভিমানের ফাঁক পূরণের জন্য কোনো ক্ষমা বা আত্মত্যাগ ভার্জিল সৃষ্টি করতে পারেন নি। দান্তে এই ফাঁক পূর্ণ করেছেন। দৈহিক মিলনের চেয়েও বড়ো এবং দীর্ঘতর সান্নিধ্য তিনি নিজের আত্মাকে দিয়েছেন, জন্মে না হলেও জন্মান্তরের সহযাত্রিনী করেছেন দয়িতাকে। ঈনিয়াসের নরক দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল স্নেহশীল পিতার দর্শনলাভ। দর্শন তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই ছায়াময় পাওয়ার মধ্যে হারানোর হাহাকারই প্রবল। দিদো ও অ্যাঙ্কিসেস— প্রেম ও স্নেহ— দুইই সমান নিস্পৃহভাবে বর্ণনা করেছেন ভার্জিল। কিন্তু দান্তের একান্ত দৃষ্টি প্রেমে উন্মীলিত ; বিয়াত্রিচের ভর্ৎসনাই তাঁকে পুর্গাতোরিয়োর পথ দিয়ে পারাদিসোতে নিয়ে গেছে। দান্তের মধ্যে যেন ভার্জিল ও ঈনিয়াস, কথক ও কথিত এক হয়ে গেছে এবং দিদোর অশরীরী নির্বাক ছায়া কল্যাণী বিয়াত্রিচের মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কাহিনীর অতিরিক্ত কোনো বিবেক ভার্জিলের জ্ঞানে ছিল না,

২১. William Shakespeare : Sonnet 144.

২২. Æneid, সর্গ ৬

তাই আবেগ উত্তরণের কোনো প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। দান্তের উৎকর্ষ ও আধুনিকতা এই যে, তিনি তাঁর কাহিনীর মধ্যে বিবেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই বিবেকই তাঁকে বাধ্য করেছে স্বর্গের আলোকিত পথ খুঁজতে। ভিতা নুয়োভার দান্তে অন্য এক ভিতা নুয়োভায় না পৌঁছে নিরস্ত হতে পারেন না। একবার নূতন হয়েছিলেন বলেই আরেকবার তিনি নূতন হতে চেয়েছেন, এবং এই দ্বিতীয় নবায়ণে তাঁর প্রেয়সীকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরতে হয়েছে, তার মুখে অনেক আলো ফেলতে হয়েছে। দান্তের গাইড ভার্জিল ও বিয়াত্রিচে দুজনেই পথের আলো, সূর্যের সমতুল্য। ভার্জিল জ্ঞানবুদ্ধিকল্পনার আলো, বিয়াত্রিচে প্রেমের আলো। পুর্গাতোরিয়োতে ভার্জিলের সঙ্গে দান্তের কথোপকথন এরূপ :

> Ed elli a me : 'Quanto ragion qui vede
> dir ti poss' io ; da indi in là t'aspetta
> pur a Beatrice, ch'è opra di fede.'[২৩]

> এবং তিনি আমায় বললেন : যতদূর যুক্তি দিয়ে দেখা যায়
> আমি তোমাকে বলতে পারি ; তার ওপারে
> শুধু বিয়াত্রিচের জন্য অপেক্ষা, কারণ সেটি বিশ্বাসের ভূমি।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভার্জিলের ক্ষমতা ও দৃষ্টি সীমিত। দান্তেকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না বিয়াত্রিচে এসে পথ দেখায়, আরো সামনে নিয়ে যায়। যে দীর্ঘ যাত্রাকে দান্তের যুগে বলা হত ইতিনেরারিয়ুম মেন্তিস অ্যাদ দেয়ুম বা ঈশ্বরমুখী মনোযাত্রা, তা ছিল ধর্ম বা তীর্থযাত্রা।[২৪] কিন্তু দান্তের মহাকাব্যে ঈশ্বরের পথ আলোকিত করবার জন্যও ডাক পড়ে প্রেমের, বিয়াত্রিচের। ধর্মতত্ত্বের রূপক দান্তে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু মেনে নিয়েও সেই রূপকের মধ্যে তিনি মর্তপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অ্যাকুইনাসের সুম্মা থিয়লগিয়ে বা দি ভেরিতাতের মধ্যে বিয়াত্রিচে বা বিয়াত্রিচের কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু দান্তের কোম্মেদিয়ার আত্মা বিয়াত্রিচে। ধর্মতাত্ত্বিক অ্যাকুইনাস ও কবি দান্তে আলিগিয়েরির পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিস্ফুট করা যায়। অ্যাকুইনাসের মতে, পরমতত্ত্ব শ্রুতি বা দৈববাণীর মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু দৃষ্টির গোচরীভূত হতে পারে না। দান্তে কেন, কোনো প্রকৃত কবিই এই অ-দৃষ্টকে অ-দৃষ্ট হিসাবে স্বীকার করতে পারেন না। কারণ শিল্পী দেখেন এবং দেখান, ইন্দ্রিয়-অনুভূতি তাঁর পরম সম্পদ ; এমনকি যখন তিনি ধার্মিক বা দার্শনিক তখনও বিশ্বরূপ দর্শনেই তিনি বিশেষ উৎসাহী। এইজন্যই দান্তে বিয়াত্রিচেকে পারাদিসো পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, পদযাত্রায় সংগী করেছেন। অ্যাকুইনাস কখনোই ধর্মযাত্রায় ভার্জিলের মতো কবি বা বিয়াত্রিচের মতো প্রেয়সীকে আমল দেন নি। দান্তে কিন্তু অ্যাকুইনাসকেও আমল দিয়েছেন, আবার ভার্জিল ও বিয়াত্রিচেকেও সঙ্গে রেখেছেন। যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে ঈশ্বরপ্রেম আছে, কিন্তু পথের অধিকাংশ ভাগ আলো করে আছেন কবি ও প্রেয়সী।

অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক— দান্তের মহাকাব্যে পুর্গাতোরিয়োর অবস্থান। অ্যাকুইনাসের মতে পুর্গাতোরিয়ো মর্তের গহ্বরে এবং নরকের সংলগ্ন। ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বাস অনুযায়ী দান্তেও

২৩. Purgatorio, XVIII, 46-48.

২৪. তুলনীয় : Saint Bonaventura-র গ্রন্থনাম Itinerarium mentis in Deum বা ঈশ্বরগামী মনোযাত্রা।

মানতেন যে পুর্গাতোরিয়োর কাজ দুটি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং স্বর্গের প্রস্তুতি। কিন্তু দান্তের পুর্গাতোরিয়োতে শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত গৌণ, পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই বড় কথা। এই জন্য দান্তের কাব্যে পুর্গাতোরিয়োর অবস্থান মর্ত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে, একেবারে স্বর্গের কাছে। কোম্মেদিয়ার পুর্গাতোরিয়োর অবস্থান ও উদ্দেশ্য অনেকটা দান্তের নিজস্ব ব্যাখ্যান। অ্যাকুইনাসের পূর্ববর্তী ধার্মিকেরা মনে করতেন, ইহলোকের সব কিছুই পরলোকের প্রতীক; প্রতীক এখানে, পরম সত্য সেখানে: Alles vergangliche ist nur ein Gleichnis.[২৫] কিন্তু দান্তের কাব্যে প্রতীক ও পরমসত্যের মধ্যে এরকম ব্যবধান দেখানো হয় নি। তিনি যদি পুরোপুরি খ্রীষ্টীয় চার্চের নির্দেশ অনুসরণ করতেন তাহলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যিশুরই শরণাপন্ন হতেন, তাহলে ঈশ্বর ও স্বর্গ-লাভের একক সোপান ও গাইড হতেন খ্রীষ্ট। কিন্তু দান্তে একাধিক গাইড গ্রহণ করেছেন—কবি, প্রেমিক, সাধক—যাদের জন্ম ও মৃত্যু যেন এই পৃথিবীতেই। দিব্য অনুভূতির জন্য মর্তের সহায়তা গ্রহণ করেছেন দান্তে। অর্থাৎ প্রচলিত ধারণাকেই তিনি এমনভাবে সম্প্রসারিত করেছেন যাতে মর্তের মানুষকে বাদ দিয়ে, তাকে হেয় করে, মর্তের অভিজ্ঞতা বিসর্জন দিয়ে বা বিস্মৃত হয়ে দৈব অনুগ্রহের সাধনা করতে না হয়। দান্তে-কথিত আত্মযাত্রা বা আত্মিক পদযাত্রা এত দীর্ঘ, এত ভৌগোলিকবোধে জীবিত, এবং এই তীর্থযাত্রায় এত ইতিহাস ও পুরাণ, আধুনিক ও প্রাচীন ব্যক্তি ও বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে যে একে অলৌকিক ঈশ্বর-করুণার ধারাবিবরণী বলা যায় না। এ এক পিলগ্রিম্‌স প্রগেস যা পরিশ্রম ও সংকল্প সাধ্য যা মর্ত অভিজ্ঞতায় পা ফেলে ফেলেই ক্রমশ উচ্চগামী। মানুষ ও মানুষী এই তীর্থপথের সাধক সহপথিক ও সহায়ক, মর্তের মই বেয়ে বেয়েই স্বর্গের শিখরে উঠবার প্রতিশ্রুতি এখানে। দান্তে কনভিভিয়োতে উল্লেখ করেছেন যে, সিসেরো এবং বোথিয়ুস তিনি পড়েছেন; পড়ে থাকলে, বিশেষ করে দি অ্যামিকিতিয়ায়, প্লেটোনিক প্রেমের ধারণা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। মধ্যযুগের লাতিন কবি বিশেষ করে অ্যালান দি লিলের কবিতার সঙ্গেও দান্তের পরিচয় সম্ভবত বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল।[২৬] ফরাসী প্রভেঁসাল প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য তাঁর বিশেষ রপ্ত ছিল এবং ক্রবাদুর প্রেমের 'ফিন্ আমর' ও 'বন আমর' কাভালকান্তি ও দান্তে দুজনেই আয়ত্ত করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোর্দেল্লো পুর্গাতোরিয়োয় এবং সোর্দেল্লোর প্রেয়সী কুনিংস্‌সা পারাদিসোয় সশরীরে উপস্থিত। তা ছাড়া লাতিন ভাষায় লিখিত দি ভুলগারি এলোকোয়েনতিয়াতেও মাতৃভাষা প্রসঙ্গে দান্তে একাধিক ক্রবাদুর কবির নাম করেছেন। কনভিভিয়ো এবং ভিতা নুয়োভায় তিনি প্রেমসাধনায় ভিসিয়ো এবং কোগিতাতিয়ো, দৃষ্টি ও মননের স্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইতালীয় ভাষায় কোগিতাতিয়োর প্রতিশব্দ হিসেবে এসেছে পেনসিয়েরো বা ইম্মাজিনাৎসিয়োনে যাকে বলা যায় স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা। পুর্গাতোরিয়োয় সাইরেনদের স্বপ্ন, মাতেলদা সাক্ষাৎকার ও বিয়াত্রিচেসন্দর্শন এগুলি কাব্যে এই স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার নিদর্শন। সব ক্ষেত্রেই দান্তে একাধিক ঐতিহ্য, একাধিক গাইড গ্রহণ করেছেন, এবং নিজের মতো করে ঐতিহ্যকে ভেঙে গড়তে চেষ্টা করেছেন। এমন-কি উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত রাগরূপকে হুবহু গ্রহণ না করে, কড়িকোমল ও বাদীবিবাদীর ব্যবহারে যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন।

২৫. H. Hatzfeld: The Art of Dante's Purgatorio.

২৬. Curtius: European Literature and the Latin Middle Ages.

সান্তায়ানা মন্তব্য করেছেন যে, দান্তের উপমাগুলি 'প্রাণহীন—যেন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন।'[২৭] কিন্তু এলিয়ট দেখিয়েছেন উপমা প্রয়োগে দান্তে কেমন আটপৌরে বাস্তব বিষয় সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন।[২৮] দূরান্ত ও অপরিচিতকে সহজ অভিজ্ঞতার বৃত্তে নিয়ে আসার সাধনায় দান্তের সিদ্ধি আশ্চর্য।

দান্তে ব্যক্তিত্ব নিয়েই তাঁর কাব্যে প্রবেশ করেছেন। কনভিভিয়োতে তিনি নিজেই লিখেছেন যে, নিজের সম্বন্ধে নিজে বর্ণনা দেওয়া অসমীচীন, উপযুক্ত কারণ না থাকলে কোনো আলঙ্কারিকই স্বনাম ব্যবহার করবেন না।[২৯] কিন্তু এই নিয়ম দান্তে নিজেই মানেন নি। পুর্গাতোরিয়োর ৩০শ সর্গে দান্তে তাঁর নামের স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই সর্গে বিয়াত্রিচের আবির্ভাব বর্ণিত হচ্ছে, এখানে দান্তে নিজেকে আর ছদ্মবেশে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। ব্যক্তিগত সেতুবন্ধনে ভিতা নুয়োভা ও কোম্মেদিয়া এখানে বাঁধা পড়েছে। দান্তে যেমন নিজেই লিখেছেন— Dante, perchè Virgilio se ne vada,[৩০] তেমনি উইলিয়ম শেক্সপীয়র নিজেই নিজের নাম উচ্চারণ করেছেন তাঁর সনেটগুচ্ছে :

> Whoever hath her wish, thou hast thy 'will',
> And 'will' to boot, and 'will' in overplus.[৩১]

সমগ্র ৩০শ সর্গটি অবগুণ্ঠন মোচনের জয়গান। অবগুণ্ঠন শুধু বিয়াত্রিচের নয় দান্তেরও :

> sovra candido vel cinta d' uliva
> donna m' apparve, sotto verde manto
> vestita di color di fiamma viva.[৩২]
>
> শ্বেত অবগুণ্ঠনের উপর অলিভের মুকুটপরা
> এক কুমারী আমার সামনে নেমে এল, সবুজ তার উপরিবাস—
> বসন তার জ্বলন্ত অগ্নিশিখার রঙে রঙীন।

এর পর বিয়াত্রিচের ভর্ৎসনা ও স্তুতিচারণা এক চমৎকার লাবণ্যে গরীয়ান।

ব্যক্তিত্ব নিয়েই দান্তে কোম্মেদিয়ায় প্রবেশ করেছেন : 'আমি একজন ইতালীয়ান, তুসকানির নাম করা একজন আমার পিতা।'[৩৩] দান্তে ইনফের্নো, পুর্গাতোরিয়ো অতিক্রম করেছেন, কিন্তু পারাদিসোর আকর্ষণ জয় করতে পারেন নি। হয় তো তাঁর পৌত্তলিক ইউলিসেস পারতেন, যেমন পেরেছিল রেনেসাঁস যুগের মানুষ। দান্তের মহাকাব্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, স্বর্গ, নরক এবং স্বর্গনরকের সন্ধি পুর্গাতোরিয়ো আছে, কিন্তু মর্তভূমি নেই। যেন মর্তে নূতন করে অনুসন্ধান করবার কিছুই নেই। একে অতিক্রম

---

২৭. G. Santayana : Three Philosophical Poets.

২৮. T. S. Eliot : *Dante*. p. 24.

২৯. Il Convivio. 1 : 2.

৩০. Purgatorio, XXX, 55.

৩১. William Shakespeare : Sonnet 135.

৩২. Purgatorio, XXX, 31-33.

৩৩. Purgatorio, XI.

করাই যেন প্রথম ও শেষ কথা। অন্তহীন যাত্রা বা প্রগতির ধারণা দান্তের যুগে প্রচলিত ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোকে, নিরাশা থেকে বিশ্বাসে যাত্রাই ছিল মধ্যযুগে মানুষের চরম অন্বিষ্ট। ইনফের্নোর আরম্ভ তাই অন্ধকার দিয়ে :

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita.[৩৪]

জীবনের যাত্রাপথের মাঝখানে
আমি এসে হাজির হলাম এক অন্ধকার অরণ্যে
যেখানে সোজা পথ গেছে হারিয়ে।

নরকের দ্বারে খোদিত সাবধানী পাঠ করতে করতে দান্তেকে অগ্রসর হতে হয়েছে :

Per me si va nella città dolente…
Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate.[৩৫]

আমার ভিতর দিয়ে পথ যন্ত্রণার নগরীতে
আমার ভিতর দিয়ে পথ অনন্ত কষ্টের মধ্যে
আমার ভিতর দিয়ে পথ ভ্রষ্ট মানুষদের মধ্যে…
সব আশা ত্যাগ করো, যারা প্রবেশ করবে।

অন্তহীন যন্ত্রণা কষ্ট ও ভ্রংশের, আত্মিক বিনষ্টির পথ মানুষের সামনে খোলা ; গ্রহণ বা বর্জনের স্বেচ্ছা মানুষের নিজের কাছে। দান্তের নরকে যন্ত্রণা আছে মৃত্যু নেই ; কারণ এখানে যারা দগ্ধ হচ্ছে তারা কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে জীবিত ছিল না। এখানে তারাই শাসিত, যারা জীবিতকালে কোনো সংকাজের সাহস দেখায় নি, যারা স্ব-ইচ্ছায় আত্মার মহৎ বোধগুলি নষ্ট করেছে অর্থাৎ আত্মিক অর্থে যারা কোনোদিনই জীবিত ছিল না। এই-সব অজাত অমৃত ক্লিষ্ট প্রেতাত্মার মাঝখানে দান্তে নিজে জীবন্ত আত্মা। মহত্তর বোধগুলি নষ্ট না করে জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্যই দান্তে নরকে প্রবেশ করেছেন, যুধিষ্ঠিরের মতো পাপস্খালনের জন্য নরক দর্শন করতে যান নি।

ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের জীবনচরিত জানবার জন্য আমাদের ঔৎসুক্য নেই। মহাভারত রামায়ণ ইলিয়াদ ওদিসির মধ্যে আদি মহাকবিদের জীবনালেখ্যের নেগেটিভ আছে কি নেই তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু শেক্সপীয়রের ডার্ক সনেট ও কমেডি এবং দান্তের ভিতা নুয়োভা ও দিভিনা কোম্মেদিয়ার মধ্যে নাট্যকার ও কবির প্লে-ব্যাক আছে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এঁদের জীবনচরিতের অনেক উপাদানই হয় তো আমরা পাই না, কিন্তু মানসচরিতের সব দলিলই আমাদের হাতে রয়েছে। ব্যাস বাল্মীকি ও হোমারের রচনা যেন অনায়াস-নিষ্পন্ন, কারণ যা গৃহীত ও গ্রাহ্য তাকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন ; এঁদের দ্বন্দ্ব শুধু বাইরের দ্বৈরথ। আধুনিক মহাকবিরা কিন্তু গৃহীতকে

৩৪. Inferno, I, 1-3.

৩৫. Inferno, III, 1-3; 9.

পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি, আবার বর্জনীয়কেও গ্রহণীয় করেছেন। দান্তে সোজাসুজি স্বর্গকে স্বর্গ এবং নরককে নরক বলতে পারেন নি, স্বর্গের মধ্যে নরক ও নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখতে পেয়েছেন, যেন 'soul of goodness in things evil'।[৩৬] চিত্তা দোলেস্তে, এত্তের্নো দোলোরে, এবং পের্দুতা জেন্তের ভিতর দিয়ে দান্তেকে যেতে হয়েছে, কিন্তু স্পেরান্‌ৎসা তিনি ত্যাগ করেন নি। দান্তের মধ্যেই রয়েছেন সেই ইউলিসেস যিনি ভ্রমণে অক্লান্ত, অ্যাডভেঞ্চারে অকুতোভয় যিনি দিদৃক্ষু, শুধু পরিবার পরিজন পেনিলোপি এবং টেলিমেকাসই নয় সর্বকালে বিচরণের জন্য প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগকেও যিনি ফেলে আসতে পারেন। সাত শতাব্দী আগে মহাকবি দান্তে এক আশ্চর্য ইতিনেরারিয়ুম মেন্তিস বা মনোযাত্রা সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু সেই যাত্রাপথের মানচিত্রে দেখা যায় গন্তব্যের চেয়ে গতিই বেশি মনোমোহক। দান্তে তাঁর গাইড বাছতে ভুল করেন নি। এর আগে কবি ও প্রিয়াকে ধর্মের সাধক বা সাধিকা হিসাবে কেউ এত স্পষ্ট করে স্বীকার করেন নি, দান্তেই করলেন। এর জন্য তাঁকে অনেক দ্বন্দ্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং কাব্য ও প্রেমের প্রতীকচিহ্ন ধর্মের নামাবলীতে মুদ্রিত করবার জন্য হয়তো-বা অজ্ঞাতেই অনেক কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। বিয়াত্রিচেকে তিনি ভুলতে বা ছাড়তে পারেন নি, আবার স্বর্গজয়ের, আত্মিক সিদ্ধিও তিনি চেয়েছেন। ফলে স্ববিরোধ নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত তাঁর পিছু নিয়েছে। নরকের তারকাগুলিই স্বর্গে আবার ফুটে উঠেছে, এবং কোম্মেদিয়ার শেষ চার পংক্তিতে, সন্দেহ হয়, ধার্মিকের ভাষায় প্রেমিকের মনের কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন :

> সেই উত্তুঙ্গ দিব্য কল্পনা আর আমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠছিল না
> ইচ্ছা তবু সামনের দিকে গড়িয়ে চলেছিল, যেন একটি চাকা
> সমান গতিতে গড়িয়ে চলেছে, পিছনের চালক সেই প্রেম
> যে চালায় আকাশের সূর্যকে এবং তারাদলকে।[৩৭]

৩৬. William Shakespeare : *Henry V*, IV. i. 4.

৩৭. Paradiso, XXXIII, 132-135.

দান্তের স্মৃতিগ্রন্থ

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

য়ুরোপে গ্রন্থকে একটি 'বিষয়' অথবা প্রতীক হিসাবে ভাবতে শুরু করা হয় কবে থেকে তা বলা কঠিন। গ্রীক কবি পিণ্ডারের দু-একটি উক্তি পাওয়া যায়। যদিও প্রাচ্য খণ্ড থেকে ধার করে গ্রীক বর্ণমালা তৈরি হয়েছিল, তবু গ্রন্থকে পবিত্র মনে করা বা বিশেষ কোনো সংজ্ঞা দেওয়া— যেমন, স্মৃতিবহ ইত্যাদি তা বহুদিন প্রতীচ্য খণ্ডে সাহিত্যে আসে নি। হোমার বা হেসিওড-এর মধ্যে গ্রন্থের কোনো ছবিই পাওয়া যায় না। পিণ্ডার ছাড়া অবশ্য ইস্‌কিলাস্, সোফোক্লেস্ বা ইউরিপিডেসের রচনায় গ্রন্থকে চিত্রকল্প বা ইমেজ হিসাবে (এমন-কি উৎপ্রেক্ষা, মেটাফরও) এখানে ওখানে পাওয়া যায়। ইউমিনিডেসে আছে : মানুষের কর্ম সব নরকে তালিকাভুক্ত আছে। বলাবাহুল্য, 'তালিকাভুক্ত' কথাটি শুধু পুঁথির নির্দেশ দেয় না, পাঠাগারে তালিকা তৈরি করার কর্মকেও বোঝায়। ইউরিপিডেস বলেছেন : মানুষের হৃদয় যেন পুঁথির মত, ইচ্ছেমত তাকে খোলা যায় গুটিয়ে রাখা যায়। 'গুটিয়ে' বলা হল এইজন্য যে, সে ভল্যুম— volume প্রাচীন অর্থে (লাতিন— volumen অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় roller)— বই বা লেখা সম্বন্ধে প্লেটোর অবিশ্বাস ফিড্রাসের শেষের দিকে আছে। সক্রাটিসের মতই সে-সময় গ্রীকদের মত ছিল এ কথা সাধারণভাবে বলা যেতে পারে। তখন স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ— শুনে আলোচনা ক'রে কথোপকথনের মধ্যেই দর্শনের সৃষ্টি— দিআলেগেস্‌থাই, যার উল্টো মধ্যযুগে— পঠন, স্মরণ ও লিখন।

এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না, কারণ পাঠকবর্গ এর বিষয়ে অল্পবিস্তর জানেন। কিন্তু আমার এই ছোট নিবন্ধে ভূমিকাটি পরিপ্রেক্ষিতের কাজ করবে তাই দিলুম। 'গ্রন্থ' কথাটির ক্রমবিকাশ প্রতীচ্য সাহিত্য দর্শনচিন্তায়, বিশেষ করে, ধর্মক্ষেত্রে এত বিচিত্রভাবে এসেছে যে, তার ইতিহাস লেখবার জন্য একটা গোটা বইই লিখতে হয়। আমরা সে-কাজে আপাততঃ প্রয়াসী নই, আপাততঃ যে-সময়ে প্রতীচ্যখণ্ডে 'গ্রন্থ' কথাটির একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে— দান্তের সেই স্মৃতি-গ্রন্থ— il libro della memoria, সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে পারি।

> In quella parte del libro della memoria, dinanzi alla quale poco si portrebbe leggere, si trova una rubrica, la quale dice: incipit Vita Nova.

আমার স্মৃতিগ্রন্থের সেই অংশে যেখানে স্বল্প পাঠই সম্ভব সেখানে একটি অঙ্কিত লিখন দেখতে পাওয়া যায়— যার পাঠ, ইনকিপিত্ ভিতা নোভা— এখানেই নবজীবনের শুরু।

যে-গ্রন্থের প্রতীক দিয়ে ভিতা নুওভা কাব্যগ্রন্থের শুরু, তার শেষও কোম্‌মেদিআ-র প্রান্তে—

> Nel suo profondo vidi che s'interna
> legato con amore in un volume
> ciò che per l'universo si squaderna,

আমি তার অন্তরতম গভীরে দেখলুম বিশ্বের
সব ছড়ানো পাতা জড়, প্রেমের মধ্যে বাঁধা একটি বইয়ে।

ইতিমধ্যে ভিতা নুওভা থেকে কোম্‌মেদিআ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ জীবনের ভূমিকায় এই প্রতীকের বিচিত্র রূপ, অনুভূতি, সংবেদন প্রকাশ পেয়েছে। দান্তে নিজেকে মনে করতেন ছাত্র, শিষ্য; তাঁর গুরু ভার্জিল ও বেআত্রিচে, অর্থাৎ যুক্তি ও করুণা, জ্ঞান ও প্রেম। জীবনের অন্যতম বড় কাজ মনে করতেন— পাঠে নিমগ্ন থাকা; বস্তুতঃ এই জীবনকেই তিনি মনে করতেন 'দীর্ঘ পাঠ'— il lungo studio; পাঠ সম্বন্ধে তাঁর নিজের যেমন আচরণ, অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করতেন পাঠকের কাছ থেকে। তিনি চাইতেন না তিনি কি বলছেন পাঠককে তাই বুঝতে, তিনি চাইতেন পাঠক তাঁর কাব্যগ্রন্থে নিমগ্ন হয়ে কি বুঝলেন তাই জানতে। বারেবারেই বলেছেন— or pensa per te stesso, এখন তুমিই বিচার ক'রে দেখো। এ শুধু মধ্যযুগীয় শিষ্টাচার নয়, এ এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যার উৎপত্তি মধ্যযুগের প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যেই। প্রধানতঃ 'গ্রন্থ'কে ঘিরেই মধ্যযুগের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে, বলা যেতে পারে একটি মাত্র গ্রন্থ বাইবেলকে ঘিরেই, যেটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন লাগে সেটা হচ্ছে দান্তে কী ভাবে গ্রন্থকেই শিল্পমণ্ডিত করেছেন, তার প্রতীকের প্রয়োগে কী ভাবে বহু বিচিত্র বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তার সমাধান হয়েছে শিল্পের অমোঘ ঔষধিবলে, অনন্যবোধে। তাঁর কাছে 'গ্রন্থ' ছিল জীবনদর্শন। এবং যেহেতু তিনি জীবন ও গ্রন্থের মধ্যে ভেদ মানতেন না, সেহেতু বারেবারেই গ্রন্থ জীবনকে বিশ্লেষণ করেছে, তাকে গ্রহণ করেছে, বারেবারেই জীবনও গ্রন্থকে বিচার করেছে, তার সত্য অনুভব করতে সমর্থ হয়েছে। মধ্যযুগের পক্ষেও দান্তের এই আচরণ অভাবনীয়।

ভক্তশিষ্য ভাবে ব্রুনেত্তোকে তিনি বলছেন :

Ciò che narrate di mio corso scrivo,
e serbolo a chiosar con altro testo
a donna che saprà, se a lei arrivo.

আপনি আমাকে যে-পথ নির্দেশ করলেন তা আমি লিখছি; এক ভদ্রার জন্য অন্য একটি সূত্রে তাকে রাখব— যদি আমি তাঁর কাছে যেতে পারি তিনি তা ব্যাখ্যা করবেন।

এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে, বেআত্রিচে নিজে দান্তেকে তাঁর ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশ দেন নি, কিন্তু তাঁর কথা শুনে তিনি উদ্বুদ্ধ— ব্রুনেত্তো লাতিনি তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। Altro testo— অন্য পাঠ্য, হচ্ছে সম্ভবত বেআত্রিচের কথা, আর দান্তে আপাততঃ যা লিখছেন তা হচ্ছে ব্রুনেত্তোর নির্দেশ। এই নির্দেশটুকু তিনি সম্ভবত প্রথম সূত্র অর্থাৎ বেআত্রিচের কথার পাশে মার্জিনে টুকে রাখবেন এমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রন্থ সম্পর্কীয় তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না। পাঠ্য বিষয় বা সূত্র তার ব্যাখ্যা এ সবই তো গ্রন্থের অন্তর্গত। উপরের পঙক্তি-গুলির সোজা অর্থ হল এই যে, বেআত্রিচেকেই ব্রুনেত্তো-বর্ণিত 'পথ' ব্যাখ্যা করতে হবে অর্থাৎ আরও স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে। এ কাজ সহজে হবার নয়, তার জন্য চাই পরিশ্রম, অনুশীলন, তবেই বোধির ক্ষেত্র তৈরি হবে। বিনা পরিশ্রমে, বিনা চর্চায় কোনো পাঠোদ্ধার তথা জীবন-অস্তিত্বের স্বরূপ বোধগম্য নয়। কাজেই scrivo— আমি লিখি, যা আমি আপনার কাছে শুনি তা লিখি। তিনি লিপিকরমাত্র,

তাঁর কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ যত্নপূর্বক স্মৃতিগ্রন্থ থেকে পাঠ কপি করা এবং কপি করতে গিয়ে যদি পুঁথির মার্জিনে কিছু টীকা-টিপ্পনী দিতে হয় তবে তা দেওয়া, যেমন এ ক্ষেত্রে বেআত্রিচের কথাগুলির পাশে তিনি ব্রুনেত্তো লাতিনির কথাগুলি টুকে রাখছেন। অতি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি লিপিকরের কাজ ক'রে যাচ্ছেন এই আশায়, একদিন বেআত্রিচের করুণায় তার ব্যাখ্যা মিলবে—serbolo a chiosar, তাকে (অর্থাৎ ব্রুনেত্তো-বর্ণিত পথের নির্দেশ) রাখি ব্যাখ্যার জন্য। অধ্যয়ন, অনুশীলন, লিখন সব কিছুই গ্রন্থসম্পর্কে প্রযোজ্য, জীবনের নির্দেশও এই গ্রন্থ থেকেই। মধ্যযুগের লিপিকরের আচরণ যা দান্তে তাঁর জীবনে লক্ষ্য করেছেন তাকেই এক শিল্পপর্যায়ে উন্নীত করেছেন। খৃস্টীয় অনুভবেই গ্রন্থকে এতখানি ভাবা সম্ভব, কারণ খৃস্ট ও গ্রন্থ এক। মধ্যযুগের লিপিকরের কাছে মূলতত্ত্ব তাই : যা এখন আছে, যা তখন আছে। 'আছে' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হল, কারণ লিপিকরের কাছে বাইবেলের প্রত্যেকটি ঘটনাই নিত্যবর্তমান এবং যেহেতু তিনি লিপিকর সেহেতু যাকে আমরা অতীত বলে মনে করি সে অতীত থাকে না, বর্তমান হয়ে যায়। ভিতা নুওভা কাব্যগ্রন্থে এই লিপিকরের আচরণ অতি সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে। স্থানাভাবে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না এবং দু-একটি কথায় তার চিত্রকল্প পাঠকের সামনে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত। যেমন ভিতা নুওভায়, তেমনি তাঁর এই নরক থেকে স্বর্গে যাত্রার বর্ণনা তাঁরই স্মৃতিগ্রন্থে আছে, তিনি কেবলমাত্র কপি করছেন। তিনি যে কপি করছেন সে-কথা আমাদের বারেবারেই স্মরণ করিয়ে দেন গ্রন্থপ্রতীকের সাহায্যে। কমেডির শেষে যে ক্ষণিকের জন্য মহান্ দর্শন হয় তাও গ্রন্থের একটি প্রতীক মাত্র, উপরে যার উদ্ধৃতি দিয়েছি, এবং নিবন্ধ শেষ করবার আগে যার উদ্ধৃতি ফের দেব। ডিভাইন কমেডি শেষ করবার পূর্ব মুহূর্তে আমাদের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, কমেডি একটি কপি মাত্র, কারণ তিনি যা দেখলেন সেটি হচ্ছে un volume, কমেডি, বলা বাহুল্য, তারই কপি।

খৃস্টীয় ভাবনায় গ্রন্থ একটি প্রতীকভাবে নিবিড়, তা ভক্তজন মাত্রেই জানেন। Complicabuntur sicut liber coeli (Isaiah ৩৪,৪)—আকাশ একটি পুঁথির মতো গুটিয়ে যাবে। এমন কি কপি করবার সাজসরঞ্জাম যথা, কালি কলম ইত্যাদিও প্রিয়, অনুভূতির চিন্তা থেকে বাদ পড়ে নি। Lingua mea calamus scribae velociter scribenti, লুথার যার অনুবাদ করেছেন—Meine Zunge ist der griffel eines guten Schreibers—উৎকৃষ্ট নকলনবীশের কলমের মতোই আমার ভাষা ক্ষিপ্র। কাজেই দান্তের পক্ষে এই উর্বর ক্ষেত্রে ফসল ফলানো হয়তো শক্ত নয়, আজকে তা আমরা অনেক সময় অনুমান করে থাকি, যদিচ আজকের দিনে এই ছাপাখানার যুগে হস্ত-লিখিত পুঁথির কি মর্যাদা তথা সংবেদন থাকতে পারে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। সুতরাং দান্তে যখন এই গ্রন্থ-প্রতীকের প্রয়োগ করেন তখন মধ্যযুগের পাঠকের মনে যে ভাবান্তর আসত তা আমাদের মনেও আসবে ভাবা অসঙ্গত। কিন্তু দান্তে এই প্রতীকের প্রয়োগ এমন এক বিস্ময়কর শিল্পপর্যায়ে করেছেন যে যতদিন মানুষ অক্ষর পড়তে পারবে ততদিন সে দান্তের কলানৈপুণ্যে বিস্মিত হবে, অনন্তবোধে অনুপ্রাণিত হবে।

পূর্বেই বলেছি ভিতা নুওভা থেকে ডিভাইন কমেডি পর্যন্ত এই প্রতীকের প্রয়োগ। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দান্তে কী করতে চেয়েছেন, কী বলতে পেরেছেন তা বোঝাবার চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, এত

ছোট নিবন্ধে দান্তের বক্তব্য আমার লেখায় পরিস্ফুট না হওয়াই সম্ভব, তবু এই চমকপ্রদ বিষয়টি কিছুমাত্র পাঠকের কাছে ধরতে পারলে সার্থক মনে করব।

যা পঠনীয় তাকে ভুল বোঝা বা ইচ্ছাপূর্বক তার অর্থ বিকৃত করা কিংবা তার প্রয়োগ যথাস্থানে না করা দান্তের মতে অপরাধ। পুরগাতোরিও ৩, ১২৬ পঙক্তিতে আছে—avesse in Dio ben letta questa faccia, যদি তিনি [অর্থাৎ কোজেন্‌ৎসা-র যাজক] সেই উক্তি ভালো ক'রে পড়তেন [উক্তিটি সেণ্ট জনের, ৬, ৩৭—and him that cometh to me I will in no wish cast out—et eum, qui venit ad me, non ejiciam foras—এবং যে আমার কাছে আসে তাকে দূরে সরিয়ে দিই না] তাহলে ম্যানফ্রেডের এই অবস্থা হত না। পোপ ক্লেমেণ্টের ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলে যে ট্রাজেডির উদ্ভব গ্রন্থপ্রতীকের সাহায্যে [এখানে ঠিকমতো পাঠ করা] তার বর্ণনা, বিশ্লেষণ, অর্থকরণ করা হয়েছে। বাইবেলের উক্তির, বিশেষ ক'রে ধর্মযাজকের পক্ষে, শুদ্ধভাবে পাঠোদ্ধার করা বিকৃত না করা কর্তব্য, এটা তার ধর্ম। Avesse letta [যদি তিনি পড়তেন] এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগে সমস্ত মধ্যযুগের নৈতিক আচরণ তথা দান্তের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ভাবে প্রকট হল। পাঠ করা (leggere) ক্রিয়াপদের বদলে আর যে কোনো ক্রিয়াপদ যা প্রত্যক্ষভাবে পাঠ বোঝায় না, ধরুন—(seguire) অনুসরণ করা, ব্যবহার করলে উক্ত অংশের এই ট্রাজেডি এত গভীর ভাবে মনে লাগত না। পাঠক একে নিশ্চয়ই কেবলমাত্র কলাকৌশল মনে করবেন না। অপরপক্ষে এ এক আশ্চর্য কলাকৌশল প্রাক্-দান্তের রচনায় তা দেখানো সম্ভব হয় নি, যদিও এর প্রয়োগ [সাধারণতঃ স্থূলরূপক হিসাবে] ছিল, সীমাবদ্ধ হলেও ছিল, নীতিগর্ভ রচনায়, হাস্যকৌতুক, প্রেমের রচনায় তা ছিল; কিন্তু কেবলমাত্র একটি ক্রিয়াপদের সাহায্যে একদিকে গোটা মধ্যযুগের আচরণ, অন্যদিকে অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় শিল্পসৃষ্টি—উভয়কেই একসঙ্গে রচনায় উপস্থিত করা শুধু দান্তের যুগে কেন, আজও অবিশ্বাস্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ব্যবধান দুটি বিভিন্ন ক্রিয়াপদের ব্যবহারেই ব্যক্ত। হোমার বা ভার্জিল যদি-বা 'গান করা' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন— Arma virumque cano, শস্ত্র ও বীর তারই গান গাই, তবে দান্তে মধ্যযুগে লেখেন :

> O Muse, o alto ingegno, or m'aiuate
> O mente, che scrivesti ciò ch'io vidi.
> হে দেবী সর্বশক্তিদায়িনী, এক্ষণে দাও বরাভয়
> হে স্মৃতি, লিপিকর যা আমি দেখেছি। —ইন্‌ফের্নো, ২, ৭

যার ক্রিয়াপদ লেখা, scrivere। স্মৃতি কথাটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা স্মরণ করতে পারি 'স্মৃতি' সম্বন্ধে সক্রাটিস কি বলেছিলেন [ফিড্রাস দ্রঃ] আর দান্তেই বা স্মৃতি সম্বন্ধে কি আচরণ দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে হয়তো অন্যত্র আলোচনা করা যেতে পারে। আপাততঃ আমরা দান্তের রচনায় দেখতে পাই কি ভাবে তিনি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ থেকে কপি করবার সময় নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন, সে-সব উত্তীর্ণ হবার জন্য কখনো প্রয়োগ করেছেন তাঁর শিল্পকৌশল, কখনো দ্বারস্থ হয়েছেন করুণার কাছে, যেমন উপরের পঙক্তিতে। অনেক বাধার মধ্যে দুটি প্রধান বাধা বড় হয়ে দেখা দেয়— এক, মাঝে মাঝে স্মৃতিশক্তির বিলুপ্তি [যার গূঢ় তত্ত্ব আমরা পরে জানতে পারব] দুই, শিল্পবোধ। এই শেষোক্ত কারণ তাঁকে অনেক সময়ই বাধা দিয়েছে তাঁরই স্মৃতিগ্রন্থের সব কিছু টুকতে।

Sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole, le quali è mio intendimento d'assemprare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sentenzia.

সেই অঙ্কিত লিখনের নীচে যে-সব কথাগুলি
লেখা সে-গুলি এই ছোট বইয়ে টুকব এই
আমার ইচ্ছা; যদি সব না হয়, অন্ততঃ মর্মার্থ।—ভিতা নুওভা

আমাদের পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, লিপিকর তাঁর স্মৃতিগ্রন্থের সব কিছুই অনুলিপি করতে চান না, কারণ তা করলে শিল্পের মাত্রাবোধ ব্যাহত হবে [পাছে লিপিকরকে ভুল বোঝে, মনে করে অহঙ্কারী শিল্পী, সেইজন্য আগেই গেয়ে রেখেছেন— যেখানে স্বল্পপাঠই সম্ভব (কারণ স্মৃতিশক্তি অতদূর সব সময় নাগাল নাও পেতে পারে) লিপিকরের অপরাধ যেন না নেওয়া হয়] বিশ্বপরিমণ্ডলের বিশ্বপিতার আচরণ লক্ষ্য ক'রেই এ কথাও তিনি বুঝেছেন যে, বিশ্বপরিমণ্ডলের নিয়মের মতোই তাঁর পুঁথিরও একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে, ইচ্ছামত বড়, ইচ্ছামত ছোট করা যায় না, অনুলিপিও সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। এবং আমরা সকলেই জানি, কমেডির তিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটি সর্গ প্রায় সমসংখ্যক পঙক্তিতে লেখা, প্রত্যেক খণ্ডের শেষে আছে একই কথা stella— তারা (বহুবচনে), প্রত্যেকটি খণ্ডের আছে ৩৩টি সর্গ, কেবলমাত্র ইনফেরনোতে আর একটি বেশি, ৩৪—যাতে গোটা কমেডির ১০০টি সর্গ হয়, প্রত্যেকটি খণ্ডের লেখা ছন্দ— terza rima, কিন্তু প্রত্যেক সর্গের শেষ stanza-টিতে একটি অতিরিক্ত পঙক্তি অর্থাৎ চার পঙক্তির শ্লোক— এইভাবে মধ্যযুগের অনুভূতি ও নিয়মাচরণ দান্তের রচনায় সমপাত্র হল। এই আবশ্যিক বোধেই তাঁকে লিখতে হয়:

Ma perchè piene son tutte le carte
Ordite a questa Cantica seconda,
Non mi lascia più ir lo fren dell'arte.

কিন্তু যেহেতু দ্বিতীয় 'কান্তিকা'-য় নির্দিষ্ট পাতাগুলি কলমবন্দ্
আমার লেখনীর টান এখানেই থামাতে হল। —পুরাগাত্তোরিও, ৩৩, ১৩৯-৪১

অনুবাদ যথাযথ হয় নি, স্বাধীনতা নিয়েছি পাঠক তা বুঝতে পারছেন। piene অর্থ ভর্তি [অর্থাৎ পাতাগুলি ভর্তি] আমি করেছি কলমবন্দ্—লিখিত। lo fren dell' arte— fren হচ্ছে এখানে ক্যালিগ্রাফির টান, আসল অর্থ হচ্ছে বাঁক; arte হচ্ছে অবশ্য কারুশিল্প craft, কিন্তু এখানে কি অর্থ? স্টাইল? কোনো সন্দেহ নেই কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তিনি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ থেকেই পঙক্তিগুলি এতক্ষণ কপি করছিলেন, এখন বাধ্য হয়ে থামাতে হল, কারণ স্মৃতিমাত্রেরই বিশাল ব্যাপ্তি, এবং এই কারণেই সীমাবদ্ধ মানুষের দৃষ্টির কাছে কিছুটা অনির্দিষ্টও বটে, তাকে নির্দিষ্ট করতে হলে শিল্পীর আবেগও সংহত করতে হয়।

স্মৃতিগ্রন্থের সব-কিছুই নকল করা সম্ভব নয় সে কথা তিনি অনেকবারই নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। কিন্তু পারাদিজো-র বর্ণনাকালে তিনি যে শুধু শিল্পের খাতিরে অনেককিছু বাদ দিয়েছেন তা নয়, বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন— তার কারণ সে-রাজত্বের অনেককিছুই অনির্বচনীয়।

E cosi figurando il Paradiso
Convien saltar lo sacrato poema.

সে কারণে স্বর্গধামের বর্ণনায় বাধ্য হয়েই পবিত্র
কাব্যগ্রন্থের [কিছুটা] বাদ দিতে হল।

বলাবাহুল্য এখানেও আমি যথাযথ অনুবাদ করি নি, কারণ saltar [অর্থাৎ saltare] মানে লাফানো বা ডিঙোনো। স্পষ্টতই কবি ক্যালিগ্রাফির টান-টোনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। saltare ক্রিয়াপদটি ব্যবহার ক'রে— যেমন টানের ঝোঁক বন্ধ ক'রে অক্ষরের পরিসমাপ্তি তথা লেখা শেষ করা যায়, যেমন উপরের lo fren dell' arte, তেমনি টানের চালে অন্য অক্ষর (বলা বাহুল্য কবি বা লিপিকর যে অক্ষরটি চান সেইটেই) ধরতে পারে। মধ্যযুগের পুঁথি যারা দেখেছেন তাঁদের কাছে এর চাতুর্য ধরা পড়বেই। sacrato poema, অর্থাৎ পবিত্র কাব্যগ্রন্থ বললেন কেন ? নিশ্চয়ই তিনি তাঁর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থকে 'পবিত্র' নামে ভূষিত করবেন না, চাইবেন না তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও বাইবেল একই বিশেষণে অলঙ্কৃত হোক ; আসলে তিনি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থকেই পবিত্র কাব্যগ্রন্থ বলছেন— দুটি শব্দের ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারিত। একটু অবান্তর হলেও বলা প্রয়োজন যে, দান্তে কয়েকবার sacrato poema, poema sacra ব্যবহার করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই La Commedia পরে La Divina Commedia নামে পরিচিত হয়। দান্তে অবশ্যই নিজের কাব্যগ্রন্থকে বলতেন শুধু Commedia, কোম্মেদিআ।

Saltare ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের ফলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, sacra poema-র পাতাগুলি আবাঁধা অবস্থা থেকে বাঁধা অবস্থায় আছে— একটা স্থিতিভাবের চিত্র যেন লিপিকরের সামনে টেবিলে ন্যস্ত, লিপিকর এখানে বাধ্য হয়ে কিছু অংশ বাদ দিয়ে কপি করছেন অর্থাৎ দরকার মতো পঙক্তি বাদ দিচ্ছেন, তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা— পাতা ওলটাচ্ছেন বা ওলটাতে পারছেন। বাঁধা বলেই এই কার্যটি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সে-যুগে বাঁধানো গ্রন্থের প্রতীক পাঠকের মনে অভূতপূর্ব শিহরণ আনত, গ্রন্থপ্রতীকের এত প্রয়োগ সেইজন্যই। আমরা পরে দেখাতে পারব, গ্রন্থ-সম্পর্কীয় যাবতীয় ভাব অনুভাব কি ভাবে গ্রন্থ, volume, তৈরি হয়, গ্রন্থের পাতা, তার ভাঁজ, তার সেলাই বাঁধাই কত নিখুঁতভাবে কবি স্মরণে রেখেছেন এবং প্রতীক হিসাবে সারা কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে গ্রন্থের প্রতিটি অংশ, তার লেখবার সরঞ্জাম, কালি, কলম ইত্যাদি।

এবারে উপরের দুটি পঙক্তির সঙ্গে আরো চারটি পঙক্তি যোগ ক'রে কলমের আচরণ আর একটু বিশদভাবে লক্ষ্য করতে পারি।

E cosi, figurando il Paradiso
Convien saltar lo sacrato poema
Come chi trova suo cammin reciso.
Ma chi pensasse il ponderoso tema,
E l'omero mortal che se ne carca,
Nol biasmerebbe, se sott' esso trema.

এবং সে-কারণে, স্বর্গধামের বর্ণনায়, পবিত্র কাব্যগ্রন্থকে
বাধ্য হয়েই [কিছু অংশ] ডিঙিয়ে যেতে হল, যেমন যাত্রাপথে
বাধা পড়লে করতে হয়। কিন্তু যিনি এই গুরু বিষয়টির কথা
চিন্তা করবেন এবং সেই নশ্বর প্রাণীটিরও, যার ওপর এর ভার ন্যস্ত
তিনি দোষ দেবেন না, যদি এই গুরুভারে সে
কেঁপে ওঠে। —পারাদিজো, ২৩, ৬১

একটা সোজা আক্ষরিক অর্থ তো আছেই তা বুঝতে কষ্ট হয় না, বিশেষ ক'রে কবি যখন যাত্রী, আচরণ তাঁর যাত্রীর মতোই ব্যক্ত— যেমন, পথে কোনো যদি বাধা আসে তাকে ডিঙোতে হয় ইত্যাদি। বহু পাঠকেরই তা বুঝতে অসুবিধা হবে না; কিন্তু অনেকেই হয়তো প্রথমে ধরতে পারবেন না যে, আসলে কবি পবিত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে কপি করতে গিয়ে, কিছুটা স্বর্গীয় বিষয়বস্তু অনির্বচনীয় সে-কারণে, কিছুটা শিল্পবোধে, তাকে বাধ্য হয়েই ডিঙিয়ে যেতে হয়েছে; এবং এই গুরু বিষয়টির সম্মুখীন হওয়াতে, বিশেষ ক'রে বাদ দিয়ে কপি করবার সময়, কলমের টানের মাথায় (অর্থাৎ ডিঙোতে গিয়ে) কলমের পালকটিই কেঁপে উঠেছে—se sott' esso trema, যদি এর গুরুভারে সে কাঁপে। esso, 'সে' যাত্রীও বটে, কলমের পালকও বটে।

কলম কখনো ডিঙোতে চায় অন্য অক্ষর ধরবে বলে, কখনো ডিঙোতে চায় ক্ষণিক বিরতির জন্য— বিরতি নানা কারণেই প্রয়োজন হতে পারে। যেমন—

E tre fiate intorno di Beatrice
Si volse con un canto tanto divo
Che la mia fantasia nol mi ridice ;
Però salta la penna e non lo scrivo

এবং তিনি [সেণ্ট পিটার] এমন স্বর্গসুধা গান গেয়ে
বেআত্রিচেকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন যে, আমার
কল্পনা তা বর্ণনা করতে অপারগ; কাজেই আমার কলম
ডিঙোয় [সে-বর্ণনা থেকে বিরত হয়] আর আমিও
তা লিখি না। —পারাদিজো, ২৪, ২২-২৫

salta la penna—কলমটি ডিঙোয়; কারণ তাঁর পক্ষে সে-বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদিও কবি একজন লিপিকর মাত্র—scribe, কিন্তু তিনি ঠিক একজন সাধারণ লিপিকর নন; তিনি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থেরই লিপিকর, কাজেই তাঁকে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়, যদি তাঁর স্মৃতিশক্তির ক্ষণিক বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু কবি দক্ষ হলেও কোনো কোনো সময়ে মহান্ দর্শন তাঁর মনে চকিতে উদয় হয়ে মিলিয়ে গেলে তাকে কল্পনার সাহায্যে পুনর্বার তাঁরই স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণনা করতে সমর্থ হন না। এখানে ridire ক্রিয়াপদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে এই অসামান্য আলোর সৌন্দর্য তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, কারণ এই অংশটি বাদ পড়ে গেছে অথবা আদৌ গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ridire অর্থ পুনর্বার বলা—dire বলা,

ridire পুনরায় বলা, এই তার সোজা মানে। স্মৃতিগ্রন্থভুক্ত হলেই কবি তার অনুলিপি করতে পারতেন, কিন্তু এখানে তিনি নিরুপায়, কাজেই তাঁর কলম থামে, তিনি আর সে-বিষয়ে লেখবার চেষ্টাও করেন না। পাঠক লক্ষ্য করবেন কবি যেমন স্মৃতিগ্রন্থ থেকে প্রয়োজনমতো বাদ দেন অনুলিপির সময়, তেমনি তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন কোথায় কোথায় তাঁর স্মৃতিগ্রন্থেই পঙক্তির স্থান শূন্য। এমন কথনো ভাবব না এই স্মৃতিগ্রন্থ ধরাছোঁয়ার বাইরে— সে আর-পাঁচটি পুঁথির মতোই বাস্তব।

এতক্ষণ যে-সব উদাহরণ দিলুম সে-সব মোটামুটি গ্রন্থ, লেখনী, লেখা সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষভাবে প্রতীকটির প্রয়োগ; কিন্তু অন্য কথার মধ্যে হঠাৎ যদি লেখবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরঞ্জাম কালি (পরে দেখাতে পারব কাগজও) একটি প্রতীক হিসাবে দেখতে পাই ব্যবহৃত হচ্ছে তখন আমাদের কাছে তা বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগের কবি পাঠককে হাজার কথার মধ্যেও স্মরণ না করিয়ে পারেন না লিখন এমন কি লেখবার সরঞ্জামেরও কী অসামান্য তাৎপর্য বা স্থান।

> E quel che mi convien ritrar testeso
> Non portò voce mai, nè scrisse inchiostro,
> Nè fu per fantasia giammai compreso;
>
> আর আমি যা বর্ণনা করতে যাচ্ছি, কণ্ঠ
> তা কখনও প্রকাশ করে নি; না কালি তা লিখেছে না
> কল্পনায় তা বোঝা গেছে।

কণ্ঠ, কালি, কল্পনা—তিনটি প্রতীক খৃস্টিআন জগতে তথা মধ্যযুগে অপরিচিত নয়, বরং সুপরিচিত। এখানে অন্তত: এটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার জিনিস যে, দান্তে 'লেখনী'র বদলে 'কালি' ব্যবহার করেছেন। তিনি অনায়াসেই লিখতে পারতেন—কোনো লেখনীই তা লেখে নি; কিন্তু তা না ক'রে 'কালি' শব্দটি ব্যবহার করলেন কেন? কালি লেখে নি— অর্থাৎ কালির দ্বারা যে-পাতা লেখা হয় সে-পাতা একটি চিত্রই আনে— la larga ploia dello spirito santo— অমৃত আত্মার অবাধ বর্ষণ, অনুরূপ vision বা দর্শনের চিত্র লেখনী কথাটি ব্যবহার করলে আসত না। সে-ক্ষেত্রে 'কলম' কথাটি ব্যবহার করলে বিষয়ের চেয়ে, অর্থাৎ vision বা দর্শনের চিত্র থেকে, বিষয়ী, অর্থাৎ লেখকের লিখনের চিত্রই আসত বেশি। গ্রন্থ-প্রতীকের মধ্যে এখানে পাতাকেই চাক্ষুষ, visual করানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু আগেই দেখিয়েছি কী ভাবে দান্তে লিখেছেন— pero salta la penna, e non lo scrivo, কারণ কলমটি ডিঙোয় আর আমি লিখি না। ওখানে saltare ক্রিয়াপদের সংযোগে কলমের ব্যবহার যথাযথ— কবির পুঁথি কপি করার ক্রিয়াটি দেখানোই অন্যতম উদ্দেশ্য, পাঠকের কাছেও ইমেজ চাক্ষুষ। অসামান্য নৈপুণ্য! এবং হাতের কাজ যে কত গভীর ব্যঞ্জনাত্মক হতে পারে এই 'কালি' শব্দটির ব্যবহারে তার আর একটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল:

> Ed io a lui: 'Li dolce detti vostri
> Che, quanto durerà l'uso moderno,
> Faranno cari ancora i loro inchiostri',

এবং আমি তাঁকে [গুইদো গুইনিংসেল্লিকে] : তোমার মধুর
গীতিকাব্যগুলি যতদিন লোকাচারে ব্যাপ্ত ততদিন এমন
কি তারা যে কালিতে লেখা সেই কালি পর্যন্ত প্রিয় হবে।

—পুরগাতোরিও, ২৬, ১১২-১১৪

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সংবেদনশীল পাঠকমাত্রেই এই তিনটি পঙক্তি পাঠে অভিভূত হবেন। অগ্রজ কবির প্রতি দান্তের শ্রদ্ধা কতখানি অকপট, কত তীব্র ভালোবাসা গুইদো গুইনিংসেল্লির কাব্যের প্রতি। এখানেও কলমের বদলে কালি (বহুবচনে) শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং আমাদের কিছুমাত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না বহুবচনে প্রযুক্ত inchiostri ইমেজ হিসাবে কতখানি যথাযথ। একটি দোয়াতের কালি একজনই ব্যবহার করতে পারে, বহু লোকের অর্থাৎ বহু লিপিকরের জন্য প্রয়োজন বহু দোয়াত, বহু লিপিকর গুইদো গুইনিংসেল্লির কবিতা কপি করলেই তবে বহুলোক পড়তে পারবে। বহুবচনের ব্যবহার শুধুশুধুই যে করা হয় নি তা বলাই বাহুল্য। তেমনি উপরে উদ্ধৃত কালি শব্দটির একবচনে ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ।

উপরের দুটি উদ্ধৃতিতেই কালি এবং পাতা উভয়ের চিত্রই এসেছে—কালি দিয়ে লেখা পাতা, মোটামুটি এই ছবিটিই চোখে আসে। আমরা নীচে যে উদ্ধৃতি দেব তাতে 'কালি' কথাটি নেই, আছে পাতা; কিন্তু কালির ব্যবহার বুঝি অপ্রত্যক্ষ ভাবে diffusa শব্দটির প্রয়োগে। এখন কালি যেমন জ্ঞান বিকিরণের মাধ্যম হয়, তেমনি হতে পারে পুঁথির কাগজ তথা মধ্যযুগের parchment vellum ইত্যাদি।

Ed io: 'La larga ploia
Dello Spirito Santo, Ch'è diffusa
In sulle vecchie e in sulle nuove cuoia'.
এবং আমি : 'অমৃত আত্মার অবাধ বর্ষণ যা পুরনো ও নতুন
চামড়ায় সর্বত্র বিকীর্ণ।' —পারাদিজো, ২৪, ৯১-৯৩

কোথা থেকে কবির এত 'বিশ্বাস' জন্মাল তার উত্তরে অনেক কথার মধ্যে উপরের পঙক্তি তিনটি বলেন। বলাবাহুল্য, vecchie e nuove cuoia, পুরনো ও নতুন চামড়া বলতে ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট বোঝাচ্ছে—সমস্ত চিত্রটি বাইবেলের প্রতি ভক্তিরসে সিক্তিত, বাইবেল পাঠকমাত্রেই তা অনুভব করতে পারছেন। পবিত্র গ্রন্থের পাতা যা এখানে পার্চমেণ্ট, চামড়ায় তৈরি— তাতে লেখা, এবং পাতার লেখাটির দিকে তাকিয়ে কবি যেমন ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্টের বাণী দেখছেন বিকীর্ণ (diffusa), তেমনি যাতে তা লেখা সেই পাতা এমন কি উপকরণ হিসাবেও, তাঁর কাছে একান্ত প্রিয়। কত দিনের পর দিন লিপিকর কী শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পাতাগুলি ভরাট করেছেন—যেন পাতাগুলি তথা সমগ্র গ্রন্থটিই পবিত্র আত্মার শ্বাসে উজ্জীবিত (cuioa চামড়া, শব্দটি এখানে তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ) spiritus-এর অন্য অর্থ শ্বাস, যেমন The spirit in God ঈশ্বরে যে-শ্বাস যা এখানে শুধু পাতার মধ্যেই উজ্জীবিত নয়, সারা জগত যে শ্বাসে উদ্দীপ্ত, আলোয় বিকীর্ণ (diffusa)—

Lo real manto di tutti i volumi
del mondo, che più ferve e più s'avviva
nell' alito di Dio e nei costumi,

বিশ্বপরিমণ্ডলের রাজোত্তরীয়, ঐশী শ্বাসে ও আচরণে
যে সবচেয়ে উদ্দীপ্ত ও স্পন্দিত। —পারাদিজো, ২৩, ১১২-১১৪

i volumi (বহুবচনে) বলতে শুধু বিশ্বপরিমণ্ডলের গ্রহগুলিই বোঝায় না, সেকালের পুঁথিও বোঝায়, যেমন বাইবেলে— And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, বহুবার বহু পণ্ডিত এই পঙক্তিটির উদ্ধৃতি বৃথা করেন নি।

লেখবার কাগজ সম্বন্ধে অন্তত একবার কোম্মেদিআ-য় [ইনফেরনো, ২৫, ৬৪] উল্লেখ আছে একটি মানুষ ও ছ' পাওয়ালা ড্রাগনের জড়াজড়ি দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্যে। কাগজের মেটাফরটি আশ্চর্য, কারণ যে-দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মেটাফরটির উদ্ভাবন তা এতই অভাবনীয়, বিস্ময়কর যে, যে-কোনো সিম্বলিস্ট কবিই তাতে ঈর্ষা বোধ করবেন।

Come procede innanzi dall' ardore
Per lo papiro suso un color bruno,
Che non è nero ancora, e il bianco more.
যেমন আগুনের শিখার সামনে কাগজ, প্রথমে তামাটে রঙ,
এখনও কালো হয়ে ওঠে নি অথচ সাদা রঙটি মরে গেছে।

—ইন্‌ফেরনো, ২৫, ৬৪-৬৬

এমনও হতে পারে, বালক দান্তে কোনো একদিন মোমবাতির শিখার সামনে সাদা কাগজ ধরে দেখেছিল কেমন করে রঙ বদলায়। তাঁর সেই ঘটনা উত্তরকালে কাব্যরচনার সময় স্মৃতিপথে হয়তো উদয় হয়েছিল; তাই কাব্যগ্রন্থে অসামান্য এক পরিস্থিতিতে এক অসামান্য মেটাফর ব্যবহার করতে সাহসী হয়েছেন। অবশ্য এটা আমার অনুমানমাত্র। এবং আমার এই প্রবন্ধে এই পঙক্তিগুলির উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিকও বটে, কিন্তু গ্রন্থের যে অন্যতম উপকরণ কাগজ তার সম্বন্ধে তাঁর অতিচিন্তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাদা কাগজ আগুনের শিখার সামনে না থাকলেও কালে রঙ বদলায়—তামাটেই হয় একেবারে কালো না হলেও, অন্তত পবিত্র শূন্য শ্বেতবর্ণটি খোয়া যায়—এ কথাও আমরা মনে রাখতে পারি; আবার আমরা ভাবি mutability-র কথা, যেটা দান্তের এই অংশে বক্তব্য—দুটি বস্তু যখন ne due ne uno—না দুই না এক, অথচ একটা কিছু খোয়া গেছে।

লিখতে লিখতে কলম ভোঁতা হয়ে যেতে পারে, যায়ও। কবির সে কথা জানা আছে, নিজেও ভুক্তভোগী নিশ্চয়ই। এখন নীচের তিনটি পঙক্তি সে কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

Quando la brina in sulla terra assempra
L'imagine di sua sorella bianco,
Ma poco dura alla sua penna tempra.
যখন কুয়াশা তার শুভ্রা ভগিনীর প্রতিমা মাটির ওপর
আঁকে, খুব বেশিক্ষণ তার কলমের ধার থাকে না। —ইন্‌ফেরনো, ২৪, ৪-৬

sorella bianca, শুভ্রা ভগিনী, অর্থাৎ তুষার। brina, কুয়াশা, তুষারের চেয়ে আগে গলে। দান্তের কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই এই অসামান্য সংবেদনশীল পঙক্তি-কটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমার আর

বিশদ বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু গ্রন্থ-প্রতীকের আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, penna tempra কলমের ধার দুটি অর্থের ইঙ্গিত করছে : (১) ধার সব সময় বা বেশিক্ষণ থাকে না, তাকে সময়মতো ধার করা প্রয়োজন হয় ফিরে ফিরেই যদি (২) ছবি বা লেখা নিখুঁত রাখতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে 'ধার'ও যেমনি আছে, 'ভোঁতা'ও তেমনি। এবং নিয়মটি আছে বলেই কবি অতি নৈর্ব্যক্তিক অথচ জড়িত এই উভয়ভাবে একদিকে বসন্তসমাগমের মুহূর্তে কুয়াশায় ঢাকা মাঠের ছবি আঁকছেন বিগত তুষারের দিন ভাবতে ভাবতে, অন্যদিকে এই কুয়াশা বেশিক্ষণ থাকবার নয়, রোদ উঠলেই যাবে তাই চাষীর হতাশা থেকে আশার কথাও ভাবছেন ; চিত্রকল্পটিতে তনাব অসাধারণ—সামান্য একটু কলমের ধারেই এই কটি পঙক্তির মধ্যে নানামুখী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারলেন।

ইতালিআন carta অর্থ পাতা (বহুবচনে carte)—যে পাতায় লেখা হয়। চারটে বড় পাতা অর্থাৎ শীট্ ভাঁজ করলে হত ১৬ পাতা, অর্থাৎ খাতা (আমাদের যুগে ফর্মা) বা quaderno বহুবচনে quaderni। এই quaderni সেলাই বাঁধাই হলে বলা যেত মধ্যযুগের ভলুমে, বর্তমান কালের বইয়ের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে। এইটুকু তথ্য পুঁথি সম্বন্ধে মনে রাখলে অনেক পঙক্তিই বুঝতে সহজ হবে। যেমন—

Ditemi, acciocchè ancor carte ne verghi,
Chi siete voi, e chi è quella turba
Che se ne va diretro ai vostri terghi?
বল, যাতে আমি এখনও টুকে রাখতে পারি,—কে
তুমি ? কেই-বা ঐ দলটি তোমার পিছনে চলে যাচ্ছে ?

—পুরাগাতেরিও, ২৬, ৬৪-৬৬

এখানে তিনটি শব্দ প্রণিধানযোগ্য। এক, ancor—এখনও ; দুই, carte—পাতগুলি : তিন, verghi—আমি টুকি [vergare—টোকা, লেখা, trace করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়]। ancor, এখনও, বললেন কেন ? তিনি কি তখন টুকছিলেন (অবশ্যই তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ থেকে) এবং টুকতে টুকতে সামনের ব্যক্তিটি ও তাঁর পিছনের দলটির কথা তার নোটবইয়ে বাদ পড়ে গিয়েছিল ? অথবা ক্ষণিকের জন্য তাঁর স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছিল, সেজন্য এত অনুরোধ ? [মনে রাখতে হবে, যে-ব্যক্তিকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং গুইদো গুইনিংসেল্লি, দান্তে যাকে এখানেই তাঁর পিতৃস্বরূপ মনে ক'রে পরে সম্বোধন করবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর পরিচয় পান নি] তাহলে কি তবে এটা একটা কৌশল—নোট বইয়ে বাদ পড়ে যাওয়া অথবা স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া ? আমরা কোম্মেদিআ-য় বারবার দেখেছি অভাবনীয় কিছু ঘটলে বা ঘটবার সম্ভাবনা হলে কখনো তিনি স্মৃতিশক্তি হারাতেন, কখনো যেতেন মূর্ছা। অনেকে একে মধ্যযুগীয় অতিনাটকীয়তা মনে করেন, কিন্তু যাঁদের light-metaphysics বা মধ্যযুগের আলোকতত্ত্বের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁরা জানেন কি ক'রে দান্তে এই ক্ষণিক 'বিলুপ্তি' বা বিরাম [তা সে স্মৃতিভ্রংশ, গভীর নিদ্রা বা মূর্ছা যাই হোক না কেন] পাবার পরই বৃহত্তর আলোক তথা দর্শন পেতেন। ancor কথাটি এই ধরণেরই একটা কিছু ইঙ্গিত করছে এবং গ্রন্থপ্রতীকের মধ্যে অতি সহজেই তিনি তা করতে পারেন। carte শব্দটি বহুবচনে অর্থাৎ যা লেখবার বিষয় তা একটি পাতায় সম্ভব নয়,

অথবা carte বলতে তাঁর লেখাগুলিই বোঝাচ্ছে [অর্থাৎ গোটা বইটাই] যেন মনে হয় তাঁর সবই লেখা ছিল শুধু উপরোক্ত ব্যক্তিটি ও সেই দলটি বাদ পড়ে গিয়েছিল—এখন দরকার সেটুকু টুকে নেওয়া। উপরে ancor কথাটির মতো এখানে ঠারেঠোরে গ্রন্থপ্রতীকের সাহায্য নেওয়া হয় নি, সোজাসুজিই। vergare ক্রিয়াপদের অর্থ লাইন টানা, সেই থেকে লেখা এই অর্থও এসেছে। তবে কি এই সামনের ব্যক্তিটি ও পিছনের ঐ দলটির বিষয় পূর্বাহ্ণে লেখা ছিল তখন স্মরণ করতে পারছেন না quaderno-র কোনো অংশে? বললেই তিনি সেই-সব লিখিত অংশে দাগ দিয়ে দেবেন? মনস্তাত্ত্বিকেরা যদি মনে করেন যে, অচেতন মনে দান্তে একটা-কিছু আশঙ্কা করছিলেন তিনি যাঁকে এখনই জানতে পারবেন তিনি তাঁর গুরু, পিতৃপ্রতিম, সেইজন্যই এত-সব 'বিলুপ্তি'র ঘটা, তবে বোধহয় খুব দোষ দেওয়া যাবে না। Scribere-লেখা ক্রিয়াপদটির বদলে vergare—টোকা, ক্রিয়াপদটির ব্যবহার অর্থপূর্ণ শুধু এইজন্যে যে, অন্তত এক্ষেত্রে ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের ফলে বিষয়টি ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। মিলের খাতিরে দান্তে ইচ্ছেমত শব্দের রকমফের ব্যবহার করতেন এ কথা কেউ স্বীকার করেন নি। verghi শব্দটির এক লাইন ছেড়ে উপরে আছে alberghi কাজেই, scribere ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের সুযোগ নেই এ কথা উঠতে পারেই বলে বললুম। carta-র বহুবচনে carte-র ব্যবহারও ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়েছে, এখানে প্রয়োজনও ছিল, সে কথা আলোচনা করেছি, শুধু ধ্বনির জন্য নিশ্চয়ই বহুবচনের প্রয়োগ হয় নি, কারণ carte থাকাতে পঙক্তিটি শ্রুতিমধুর হয়েছে—carte-র বদলে carta বসিয়ে পড়লেই তা হৃদয়ঙ্গম হবে। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও ধ্বনি ও তত্ত্বের মিল অনস্বীকার্য।

দান্তে স্বর্গারোহণের পথে চন্দ্রবৃত্তে এলে বেআত্রিচের সঙ্গে চাঁদের বাড়া-কমা নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক বিতর্ক হয়। সেই প্রসঙ্গে বেআত্রিচে গ্রন্থপ্রতীকের সাহায্যে যুক্তির অবতারণা করছেন।

> . . . Si come si compare
> Lo grasso e il magro un corpo, cosi questo
> Nel suo volume cangerebbe carte.
> অথবা যেমন শরীর স্থূল ও কৃশভেদে বিভক্ত,
> তেমনি সে (চন্দ্র) তার বইয়ের পাতা পরিবর্তন করে (অর্থাৎ
> ওলটায়) —পারাদিজো, ২, ৭৬-৭৮

cangerebbe ক্রিয়াপদটি Conditional Mood-এ, আমি বাঙলায় এর ঠিক মানে তর্জমা করতে পারি নি। সে যাই হোক, চাঁদকে এখানে বলা হয়েছে যেন একটি বই— কল্পনা করা যাক মাঝ-বরাবর খোলা একটি বই। যদি আপনি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাতা উল্‌টে যান তাহলে ডান দিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটা দেখাবে আর বাঁ দিকে কৃশ। এর উলটো ক্রিয়াটিও অনুরূপ দেখাবে। এখানে লক্ষণীয় যে, চাঁদ গ্রহ হলেও তাকে মধ্যযুগের volume-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— একটু আগে যার বর্ণনা দিয়েছি; কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখব বিশ্বপরিমণ্ডলের গ্রহ volume— প্রাচীন অর্থে (এ কথাও অবশ্য পূর্বে একবার বলেছি)। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনমতো দান্তে গ্রন্থপ্রতীকের ব্যবহার করেছেন কখনো মধ্যযুগের অর্থে কখনো প্রাচীন সংজ্ঞায়। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, এতে রসাভাস হয়েছে কি না। বিশেষ করে মধ্যযুগের লোক, দান্তের সময়কার লোক, যারা মধ্যযুগের প্রচলিত বাঁধানো

পুঁথি দেখতেই অভ্যস্ত, তাদের কাছে প্রাচীন পুঁথির আবেগ তখন আর অতটা নেই। অনেক পণ্ডিতদের এই অভিমত, এমন-কি কুরতিউস পর্যন্ত তার মধ্যে আছেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দান্তের সময়ে স্পষ্টতই প্রাচীন সাহিত্য দর্শন, বিশেষ ক'রে আরিস্ততল, ইতালিতে চর্চা হয়েছে; দান্তের রচনাই তার সাক্ষ্য, শুধু দান্তের একক প্রয়াসে কোম্মেদিআ রচনা সম্ভব হয় নি, দেশে তার জমি তৈরি হচ্ছিল, দান্তের প্রতিভা তার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। কাজেই দান্তের দৃষ্টিভঙ্গি কোনো এক নির্দিষ্ট কাল বা সমাজ ঘিরে থাকে নি। যেমন কোম্মেদিআ-র চরিত্রগুলি নির্দিষ্টকালের হয়েও সর্বকালেরই, তেমনি গ্রন্থ-প্রতীকের সংজ্ঞা প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়েও (শিল্পবোধে তাকে নির্দিষ্ট করতেই হবে) একটা বিশ্বজনীন অনুভবে উদ্ভাসিত।

এতক্ষণ গ্রন্থ, লেখনী লেখবার সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করা গেল। কিন্তু গ্রন্থে আছে অক্ষর, অক্ষর পাশাপাশি বসিয়েই বাক্য রচনা। এই অক্ষর অতি স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল, উদ্দীপনা আনতে পারে; তারা বিশেষ অর্থবহ হতে পারে কবির কাছে। কিন্তু দান্তে শুধু প্রচলিত ভাবেই 'অক্ষর' দেখেন নি, যেমন—

Nè O si tosto mai, nè I si scrisse,
Com'ei s'accese ed arse, e cener tutto
Convenne che cascando divenisse.
না 'ও' না 'ই' এত তাড়াতাড়ি কখনও লেখা হয়েছে,
যে-ভাবে সে আগুনে ঝাঁপ দেয়, পোড়ে, ছাই হয়ে ভুঁয়ে পড়ে।

—ইন্‌ফের্‌নো, ২৪, ১০০

বলা বাহুল্য, সময় বা গতির পরিমাণ বোঝাবার জন্য O এবং I-র উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'ও' বা 'ই' লিখতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না লিপিকরের কাছে তেমনি, এমন-কি তার চেয়েও কম সময় নিয়েছে ভান্নি ফুচ্চি আগুনে পুড়ে ছাই হতে। লিপিকরের লেখার চাল সম্বন্ধে কতখানি আগ্রহ থাকলে, কতখানি তন্ময়তা এলে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অক্ষরের উল্লেখ হতে পারে; 'অপ্রত্যাশিত' আমাদের কাছে, দান্তের কাব্যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই তা এসেছে।

কখনো অক্ষরের সাহায্যে তিনি মুখাবয়বের চিত্র এনেছেন, যেমন OMO, অর্থ মানুষ :

Parean l'occhiaie anella senza gemme:
Chi nel viso degli uomini legge *omo,*
Ben avria guivi conosciuto l' *emme.*
চোখের গর্তগুলি যেন আঙটি— পাথর নেই; যে মানুষের
মুখ দেখে পড়তে পারে OMO (ওমো) সে অনায়াসে
চিনতে পারবে এম্মে (ইতালিআন M— উচ্চারণ এম্মে)

অক্ষর-প্রতীক হিসাবে M অক্ষরটি দান্তে একাধিক ভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে অবশ্য মানুষের মুখ হিসাবে। সে-যুগে এ পঙক্তিগুলি পড়ে দান্তেকে আধুনিক মনে করত কি না বলতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাদের কাছে আধুনিক বলেই এখনো মনে হবে, তা সে-আধুনিকতা বলতে যাই বোঝাক না কেন।

কতখানি শিল্পনৈপুণ্য থাকলে উপরের পঙক্তিগুলি লেখা সম্ভব! ইতালিআন বর্ণমালায় যেহেতু W নেই সেহেতু M অক্ষরটি বর্ণমালার মধ্যমণি—অর্থাৎ তার তিনটি অংশ I V I পবিত্র ধ্যানে দান্তেকে নিমগ্ন করেছে বারে বারে।

অক্ষরপ্রতীকের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় পারাদিজোর ১৮ সর্গে ৭০ পঙক্তি থেকে ১১৭ পঙক্তি পর্যন্ত। তাঁর সেই দর্শন আকাশের লিখন—Diligite justitiam qui judicatis terram, ন্যায় বিচারে আনন্দ পাও, তোমরা যারা এই মাটির বিচার কর। সব-কটি পঙক্তি উদ্ধৃত করা এখানে সম্ভব নয়, করতে পারলে খুশিই হতুম, কারণ পৃথিবীর যে-কোনো কাব্যে এর তুলনীয় কবিত্ব অন্তত আমার জানা নেই। তবু দান্তের বক্তব্য নীচের কয়েকটি পঙক্তি থেকেই ধরা যাবে আশা করা যায়। দান্তে এখন জুপিটার গ্রহে, তার নাতিশীতোষ্ণ আশ্রয়ে তিনি প্রেমের জ্যোতিতে মুগ্ধ। তার পরেই তিনি বর্ণনা করছেন :

E come augelli surti di riviera,
Quasi congratulando a lor pasture,
Fanno di sè or tonda or lunga schiera,
Si dentro ai lumi sante creature
Volitando cantavano, e faciensi
Or di or i, or elle in sue figure.

যেমন পাখিরা পাড়ে চরা শেষ ক'রে আনন্দে আকাশে
ওড়ে কখনো বৃত্তাকারে, কখনো লম্বা সারিতে, তেমনি আলোর
অন্তরে অমর আত্মারা ঘুরে ঘুরে গান করছিলেন— তাঁদের
সমবেত আকৃতি দেখাচ্ছিল কখনো 'ডি' (D), কখনো
ই (I), কখনো এল্‌লে (L)। —পারাদিজো, ১৮, ৭৩-৮

একটু পরেই :

Mostrarsi dunque in cinque volte sette
Vocali e consonanti ; ed io notai
Le parti si come mi parver dette.
Diligite justitiam, primai
Fur verbo e nome di tutto il dipinto ;
Qui judicatis terram, fur sezzai.
Poscia nell' *emme* del vocabol quinto
Rimasero ordinate, sì che Giove
Pareva argento li d'oro distinto.
E vidi scendere altre luci dove

Era il colmo dell' *emme*, e li quetarsi,
Cantando, credo, il ben ch' a sè le move.
তারপর তাঁরা পাঁচবার সাতটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রদর্শন
করলেন, আমি অংশগুলি টুকলুম [অর্থাৎ অক্ষরগুলি]
যেমন তারা আমার কাছে উচ্চারণে প্রকাশ পায়।
ডিলিগিটে য়ুস্টিটিআম্— প্রথমে শুধু ক্রিয়াপদ এবং
উদ্দেশ্য সাজানো ; কুই য়ুডিকাটিস্ টের্‌রাম্ শেষে।
এরপর তাঁরা পঞ্চম অক্ষর এম্‌মে জড় হয়ে সজ্জিত হলেন,
যাতে জুপিটার সেখানে দেখায় স্বর্ণ-খচিত রৌপ্য।
এবং এম্‌মে-র শিখরে আরও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের
নামতে দেখলুম, তাঁরা সেখানে শান্ত, গান গাইছেন
আমার বিশ্বাস মঙ্গলময়ের যিনি তাদের আকর্ষণ করছেন
তাঁরই কাছে।

—পারাদিজো, ১৮, ৮৮-৯৯

কয়েক পঙক্তি পরে M অক্ষরটিকে ন্যায় বিচারের প্রতীকভাবে কল্পনা করা হয়েছে একটু সামান্য পরিবর্তনেই অক্ষরটি ঈগল পাখির মতো দেখানো যায়, যেমন —বলা বাহুল্য যাঁরা পুঁথি দেখেছেন তাঁরা জানেন M অক্ষরটি লিপিকর অনেকটা ঐ ভাবেই লিখতেন— বিশেষ ক'রে অক্ষরটি যদি পঙক্তির আদ্যক্ষর হত। এই অক্ষরটির মাঝখানে মাথার উপরে একটি বিন্দু বসালেই হবে ঈগল— ন্যায় বিচারের প্রতীক [পারাদিজো ১৮, ১০৬ দ্রঃ]। দান্তে পুঁথির অক্ষরটির কথা নিশ্চয়ই স্মরণ করেছেন যখন উপর্যুক্ত পঙক্তিগুলি লেখেন।

অক্ষর ছাড়া সংখ্যাকেও প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে, যেমন un cinquecento diece e cinque, পাঁচশো দশ পাঁচ, যাকে রোমান অঙ্কে হরফে লিখলে দাঁড়ায় D V X, যার অর্থ এখানে নেতা (বলা যেতে পারে অনেকটা অবতার স্বরূপ) [পুরগাতোরিও, ৩৩, ৪৩]। বাইবেলে অবশ্য সংখ্যার উল্লেখ আছে, যথা, for it is the number of a man ; and his number is six hundred three score and six [Revelation, 13, 18]

মধ্যযুগের একটি দার্শনিক তত্ত্ব যাকে দান্তে বলেছেন la contingenza,— সম্ভাব্য, বিশেষ একটি অর্থে সে-যুগে দার্শনিকেরা ব্যবহার করতেন। বিশ্বপরিমণ্ডলের মধ্যে এই পৃথিবী (মানুষকেই প্রধানত মনে করা হচ্ছে) ও গ্রহমণ্ডলের মধ্যে তফাত এই : পৃথিবী অনিয়মে পূর্ণ, কিন্তু বিশ্বপরিমণ্ডলের আর সব নিয়মে বাঁধা। অনিয়ম আছে বলেই বিশ্বপিতার আবির্ভাব প্রয়োজন, ঘটেও। পরম কারুণিকের করুণা বর্ষিত হলেই মানুষের মনে পড়ে কী এক সুসমঞ্জস নিয়মে বাঁধা এই বিশ্বপরিমণ্ডল। কাজেই পৃথিবীতে ঘটনা ঘটবেই, সম্ভাবনা অথবা সম্ভাব্য— Contingency থাকবেই, এবং সেইজন্যই

La contingenza, che fuor del quaderno
Della vostra materia non si stende,
Tutta è dipinta nel cospetto eterno...
এই সম্ভাব্য যা তোমার বইয়ের পাতার বাইরে
যায় নি তা সবই [এখানে] শাশ্বত নেত্রে চিত্রিত। —পারাদিজো, ১৭, ৩৭-৩৯

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্র এক একটি quaderna, বিশ্বপিতা তাদের সকলকেই গ্রথিত করে রেখেছেন এই আকাশে, তাই আকাশ volume :

Lo real manto di tutti i volumi
del mondo—
বিশ্বপরিমণ্ডলের রাজোত্তরীয়—

উপরের তিনটি পঙক্তির মধ্যে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে contingenza নিয়ে : যে-contingenza দান্তের বইয়ের পাতায় পাতায় প্রকাশিত, তা স্বভাবতই বিক্ষুভিত, আশান্বিত ও প্রশান্ত, এই পৃথিবীর মানবীয় নিয়মে যা বাঁধা ; আর যে-contingenza ঈশ্বরের শাশ্বত উপস্থিতির মধ্যে বিধৃত। উভয়ক্ষেত্রেই গ্রন্থ-প্রতীকের সাহায্যে একদিকে যেমন আকাশের বর্ণনা সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অনির্দিষ্ট নিয়মে চালিত এই পৃথিবীর মর্মচিত্রও সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে।

গ্রন্থপ্রতীকের প্রয়োগে এত বিচিত্র অনুভূতি ব্যক্ত হতে দেখবার পর আমরা পারাদিজোর প্রায় শেষে দেখি সেই গ্রন্থ বিশ্বের সব ছড়ানো পাতা সযত্নে গেঁথেছে :

Nel suo profondo vidi che s'interna
Legato con amore in un volume
Ciò che per l'universo si squaderna.
আমি তার অন্তরতম গভীরে দেখলুম বিশ্বের সব
ছড়ানো পাতা জড়, প্রেমের মধ্যে বাঁধা একটি বইয়ে।

—পারাদিজো, ৩৩, ৮৬-৮৭

তবে এতক্ষণ গ্রন্থপ্রতীকের মধ্যে যে-'গ্রন্থকে' আমরা দেখেছি— তার অবয়ব, আচরণ লক্ষ্য করেছি, তা থেকে এ গ্রন্থ কিছুটা আলাদা, কারণ এখানে সে শুধু গ্রন্থই নয়, আলোকও বটে।

Sustanzia ed accidenti, e lor costume,
Quasi conflati insieme per tal modo,
Che ciò ch'io dico è un semplice lume.
সত্তা ও অনুষঙ্গ ও তাদের নৈকট্য এমনভাবে
পরস্পর জড়িত যে, আমি যার সম্বন্ধে বলছি সে
শুধু একটি জ্যোতি মাত্র।

—পারাদিজো, ৩৩, ৮৮-৯০

১৮৬৫ সালে দান্তের ষষ্ঠ শতবার্ষিক জন্মোৎসবে
মধুসূদন কর্তৃক প্রেরিত কবিতার প্রতিলিপি

কবি দান্তে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে

দান্তের ষষ্ঠ জন্মশতবার্ষিক উৎসবে প্রেরিত। ১৮৬৫

দান্তের কবিতা : অনুবাদ

স্বর্গোদ্ভবা

যেখানে এসেছি সেখানে হায়, হ্রস্বদিন আর বিশাল ছায়ার বৃত্তাংশ, আর তৃণভূমি থেকে রং যখন যায় লুপ্ত হয়ে, গিরির সেই শুভ্রতা। আমার বাসনাও তাই বলে তার হরিৎরূপ বদলায় না, রমণীর মত যা কথা বলে ও শোনে সেই কঠিন শিলায় তা এমন বদ্ধমূল।

স্বর্গোদ্ভবা এই রমণী সেইমত ছায়ার মধ্যে তুষারের মত পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, কারণ সে তো স্পন্দিত হয় না, যে মধুর কাল গিরিপর্বত তাতিয়ে শুভ্র থেকে সবুজ করে তোলে পুষ্পে গুল্মে সব কিছু আবৃত করবার জন্যে, তার দ্বারা শিলাখণ্ড যেমন হয়, তেমনি করে ছাড়া।

মাথায় যখন তার থাকে তৃণগুল্মের মালিকা, তখন আর সমস্ত নারীকে ছেড়ে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় তার দিকে, কারণ তরঙ্গিত পীত হরিৎ এমন মনোহর ছাঁদে সে মেশায় যে আমাকে যা আবদ্ধ করেছে দুটি ছোট গিরির মধ্যে চুন পাথরকে যত কঠিনভাবে বাঁধে তার চেয়ে সবলে, সেই প্রেম এসে দাঁড়ায় তাদের ছায়ায়।

মণিরত্নের চেয়ে গুণগ্রাম তার রূপলাবণ্যে, যে ক্ষত সে দেয় কোনো ওষধিতে তা সারবার নয়। কারণ গিরিপ্রান্তর পার হয়ে আমি পালিয়েছি এমন নারীকে এড়াবার জন্যে, তবু মৃৎস্তূপ কি প্রাচীর কি হরিৎ পত্রকুঞ্জ তার বিকিরণ থেকে পারে না আমায় ছায়া দিতে।

আমি তাকে হরিৎ বাসে দেখেছি, এমন সে বেশবাস যে তার শুধু ছায়াটুকুর জন্যে আমি যা করি অনুভব সেই প্রেম পাথরের বুকেও তা জাগাতে পারত : তাই সবচেয়ে তুঙ্গ পাহাড় ঘেরা স্নিগ্ধ তৃণপ্রান্তরে আমি তাকে কল্পনা করেছি, নারীর মধ্যে যতখানি প্রেম সম্ভব তাইতে বিভোর।

কিন্তু, যাতে আমি চাইব আজীবন কঠিন শিলায় শুয়ে কাটাতে, আর কোথায় তার অঙ্গবাসের ছায়া পড়ে তারই সন্ধানে বিচরণ করতে তৃণাহারে, বরবর্ণিনীদের যেমন হয়, আমার জন্যে তেমনি এই নধর সবুজ তরুদেহে আগুন ধরবার আগে নদীরাই ফিরে যাবে পর্বতশিখরে।

যখনই পর্বতেরা গাঢ় গভীর কালো ছায়া ফেলে, এই তরুণী রমণী হারিয়ে যায় স্নিগ্ধ সবুজের মধ্যে মানুষ যেমন রত্ন লুকিয়ে রাখে ঘাসের মধ্যে তেমনি করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাওলো ও ফ্রানচেস্‌কা ইনফের্নো : সর্গ ৫, ৭০-১৪২

গুরু যবে সেকালের অঙ্গনা ও বীর
সবাকার নাম কন, এল মোর মনে
অনুকম্পা, হয়ে গেনু বিমূঢ় অধীর।
বলি পুন : "কবি, ঐ চলেছে দুজনে
একত্রে, বায়ুতে দোঁহে অতি লঘুপতি,
ইচ্ছা করে যুগলকে ডাকি সম্ভাষণে।"
তিনি কন ; "যবে কাছে আসবে দম্পতি
চেয়ে দেখো এবং যে প্রেমে ওরা চলে
দোহাই জানিও তার, রাখবে মিনতি।"
অচিরে বাতাসে যেই তারা পড়ে ঢলে',
কণ্ঠ তুলে কই : "ওগো ক্লান্ত হিয়া, থাকে
যদি না নিষেধ কারো, কথা যাও ব'লে।"
যেমন কপোত আসে কামনার ডাকে
ব্যাপ্ত স্থির পাখা মেলে হাওয়া ভেদ করে
মধুর কুলায়ে নিজ সঙ্কল্পের পাকে,
তেমনই এ দুটি আত্মা বাহিরিয়া পড়ে
দিদো-র দলের থেকে, আমরা যেথায়,
দুষ্ট বায়ু বেয়ে আসে মোর তীব্র স্বরে।
"হে জীব, হে দান্ত সৌম্য! অসিত হাওয়ায়
তুমি চলো আমাদের মাঝারে, লালসে
পৃথ্বীকে করেছি দুষ্ট রক্তের ধারায়।
বিশ্বরাগ অনুকূল হ'লে ভাগ্যবশে
চাইত অভাগা তব কল্যাণ অভয়ে,
আমাদের দুর্দশা যে তব মর্মে পশে।
তুমি যে শুধাবে আর শোনাবে বিস্ময়ে
তোমাকে শোনাব আর শুনব প্রত্যাশে,
আরো যতক্ষণ হাওয়া থাকে শুব্ধ হ'য়ে।
যে দেশে জন্মেছি, উপকূল তার পাশে
যেখানে পো-নদ নেমে আসে সমারোহে
দলবল নিয়ে তার শান্তির তিয়াষে।
প্রেম, যে কোমল চিত্ত বাঁধে দ্রুত মোহে,

নিয়ে গেল দিব্যকান্তি সর্বস্ব আমার
তাকে বেঁধে, নিষ্ঠুর সে স্মৃতি যায় দহে'।
প্রেম, যে দেয় না কোনো প্রেম-অধিকার
প্রেমের পাত্রকে, এল প্রবল পুলকে
আমার হৃদয়ে, দেখ শক্তি আজো তার।
প্রেম আনে উভয়কে এক মৃত্যুলোকে ;
সে হন্তার ভাগ্যে আছে অনন্ত রৌরব।"
এই কথা ব'লে তারা থামে এক ঝোঁকে।
মর্মাহত আত্মাদের কথায় নীরব
আমি মাথা নত করি, তাই দেখে দাসে
"কিবা ভাবো" শুধালেন বাণীর গৌরব।
কবিকে উত্তরে মুখ তুলি দীর্ঘশ্বাসে,
"হায় রে কি সুখচিন্তা কোন্ কামনাতে
এনেছে এদের এই দুঃখের সন্ত্রাসে!"
তারপরে উভয়ের দিকে আঁখিপাতে
বলি, "ফ্রান্‌চেস্‌কা, তব ব্যথায় কাঁদালে
আমাকে বেদনা আর সমবেদনাতে।
বলো তুমি, সেই মধু দীর্ঘশ্বাসকালে
কেমনে কি অভিজ্ঞান দিলে বলো রতি
তোমাদের অনিশ্চয় অতনুর তালে।"
সে বলে : "এই তো হায় চরম দুর্গতি
দুঃখের সময়ে সুখদিনের স্মরণ—
এ কথা জানেন তব গুরু মহামতি।
কিন্তু যদি জিজ্ঞাসুই থাকে তব মন
আমাদের প্রেমে মূল কোথায়, তাহলে
কেঁদে কেঁদে ব'লে যাব ভরুক শ্রবণ।
একদিন পড়ি কালবিনোদন-ছলে
লাঞ্চিলোংতো'-কে প্রেম বাঁধে কি বাঁধনে,
ছিল না সংশয় লেশ, দুজনে বিরলে।
বারে বারে সেই পাঠে মিলাল নয়নে,
আননেও বারে বারে এল বর্ণান্তর,
কেবল একটি পলে ডুবি দুইজনে,
যবে পাঠ করি দোঁহে কেমনে নাগর

মধুর হাসিটি চুমে, তখন এই যে
আমার বাহুতে যার মিলন অমর,
সে আমায় চুমু দিল থরো থরো নিজে ;
সে কাব্য ও কবি কুটি পালেওত্তো হায় !
সেদিন আমরা আর পাঠ করিনি যে !”
যতক্ষণ এক প্রেত কথা ব’লে যায়,
অন্যজনা কাঁদে তত, অনুকম্পাভরে
আমি মূর্ছা যাই, যেন আমি মৃতপ্রায় ;

প’ড়ে যাই, মৃত দেহ যেইমত পড়ে ॥

বিষ্ণু দে

সন্দেশরাসকম্ কাব্যসমীক্ষা

কালিকারঞ্জন কানুনগো

কাব্যের কবিলিখিত ভূমিকা

হিন্দী সাহিত্যিক এবং সমালোচক মণ্ডলী গত বিশ বৎসর যাবৎ একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে সন্দেশরাসকম্ কাব্য রচয়িতা মীরসেন নামক কোনো ধর্মান্তরিত তন্তুবায়-পুত্র অদ্দহমাণ বা আব্দুল রহমান। ইহার প্রমাণ তাঁহাদের মতে কাব্যের প্রথম 'প্রক্রম', যেখানে কবি স্বয়ং আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমান লেখক মনে করেন, কবির তথাকথিত আত্মপরিচয় একটি নিছক সাহিত্যিক ধাপ্পা, যাহাকে কলাকৌশল বলা হয়। 'অদ্দহমাণ' কোনো অজ্ঞাতনামা জৈনমুনির বঙ্কিমী 'কমলাকান্ত' কিংবা 'ভীষ্মদেব খোশনবীশ'। এই কাব্যের কবিপরিচয় বিতণ্ডামূলক জটিল সমস্যা 'অদ্দহমাণ' ভাষাতত্ত্বের একটা হেঁয়ালী।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুধী পাঠকসমাজকে আঁধারে রাখিয়া বিচার হয় না। সুতরাং প্রথম প্রক্রমের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল—

শ্লোক ১। আর্য বুধগণ! যিনি রত্নাকর, গিরিতরুরাজি, গগনাঙ্গনে 'ঋক্ষ' (তারামণ্ডলী) তথা সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, তিনি আপনাদিগকে 'শিব' অর্থাৎ কল্যাণ প্রদান করুন।[১]

২। হে নাগরগণ। মনুষ্য, দেবতা, বিদ্যাধরগণ তথা আকাশে চন্দ্রসূর্য-বন্দিত সৃষ্টিকর্তাকে তোমরা প্রণাম কর।

৩-৪।[২] পশ্চিমে প্রভূতপূর্ব-প্রসিদ্ধ ম্লেচ্ছদেশ আছে। সেই দেশে মীরসেনের 'গৃহাগত' [আরদ্ধ], তাঁহার কুলকমল অদ্দহমাণ, যিনি প্রাকৃত কাব্য তথা 'গীতবিষয়ে' সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি সন্দেশরাসক রচনা করিয়াছিলেন।

---

১ টীকাকার অজ্জ শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ইত্যাদি'। আচার্য হজারিপ্রসাদ অজ্জ শব্দের অর্থ আয এবং উহাকে 'বুধজনের' বিশেষণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অধিক সমীচীন; 'ইত্যাদি' অর্থ দ্বারা কবিতাই মাটি হয়।

২ এই দুই শ্লোকের শব্দার্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। মূল সংস্কৃত টিপ্পনী—'তত্রবিষয়ে আরদ্দো দেশীত্বাৎ তন্তুবায়ো মীরসেনাখ্যঃ সম্ভূতঃ উৎপন্নঃ!' দ্বিবেদীজী বলেন, 'এই আরদ্দ শব্দ বিলকুল নয়া'। জুলহা বাচক আরদ্দ শব্দের ব্যবহার অন্ততঃ আমি পাই নাই। দেশীনামমালাতেও ইহা নাই।··· আরদ্দ স্থানে আরদ্ধ পাঠ যদি হয় তবে উহার এক অর্থ হয় গৃহাগত। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন 'আরদ্দ মীরসেনস্স' শব্দের অর্থ 'আরদ্দোমীরসেনাখ্যঃ' ব্যাকরণ অনুসারে হইতে পারে না।

[দ্বিবেদীজীর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত; সুতরাং এই দুই শ্লোকে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহা দ্বারা মীরসেন তাঁতি ছিলেন— এই কথা বলা চলে। যদি 'আরদ্ধ' পাঠ গ্রহণ না করিয়া আরদ্দ পাঠ বজায় রাখা হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় ইহা আরবী Aulad (সন্ততি) শব্দের দেশীকরণ। পুত্রের জন্মকে 'মেহমানের আগমন' বলা হয়— ইহার সহিত আরদ্ধ= গৃহাগত পদের অর্থ সামঞ্জস্য আছে।

দ্বিবেদীজী এই শ্লোকের 'পচ্চাএসি' শব্দের মধ্যে 'প্রত্যাদেশ' (Revelation) এবং মিচ্ছদেশের মধ্যে 'মিথ্যা দেশনা' (false belief) শ্লেষ অনুমান করিয়াছেন। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় শ্লেষ কোথায়ও নাই। কবি মুসলমান ছিলেন— এই

৫। শব্দ (ধ্বনি) সহিত অর্থ প্রকাশ-কুশল পূর্ব কবিগণ, যাহারা ত্রিভুবনে সুন্দর ছন্দসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহাদের প্রয়োগ নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার!

৬-৭। যাহারা অপভ্রংশ সংস্কৃত এবং পৈশাচী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন এবং সুকাব্য সমূহকে লক্ষণ ও ছন্দালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন,

তাঁহাদিগের পরবর্তী আমাদের মতো শ্রুতি (ধ্বনি?) এবং শব্দার্থ-জ্ঞানহীন ব্যক্তির লক্ষণ-ছন্দপ্রমুক্ত (বর্জিত) কুকবিতার প্রশংসা কে করিবেন?

৮। অথবা ইহাতে (এইরূপ কাব্যপ্রচেষ্টায়) দোষই বা কি? রাত্রে চন্দ্রোদয় হইলে অন্য জ্যোতিষ্কগণ [জোইকৃথ] কি জ্যোতি বিকিরণ করে না? না কি কেহ ঘরে আলো জ্বালাইতে পারিবে না?

৯। তরুশীর্ষে পরভৃত কোকিল মধুর মনোহর কণ্ঠে যদি ডাকে তাহা হইলে ঘরের চালায় বসিয়া কাক কর্কশ কা কা ধ্বনি করিতে পারিবে না? [ণ করকয়ঁতু]

১০। (সুকুমারী) তরুণীর নবপল্লবপেলব করাঙ্গুলিপ্রহৃত বীণায় অতি মধুর সুর বাজিয়া উঠে বলিয়া কেহ উৎসবাদি উপলক্ষে গ্রাম-বধূর (স্থূলহস্ত তাড়িত) মাদলের উতলা বাদ্য শুনিতে পারিবে না?

১১। পদ্মপত্রের ঘনরস-গন্ধোৎকট মদস্রাবী 'দুপ্রেক্ষ্য' (দূরাৎ দর্শনীয়) গজরাজ কামোন্মত্ত হয় বলিয়া অন্যহস্তী কি তাদৃশ মত্ত হইতে পারিবে না?

১২। বহুবিধ গন্ধাঢ্য-কুসুমামোদিত সুরেন্দ্র-ভুবনে (স্বর্গে) পারিজাত বৃক্ষে পুষ্পোদ্গম হয় বলিয়া 'সেসতরু'-র[৩] কি ফুল ফুটে না?

১৩। ত্রিভুবনে নিত্যপ্রকটিত-প্রভাবা সরিদ্বরা গঙ্গা সাগরগামিনী বলিয়া 'সেস-সরী' অর্থাৎ অবশিষ্ট নদী কি সমুদ্রে পড়িতে পারিবে না?

১৪। সূর্যোদয়ে বিমল সরোবরে নলিনী প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া গৃহস্থ বাড়ির ঘেরায় [বৃতিবিলগ্না] লাউগাছে কি ফুল ফুটিতে পারিবে না?

১৫। ভরতমুনি-নির্দিষ্ট ভাব তথা ছন্দানুসারে 'নবরঙ্গচংগিমা' (সুন্দরীঃ অর্থে বাং কথ্য: রাঁগা চাঁগা? rānga chānga) লাস্যময়ী সুগৌর তরুণী নৃত্য করেন বলিয়া মুগ্ধা গ্রাম-বধূ কি তালি বাজাইয়া আপন মনে নাচিতে পারিবে না?

বদ্ধমূল পূর্বসংস্কারের ছলনায় দ্বিবেদীজী আরো অন্যত্র ইস্‌লামী শ্লেষের সরিষাফুল দেখিয়াছেন, কাব্যের শেষে 'অনাই অনন্ত'-র (অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরের জয় হোক) মধ্যে কেয়ামতের জয়ধ্বনি শুনিয়াছেন!

দ্বিবেদীজী 'অদ্দহমাণ=অব্দুর রহমান' অন্বয়ের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে মনে হয় Ahad Zaman নাম প্রাকৃতে অদ্দহমাণ হইয়া গিয়াছে।]

৩ সংস্কৃত টীকাকার তথা আধুনিক হিন্দী-সাহিত্যিকগণ 'সেসতরু'র সোজা অর্থ 'অবশিষ্ট বৃক্ষ' করিয়াছেন। যে কবি কাক-কোকিল, দীপ-চন্দ্রমা, বীণা-মাদল ইত্যাদি সামান্য-অসামান্য বস্তুর বৈপরীত্য চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কি এইস্থলে মাটির পৃথিবীর কোনো অবজ্ঞাত বৃক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করেন নাই?

বাঙালি পাঠক নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবেন 'শেষ-তরু' আমাদের গ্রামাঞ্চলের ফণীমনসা, হিন্দুস্থানের নাগ-ফণী এবং অভিজাত উদ্যানের Cactus।

১৬।[৪] (ধনীর গৃহে) বহুলপরিমাণ দুগ্ধে (অল্পপরিমাণ) তণ্ডুলের ক্ষীর (পায়সান্ন) যদি ডগ্ বগ্ করে, তবে (গরীবের) খুদকণা সমেত (ছোলার ছাতুর) রাবড়ি [রব্বড়িয়া] কি 'দড় বড়' করিবে না?

(অর্থাৎ পাকের শেষে ঘন হইয়া লাফাইবে না?)

১৭। যাহার যতটা কাব্যশক্তি আছে শক্তি অনুসারে নিঃসঙ্কোচে সে কবিতা লিখিবে। যেহেতু 'চউমুহ' [এক অর্থে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, অন্য অর্থে পূর্ববর্তী চউমুখ নামক প্রসিদ্ধ অপভ্রংশ ভাষার কবি] কবিত্ব করিয়া গিয়াছেন সেজন্য 'সেসা' [অবশিষ্ট এবং বিজয়সেসিয় নামক কবি অর্থে?] কি কবিতা লিখিবেন না?[৫]

১৮। ত্রিভুবনে [স্বর্গমর্ত্যপাতালে, অন্য পক্ষে কবি ত্রিভুবন-রচিত কাব্যে], এমন কিছু নাই যাহা আপনারা দেখেন নাই কিংবা শুনেন নাই [সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী?] কিংবা যাহা পড়েন নাই কিংবা অন্যের মুখে শুনেন নাই। অধিকন্তু বিকটবন্ধ-সুছন্দ [স্বয়ম্ভু বা শেষ কবি রচিত?] শুনিবার পর আমাদের মতো কবির নীরস লালিত্যহীন কবিতা কে পছন্দ করিবেন?

তবুও বিপাকে পড়িলে [? দুগচ্ছিয় বা দোগ্গচ্ছিয়] রসিক নাগর জন [? ছেঅর[৬] = ছেবল = ছবিলা

৪ বাঙালি পাঠক হয়তো জানেন না যে হিন্দুস্থানী 'ক্ষীর' এবং গোয়ালন্দের 'পাতক্ষীর' কিংবা বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ 'ক্ষীর' এক বস্তু নহে। প্রতিমের মহিষের দুধে দুই তোলা হিসাবে সরু চাউল দিয়া পায়সের মাটির ভাণ্ড ঘুঠের ধিমি আঁচে শীতকালের সন্ধ্যায় চাপাইয়া রাখিলে পরের দিন সকালে আসল দেহাতী ক্ষীর প্রস্তুত হয়।

হিন্দুস্থানী রাবড়ি ইটাবা (উত্তরপ্রদেশ) কিংবা কলিকাতার হালুয়াই দোকানের দুধের রাবরী নহে। গ্রাম্য লোকেরা মাটির বড় মটকায় যব গম ছোলার খুদ কণাসমেত আটা জলে খুব সিদ্ধ করিয়া ভাণ্ডের মুখ সরার দ্বারা ভালোভাবে বন্ধ করে যেন তাপ বাহির হইতে না পারে। দুই দিন পরে ভাণ্ডস্থ বস্তুই পরম উপাদেয় রাবড়ি নামে পরিচিত। ইহার স্বাদ টক, এবং গুণ বলবর্ধক, কিঞ্চিৎ মাদকও বটে। ইহা বাংলা কাঁজি, সংস্কৃত কাঞ্জিকের বিকল্প।

লোকে বলে পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় দোয়াবের পশুপালক আহীর জাতি মিথ্যা বড়াই করে, শাক খাইয়া ঘিয়ের ঢেকুর তোলে। এই জন্য প্রবাদ আছে—আহীর বে-পীর (unscrupulous); খাঁয়ে রাবড়ি বতাওবে ক্ষীর।

৫ আচার্য দ্বিবেদীজী এই শ্লোকের চউমুহ এবং সেসা তথা পরবর্তী (১৮শ) শ্লোকের তিহুয়নি শব্দের উপর দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা লিখিয়াছেন (দ্রঃ প্রস্তাবনা পৃ ৮-৯)। ইহা সুধী সমাজ আশা করি গ্রহণ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন—

সংস্কৃত টীকাকারদ্বয় চউমুহ-কে ব্রহ্মা এবং তাঁহার কাব্যকে বেদ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয় কবি কৌশলে এই দ্ব্যর্থবোধক চউমুহ শব্দের দ্বারা অপভ্রংশ ভাষার ছন্দালঙ্কারবেত্তা কবি চউমুহের প্রতি সংকেত করিয়াছেন। চউমুহ নামের পরেই কবি তিহুয়নি শব্দ নিপুণভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন।···টীকাকারেরা ইহাকে সোজাসুজি 'ত্রিভুবন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন···এই তিহুয়ন শব্দের দ্বারা কবি পূর্ববর্তী ত্রিভুবন কবির প্রতি ইঙ্গিত করেন নাই কি? চউমুহ শব্দের পর সেসা শব্দও দ্ব্যর্থবোধক। সেসা শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র 'অবশিষ্ট' অর্থই কবির অভিপ্রেত কি? 'বিকটবন্ধ— সুছন্দসরস' বাক্যের দ্বারা উহার ছন্দকার কবি 'স্বয়ম্ভু'র নামই হয়তো কবি পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন মনে হয়। 'স্বয়ম্ভু' কবি 'শেষ' বা বিজয়সেসিয় নামে পরিচিত ছিলেন। ত্রিভুবন এই 'স্বয়ম্ভু' কবির পুত্র।

বর্তমান লেখকের মত অকবি ও অরসিক ব্যক্তির মনে হয় সংস্কৃত টীকাকারগণ এই অন্তঃসলিলা রাসক-কাব্যফল্গুর ভিজা বালুর উপরে গড়াগড়ি দিয়াছেন মাত্র; বালুকার নীচে প্রবহমান রসধারা এই স্থলে এবং কাব্যের অন্য অংশে দ্বিবেদীজী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার কবিগুরু-সাহচর্য সার্থক হইয়াছে।

৬ দ্বিবেদীজী বিচার করিয়া দেখিবেন ছেঅর শব্দ হইতে ছেবল শব্দ নিষ্পন্ন হওয়া প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্মত কি না? হিন্দীর কৃষ্ণনাম 'ছৈলবিহারী'-র ছৈল, ছবিলারামের ছবিলা হিন্দী বটতলার প্রেমকথা 'ছবিলী ভাটিয়ারীন্'-র ছবিলী শব্দ কোথা হইতে

(হিন্দী) বাংশহুরে চালিয়ং বা ছেবলা ?] যেমন 'পত্তি'-র [পান-পাত্তি (হিন্দী) ; সংস্কৃত নাগবল্লী ; অপভ্রংশ নায়র বেলি ; বাংলা বরজের মিঠাপান] অভাবে [অলভ্যমান হইলে] সইবত্তি-রসিক হইয়া আশ্বস্ত হইয় থাকেন [সইবত্তি = সইপত্তি = সংস্কৃত শতপত্রী বা শতপত্রিকা = বাঃ চই পাতা ; সোজা বাংলা অর্থ পান পাওয়া না গেলে চই পাতা চিবাইয়া পান খাইলাম বলিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন], সেই রূপ উৎকৃষ্ট কাব্য হাতের কাছে না পাইলে সময় সময় কেহ কেহ (কুতুহলী হইয়া) আমার কুকবিতাও হয়তো পড়িয়া লইবেন।[৭]

১৯। নিজের কবিত্ববিস্তার মাহাত্ম্য তথা পাণ্ডিত্যের পরিপোষক এই সন্দেশরাসক মনুষ্যলোকে 'কোলিয়' [কোলি-কুলজাত] কর্তৃক কৌতূহলবশতঃ সরলভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া বুধজন অর্ধক্ষণ কৃপা করিয়া এই 'পামর-জন' (অধম) কর্তৃক 'স্থূলাক্ষরে' (অমার্জিত ভাষায়) লিখিত কাব্য শ্রবণ করুন।

আসিল ? বাংলাভাষায় ছ্যাবলা ভিন্নার্থ বাচক হইলেও আদিতে প্রাকৃত ছেয়র বা ছেবল হইতে উৎপন্ন নয় কি ?] এই শব্দগুলিতেও ছেক্-ত্ব বা বিগদ্ধতার (নাগর-সুলভ) ভাব আছে।

৭ লেখক মূল অপভ্রংশ এবং অবচূরিকা-র (সংস্কৃত টীকা) অর্থ-সমন্বয় করিয়া এই শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়াছেন। সন্দেশরাসকম্ কাব্যের সংস্কৃত টীকা ও মূল পাঠ সংশোধন (? না কি বিকৃত করিয়া ?) মহাপণ্ডিত আচার্য দ্বিবেদীজী এই শ্লোকের যে সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন (দ্রঃ প্রস্তাবনা পৃ ১০-১১), উহা এই প্রবন্ধে গৃহীত হয় নাই। দ্বিবেদীজী ভাবার্থ করিয়াছেন—

'তবুও দারিদ্র্যগ্রস্ত সহৃদয় জন (যেমন) পাত্র পাওয়া না গেলে শতপত্রী (=কমলিনী) পত্রের রসিক হইয়াও আশ্বস্ত হইয় থাকেন, সেইরূপ আমার এই মামুলী কবিতা কখনো কখনো সহৃদয় লোক পড়িয়া লইবেন।' দ্বিবেদীজী টিপ্পনী করিয়াছেন— 'ইহাতে (এই শ্লোকে) নিজের কাব্যকে জড় ধাতুপাত্র অপেক্ষা জীবন্ত কমলপত্র কহিয়া কবি কৌশলপূর্বক উহার সপ্রাণতা এবং কোমলতার প্রতি 'ইঙ্গিত ভী' করিয়াছেন· ·।'

সংস্কৃত টীকায় আছে—

'যথা দুর্গতৈঃ দারিদ্র্যোপদ্রুতৈঃ ছেকৈঃ পত্রানি নাগবল্লী-দলান্যলভমানৈঃ পর্বতাদৌ বহুমূল্যত্বাৎ শতপত্রিকাস্বাদ্যাৎ···।'

সংস্কৃত টীকায় 'শতপত্রিকা-আস্বাদন' অনুমান করিয়া দ্বিবেদীজী যেন দিশাহারা হইয়াছেন। পদ্ম পাতা লেহ্য পেয় চষ্য চর্ব্য বস্তু নহে ; উহার আবার আস্বাদন কি ? দ্বিতীয় কথা— মূল অপভ্রংশ শব্দ আসাসিজ্জই হইতে সংস্কৃত আস্বাদ্য হইতে পারে না, আশ্বস্যতে হইতে পারে— যাহা আশ্বস্ত হওয়া অর্থে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় কথা— পত্তেহি শব্দ সংস্কৃত টীকাকার 'পত্র' অর্থে গ্রহণ করিয়া সব গড়বড় করিয়াছেন। পত্ত শব্দ হইতে পত্র নিষ্পন্ন হয় বটে কিন্তু পান (তাম্বূল) অর্থে উহা প্রাকৃত পন্ন (সংস্কৃত পর্ণ) শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হয়। পত্ত শব্দই কবির অভিপ্রেত ; কিন্তু পত্র হইতে নিষ্পন্ন কোনো বস্তু নহে, সংস্কৃত পত্র অর্থে পত্ত। পত্ত শব্দের সংস্কৃত রূপ পত্র কষ্টকল্পিত নহে, প্রাকৃত গ্রন্থে ইহা উপলব্ধ আছে। সইবত্তি শব্দও সংস্কৃত 'শতপত্রিকা' (=কমলিনী) শব্দের রূপান্তর। (দ্রঃ প্রস্তাবনা পৃ ১০)।

জলে নামিয়া কুমীরের সহিত শক্তিপরীক্ষা ঐতিহাসিকের স্বধর্ম নহে। কিন্তু এত করিয়াও দ্বিবেদীজী নির্ভরযোগ্য কিছু পাঠককে দিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। দ্বিবেদীজীর ব্যাখ্যা আমাদের মতে বাস্তব-বিরোধী। এই সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়—

ক. 'দারিদ্র্যগ্রস্ত বিদগ্ধ জন যেমন (ধাতু) পাত্রের অভাবে পদ্মের পাতায় ভোজন করিয়া আশ্বস্ত হইয়া থাকেন· ·'—

এইরূপ ব্যাপার সচরাচর দেখা যায় না, কোনো কাব্যেও কল্পিত হয় নাই। দারিদ্র্যগ্রস্ত বিলাসী ব্যক্তির জন্য পাত্তল কি তখন হিন্দুস্থানে ছিল না ? পাত্তল অপেক্ষা পদ্মপাতা কোনো শহরে সুলভ নহে। দ্বিবেদীজীর ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে হইলে অনুমান করা অবশ্যক যে এহেন ব্যক্তি গামছা পরিয়া পচা পুকুরে জীবনসংশয় করিয়া পদ্মপাতা তুলিবেন, বাড়িতে পদ্মপাতায় দাল-রুটি

২০। যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই কাব্য আসিয়া পড়ে এবং তিনি উহা পড়িতে চাহেন তাহা হইলে আমি ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তির হাত ধরিয়া বলিতেছি (অর্থাৎ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি) তিনি যেন অপণ্ডিতের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাপণ্ডিতের নিকট এই পুস্তক পাঠ না করেন।

২১। পণ্ডিতেরা বাজে কবিতা ['কুকবিতা' অর্থাৎ অখ্যাত কবির রচনা] পড়েন না ; মূর্খেরা কবিতা বুঝিতেই পারে না। এই জন্য যিনি অতিপণ্ডিত কিংবা যে অতি মূর্খ নহে, তাহাদিগকে পরিহার করিয়া মধ্যম শ্রেণীর বিদ্বানগণের নিকট এই কাব্য সর্বথা পঠিতব্য।

২২। এই সন্দেশরাসক অনুরাগীজনের রতিগৃহ ; কামীজনের চিত্তবিমোহনকারী ; মদন-মাহাত্ম্যের সঞ্চারিণী দীপশিখা [? ময়ন মহপ্পহ দীবয়রো = মদনমনস্কাণাং পথোদীপ-করং (অবচুরিকা)] ; বিরহিণীগণের 'মকরধ্বজ' [? কামদেবের ন্যায় জ্বালাময় তথা মুমূর্ষের পক্ষে সিদ্ধ মকরধ্বজ ?] এবং রসিকজনের পক্ষে 'বিশুদ্ধ' [কামগন্ধবর্জিত ?] রসসঞ্জীবক (রসের বাজিকরণ ?)।

খাইয়া 'আশ্বস্ত' (?) হইবেন। ছোট বয়সে বনভোজনে থালা কলাপাতা ফেলিয়া পদ্মপাতায় গরম ভাত আমরা খাইয়াছি ; রসনা-বিলাসী জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌, হবিষ্যান্নের মাসে বাজরার খিচুড়ী খাইয়াছেন, নবাব সুজাউদ্দোলা নিত্যনূতন মাটির খুড়ীতে মাষ কলাইয়ের দালে চুমুক দিয়া মনে করিতেন আব্-ই-হয়াত (অমৃত) খাইতেছেন ; 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'পদ্মিনী' পদ্মপাতায় লজ্জানিবারণ করিয়া পদ্মবসন পতি হরিহরের পাতে পদ্ম পাতায় ভিক্ষার চালের ভাত পরিবেশন করিতে করিতে চোখের জল পদ্ম পাতায় মুছিয়াছেন— এইগুলির কোনোটাই 'আশ্বস্ত' হওয়ার ব্যাপার নহে।

খ. দ্বিবেদীজীর ব্যাকরণে যাহা নাই চল্‌তি কথায় উহাই চলিয়া আসিতেছে। পানের দোকানে খরিদ্দার যখন 'এক পত্তি লাগাও' বলিয়া হাঁক দেয় তখন পানওয়ালা 'ধাতুপাত্র' তালাশ করে না, পানে চূণ খয়ের লাগায়।

গ. সংস্কৃত টীকাকার যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে লিখিয়াছেন, কেবল 'স ই বত্তি'-র অন্বয় শতপত্রী না করিয়া 'শতপত্রিকা' করিয়াছেন। টীকাকার কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ছিলেন না, মানস-সরোবর কিংবা হ্রদব্যতীত পর্বতাগ্রে পদ্মপাতা সুলভ নহে, এই কথা তিন জানিতেন। দ্বিবেদীজী আয়ুর্বেদের 'দ্রব্যগুণ' পড়িলে জানিতে পারিতেন পানজাতীয় 'শতপত্রী' নামক উদ্ভিদ আছে, যাহাকে বাংলাদেশে চই বলে।

ঘ. সইবত্তি যে কমলিনী নয় উহার প্রমাণ সন্দেশরাসকেই আছে। বনস্পতি নামানি পর্যায়ে কবি কুন্দ এবং রক্তোৎপলের মাঝখানে যে সয়বত্তিয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন উহাই শতদল পদ্ম (পৃ ১৫) ; সঞ্জীবনীলতা এবং শিরীষ গাছের মধ্যবর্তী সইবত্তিয়-কে 'শতপত্রিকা' করিলে দ্বিরুক্তি দোষ হয়। ইহাই চই লতা। বরজের পানের এক নাম নায়বেলি (হিন্দী নাগরবেলি, সংস্কৃত নাগবল্লী ; রাসক পৃ ১৬) ; অপর এক বিশিষ্ট পানের নাম ঋদ্ধুর (পৃ ১৪)।

কবি যাহা বলিয়াছেন উহা লক্ষ্মৌর পান রসিকের খাসিয়া পাহাড়ে (আসাম) বিপাকে পড়িয়া গাছপাণ চিবাইয়া 'আশ্বস্ত হওয়ার অনুরূপ ব্যাপার' সন্দেহ নাই। টীকাকার অপেক্ষা আচার্য দ্বিবেদী সংস্কৃতে অধিক ব্যুৎপন্ন, কিন্তু দ্বিবেদীজী শত-পত্রিকা-র অর্থ পদ্ম কি করিয়া বাহির করিলেন ? বিশ্বকোষ এবং মেদিনী অভিধান-কর্তা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন পদ্ম অর্থে উহা স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে না, ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ শতপত্রম্ হইবে। বৈদ্যক শাস্ত্রে শতপত্রিকা (= শতপত্রী) পাওয়া যায়। শতপত্রী বলিতে বাংলায় মৌরী এবং হিন্দী সৌঁফ্, বুঝায়। সুতরাং টীকাকার শতপত্রী অর্থে শতপত্রিকা ব্যবহার করিয়া অধিক শুদ্ধ সংস্কৃতই লিখিয়াছেন। ইহা মানিয়া লইলেই এই শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। কবি বলিতে চাহিয়াছেন, '…বিদগ্ধ জন দুর্গতিগ্রস্থ হইলে যেমন পান পাওয়া না গেলে শতপত্রিকা বা মৌরী আস্বাদন করিয়া (= চিবাইয়া) আশ্বস্থ হইয়া থাকেন।' পদ্মপাতায় ভোজন-রূপ কষ্টকল্পনা এবং ব্যাকরণ-বিরোধী শব্দার্থ সুতরাং এইক্ষেত্রে অবান্তর। বর্তমান লেখকের চই-পাতা চর্বণ গবেষণা মৌরী-চর্বণের বিকল্পমাত্র।

কবির নাম ও বংশ পরিচয়

প্রাকৃত ভাষায় কোন্ মুসলমানী নাম বিকৃত হইয়া অদ্দহমাণ হইল? সংস্কৃত টীকায় অদ্দহমাণ-কে আব্দুল রহমান করা হইয়াছে এবং দ্বিবেদীজী ব্যতীত অন্য কোনো হিন্দী সমালোচক ইহাতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। দ্বিবেদীজী বলেন 'আব্দুল রহমান' নামের মধ্যে 'রহমান' মুখ্যপদ; ইহার প্রথম দুইটা অক্ষর বাদ দেওয়া উচিত ছিল না; ইহা কবির শব্দগঠনে 'স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক'। আমাদের মনে হয় আদিনাম আদৌ 'অব্দুল রহমান' নয়, কবি দুটা অক্ষর বাদ দিয়া শব্দ গঠনে বাহাদুরী জাহির করেন নাই; কিন্তু এমন একটা শব্দ অদ্দহ ব্যবহার করিয়াছেন— যাহার দ্বারা প্রাকৃত এবং আরবী ভাষায় এই নাম ধ্বন্যাত্মক একার্থ বাচক হইয়াছে। ইসলামী নাম সম্ভবত Ahad-uz-zaman সংক্ষেপে আহদ্-জমান্ (Unique one of the age) ছিল। জমান-শব্দের জ (Z) হিন্দুস্থান 'দ' হইয়া গিয়াছে, যথা কাগজ=কাগদ [মারাঠী 'কাগদ পত্রাঞ্চে']। উত্তর প্রদেশের নিরক্ষর গ্রামবাসী আর্যসমাজ— কে আরিয় সমাধ বলে। সুতরাং অহদ+দমান=অহদ্দমান্ হওয়া উচিত ছিল। কবি অহদ্দমাণকে অদ্দহমাণ করিয়াই শব্দগঠনে চতুরতা দেখাইয়াছেন। দ্বিবেদী বলেন, যদি অদ্দহ স্থানে অদ্ধহ পাঠ লওয়া যায় তাহা হইলে ইহার অর্থ আহিতযশাঃ (দ্র. প্রস্তাবনা পৃ ৫) হয়। সুতরাং সন্দেশরাসক-কে আব্দুল রহমান-কৃত (title page, দ্বিতীয় সংস্করণ) না লিখিয়া অদ্দহমাণ-কৃত লেখাই অধিক সঙ্গত ছিল মনে হয়। কিন্তু আসল কথা, মুসলমান কবি স্বয়ং নিজের নামের উপর কি এই কারিগরী করিয়াছেন? মুসলমান রচিত কোনো হিন্দী কাব্যে ধর্ম তথা রীতিবিরুদ্ধ এইরূপ হিন্দীকরণের উদাহরণ নাই। সংস্কৃত ভাষা এবং প্রাকৃত অপভ্রংশ ইত্যাদি লোকভাষায় বিদেশীয় ব্যক্তির নামের ভারতীয়করণ[৮] হিন্দুলেখকগণ করিয়াছেন। এই স্থলেও কোনো অপভ্রংশ হিন্দু কবি যথাসম্ভব কম মিথ্যা কথা বলিয়া সন্দেশরাসক কাব্যকে কোনো অজ্ঞাত কারণে মুসলমান রচিত বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন— এইরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে মনে হয়।

অদ্দহমাণের পিতার নাম দেওয়া হইয়াছে মীরসেন। ইহার জাতিবাচক দুইটা পদের মধ্যে 'আরদ্দ দেশীত্বাৎ তন্তুবায়ঃ'— এই মত দ্বিবেদীজীখণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আরদ্দ শব্দ 'বিলকুল নয়া'। 'তন্তুবায়' অর্থে ইহার প্রয়োগ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। আমাদের সন্দেহ হয় এই 'আরদ্দ' শব্দের মধ্যেও একার্থ বাচক দুইটি ভিন্ন ভাষাগত শব্দের ধ্বনি রহিয়াছে। দ্বিবেদীজী এই শব্দের শুদ্ধরূপ আরদ্ধ (=গৃহাগত) অনুমান করিয়াছেন। আরবী শব্দ walad (পুত্র) হইতে অপভ্রংশ অরদ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে কি? সন্তানের জন্ম হইলে ভব্য মুসলমান বলেন, 'নব অতিথির (গৃহাগত) আগমন শুভ হউক'।

যাহা হউক, 'আরদ্দ' শব্দের দ্বারা অন্ততঃ ইহা প্রমাণ হয় না যে মীর সেন জাতে তাঁতি ছিলেন। মীরসেন কেমন নাম? 'সেন'এর উপর 'মীর' যেন ধুতিচাদর-পরা বাঙালি মুসলমানের মাথায় লাল লটকন্ ফেজ টুপী! কিন্তু তাঁতি-জোল্‌হার উপাধি 'সেন' ভারতবর্ষে কোনো দিন ছিল না এবং এখনো নাই। বাংলা দেশে উচ্চবর্ণের 'সেন' উপাধিধারী যাহারা কোনো কালে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল তাহারা এখনো

---

৮ যথা Jalaluddin=জল্লালদ্দীন অকব্বর' বাদশাহ-র উপাধি); (Malik) Sarwar='সুরহর' (কথানক, পৃ ৫)

উহা ছাড়ে নাই।[৯] বাংলার বাহিরে নাপিত মাঝে মাঝে 'সেন'ত্ব গৌরব দাবী করে। পঞ্জাবে 'সেন' (Sein) উপাধিধারীরা উচ্চবর্ণের 'ক্ষত্রী' পর্যায়ের হিন্দু। 'সেন' প্রাচীন কাল হইতে ক্ষত্রিয়, চারণ ইত্যাদির উপাধি ছিল। মীরসেনের মতো তন্তুবায়-সেন অলীক পদার্থ মনে হয়। 'মীর' এবং 'সেন' দুইটা ক্ষাত্র গৌরব-সূচক উপাধি লইয়া তাঁতির ছেলে এক লাফে 'মীরসেন' হইয়া গেল? দোষ কিন্তু আসলে কবির নহে, ভাষ্যকারের; টীকাকার তথা আধুনিক হিন্দী সমালোচকগণই 'কোলিয়'কে তন্তুবায় করিয়াছেন। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে 'কোলি'র প্রচলিত অর্থ বয়নজীবী; কিন্তু গুজরাটের দুর্ধর্ষ কোলি (Koli) জাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কোলি জাতি রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়।[১০] ধর্মান্তরিত কোনো কোলি সামন্তের উপাধি 'মীরসেন' হওয়া কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী সমালোচকগণ যে দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাব এলাকায় 'কোলি' রাজপুত বাস করিত না।

মীরসেনের দেশ কোথায়? কবি যেন ইচ্ছা করিয়া তাঁহার দেশ জাতি বংশপরিচয় সব কিছুই একটা অস্পষ্টতার ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই প্রথম প্রক্রমের তৃতীয় শ্লোকের চারি প্রকার ব্যাখ্যা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সংস্কৃত টীকায় আছে 'প্রতীচ্যাং পশ্চিমদিশি প্রভূত পূর্বপ্রসিদ্ধো ম্লেচ্ছনামা দেশোঽস্তি।...তত্র বিষয়ে...।' দ্বিবেদী টিপ্পনী করিয়াছেন—'মীরসেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেই পূর্বদেশে আসিয়াছিলেন, এবং এইখানে আব্দুল রহমান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (তহ বিষয়ে সম্ভবৌ) দ্বিবেদীজী পূর্বদেশ কোথায় পাইলেন? পূর্বপ্রসিদ্ধের সোজা অর্থ পূর্বাং প্রসিদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র নিজ সিদ্ধান্তের খাতিরে ইহাকে 'পূর্বেষু প্রসিদ্ধ' করিয়া পূর্বদেশ টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তবুও তত্র বিষয়ে বাক্যের সহিত উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'ম্লেচ্ছনামা দেশোঽস্তি' অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ-কে ডিঙাইয়া পূর্বপ্রসিদ্ধ বাক্যের অন্বয় নিছক জুলুম।

যদি তর্কের খাতিরে দ্বিবেদীজীর ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যায় তবুও প্রশ্ন উঠে কবির এই ম্লেচ্ছদেশ এবং পূর্বদেশ ভারতবর্ষের কোন ভাগ? পূর্ব পশ্চিম কোন স্থান হইতে নির্ণয় করিতে হইবে? শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী লিখিয়াছেন— 'যাহা হোক্, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে মিচ্ছ বা ম্লেচ্ছদেশ দ্বারা আধুনিক পশ্চিমী পাকিস্থান কিংবা উহার আশে পাশে কোনো প্রদেশেই অদ্দহমাণের অভিপ্রেত ছিল। সন্দেশ-রাসক বর্ণিত সমস্ত নগর [? কাম্বে সমেত ?] ঐ প্রদেশেই পড়ে। ইহা হইতে দেখা যায় যে কবি ঐ প্রদেশের নিকটবর্তী কোনো স্থানের অধিবাসী হইবেন। কালক্রমে 'ম্লেচ্ছ' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত আর্যেতর জাতি-সমূহের ভারতবর্ষে আগমনও ঐ দিক হইতে হইয়াছিল। অতএব এই উক্তির পূর্ণ সম্ভাবনা প্রকট করা যাইতে পারে যে ঐ ভূখণ্ডকে 'ম্লেচ্ছদেশ' বলিবার পরম্পরা কোনো কালে ছিল।'[১১]

---

৯ আনন্দবাজার পত্রিকায় (২রা আগষ্ট ১৯৬২) আমি স্বয়ং পড়িয়াছি 'জিলা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানা নিবাসী শ্রীআকবর আলী সেন তাহার স্ত্রী মোনাজান বিবিকে খুন করিয়াছে'।

১০ ছত্রিশ-কুল রাজপুত জাতির একটি কুলের কুলী নাম চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জ্যোতিরীশ্বর ঠক্কর-বিরচিত বর্ণ-রত্নাকর গ্রন্থ (পৃ ৩১) দ্রষ্টব্য।

১১ দ্রঃ ভূমিকা, পৃ ২৯। পাদটীকায় যোগ করা হইয়াছে মুলতান, খম্বাত বিজয়নগর (মুনিজির মতানুসারে বিজয়নগর বর্তমান জৈয়সলমীর রাজ্যে)!

শ্রীযুত ত্রিপাঠী-র ভূগোল ও ইতিহাস তাঁহার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতে পারে; কিন্তু পাকিস্থানী-ভূগোলেও খম্বাত বা গুজরাট প্রদেশের কাম্বে বন্দর পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত বলিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার 'অনুমান' ইতিহাস তথা বাস্তব দৃষ্টি বর্জিত বলিয়া সন্দেহ হয়। যথা

১। 'পশ্চিম পাকিস্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলিবার কোনো' পরম্পরা 'হয়তো কোনো কালে ছিল'। উহা কোন্ কাল?

রাজা যুধিষ্ঠির হইতে আকবর বাদশাহ-র রাজত্ব পর্যন্ত কোনো ইতিহাস কিংবা জনশ্রুতি ম্লেচ্ছদেশকে সিন্ধুনদীর পূর্বতীরে টানিয়া আনে নাই। মহাভারতের 'কর্ণপর্বে' ঐ অঞ্চলকে 'পিশাচের' দেশ [পৈচাশী প্রাকৃত ভাষী] বলা হইয়াছে; মদ্রদেশ উক্ত অঞ্চলের একাংশ। আকবরের রাজপুত সামন্তগণ আটক নদীর (সিন্ধু) অপর পারে যাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা উহাকেই ম্লেচ্ছদেশ মনে করিতেন। সন্দেশরাসকের কবি এই অঞ্চলকেই কেমন করিয়া ম্লেচ্ছ মনে করিতে পারেন? দ্বাদশ শতাব্দীতে কাবুল-গজনীও 'ম্লেচ্ছ দেশ' হয় নাই; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লী-মথুরা, বিহার-বাংলার মতো আফগানীস্থান ম্লেচ্ছ বা মুসলমানের বিজিত রাজ্য মাত্র ছিল।

২। ত্রিপাঠীজী মুলতানকে ম্লেচ্ছদেশে অবস্থিত এবং কবিকে উহার নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহার ভিত্তি কি হইতে পারে?

এই অনুমান কবির মুলতান-বর্ণনা বিরোধী। কবি-বর্ণিত মুলতান যদি ম্লেচ্ছদেশে হওয়া সম্ভব হয়, কাশী-নবদ্বীপকেও ম্লেচ্ছদেশে অনুমান করিতে হয়।

আসল কথা, কবি যাহা কোনো কারণে অস্পষ্ট রাখিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছেন উহা সঠিক অনুমান করা অসম্ভব। কবি আগাগোড়া পাঠকের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন। এই জন্যই মীরসেন ও ম্লেচ্ছদেশ বিতণ্ডার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। কোনো কবি আপন মুখে নিজেকে 'কুল-কমল' বলিতে পারেন? না কি স্বমুখে নিজের গুণগান করেন? (শ্লোক ৪)। এই কাব্য আদৌ মুসলমান-রচিত কিনা বুঝিতে হইলে প্রথমে কাব্যের সম্ভাব্য রচনাকাল ধার্য করিতে হইবে।

মীরসেন সম্বন্ধে আরো একটি সন্দেহের কারণ, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি 'ম্লেচ্ছদেশ' ত্যাগ করিবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কাব্যের কোথায়ও স্থানত্যাগ-সূচক একটি শব্দও নাই। ইহা হিন্দী সমালোচকগণের অনুমান মাত্র, অথচ মধ্যযুগের ইতিহাস এই অনুমানের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীযুত অমরচাঁদ নাহটা ব্যতীত গত বিশ বৎসর যাবত সমস্ত হিন্দী সমালোচকগণ সন্দেশরাসকের রচনাকাল সিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয়ের পূর্বে কিংবা কিছুকাল পরে (অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশক কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে) অনুমান করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ গজনভীর বংশধরগণ পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা হিন্দু নির্যাতন করেন নাই; মামুদের সেনাপতি বিজয় রায়[১২] এবং সিবান্দ রায়ের হিন্দুসেনা হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী পার হইয়া মধ্যএসিয়ার তুর্কীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের দরবারে নাপিত জয়সেনের পুত্র তিলক···হিন্দুস্থানের বিদ্রোহী তুর্কী শাসনকর্তা আহমদ নিয়ালতিগীন-কে দমন করিয়াছিল। নাপিত তিলক হিন্দু হইয়াও এত নাম করিল, অথচ তন্তুবায় মীরসেনের ধর্ম গেল, ভিটামাটিও গেল? মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় উচ্চবর্ণের

১২ Elliot and Dowson, Aligarh edition, Vol. II, p. 60.

হিন্দু ও আর্য সংস্কৃতি পাঞ্জাব হইতে পলায়নপর হইয়াছিল। মুসলমান বিজেতাগণ ব্রাহ্মণ ও রাজপুতকে জোর করিয়া কিংবা প্রলোভন দেখাইয়া মুসলমান করিয়াছে, তাঁতি মুদী কিংবা চাষাকে নহে। জোল্‌হার মুলতানে যে মাকু মীরাঠেও সেই মাকু; সুতরাং মুসলমান হইয়া মীরসেন কেন পূর্বদেশে আসিবেন? দিল্লীর পূর্ব এবং বাংলার পশ্চিম—এই স্থান পূরব, ইহার অধিবাসীগণ East India Companyর যুগ পর্যন্ত নামজাদা পূরবিয়া সিপাহী। এই অঞ্চলের ভাষা শৌরসেনী, আউধী, ভোজপুরী ও মৈথিলী হিন্দী। 'পূরবে'ই যদি মীরসেনের পুত্র অদ্দহমাণ-র জন্ম হইত তবে তিনি গুজরাটী প্রাকৃত ভাষায় 'কাব্য তথা গীত বিষয়ে' সুপ্রসিদ্ধ হইবেন, সংস্কৃত প্রাকৃত ও পৈশাচী ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করিবেন, অথচ তাঁহার ভাষায় কোনো পূরবিয়া প্রভাব থাকিবে না, গুজরাট রাজপুতানা ব্যতীত অন্যত্র সন্দেশরাসকম্‌ কাব্যের প্রতিলিপি অপ্রচলিত থাকিয়া যাইবে—এহেন ব্যাপার 'অনুমান' তথা 'সম্ভাবনা'র অতীত।

সন্দেশরাসক কাব্যের আনুমানিক রচনা কাল

সন্দেশরাসকের রচনাকাল তথা স্থাননির্ণয় করিবার কোনো নির্ভরযোগ্য বহিঃপ্রমাণ কিংবা অন্তঃপ্রমাণ এখনো কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দ্বিবেদীজী মনে করেন যদি ত্রিভুবন ও সেস (স্বয়ম্ভূ) কবির প্রতি অদ্দহমাণ ইঙ্গিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে একাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধ কবি আব্দুল রহমনের (? অদ্দহমান) সময় হওয়া উচিত, যেহেতু স্বয়ম্ভূ কবির আনুমানিক কাল দশম শতাব্দীর শেষার্ধ। দ্বিবেদীজী অন্যত্র রাসক কাব্যকে দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১৩]

সন্দেশরাসকের উদ্ধারকর্তা তথা উহার প্রথম সংস্করণের সম্পাদক জিনবিজয় অদ্দহমাণ কবির সময় শিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণের কিছু পূর্বে (অর্থাৎ ১১৮০-৯০ ইং) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন সুবিদ্বান্‌ সমালোচক শ্রীযুত অমরচাঁদ নাহটা। তিনি লক্ষ্মীচন্দ্রের সংস্কৃত টীকার (রচনাকাল ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম শ্লোক কয়েকটি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সন্দেশরাসকের রচনাকাল খুব বেশি বিক্রম সম্বত পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) হইতে পারে। শ্রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন লক্ষ্মীচন্দ্রের উক্তি হইতে এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে 'অদ্দহমাণ' টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্রের সমসাময়িক, কিংবা উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব কম ছিল। 'যদিও সন্দেশরাসকের রচনাকাল নির্ধারিত করিবার মতো' সবল প্রমাণ সমূহের অভাব, তত্রাপি মুনিজির 'তর্ক' (=যুক্তি) গুলি মানিয়া না লইবার কারণ দেখা যায় না। অতএব সন্দেশরাসকের রচনাকাল দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি স্বীকার করিবার বিপক্ষে কোনো আপত্তি উপস্থিত করা যায় না।[১৪]

সন্দেশরাসকের পাটন প্রতিলিপিতে কোনো টীকাটিপ্পনী নাই, মূল পাঠ নকল করা হইয়াছে। টীকা-টিপ্পনী নাই কেন? অবোধগম্য কোনো পুঁথি কেহ মাছিমারা কেরানীর মতো নকল করে না। ইহার লিপিকার মুনি মানসাগর,··সম্ভবত দেবসাগর ভট্টারকের শিষ্য বা প্রশিষ্য। ইহাতে কোনো তারিখ নাই। না থাকিবার কারণ কি? ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ সময়ে গুজরাটের লোক অক্লেশে রাসকের ভাষা

১৩ দ্রঃ প্রস্তাবনা পৃ ৯; ভূমিকা পৃ ২৩; পাদটীকা ২

১৪ ভূমিকা ২৩-২৪

বুঝিতেন এবং কাব্যখানা তখন ঐ অঞ্চলে মানসাগরের সমসাময়িক কোনো কবির রচনা। এই জন্যই লিপিকার ঘটা করিয়া সন-তারিখ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নাই। মুনি জিনবিজয় হস্তাক্ষর বিচার করিয়া অনুমান করিয়াছেন ইহার লিপিকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হওয়া উচিত। কিন্তু লিপি-বিজ্ঞান অভ্রান্ত নহে।

লোহাবত প্রতিলিপিতে লিপিকারের নাম নাই; কিন্তু ইহার সংস্কৃত টীকাকার লক্ষ্মীচন্দ্র নিজের পিতা মাতা ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বি. ১৪৬৫ হিসার দুর্গে শুক্লাষ্টমী তিথিতে (১৪০৯ খ্রীঃ) লিখন কার্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ক্ষত্রিয় গাহড় যে রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় গুজরাটে সে কাব্যের টীকার প্রয়োজন ছিল না। পূর্বপাঞ্জাবে একজন জৈন সাধু অন্যের সাহায্য ব্যতীত খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহার অর্থোদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুতরাং পাটন প্রতিলিপি নিশ্চয়ই লক্ষ্মীচন্দ্রের পূর্বকালীন।

পুণা প্রতিলিপিতে কোনো সন-তারিখ নাই। লিপিকার নয়সমুদ্র এক সংস্কৃত টীকা নকল করিয়াছেন— নাম অবচুরিকা। পুণায় এই পুথি কোথা হইতে গেল? ইহা সম্ভবতঃ গুজরাটের বাহিরে রাজপুতনা পাঞ্জাব কিংবা পূর্বদেশে কোথাও লেখা হইয়াছিল। মুনি জিনবিজয় প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

পুণা প্রতিলিপির অবচূরিকা লক্ষ্মীচন্দ্র-কৃত টিপ্পনক-রূপ ব্যাখ্যাকে আধার করিয়া দ্বিতীয় অন্য কোনো পাঠক উহাতে কিছু 'হের-ফের' করিয়াই অবচুরিকা লিখিয়াছেন মনে হয়। দ্বিবেদীজী দ্বিতীয় সংস্করণে মন্তব্য করিয়াছেন উভয় টিপ্পনী মিলাইয়া দেখিলে ধারণা করা যায় মুনিজির উক্তিই ঠিক।[১৫] দ্বিবেদীজীর সহকর্মী শ্রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী-র কিন্তু ভিন্ন মত। তিনি বলেন, যদিও লক্ষ্মীচন্দ্রের টীকার পূর্বে লিখিত কোনো টীকা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই তবুও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ইহা বলা কঠিন যে লক্ষ্মীচন্দ্রই রাসকের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা। ত্রিপাঠীর যুক্তি মামুলী পণ্ডিতী কথা—কোনো বস্তুর অপ্রাপ্তি উক্ত বস্তুর অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। 'জ্ঞাত হওয়া যায় যে পুণা-প্রতিলিপির অবচুরিকা বীকানীরে প্রাপ্ত খণ্ডিত প্রতিলিপির 'বার্তিক' এবং এই প্রতিলিপির [জয়পুর প্রতিলিপি, ১৫৫২ খ্রীঃ, ইসলাম শাহ-র রাজত্বকালে লিখিত] সংস্কৃত টীকা (অবচূরী) একই ব্যক্তি অর্থাৎ লব্ধিসুন্দর-কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।'[১৬]

ত্রিপাঠীজী কি বলিতে চাহেন লব্ধিসুন্দর-কৃত 'বার্তিক' লক্ষ্মীচন্দ্রের টীকা অপেক্ষা প্রাচীন? তিনি এই লব্ধিসুন্দর কোন্ শতাব্দীর লোক নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলেন না কেন? তাঁহার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন কাজ ছিল না। অর্ধকথানক কাব্যের সম্পাদক নাথুরাম প্রেমী জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আগ্রার শ্বেতাম্বর জৈন মন্দিরে প্রাপ্ত এক 'প্রতিমা লেখ' উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা বি. ১৬৬৮ অর্থাৎ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীলব্ধিবর্ধন— শিষ্যেন' লিখিত হইয়াছিল।[১৭]

এই লব্ধিবর্ধনই সম্ভবতঃ বীকানীর প্রতিলিপির লিপিকার লব্ধিসুন্দর— যিনি (১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দুই শত বৎসর পূর্বে লিখিত) লক্ষ্মীচন্দ্রের টীকাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের নামে চালাইয়া বিদ্যাচুরির চাতুর্য

১৫ দ্রঃ ভূমিকা পৃ ১

১৬ দ্রঃ প্রস্তাবনা পৃ ২৬, ২৮

১৭ অর্ধকনাথক দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৩

প্রকট করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সে যুগে বিরল ছিল না; বর্তমানকালে সব কিছুর মতো এই বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছে।

যাহা হউক, মুনিজির মত শ্রদ্ধার সহিত বিচার না করিলে রচনাকাল সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত হিন্দী সাহিত্য সমালোচকগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই জন্যই শ্রীযুত নাহটা-র মত বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে। মুনিজি যে সমস্ত যুক্তি তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রথম সংস্করণে দিয়াছেন উহার মধ্য হইতে কেবল ঐতিহাসিক যুক্তিগুলি আমরা প্রথমে আলোচনা করিব। ত্রিপাঠীজী লিখিয়াছেন—

১। 'সন্দেশরাসক রচনার সময় পর্যন্ত মুলতানের উপর মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ হয় নাই; কেননা মুহম্মদ ঘোরী কর্তৃক একবার ধ্বংস হওয়ার পর মুলতান পুনরায় পূর্বপ্রসিদ্ধি [হিন্দুতীর্থ রূপে] ফিরিয়া পায় নাই।

২। ইতিহাস এই কথা বলে যে চালুক্যবংশীয় শাসক সিদ্ধরাজ এবং কুমারপালের রাজত্বকালে খম্ভাত (Cambay) অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। কুমারপালের মৃত্যুর পর খম্ভাত নগরের শ্রী বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের আধারের উপর মুনি জিনবিজয় এই 'নিষ্কর্ষ' বাহির করিয়াছেন যে সন্দেশ-রাসক মুহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের (১১৯২ খ্রীঃ) পূর্বে অথবা কুমার পালের মৃত্যুর পূর্বে কোন সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে।

ঐতিহাসিক টিপ্পনী : লেখক-কৃত

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে উহা ইতিহাস নয়, সনাতনপন্থী মুনিজন তথা হিন্দী সাহিত্যিকমণ্ডলীর 'হা হুতাশ'।

৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক মুলতান অধিকারের পর মুলতান হিন্দুর হাতে আর ফিরিয়া আসে নাই, উহার আর্যসংস্কৃতিও পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। উম্মীয় বংশের পতনের প্রাক্কালে মুলতান স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হইয়াছিল। মহম্মদ বিন্ কাসিম মুলতানে হিন্দু ধর্মের চিহ্ন যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন মুলতানের করামথী ধর্মান্ধগণ উহা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল। মুলতানের প্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির ইহারাই ধ্বংস করিয়া মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল। সুলতান মাহমুদ গজনভী ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে করামথী শাসক আবুল ফতাহ্-কে পরাজিত করিয়া মুলতান অধিকার করেন; কিন্তু করামথীরা উহা আবার দখল করে। পাঁচ বৎসর পরে (১০১১ খ্রীঃ) মাহমুদ দ্বিতীয়বার করামথীগণকে বিতাড়িত করেন। মাহমুদের মৃত্যুর পর হইতে শিহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রথম মুলতান অভিযান পর্যন্ত (১১৭৫ খ্রীঃ) মুলতানে অখণ্ড করামথী-রাজত্ব চলিয়াছিল। সুতরাং মুনিজির অলীক ইতিহাস সন্দেশরাসকের রচনাকাল কেমন করিয়া নির্ণয় করিতে পারিবে? হিন্দী সমালোচকগণ যে কোনো ইতিহাস পড়িলেই মুলতানের এই ইতিবৃত্ত জানিতে পারিবেন।

খম্বাত (Port of Cambay) ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিম-ভারতের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে খিল্‌জী এবং তোগলক সাম্রাজ্যে গণ্য হইত। বাণিজ্যের পরিমাণে খম্বাত বন্দর মুসলমান বিজয়ের পর চতুর্গুণ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। কুমারপাল চালুক্যের মৃত্যুর পর হিন্দুপ্রাধান্য নির্বাপের মুখে চলিয়াছিল বটে কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী বিদেশীয় বিজাতীয় বণিককে আশ্রয় করিয়া খম্বাত-কে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

খম্বাত এবং মূলতান শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সন্দেশরাসক কাব্যের রচনাকালকে মুনিজি কেন জুড়িয়া দিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে মুনিজি তথা প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্য সমালোচকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, যে মনস্তত্ত্ব বাংলার কাব্যরসিকগণের মনস্তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্রপ্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

অন্তঃপ্রমাণে বিচার বিভ্রাট্

সন্দেশরাসকে কবি খম্বাতের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কবি নায়কস্থানীয় মূলতানী 'পথিকে'র মুখে 'সামোর' (= শাম্বপুর = মূলতান) নগরের যে বর্ণনা আরোপ করিয়াছেন, কল্পনাপুরী 'বিজয়নগরে'র বিরহিণী বণিকপত্নীর মুখে বিলাপের মাধ্যমে ঐ নগরের জীবনযাত্রা তথা ঐ দেশের ঋতুপ্রকৃতির সহিত পাঠককে পরিচিত করিয়াছেন— উহাতে কাল তথা স্থানের অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক। মুনিজিও এই সূত্র ধরিয়া বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। মূলতান-বর্ণনা পড়িলে মনে হয় কবি যেন পাঠককে সুদূর অতীতের কাশী-কাঞ্চী-অবন্তী পরিক্রমা করাইতেছেন; মূলতান যেন কালিদাসের উজ্জয়িনী কিংবা রাজা ভোজের ধারা নগরী—যেখানে অপণ্ডিত নাই, গ্রামীণ নাই! মূলতানের 'বেসবাড়া'য় ঊর্ধ্বনেত্র পথচারীকে কবি সাবধান করিয়াছেন; ঐখানে রাস্তায় প্রবহমান পানের পিকে পদস্খলনের ভয় আছে। 'ভদ্রং পশ্যামি, ভদ্রং শৃণ্যেমি' বাক্য স্মরণ করিয়া মুনিজি ঐ দিকটা যেন এড়াইয়া চলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সন্দেহ করিবার কোনো হেতু ছিল না যে, এহেন মূলতান মুসলমান আক্রমণের পরে থাকিতে পারে। এইরূপ শুচি বায়ু ও সনাতনী বাতিক থাকিলে কিন্তু মধ্যযুগের চর্চা হয় না। মুনিজি ঐ স্থানের সুন্দরী নর্তকীগণের চর্মপাদুকার মচ্‌মচ্ (=চমক্কউ= উপানহ চমচমচ্ছশব্দঃ) শব্দ শুনেন নাই; দ্বিবেদীজী উহা কষ্টকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।[১৮]

দ্বিতীয়বারেও যদি জুতার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ (চিক্কণরউ=উপানহাং চিক্কণ শব্দ)[১৯] বাহির হয়, উহা উপেক্ষা করা যায় না। টীকাকার এই ক্ষেত্রে দ্বিবেদীজী অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য, যেহেতু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে মুসলমানী ভব্যতার অনুকরণে ভারতীয় বারনারী চর্মপাদুকা ব্যবহার করিত। মুসলমান ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোক যাহাতে পীরের দরগায় যাইবার অজুহাতে বিপথগামিনী না হয় এইজন্য ফিরোজ শাহ তোগলক হুকুম দিয়াছিলেন মুচীরা স্ত্রীলোকের জুতা তৈয়ারী করিতে পারিবে না। হিন্দু যুগের স্থাপত্যে কিংবা সাহিত্যে স্ত্রীলোকের পায়ে জুতার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং সন্দেশরাসক মুসলমান যুগেই রচিত হইয়াছিল অনুমান করিতে হয়।

সাহিত্য-সমালোচকগণ কবিকে নিজের কথার ফাঁদে ফেলিয়া স্থান কাল জাতি ও স্বভাব সহ কবিকে ধরিবার চেষ্টা করেন। সকল ক্ষেত্রে ইহা সফল হয় না। কারণ ঝানু কবি বহুরূপী মায়াবী, সীতার স্বর্ণমৃগ, কবির কল্পনা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একই চিত্রে সমাবেশ করিতে সক্ষম। কাব্যসরোবর হইতে কবিকে টানিয়া তোলার চেষ্টা লেজ ধরিয়া মাছকে ডাঙ্গায় তুলিবার মতো ব্যাপার। কিন্তু হিন্দী সমালোচকেরা দমিবার পাত্র নহেন। বাঙালি কাব্যকে কবিতা মনে করে, কাব্যবিচারে বাঙালি রসকে প্রধান এবং তত্ত্বকে গৌণ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলার বাহিরে হিন্দীভাষীগণ কাব্যের খোলস অর্থাৎ ঘটনার সত্যাসত্য

---

১৮ মূল শ্লোক ৫০, প্রস্তাবনা পৃ ২১

১৯ শ্লোক ৫৩; অবচূরী, পরিশিষ্ট ১ পৃ ৬০

বিচার, ঐতিহাসিক পটভূমি ছন্দালঙ্কার ইত্যাদির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। রসবেত্তা হিসাবে আচার্য রামচন্দ্র শুক্লা এবং আচার্য দ্বিবেদীজী ইহার ব্যতিক্রম। মুনিজি 'পথিকে'র মধ্যেই কবিকে দেখিয়াছেন; কবি কিন্তু লুকাইয়া আছেন তাঁহার কল্পনানগরী 'বিজয়পুরে', নায়িকার অন্তরালে। কবির 'মুলতান' নিতান্ত অনৈতিহাসিক। কবিকৃত 'বনস্পতি নামানি' পর্যায়ে ১১০টা বৃক্ষলতাগুল্মের নাম আছে। উহার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা কস্মিন্ কালে মুলতানে জন্মাইতে পারে না। যথা লবঙ্গ এলাইচী নারিকেল সুপারি ভূর্জপত্র ইত্যাদি।[২০] মুলতানের কবি-বর্ণিত 'বেসবাড়া' প্রাচীন ভারতের পাটলীপুত্র কিংবা অবন্তীর ভব্য সংস্কৃতি, সুরুচি, সংগীতনৃত্যকলার কেন্দ্র বার-পল্লী নহে, শ্যামা-বসন্তসেনার ন্যায় 'গুণানুরক্তা গণিকা'-অধ্যুষিত বিদগ্ধ নাগরজনের প্রার্থিত স্থান নহে। মুলতানের 'বেস-বাড়া' মুসলমান যুগের ছোট বড় শহরের একটি বৈশিষ্ট্য; ফতেপুরসিক্রীর আকবরশাহী শয়তানপুরা। কবি অদ্দহমাণ (?) 'বেস-বাড়া'র যাহা বর্ণনা দিয়াছেন পুরাতন লাহোর শহরের চকে মুসাফির পঁচিশ বৎসর পূর্বে উহা চাক্ষুষ দেখিয়া হয়রান হইতেন।

সন্দেশরাসক কাব্য পড়িয়া একটিমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা যায় যে, ঐ সময়ে পাঞ্জাব রাজস্থান গুজরাট-কচ্ছপ্রদেশ এক সার্বভৌম পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। আলাউদ্দীন খিলজী সর্বপ্রথম গুজরাট জয় করিয়াছিলেন, লাহোর-মুলতান হইতে মোঙ্গল আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বের (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম-ভারত ও পাঞ্জাবে যে শান্তি সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হইয়াছিল উহা ফিরোজ শাহ তোগলকের রাজত্ব পর্যন্ত (১৩৫১-১৩৮৯ খ্রীঃ) অব্যাহত ছিল। শ্রীযুত অগরচাঁদ নাহটা বলিয়াছেন বি. পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সন্দেশরাসকের রচনাকাল অনুমান করা যায়। আমাদের মতে এই অনুমান ইতিহাসসম্মত। ফিরোজ তোগলকের শান্তিপূর্ণ রাজত্বে খুব সম্ভবতঃ সন্দেশরাসক রচিত হইয়াছিল।

সন্দেশরাসক তথা জৈন বিদ্বৎসমাজ

এই কাব্যের যে সমস্ত প্রতিলিপি আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে সমস্তই গুজরাট রাজপুতানা ও পূর্ব-পাঞ্জাবে। লিপিকারগণ সকলেই জৈন পণ্ডিত; তাঁহারা 'স্বপঠনায়' কিংবা অধ্যাপনার জন্য উহা নকল করিয়াছেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী সরস্বতীপট্টনে বি. সম্বত ১৬০৮ বৈশাখ শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশ্রী সংযমরাজ সূরি ছাত্রদিগকে পড়াইবার জন্য শ্রীমাণিক্যরাজ মিশ্রের দ্বারা ইহার পুথি নকল করাইয়াছিলেন। সংযমরাজ ছন্দবিষয়ক অসংখ্য পুস্তক বাদ দিয়া জৈন বিদ্যার্থীদিগকে সন্দেশ-রাসক পড়াইতেন কেন? এই কাব্যে মুনি যতি ব্রহ্মচারীর এইরূপ অনুচিত মনযোগের কারণ কি হইতে পারে? কবি সাধুসন্ত ধর্মাচার্যের জন্য রাসক লিখেন নাই। তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাব্য 'অনুরাগীজনের রতিগৃহ' মদনের মাহাত্ম্য প্রচারক, বিরহিণীর পক্ষে 'মকরধ্বজ', রসিকজনের (রসোদ্দীক) সঞ্জীবনী সুধা। এই কাব্যের 'অর্থ এবং লক্ষণসমূহ সুরতিসঙ্গমে যিনি বিদগ্ধ, এহেন 'বিচক্ষণ' ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।' (শ্লোক ২১)

---

২০ হিন্দী অনুবাদক এই অংশের অনুবাদে অনেক গাছপালা ঠিক সনাক্ত করিতে পারেন নাই। ফলে কয়েক স্থানে দ্বিরুক্তি দোষ হইয়াছে (মূল পৃ ২৫-২৭)

সরস্বতীপত্তনে লিখিত প্রতিলিপির সম্ভবতঃ এক প্রতিলিপি বি. সম্বত ১৭২০ (= ১৬৬৪ খ্রীঃ) বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে হর্ষকীর্তি জয়পুরের উপকণ্ঠে সাংগানের নামক স্থানে নকল করিয়াছিলেন। লিখন-কার্য শেষ করিয়া মনের বিষাদে তিনি বলিয়াছেন,

'কুচাবলোক্য তন্বঙ্গ্যাঃ শিরঃ কম্পয়তে যুবা।
তয়োরন্তর্নিমগ্নং হি দৃষ্টিমুৎপাটয়ন্নিব……'

হর্ষকীর্তি জৈনাচার্যগণের হাঁড়ি হাটে ভাঙিয়াছেন। খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে গুজরাট তথা রাজপুতানায় হিন্দুস্বাধীনতা লুপ্ত হইবার পূর্ব হইতে জৈনসমাজে যে ধার্মিক এবং নৈতিক অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল, সন্দেশরাসকে উহারই ছায়া পড়িয়াছে। এই জন্য সম্রাট্ শাহজানের রাজত্বে জৈনধর্ম সংস্কারের আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। কবি ও ধর্মসংস্কারক বানারসীদাস এই সময়ে 'বানারসীয় মত' ও সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া জৈনসমাজে 'মিথ্যাচারের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

রাসক-কাব্যের ধারা হিন্দী সাহিত্যে পশ্চিম-ভারত হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত (খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী) রাসক পর্যায়ে শৃঙ্গার-প্রধান প্রেক্ষ্য (নৃত্য-অভিনয় যুক্ত) রাসের পরিপূরক হিসাবে গেয় রাসের স্থান ছিল। সন্দেশরাসক প্রেক্ষ্য নৃত্য কিংবা গেয় রাস নহে ; ইহা শৃঙ্গাররস-সর্বস্ব পাঠ্য রাস। দ্বাদশ শতাব্দীর পরেই সন্দেশরাসক, উপদেশরসায়ন-রাস, কর্মবিপাক-রাস শ্রেণীর পাঠ্য রাস রচিত হইয়াছিল। সুতরাং মুনিজি প্রমুখ হিন্দী সাহিত্যিকগণ দ্বাদশ শতাব্দীকে কেমন করিয়া সন্দেশরাসকের রচনাকাল প্রমাণ করিতে চাহেন ?

শ্রীযুত বিশ্বনাথ ত্রিপাঠী বলিতে চাহেন সন্দেশরাসক পাঞ্জাবের হীর-রাঞ্জা (কিংবা রাজপুতনার ঢোলা-মারু ?) ন্যায় 'প্রচলিত প্রেম গাথার আধারের উপর রচিত'। সন্দেশরাসকে প্রেমগাথা কোথায় যে উহা প্রচলিত থাকিবে ? কথার মধ্যে শুধু আমরা পাই, এক বিরহিণী কোনো পথিককে দুঃখ নিবেদন করিয়া বাড়ির দিকে ফিরিতেই প্রবাসীপতির সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। এই কয়টা কথা লইয়া মুক্তক-কাব্যের অনুপম শ্লোকরূপ মুক্তদানাগুলি সূক্ষ্ম কথাসূত্রে গাঁথিয়া কাব্যলক্ষ্মীর গলার বহুমূল্য হার হইতে পারে বটে ; কিন্তু ঐ কয়টি কথায় প্রেমগাথা হয় না। শ্রীযুত ত্রিপাঠী অন্যত্র সন্দেশরাসক-কে মুক্তক-কাব্য প্রমাণ করিয়াছেন আমাদের মনে হয় ইহাই এই কাব্যের যথার্থ পরিচয়। কবি এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। রাসক মুক্তক হইলেও কবি উহাকে কলাকৌশলে গাথার রূপ দিয়াছেন। ত্রিপাঠীজির এই সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য।

জৈনাচার্যগণ নারীর রূপ ধ্যান করিবার জন্যই সন্দেশরাসক পড়িতেন এবং পড়াইতেন—ইহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। এই কাব্যের শৃঙ্গাররসধারার মধ্যে সুফীতত্ত্ববাদ নাই ; কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় জৈনদর্শনের কোনো তত্ত্ব রূপকের মাধ্যমে কবি প্রচার করিয়াছেন। দুঃখ 'নিত্য' কি 'অনিত্য' ?—ইহাই স্যাদ্ বাদ্ (Theory of probability ?) দ্বারা কবি যেন পাঠককে বিচারে আহ্বান করিয়াছেন। কবির সিদ্ধান্ত 'দুঃখ' নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে ; না হয় রাস্তার মোড় ঘুরিতেই বিরহিণীর বিরহদুঃখ গেল কোথায় ?

তাঁতির ছেলে একপুরুষে প্রাকৃতভাষায় দ্বিতীয় 'গুণাঢ্য' হইতে পারে না ; যদি হইতেন তাহা হইলে অদ্দহমাণের রাসক ব্যতীত অন্য 'কাব্যগীতবিষয়েষু' সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার মতো অন্য রচনাগুলি লুপ্ত

হইবার কথা নহে। রাসকের রচয়িতা অসাধারণ মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি, শব্দকুশলী কাব্যশিল্পী, ছন্দশাস্ত্রপারঙ্গম, বহুশ্রুত এবং বহুদর্শী ব্যক্তি। এই কবির রসবোধ অতি উচ্চস্তরের। জগতে ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত সব কিছুর মধ্যে তিনি রস পাইয়াছেন, রূপ দেখিয়াছেন। 'কুন্দ-ধবলে' কবিত্ব থাকিলে 'লাউ ফুলের মতো' সাদা উক্তিতেও কবিত্ব আছে; কোকিল-ময়ূরের ডাকে কবির প্রাণে যে সাড়া জাগায়, অপণ্ডিতা প্রোষিতভর্তৃকা গৃহস্থবধূর কানে ঘরের চালায় কাকের ডাক উহা অপেক্ষাও অধিক মধুর ও করুণ। কোকিল আগুন জ্বালায়, কাক প্রবাসীপতির শুভাশুভ সংবাদ দিয়া অস্থিরাকে আশ্বস্ত করে।[২১] 'কুকবি'র পক্ষে ওকালতী করিয়া কবি পাঠককে এই রসে কুতূহলী করিয়াছেন। কবি শব্দের ধ্বনিচাতুর্যের দ্বারা দ্বিবেদীজীর ন্যায় রসবেত্তাকে সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়াছেন, চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান বর্ণনাচ্ছলে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের অবন্তী-পাটলীপুত্রের ছবি চোখের সামনে ধরিয়া মুনিজির মতিভ্রম ঘটাইছেন। রাসক কাব্য যিনি লিখিয়াছেন, মীরসেন-অদ্দমহাণ তথা ম্লেচ্ছদেশ তিনিই উদ্ভাবন করিয়া নিজে গা ঢাকা দিয়াছেন। কবি খেয়ালী মানুষ; বেনামীতে রাসক লিখিয়া অতিপণ্ডিতকে অপদস্থ করিবার আনন্দটুকু তিনি চাহিয়াছেন। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে এহেন কবি নামের লোভ সামলাইতে পারিতেন না। ভবিষ্যৎ গবেষণায় হয়তো তাঁহার কীর্তি ধরা পড়িবে।

পাটন-প্রতিলিপির অনুরূপ টীকাবর্জিত আর একখানা অক্ষত প্রতিলিপি পাওয়া গেলে আমাদের এই সন্দেহ সত্যও হইতে পারে। মুনিজি বলিয়াছেন প্রাচীন গুজরাতি ভাষায় একাধিক কবির নাম নয়সমুদ্র পাওয়া যায়। ঐ রকম কোনো নয়সমুদ্র কিংবা পাটন-প্রতিলিপির লিপিকার মুনি মানসাগরের গুরুপরম্পরার মধ্যে কেহ সম্ভবতঃ ছদ্মনামে সন্দেশরাসকম্ লিখিয়াছেন।

২১ কাক-বলি হিসাবে স্ত্রীলোকের প্রত্যহ একগ্রাস ভাত দেওয়ার প্রথা আছে। কাক বিরহিণীর বার্তাবহ।

এই রচনার প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য: বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২১ সংখ্যা ৩

হেনরী ডিরোজিওর কবিতা

পল্লব সেনগুপ্ত

১

হেনরী লুই ভিভিআন ডিরোজিওকে আমরা কেবলমাত্র নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত; এক মহাপ্রতিভাশালী প্রজন্মের অনুপ্রেরক অধ্যাপক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি। ফলত, কবি হিসেবে তাঁর মূল্যায়নটুকু এখনো অপূর্ণ থাকায়, তাঁর আর-একটি মহৎসত্তা আমাদের কাছে আজো অপরিচিত!

পরবর্তীকালে ডিরোজিও অবশ্য এদেশের সামাজিক ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁর প্রতি পুরো সুবিচারটুকু করা হয়েছে বলে ভাববার কারণ নেই। ডিরোজিও সম্পর্কে এদেশের মানুষ অবিচার বড় কম করে নি; প্রতিক্রিয়াশীলতার চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা তাঁর জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার ছুতোয় তাঁর নামে চাঁদা তুলে সে টাকা তছরূপ করেছিলেন, তাঁর বাসগৃহটি ভেঙে ফেলে সেখানে তাঁরা ফ্ল্যাট বাড়ি বসিয়েছেন তা এমন কি, তাঁর কবরটি পর্যন্ত এখন পরিত্যক্ত সমাধিভূমির কোন একান্তে অবহেলিত ও অপরিজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে তার খবরই বা আমরা ক-জন রাখি! এ দেশে আধুনিক সংস্কৃতির প্রধানতম অগ্রনায়ক যিনি, তাঁর প্রতি এই হল আমাদের জাতীয় কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যনিচয়! উত্তরকালের সামাজিক ইতিহাসে তাঁর অগ্রসূরীত্বের অবদান শ্রদ্ধায় স্বীকৃত হলেও, আমাদের জাতীয়-পাপস্খালন তবু অসমাপ্ত থাকবেই, যদি তাঁর অন্যতর সত্তা, তাঁর কবিপ্রতিভার পূর্ণায়ত মূল্যায়ন আমরা আজো না করি।

ডিরোজিওর প্রতিভার মূল্যায়নের পটভূমিতে তাঁর শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের অবদানটুকু অবশ্যবিচার্য সর্বাগ্রে। বাংলাদেশে আধুনিকতার অগ্রনায়ক ডিরোজিওর প্রসঙ্গে তাঁর গুরু ড্রামণ্ড সাহেবের এই পরিচিত দানটা অত্যাবশ্যক।[১] ১৮১৩ সালে এই 'কুঁজো স্কচম্যান' কলকাতা শহরে এসে পৌঁছন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর একদা বিখ্যাত ধর্মতলা একাডেমী। ক্ষুরধার তার্কিক, চৌকস পণ্ডিত, বিদগ্ধ শিক্ষক, কবি এবং সুগভীর রসবোদ্ধা এই মানুষটি বাল্যকালেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের মননে নিজের গুণবত্তার সবগুলি বীজই বুনে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দর্শনচিন্তায় ড্রামণ্ড ছিলেন ঘোরতর যুক্তিবাদী হিউমের অনুগামী; ঈশ্বর-চিন্তার চেয়ে মানবধর্ম যে মহত্তর, এই চিন্তাধারা ডিরোজিও অর্জন করেছিলেন তাঁর অধ্যাপকেরই মারফতে। আর এই হল তাঁর কাব্যের মূল স্বরলিপি!

ড্রামণ্ড সম্বন্ধে আরো দুটি কথা বিশেষ উল্লেখ্য: সে আমলের অন্যান্য বিদ্যালয়ে যখন ডাইসের স্পেলিং বুক[২] পড়িয়ে ইংরেজী শেখানো হচ্ছে, ড্রামণ্ড তখন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে যাচ্ছেন শেকসপীআরের মর্মলোকে![৩] দ্বিতীয়ত, সে আমলে কেবলমাত্র তাঁর স্কুলে এবং শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলেই ইউরোপীয়

---

১ ড্রামণ্ড সম্বন্ধে বিশদতর তথ্যের জন্য 'দি ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' পত্রিকার ১৮৪৩ সালের বিভিন্ন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' (১৯৫২): হরিহর শেঠ; পৃ ৭৮।

৩ 'India Gazette', last issue of December, 1822.

ছাত্রদের সঙ্গে এদেশী ছাত্ররাও সমান যোগ্যতায় প্রবেশ এবং পড়াশুনো করতে পেতেন। এই দুটি ঘটনা থেকে শিক্ষক হিসেবে ড্রামণ্ডের অসাধারণতা এবং আদর্শবোধের স্বরূপটা উপলব্ধ হবে— যা কি-না ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গীরও নির্ণায়ক।

১৮১৮ সাল থেকেই ডিরোজিওর নাম সংবাদপত্রের পাতায় খুঁজে পাই আমরা। ভালো ছাত্র হিসেবে, অভিনেতা হিসেবে তিনি তখন খ্যাতি অর্জন করেছেন ক্রমশ। অতঃপর, ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসের এক সংবাদ-অনুযায়ী কবি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি পাওয়া যায়।[৪] বিতর্কিতব্য পরিচয় জনৈক রামরতন চক্রবর্তীর[৫] নাম বাদ দিলে, ইংরেজী কাব্যচর্চায় বাঙালীর এই প্রথম অভ্যুদয়। কবিতাটি খুব একটা আহামরি জাতের কিছু না হলেও, একজন বয়ঃসন্ধ্য কিশোরের পক্ষে যথেষ্টই পরিণত। কবিতাটি শুরু হয়েছে এই ভাবে :

As new fledg'd birds, while yet unus'd to soar,
Tremble the airy regions so explore…

তরুণ ছাত্রদের প্রতি ব্যবহার্য এই রূপকল্পটির মাধ্যমে ডিরোজিও নিজেদেরকেও বোঝাতে চেয়েছেন ; তাঁর কাব্যজীবনের শেষপর্বে লেখা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণমূলক সনেটটিতে এই চিত্রকল্পটি ফিরে এসেছে। চিত্রকল্পের এই বৃত্তায়ন তাঁর কাব্যমননের নিটোলত্ব প্রকাশ করেছে, এমন কথা ভাবা চলে।

ছাত্রজীবনের শেষে, সামান্য কিছুদিন কেরানীগিরি করে ভাগলপুরে প্রবাসী হলেন ডিরোজিও। এইখানে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গিয়ে, সৃজনী প্রতিভা পরিণতি পেল। গঙ্গার প্রবাহ, ভাগলপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমালা, মুঙ্গের-ডালটনগঞ্জের পর্বতশ্রেণী, রাজমহলের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য—সব মিলিয়ে বিহারের গাঙ্গেয় অঞ্চলের এই রুক্ষরূপে মুগ্ধ হয়ে ডিরোজিওর কবিপ্রতিভার হল স্ফুরণ। কলকাতার 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকায় তিনি এই সব কবিতা (এবং কিছু গদ্য প্রবন্ধও) পাঠাতে লাগলেন 'জুভেনিস', 'হেনরী', 'ইস্ট ইণ্ডিআন' প্রভৃতি ছদ্মনামে। লেখাগুলি সমাদৃতও হল ঐ পত্রিকায়।

অতঃপর কলকাতায় ফিরে এসে হিন্দু কলেজে যোগ দেবার ঠিক এক বছর পরে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ '*Poems*' (১৮২৭)। এর এক বছর পরে বেরোয় তাঁর একদা বিখ্যাত আখ্যান-কাব্য *The Fakeer of Jungheera* সহ আরো কতকগুলি খণ্ড কবিতা (১৮২৮)। গ্রন্থাকারে ডিরোজিও আর কিছু প্রকাশ না করলেও সাহিত্যচর্চা তাঁর বরাবরই অব্যাহত ছিল—যার প্রমাণ তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী সময়ে, বিভিন্ন কাব্যসংকলনেও তাঁর কিছু কিছু কবিতা বিধৃত হয়েছে।

সে আমলে ডিরোজিওর কবিতাকে মূলত, তখন প্রচলিত জনপ্রিয় ইংরেজ কবিদের অনুকৃতির প্রয়াস হিসেবেই গণ্য করা হত। আশ্চর্যের বিষয় যে, এ দেশবাসী ইংরেজ সাহিত্যরসিকরা এই অদ্ভুত গবেষণা শুরু করলেও, এ দেশের বিদগ্ধ মানুষরাও তার প্রতিবাদ করেন নি! তাঁর অনেক কবিতার মুখপাতে সেকালীন রীতিমাফিক জনপ্রিয় কবিদের লেখা থেকে দু-চার লাইন করে উধৃতি দেবার অভ্যাস দেখি ; হয় তো এইটাই তাঁর সম্বন্ধে এই অমূলক গবেষণার প্রধানতম কারণ! অবশ্য এই সব কবিদের, অর্থাৎ বাইরন, মুর,

৪ 'India Gazette', 22nd January, 1824.

৫ 'Memoirs of William Hickey' (Edited by A. Spencer, 1948), Vol. 4. Pp. 42-'3.

ক্যাম্পবেল, এল-ই-এল প্রমুখের কাব্যপ্রেরণার আভাস মাঝে মাঝেও তাঁর কবিতায় লাগে নি, এমন কথা বলছি না। সমসাময়িক ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন তিনি।[৬] কিন্তু, তাঁদের চেয়ে ভারতীয়তার আদর্শই তাঁকে অধিকতর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বরং, তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব যা পড়েছে, তা মূলত ইতিহাসবোধে এবং দর্শনচিন্তায়। হিউম, বেকন, মোপার্তুই, কাণ্ট প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর অভিনিবিষ্ট অনুধাবন ছিল[৭], যার ফলে তাঁর কাব্যের সর্বত্রই একটা সুগভীর মানবমুখীন সহানুভূতি দেখতে পাই। ইউরোপের ইতিহাস তাঁকে পড়াতে হত হিন্দু কলেজে— তা ছাড়া, তার আগে থেকেই সে বিষয়ে তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। হিন্দু কলেজে ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যও তাঁকে পড়াতে হয়েছে; তাঁর লেখার 'ইউরোপীয়তা'-র অন্যতম ক্ষীণ উৎস হিসেবে সেটুকুও গণ্য করা চলে।[৮]

মোটামুটি ভাবে ডিরোজিওর কবিতাকে এই কয়েকটি মূল ধারায় বিভক্ত করা যায়। যথা— ক ভারতীয়, খ ইউরোপীয়, গ সর্বমানবীয়, ঘ ব্যক্তিগত এবং ঙ পাঁচমিশেলী। তাঁর প্রধানতম সৃষ্টি 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা'-কে ভারতীয় পর্যায়ের সার্থকতম ফসল বলে গণ্য করতে পারি। এ ছাড়া, 'টু ইণ্ডিআ— মাই নেটিভ ল্যাণ্ড', 'দি হার্প অফ ইণ্ডিআ', 'এনচ্যান্ট্রেস অফ দি কেভ', 'দি রুইন্স অফ রাজমহল', 'সং অফ অ্যান ইণ্ডিআন গার্ল', 'সং অফ হিন্দুস্থানী মিনস্ট্রেল', 'অন দি অ্যাবলিশন অফ সতী', 'ডেভিড হেআর' প্রমুখ কবিতা এই পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ইউরোপীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বিভিন্ন উপ-পর্যায়ে ভাগ করা চলে— 'থার্মপলি', 'গ্রীস', 'দি গ্রীকস অ্যাট ম্যারাথন', 'দি গ্রীসিআন সাআর অ্যাণ্ড দি সন', 'অ্যাড্রেস টু দি গ্রীকস', 'সাফো' ইত্যাদি (গ্রীক); 'ইতালী', 'তাসো', 'এনেকডোট অফ ফ্রান্সিস ওআন,' ইত্যাদি (ফরাসীয়, ইতালীয়); 'এ সং, টিউনড টু পর্টুগীজ এআর', 'এ পর্টুগীজ সং' (পর্তুগীজ); 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট', 'য়োরিক'স স্কাল' (শেকসপীআরীয়); 'নিউ আটলান্টিস', 'লাভ'স ফার্স্ট ফীলিংস', 'গোল্ডেন ভাস' ইত্যাদি (সমকালীন ইংরেজীকাব্যাশ্রয়ী)। ডিরোজিওর ভারতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বাদ দিলে তাঁর ব্যক্তিগত এবং সর্বমানবীয় পর্যায়ের কবিতাগুলিই সর্বোত্তম! ব্যক্তিগত কবিতার মধ্যে— 'দি পোএট'স গ্রেভ,' (১, ২) 'সিস্টার-ইন-ল',

---

৬ 'The Modern British Poets', in 'Calcutta Literary Gazette', 13th October, 1833.

৭ হিউম সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় পাই এইচ. এইচ. উইলসনকে ২৬শে এপ্রিল, ১৮৩১, তারিখে লেখা চিঠিতে ['*Poems of H. L. V. Derozio*' (1923), Edited by F. B. Bradley-Birt; Pp. xlvii.]; বেকন সম্পর্কে ঐ চিঠিটি এবং তাঁর '**অন দি ফিলজফি অফ বেকন**' ['Calcutta Gazette', 21st, August, 1829] সনেটটি স্মর্তব্য; মোপার্তুইয়ের একটি দর্শন-চিন্তা মণ্ডিত প্রবন্ধ তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'অন মর্যাল ফিলজফি' ['Calcutta Quarterly Review' (1833)] নামে; কাণ্টের দর্শন সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ এবং কঠোর একটি সমালোচনাত্মক নিবন্ধ লিখেছিলেন ডিরোজিও, যা সে আমলে সুধীমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছিল ['English Poetry in India' (1869), Edited by T. B. Laurence, Vol. I, Pp. 99]

৮ **হিন্দু কলেজে ডিরোজিও পড়াতেন এই বইগুলি :**

Goldsmith's *'History of Greece, Rome & England'*; Rusell's *'Modern Europe'*, Robertson's *'Charles V'*; Gay's *'Fables'*; Pope's *'Homer's Illiad & Odyssey'*; Dryden's *'Virgil'*; Milton's *'Paradise Lost'*; Shakespeare's one of the *'Tragedies'*. ['Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teach & Journalist' (1884) : T. Edwards; Pp. 66].

'হিআর'স এ হেলথ টু দী, ল্যাসি', 'টু মাই স্টুডেন্টস অ্যাট হিন্দু কলেজ' প্রমুখ কবিতাগুলিকে অনন্যসাধারণ আখ্যা দিতে পারা যায়। সর্বমানবীয় কবিতা বলে যেগুলিকে অভিহিত করতে পারি, তাদের মধ্যে 'ফ্রিডম অফ দি শ্লেভ', 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স', 'মর্নিং আফটার এ স্টর্ম', 'পোএট্রি অফ হিউম্যান লাইফ' কবিতা চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁচমিশেলি কবিতাগুলির মধ্যে 'ডন জুআনিকস', 'পোএট্রি', 'ওডস ফ্রম দি পার্সিআন অফ দি হাফিজ', 'এ ওআক বাই মুনলাইট', 'সং অফ আণ্টার, দি আরব', ইত্যাদির নাম করা চলে।

সংকলিত-অসংকলিত অজস্র কবিতার মধ্যে ডিরোজিওর এই রচনাগুলির উল্লেখ করা গেল, বিশিষ্ট উদাহরণ হিসেবে। এদের বাইরেও তাঁর প্রচুর কবিতা ছড়িয়ে আছে— কিন্তু কাব্যমূল্য বা অন্যান্য দিক থেকে সেগুলির আলোচ্যতা যৎসামান্যই!

২

ডিরোজিওর প্রধানতম কাব্য বলে গণ্য 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা' গাথাকাহিনীটির গল্পাংশটি বেশ অভিনব: স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিয়ে 'সতী' হবার জন্যে শ্মশানভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছে সদ্যোবিধবা তরুণী নলিনীকে। তার মনে এক নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত; একদিকে সুতীব্র জীবন-পিপাসা, অন্যদিকে উচ্চবর্ণীয়া হিন্দুনারীর যুগার্জিত ধর্মবোধের সর্বগ্রাসী সংস্কার। কুলবালার স্ত্রী-আচার-মূলক সংগীত, বৈদিক ব্রাহ্মণদের স্তোত্রগান এবং জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে অবশেষে সংস্কারই প্রবলতর হিসেবে প্রতিভাত হয়; সাজানো চিতায় উঠে বসে নলিনী সূর্যবন্দনা করতে শুরু করে। ঠিক এই সময়ে নলিনীর পূর্ব-প্রণয়ী— অধুনা এক দস্যুসর্দার, শ্মশানভূমিতে এসে হাজির হয় সদলে। প্রেয়সী নারীকে মৃত্যুর মুখোমুখি দেখে, দস্যুপতি তাকে তুলে নিয়ে যায় সাজানো চিতার উপর থেকে; হারানো প্রণয়ীকে ফিরে পেয়ে নলিনীও অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে দস্যুদলের সঙ্গে তাদের ডেরা জঙ্গীরার পর্বতগুহায় হাজির হয়। এইখানে প্রথম সর্গের সমাপ্তি।

নলিনীর বিক্ষুব্ধ এবং অপমানিত পিতা, রাজ-মহলাধীশ সুজার কাছে এই 'অন্যায়ে'র প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ফলশ্রুতিতে, প্রতিশোধেচ্ছু ব্রাহ্মণ, সুজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে দস্যুদের পাহাড়ে-ডেরায় হানা দিলেন। ওদিকে হারিয়ে যাওয়া প্রেমকে ফিরে পেয়ে নলিনী এবং দস্যুরাজ তখন পরম সুখে সময় কাটাচ্ছে! অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের প্রাক্কালে দস্যুসর্দার নলিনীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে হানাদারদের পরাভূত করে ফিরে আসবে; ফিরে আসবে চিরদিনের মতো দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রিয়তমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। পরিণামে, হানাদারেরা পরাজিত হল বটে, কিন্তু দস্যুপতির বাকি প্রতিশ্রুতিটুকু আর পূর্ণ হল না। যুদ্ধের অবশেষে পরদিন ভোরে দেখা গেল তার প্রাণহীন শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে নলিনীর নিঃস্পন্দন তন্বীতনু। মৃত্যু এবার আর তাকে প্রিয়বঞ্চিত করতে পারে নি, বরং মহামিলনের সেতুই সে বেঁধে দিল হয় তো বা!

এই কাহিনীর উৎস পাওয়া যায় গ্রন্থশেষে ডিরোজিওর স্বকৃত টীকায়:

Although I once lived nearly three years in the vicinity of Jungheera, I had but one opportunity of seeing the beautiful, and truly romantic spot. I

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

had a view of the rocks from the opposite bank of the river, which was broad & full, at the time I saw it, during the rainy season. It struck me then as a place where achievements in love & arms might take place; and the double character I had heard from the Fakeer, together with some acquintance with the scenery, induced me to found a tale upon both these circumstances.[১]

এই বক্তব্য থেকে কবিতাটির নামকরণের যাথার্থ্যও প্রতীয়মান হবে।

আনুপূর্বিক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইঙ্গবঙ্গ-সাহিত্যের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য আলেখ্য-কবিতাটি একটি অনুসন্ধানের স্বর্ণখনি বিশেষ! প্রথমত, এই বইয়ের প্রারম্ভেই ডিরোজিওর সেই বিখ্যাত সনেট,

My country! in thy day of glory past
A beauteous halo, circled round thy brow·[১ক]

বিবৃত হয়েছে। এর আগের বছর প্রকাশিত 'পোএমস'-এ ডিরোজিওর দেশমাতৃকার বন্দনামূলক 'হার্প অফ ইণ্ডিআ' সনেটটির পর এই সনেটটিকেও এ দেশের সাহিত্যে স্বদেশবন্দনার অন্যতম প্রথম মুখপাত বলে গণ্য করতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, এই কবিতার পনের বছর পরেও 'যশোর জেলার দত্ত বংশের সন্তান' মধুসূদন 'আই সাঈ ফর অ্যালবিঅন'স ডিস্ট্যাণ্ট শোর···' বলে যেখানে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, সেখানে 'ফিরিঙ্গি' (!) হেনরী জন্মভূমিকে মাতৃভূমির সঙ্গে অভিন্ন করেই তার বন্দনা করেছেন! মনে রাখতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যেও তখন ঈশ্বরগুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনাগত। যাকে এদেশের প্রথম জাতীয় সংগীত বললেই যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই গানটি পর্যন্ত ডিরোজিওর এই কাব্যে ঝংকৃত হয়েছে :

O! lovely is my native land
With all its skies of cloudless light;
But there's a heart, and there's a hand
More dear to me than sky most bright.

I prize them— yes, as though they were
On earth the only things divine
The only good, the only fair—
And oh! that heart and hand are thine.

My native land hath heavenliest bowers
Where Houris ruby-cheeked might dwell,

১ 'The Fakeer of Jungheera'; notes on Canto 1/Section 3/Lines 1-2.

১ক এই কবিতাটির দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'স্বদেশ আমার কি বা জ্যোতির মণ্ডলী' শীর্ষক একটি অনুবাদ সর্বজন পরিজ্ঞাত।

And they are Jemmed with bud and flowers
Sheeter than lip or lute may tell.[১০] ইত্যাদি।

'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'র পূর্ব-প্রতিভাস এই দেশবন্দনার ভাষাটা ইংরেজী বলে আমরা নিশ্চয় তাকে ব্রাত্য বলে গণ্য করব না!

স্বদেশচেতনার এই প্রকাশ আরো বিচিত্র সব বর্ণে চিত্রিত হয়েছে এ কাব্যের নিসর্গবর্ণনায়। ভারতবর্ষের মৃদু উষ্ণ বাতাস, ঝর্নার জল ভাঙা-ভাঙা কুলুকুলু শব্দ, প্রখর সোনালী সূর্যালোক, গঙ্গার জলজলে প্রবাহ, সবুজ মাঠে বনে ঘাস-ফড়িংদের লাফালাফি, রঙবেরঙের ফুলে ঝিকমিকে প্রজাপতিদের ফুরফুরে লাফঝাঁপ, শাল তাল তমাল বট অশ্বত্থের ঠাণ্ডা ছায়ার পটভূমিতে তাঁর কাব্য বিরাজমান। গঙ্গার উপকূলে যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণদের বেদমন্ত্রপাঠ, কুলললনাদের ব্রতগান, ধর্মশীলার সূর্যবন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই নবাবের দরবারের লক্ষদ্যুতিময়ী রূপ, মোগল এবং হিন্দুর সবীর্য অসি-ঝংকার, দস্যুনায়ক আর তন্বী নায়িকার দুঃসাহসিক রোম্যান্স—সব মিলিয়ে এই ছোট আখ্যানকাব্যটি মহাভারতের এপিক ব্যঞ্জনা অর্জন করেছে হয় তো বলতে পারি। এর মধ্যে স্কটের ব্যালাডীয় আভাস থাকতে পারে, থাকতে পারে ফরাসী ত্রুবাদুর কাব্যের প্রেরণা, প্রকৃতিতে-মানুষে অন্তর-সাজুয্য একে ওআর্ডসওআর্থীয় বৈচিত্র্য দিয়েছে কখনো বা, বলা সম্ভব নায়কনায়িকার মৃত্যুমিলন দৃশ্য রোমিও-জুলিএটের আদর্শান্বিত—এ সবই হয় তো ঠিক। কিন্তু এই কাব্যের মৌল-আবর্তন যে ঐ মহাভারতীয়তার কক্ষপথে, সেইটাই এর সবচেয়ে বড় কথা।

এই কাব্যের আর-এক বিশিষ্টতা হল, তদানীন্তন আমলে বহু বিতর্কিত সতীদাহ-প্রথার একটি নিখুঁত চিত্রায়ন। যদিও টীকায় ডিরোজিও বলেছেন:

I have taken a license with the fact which thus assumes a more romantic character...[১১]

কিন্তু সহমরণের পূর্বে চিতাপ্রদক্ষিণ, বেদমন্ত্রপাঠ, স্ত্রী-আচার, মুখাগ্নি, ভবিষ্যদ্বাণী প্রমুখ যাবৎ ধর্মানুষ্ঠানের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ডিরোজিও এঁকেছেন, যাতে তাঁর পূর্ণায়ত সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় আছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই কাব্যপ্রকাশের পরের বছর সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হলে, ডিরোজিও 'অন দি অ্যাবলিশন অফ সতী' নামে অগ্নি এবং আবেগ মিশ্রিত একটি কবিতা লেখেন। সে কথা যথাকালে আলোচ্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ১৮২৮ সালে, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে চেষ্টা করায় স্বয়ং রামমোহনের মতো ক্ষমতা ও প্রভাব -শালী লোকের নিরাপত্তা পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সমাজপতিদের প্ররোচনায়, সেখানে আঠারো বছর বয়সী 'ফিরিঙ্গি' ইস্কুল-মাস্টার হেনরী অকুতোভয়ে এমন সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, যার উপজীব্য হল সহমরণোন্মুখ নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে বিধর্মীর দাম্পত্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা! এই দুঃসাহসই অধ্যাপক, সমাজ-সংস্কারক এবং কবি ডিরোজিওকে এক করেছে।

---

১০ Jungheera; II/3/1-12.

১১ do; notes on I/21/9-12.

প্রথম সর্গের সূর্যস্তোত্র এবং মন্ত্রপাঠও প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য। ডিরোজিও ঋগ্বেদ পড়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এই কাব্যে যে সূর্যবর্ণনা এবং বন্দনা করা হয়েছে তার সঙ্গে ঋগ্বেদের সূর্যচেতনার পার্থক্য নেই বললেই চলে :

HYMN TO THE SUN[১২]

God of this beauteous world! whom earth and heaven
Adore in concert and in concert love,
Whose praise is hymned by the eternal seven
Bright whirling ministrels of the courts above
God of this glorious universe!— the sea
Smiles in thy glance, and gladdens in thy ray,
And lifteth up its voice in praise to thee
Giver of good, creator of the day.
God of th' immortal mind! with power to scan
Though like diamonds in the cavern lie,
Though deeply bedded in the breast of man,
Distinct and naked to thy piercing eye.
God of Eternity! whose golden throne
Is borne upon the wings of angels bright;
God of all goodness, thou art God alone,
Circled with glory, diademed with light.
Thou look'st from thy pavillion, and each cloud
Like fear o'ercome by hope triumphant flies;
The angry thunder's voice, though raining cloud
As thy bright presence into silence dies.
When all is darkness, like the sad soul's night
And tempests lower like grief upon her hearts,
Affrigated nature sees thy forehead bright
The black storm furls his banner and departs.
Thou mak'st the rainbow with thy golden beams,
Span the blue ocean rolling at thy feet

---

১২ Jungheera; I/19

Set in the sky that arch of promise seems
Like hope still distant, and like hope still sweet.
The flowers, the beauty of the earth, implore,
Like woman in distress, thy rays so bring
Their beauty out of nothing, and their store
Of scent and sweetness from their latent spring.
The forest's green is of thy giving. Thou
Dost fling its emerald mantle o'er the earth—
Prostrate to thee let all creation bow
For all creation at thy word had birth.
O sun ! thy herald is the morning star
Like flame preceding greatness ; but when day
Comes on advancing with thy glided car
Heaven's hosts of wonder melt like sparks away.
Who shall declare thy glory ?— Unto the
My heart in fervent adoration kneels
Thou know'st whate'er it sufferings may be
To thee alone it tremblingly appeals.

অতঃপর প্রথম চার স্তবক পুনরাবর্তিত হয়েছে। এর সঙ্গে, এই কাব্যের অন্যত্র যে সব সূর্যবর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিও বিবেচ্য :

Surya ! in thy course of light
Never saws't thow woman bright,
Like to her who soon shall be
Robed with immortality !
Hear thy servants' prayer from high
Regent of the sapphire sky.[১৩]

কিংবা

The golden god of the day has driven
His chariot to the western gate
Of yonder red resplendent heaven,
Where angels high to hail him wait,

১৩ Jungheera ; I/9/1-6.

But ere his couch he press to-night,
His mournful scene shall light.[১৪] ইত্যাদি।

স্পষ্টতই, ঋগ্বেদের আলোকদেবত্রয়ী— সূর্য, সবিতা এবং পূষণ ঐ স্তোত্র এবং এই সব বন্দনার মধ্যে প্রতিভাসিত হয়েছে অল্পবিস্তর। কথাটা বিশ্লেষণসাপেক্ষ—

ক. স্তোত্রের ১ম স্তবকে যেখানে 'চিরায়ত সপ্তকের' কথা বলা হচ্ছে, সেখানে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে 'হুইলিং মিনস্ট্রেলস অফ দি কোর্ট অ্যাবভ' বলে ; এই আবর্তমান সপ্তচারণকে ঋগ্বেদোক্ত সূর্যের রথের সপ্তাশ্ব বলে মনে করা চলে।[১৫] [স্মর্তব্য যে, হিন্দু-চিন্তা মাফিক স্বর্গীয় চারণ অর্থাৎ কিন্নরদের রূপ হল অর্ধেক মানব, অর্ধেক অশ্ব ; এই কিন্নরদের কথাও এই কাব্যের অন্যত্র এবং টীকাংশে দেখা যায়।[১৬]]

খ. ২য় স্তবকে যেখানে সূর্যের শুভদ রূপের বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে ঋগ্বেদের সূর্য চেতনার সাজুয্য বিচার্য।[১৭]

গ. ৩য় স্তবকে সূর্যকে 'অবিনশ্বর মননের অধিদেব' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। উপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্মচেতনায় মনরূপে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে ব্যাখা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সত্যের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। বেদভাষ্য স্বরূপ এই ঔপনিষৎ-চিন্তার সঙ্গে 'থট ছ্যাট লাইক ডাআমণ্ডস ইন দি ক্যাভার্ন লাঈ' বর্ণনাটি তুলনীয়।[১৮]

ঘ. ৪র্থ স্তবকে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ় সূর্যমূর্তির সঙ্গে ঋগ্বেদোক্ত সবিতা মূর্তি তুলনীয়। স্তোত্র বহির্ভূত ২য় উদ্ধৃতিটিও এ প্রসঙ্গে বিচার্য।[১৯]

সবিতা মূলত স্বর্ণবর্ণিম দেবতা। তাছাড়া তিনি অমরত্ব দানেরও অধিকারী। ৩য় স্তবকে সূর্যকে 'গড অফ ইমর্টাল মাইণ্ড' বলা হয়েছে, সেটা পুনঃ স্মর্তব্য।[২০]

ঙ. স্তবকে বর্ণিত সূর্যের মেঘ-বজ্র-জয়ী রূপ, ৬ষ্ঠ স্তবকের অন্ধকার বিজয়ী রূপ, ৭ম স্তবকের ইন্দ্রধনুস্রষ্টা রূপ, ৮ম স্তবকের পুষ্পগন্ধ ও নারীর মাধুর্য প্রদাতা রূপ, ৯ম স্তবকের অরণ্যের হরিৎবর্ণস্রষ্টা রূপ এ সবই ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলে ছড়ানো সূর্য, সবিতা, পূষণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিবিধ সূক্তের বর্ণিত রূপের অনুসারী।[২১]

চ. স্তোত্র বহির্ভূত ১ম উদ্ধৃতিতে সূর্যকে 'রিজেণ্ট অফ দি স্যাফাআর স্কাই' বলা হয়েছে ; এটিও ঋগ্বেদ-নির্ভর বর্ণনা।[২২]

---

১৪ Jungheera ; I/2/1-6.

১৫ 'ঋগ্বেদ, ; ১/৫০/৮-৯।

১৬ Jungheera ; I/6/40 & notes.

১৭ 'ঋগ্বেদ' ; ১/৩৫/২-১১, ১০/৩৭/১-১২।

১৮ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ '; ১/৩/১-১৮, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' ; শ্বেতকেতু-উপাখ্যান।

১৯ 'ঋগ্বেদ' ; ১/৩৫/২-১৫, ৬/৭১/১-৩, ৭/১, ৭/৪৫।

২০ ঐ ; ১/১৯১/৭-১২।

২১ ঐ ; যথাক্রমে, ১/২২/৫-৮, ১/১১৫/৪, ৪/৪৬/৬, ১/১৬৪/৫২, ৫/৪১/২, ৫/৮২/১-৬, ৭/৬৩/১-৪ ইত্যাদি।

২২ ঐ ; ৭/৬৩/৪।

স্পষ্টতই বেদ সম্পর্কে নিবিষ্ট অনুধাবন না থাকলে ডিরোজিওর পক্ষে এত সব রূপকল্পকে আয়ত্ত করা সম্ভব হতো না! আর বেদ সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত ছিলেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই কাব্যের স্বকৃত টীকাংশে :

The Vedas, which are supposed to contain the essence of wisdom, declare in various places, wherever the language of praise is employed, the object of such praise is the Deity or Brihm. Thus fire is Brihm, the sun is Brihm, water is Brihm; a number of other substances are defined in like manner. It is necessary to state that all prayers in the ceremony of female immolation are addressed to the sun.[২৩]

ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত 'পুরুষ-সূক্ত'এর[২৪] সঙ্গে এর মৌল বক্তব্যের মিলটুকু দ্রষ্টব্য।

বৈদিকতত্ত্ব সম্পর্কে ডিরোজিওর এই অভিনিবেশ কি করে অর্জিত হয়েছিল সেটা গবেষণার বিষয়! ডিরোজিও মূল সংস্কৃত পড়েছিলেন এমন কথা প্রমাণ করা কঠিন। ডিরোজিওর পক্ষে অধিগম্য ভাষায় বেদচর্চার নিদর্শন (যা তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল,) কেবলমাত্র উইলিআম জোন্স, আঁকিতেল দ্যুপের্, কোলব্রুক এবং রামমোহনের লেখায় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভাষায় বেদ- (এবং ভারততত্ত্ব)-চর্চার প্রথম ধারক জোন্সের প্রথম বৈদিকতত্ত্ব সম্পৃক্ত গবেষণা হল 'অন দি গডস অফ গ্রীস, ইতালী অ্যাণ্ড ইণ্ডিআ' (১৭৮৪)। এই গবেষণায় অবশ্য সূর্যদেবতা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আছে। এছাড়া তিনি পরবর্তী আট-দশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন বেদ এবং উপনিষদ থেকে কিছু কিছু অংশ তর্জমা করে প্রকাশ করেন এবং বৈদিক স্তোত্রের আদর্শে হিন্দু দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি 'হিম্' বা স্তোত্র রচনা করেন। এই সব স্তোত্রগুলির মধ্যে একটি সূর্যদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও, সেটির বক্তব্য আদৌ বৈদিক-বর্ণনামাফিক নয়। সুতরাং, সেটি ডিরোজিওর আদর্শ হতে পারে না।[২৫]

জোন্সের পর দ্যুপের্ লাতিনে কোলব্রুক ইংরেজীতে এবং রামমোহন ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায়

---

২৩ Jungheera; notes on I/19/15-16.

২৪ 'ঋগ্বেদ', ১০/৯০।

২৫ বিভিন্ন বৈদিক-সাহিত্য থেকে জোন্সের কৃত অনুবাদ-তালিকা :

Extract from a Dissertion of the Primitive Hindus; The Gāytriá, or Holiest Verse of the Vedas; Isāvāsyam, or an Upanishad from Yajur Veda; From the Yajur Veda (hymn); A Hymn to Night.

জোন্সের স্বরচিত হিন্দু স্তোত্রগুলির তালিকা :

Hymn to—Durga, Bhavāni, Indra, Surya, Lacshmi, Nārāyana, Serswaty, Gangā.

ফলিতভাবে বেদচর্চা করেন, উনবিংশ শতকের প্রথম চতুষ্টকের মধ্যে।[২৬] কিন্তু দ্যুপের্ঁর মতন রামমোহনের অভিনিবেশও মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন উপনিষদের বিশিষ্ট অংশসমূহ ভাষান্তরণে। এঁদের লেখা থেকে ডিরোজিও বেদের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জেনে থাকতে পারেন; কিন্তু নিজের লেখায় প্রত্যক্ষ ভাবে বৈদিক রূপকল্প প্রয়োগটার মূল অবশ্যই আরো গভীরে নিহিত।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে একটা হতে পারে যে, হিন্দু কলেজের তদানীন্তন অন্যতম পরিচালক অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের কাছে এ ব্যাপারে তিনি কিছু আলোক পেয়ে থাকতে পারেন। ডিরোজিওর এই কাব্য রচনার কালেই যে পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত এই বেদবেত্তা অধ্যাপক ঋগ্বেদ সম্পর্কে তাঁর মহাকীর্তির[২৭] প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন, এমন ধারণা করা অসঙ্গত নয়। উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাপ্রীতিও ছিল সুগভীর, ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে যখন প্রতিক্রিয়াশীল-গোষ্ঠী বিতাড়িত করবার উদ্যোগ করেন, তখন ডেভিড হেআর এবং শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে উইলসনও প্রবলভাবে সেই অপপ্রয়াসে বাধা দেন। একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য : ডিরোজিও এই কাব্যটি উৎসর্গ করেছেন উইলসনকেই। কে বলতে পারে, এটা সেই ঋষিঋণ শোধেরই প্রয়াস কি না! যে ড. গ্র্যান্টের কাছে তিনি আশৈশব স্নেহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণস্বীকারের জন্যেই তো ডিরোজিও নিজের প্রথম বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন!

দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে, হয়তো কোনো সহমরণ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হবার সুযোগ হয়েছিল ডিরোজিওর। ঐ অনুষ্ঠানের যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ ডিরোজিও করেছেন, তাতে এ কথা বিশ্বাস করা চলে। সে ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে কোনো বেদজ্ঞ পুরোহিতের কাছে ঐ সব স্তোত্রের ব্যাখ্যান তিনি জেনে নিয়েছিলেন এমন কথা ভাবা চলে।

তৃতীয় একটি সম্ভাবনা হতে পারে যে, তাঁর কোনো ছাত্র বা বন্ধুস্থানীয় কারুর সাহায্য পেয়ে থাকতে পারেন তিনি। তাঁর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিএশনের অনেকেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। নিজেরা আচার সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে মোহমুক্ত হলেও, অগ্রজকল্প অধ্যাপকের উপকারার্থে (বিশেষত, একটি পরম প্রগতিশীল সাহিত্য রচনার ব্যাপারে) তাঁরা এ বিষয়ে কিছু সহায়তা করে থাকতে পারেন স্বাভাবিক কারণেই। স্মর্তব্য যে ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি পরবর্তীকালে খৃষ্টান যাজক হয়েও বৈদিক গবেষক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২৮]

---

২৬ ক 'Oupnékhat ou Theologia et Philosophia' (1801-2, Vols. 1-2) : A. Duperron.

খ 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus' by H. T. Colebrooke [Asiatic Researches', 1805]

গ রামমোহনের বৈদিক-সাহিত্য চর্চার তালিকা :

'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (ঐ), 'তলবকার উপনিষৎ' (১৮১৬), 'ঈশোপনিষৎ' (ঐ), 'কঠোপনিষৎ' (১৮১৭), 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' (ঐ), 'মুণ্ডকোপনিষৎ' (১৮১৯);

'Vedant, or the Resolution of all the Veds' (1816), [German & Hindi Versions (1817)], 'Cena Upanishad' (1816), 'Ishopanishad' (do), 'Moondak Upanishad' (1819), Kuthopunishad (do).

২৭ 'Rig-Veda-Samhita' (1850-88, Vols. 1-6) : H. H. Wilson.

২৮ 'Rig-Veda' (1875) : K. M. Banerjea.

এই কাব্য রচনার ব্যাপারে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের সাহায্য নিয়েছিলেন এমন স্বীকৃতি তিনি নিজেই গ্রন্থটীকায় দিয়ে গেছেন :

A student of that excellent institution, the Hindu College, once brought me a translation of the Betal Puncheesa, and following fragment of a tale having struck me for its wilderness, I thought of writing a ballad…[২৯]

মোটামুটিভাবে এর সবকটি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। সবগুলিকে একত্র করেও গ্রাহ্য করা চলে, ডিরোজিওর কাব্যে বৈদিক রূপকল্প প্রয়োগের উৎস হিসেবে।

৩

একটু আগে এই কাব্যকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছি আমরা। এই কথাটি একটু আলোচনা করা উচিত। ··মহানগরী কলকাতার আদি প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক নাকি কৃতবাধ্য-হয়ে-সহমরণোন্মুখ কোনো তরুণী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে উদ্ধার করে তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। বলতে পারি কলকাতার পত্তনীকালের আদি-দম্পতীর মাধ্যমেই এইভাবে এদেশে প্রাচ্যপাশ্চাত্য ভাবধারার মেলবন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল! ঐ মেলবন্ধনই এ দেশে প্রগতির সূত্রস্বরূপ। প্রচলিত এই কাহিনীর সমন্বয়ের প্রেরণা ডিরোজিওকে কিছুটা প্রবুদ্ধ করে থাকতে পারে। কিন্তু, এই কাহিনীতে যে প্রগতিমূলক সমন্বয় চিত্রিত হয়েছে তার গুরুত্ব ভিন্নতর; সে সমন্বয় হিন্দু ও মুসলমানের।

'দি ফকির অফ জঙ্গীরা'র নায়িকা হিন্দুকন্যা; নায়কের নাম আমাদের অজানা হলেও তার ধর্ম সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি তার নিজেরই কথায় :

No more to Mecca's hallowed shrine
Shall wafted be a prayer of mine··
Henceforth I turn my willing knee
From Alla, Prophet, heaven, to thee··[৩০] ইত্যাদি।

স্পষ্টতই, নায়ক মুসলিম ধর্মের অন্তর্গত।

তা হলে মূল ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে যে, উচ্চবর্ণীয়া হিন্দুকন্যা প্রথম যৌবনে মুসলমানকে ভালোবেসেছিল; ঘটনাক্রমে, ধর্মসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে সে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ অর্জন করে ধন্য; অন্যপক্ষে, প্রণয়িনীর জন্যে মুসলমান নায়ক মক্কা আল্লা পয়গম্বর এবং বেহেস্তের প্রতিও আনুগত্য বর্জনে প্রস্তুত। ধর্মবোধের চেয়ে জীবনবোধকে এই বড় করে দেখানোর মধ্যেই এই কাব্যের মহত্তম প্রগতিশীলতা।

শুধু এই নয়; 'মুসলিম' দস্যু কর্তৃক অপহৃতা 'হিন্দু'কন্যার পিতার অপমানের প্রতিশোধার্থে মুসলমান নরপতি এক হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছেন সেই দস্যুর বিরুদ্ধে, ধর্ম-সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক নীতি সংস্কারের প্রাধান্য দেওয়ার পরিচায়ক এই ঘটনার মধ্যেও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিভাসিত হচ্ছে!

উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঐ সমন্বয়ের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৮)-এ শিবাজী রোশিনারার কাহিনী, 'দুর্গেশনন্দিনী'

---

২৯ 'Jungheera'; notes on II/5.

৩০ do; I/27/last 6 line.

(১৮৬৫)-তে আয়েষা জগৎসিংহের প্রণয়, 'রাজসিংহ' (১৮৯১)-এ ঔরঙ্গজীব নির্মলকুমারীর ভালোবাসা, 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯)-তে সেলিম অশ্রুর প্রেম এ সবই প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য। 'সতী' (১৮৯৭) কাব্যনাট্যটিতে বিশেষভাবে স্মর্তব্য; তার মূল প্লটের কাঠামো এবং এই কাব্যের কাঠামোটির ছক দুটি মোটামুটিভাবে একই; সেখানেও বিধর্মীর সঙ্গে কন্যা অমাবাঈ-এর মিলনে বিক্ষুব্ধ পিতা, 'জামাতা'-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পরিণতিতে সে নিহত হয়। বিধবা কন্যাও আত্মবিসর্জন দেয়।

··একটা কথা বিবেচ্য; বাংলা দেশে সেই উগ্র ধর্মান্ধতার যুগে এই সমন্বয়ের প্রেরণা ডিরোজিও পেলেন কোথায়?

আসল কথা যে ধর্মসংস্কারবিমুক্ত মানবতাবোধ ডিরোজিওকে পরবর্তী সময়ে নাস্তিক রূপে চিত্রিত করবার জন্য দায়ী সেই বিশ্বাসেরই কাব্যিক প্রকাশ এটি। বাংলা দেশের গীতিকা-সাহিত্যে যে ধর্মান্ধদৃষ্টি পরিবর্জিত সমন্বয়বোধের আত্মপ্রকাশ দেখি, সেই মর্জিরই আধুনিক সংবেদন হল এই কাব্য, এমন বললে অন্যায় হবে না।

শুধু মর্জিতেই নয়, প্রকরণে এবং রূপারোপণেও এই কাব্যের মধ্যে গীতিকার উপাদান রয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিবেশ, ভয়ংকর ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা, দস্যুসর্দার কর্তৃক প্রাক্তনা প্রণয়িনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া, উদ্দাম প্রণয়চিত্র, প্রবল যুদ্ধ এবং যুদ্ধান্তে নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক মৃত্যু ব্যালাডের পক্ষে এ তো আদর্শ প্লট! অন্যপক্ষে,ব্যালাডের যা ফর্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন রিফ্রেন বা ধুয়া, তার উদাহরণও এর মধ্যে মেলে। 'দস্যুদলের গান'এর মধ্যে:

> Towards you grey isle the waters flow.
> Then brothers, bravely row· · [৩১] ইত্যাদি।

কিংবা, 'মহিলাদের কোরাসের':

> On to the alter, and scatter the flower[৩২]

ইত্যাদি অংশ এ প্রসঙ্গে বিচার্য।

প্রকৃতপক্ষে এ কাব্য হল এক মিশ্র প্রবণতার সমষ্টি। কখনো এর মধ্যে বৈদিক স্তোত্রের অনুরণন একে ধ্রুপদী প্রবীণত্ব দান করেছে, কখনো ব্যালাডীয় শৌর্য-বীর্য-প্রণয় একে মধ্যযুগসুলভ রোম্যান্টিকতায় ভূষিত করছে, কখনো আবার সংস্কারহীনতায়, সমন্বয়-চিন্তায় এবং মানবতাবাদী আত্মস্বাতন্ত্র্যের ঘোষণার মধ্যে এর আধুনিকতা প্রমূর্ত।

এই শেষ পর্যায়ে অভিহিত ভাবধারারই সফলতর অভিব্যক্তি দেখি উত্তরকালে ডিরোজিওর ভাবশিষ্য মাইকেল মধুসূদনের লেখাতে।´ শুধু মানবতাবোধ, জীবনকে নিজের বাঞ্ছনীয় খাতে প্রবাহিত করা, নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের স্বীকৃতির ব্যাপারেই ডিরোজিও মধুসূদনকে পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরিত করেছেন এমন নয়: এই কাব্যে অন্তত একটি বর্ণনাও পাই, যার সমান্তরাল চিত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১) হাজির হয়েছে। সুজার দরবারের বর্ণনা এবং রাবণের রাজসভার বর্ণনার ঐ তুলনায় আমরা দেখি:

---

৩১ Jungheera; I/24.

৩২ do; I/6.

ক. The lamps upon each marble wall
Now echoing with the sound of song,
Those lamps are of glittering gold
Like sunset gleaning o'er the sea
And scented is the store they hold
As at some blest Immortal's call.…

… … …

On carpet bright of velvet green
Whose broidered rim with gold is shining,
With pearls the glittering lines between
The prince is all at ease reclining.
And golden cups & goblets bright
With spices sweet from Lunka's isle
And sherbets all like liquid light
Sparkle around him there the white.
And crystal vases gemmed with gold,
Meet ornaments for heavenly bowers
In fragrant heaps and clusters hold
The most enchanting fairy flowers.[৩৩]

খ. ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে।[৩৪]

---

৩৩ Jungheera; II/2/1-6, 31-42.

৩৪ 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) : মাইকেল মধুসূদন, ১/৩৭-৪৬।

সামগ্রিকভাবে 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা' কাব্যে ইউরোপীয় আদর্শের ক্রমান্বয়ী অনুসৃতি দেখা না গেলেও এর কিছু কিছু অংশে তার আভাস যে মেলে না এমন নয়। তৎকালীন ইংরেজী কাব্যে জনপ্রিয় স্কটের প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণা এই কথাকাব্য রচনার পিছনে সুপ্ত উৎসাহ হিসেবে থাকতে পারে। ২য় সর্গের ১০ম থেকে ১৮ স্তবকমালার মধ্যে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম-সাযুজ্যে যে বিশেষ আবহ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ওআর্ডস-ওআর্থীয় বলতে পারি। [কিন্তু 'বেদজ্ঞ' ডিরোজিও অন্ততপক্ষে জোন্সের অনূদিত 'শকুন্তলা' (১৭৮৯) পড়েন নি কি ?] নলিনী এবং দম্যুপতির প্রণয়ের পটভূমি হিসেবে যখন প্রকৃতির রূপ বর্ণিত হচ্ছে, তখন সে আনন্দোচ্ছল, সৌন্দর্যময়ী ; চন্দ্রালোকে বহমান ঝর্ণার সঙ্গে প্রণয়ীযুগলের খুশির প্রবাহ সমান্তরাল-পুষ্পগন্ধ, তাদের নিশ্চিন্তির মতনই বিরামে বিপ্রলম্ভ এবং :

Hope's and the moon's rays quiver o'er them still.[৩৫]

আবার নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদের মুহূর্তে প্রকৃতির মধ্যে তাদেরই বেদনা প্রতিভাসিত :

Lost is of the light the last remaining ray.[৩৬]

শেষ দৃশ্যে প্রণয়ীযুগলের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ দুটি যখন গ্রামবাসীরা আবিষ্কার করল, তখন সেই চিত্রায়ণে নিঃসন্দেহে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'এর অনুপ্রেরণা সক্রিয়। স্মর্তব্য যে, এই কাব্য রচনার প্রায় একই সময়ে ডিরোজিও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট' নামে একটি চতুর্দশী রচনা করেছিলেন (এপ্রিল ১৮২৭)।

ডিরোজিওর এই কাব্যের একটি উপ-আখ্যানও রয়েছে, বেদচর্চায় তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে সম্ভাব্য সহায়তালাভের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে যার উল্লেখ করা রয়েছে আগে। এই কাহিনীটির প্রসঙ্গ দুটি কারণে বিশিষ্ট। প্রথম, ডিরোজিও তাঁর গ্রন্থের টীকাংশে, তাঁর ঐ 'অজ্ঞাত পরিচয়' ছাত্রের আনিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র গল্পটি সন্নিবিষ্ট করেছেন ; এটিকেই ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের প্রথম প্রাপ্তব্য গল্প হিসাবে গণ্য করা চলে। এই অনুবাদটি সম্ভবত ১৮১৭ সালে প্রকাশিত জনৈক ছিদামচন্দ্র দাসের অনূদিত ইংরেজী বেতাল পঞ্চবিংশতির অংশবিশেষ। দ্বিতীয়ত, লোক-সংস্কৃতির প্রতি যে ঐতিহ্যবোধ থাকলে একজন সাহিত্যিককে প্রকৃত অর্থে 'জাতীয় কবি' বলে গণ্য করা যায়, সেই ঐতিহ্যের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে এই লোকবৃত্ত নির্ভর কাহিনীটি অবলম্বন করায়।

২য় সর্গে সুজার দরবারের বর্ণনাকালে, জনৈক কথকের মুখ দিয়ে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'—আশ্রয়ী ঐ উপকাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির সারাংশ হল : প্রণয়িনী রাধিকার মৃতদেহটি নিয়ে রাজপুত্র যোগীন্দ্র শ্মশানভূমিতে তান্ত্রিক সাধনায় নিরত, উদ্দেশ্য প্রেয়সীর পুনর্জীবন-অর্জন। এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে ঐ সাধনার পথে সম্ভাব্য সব ভয়াবহ বিঘ্নের কথা শোনালেন, যার সামনে সাহসে অবিচল থাকলে, তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। সন্ন্যাসীর বর্ণনামাফিক, পরপর তিন রাত্রি প্রেতিনীরা এসে যোগীন্দ্রকে ভয় দেখায় গান গেয়ে ও অন্যভাবে প্রলুব্ধ করে ; কিন্তু যোগীন্দ্র অবিচল থেকে পরিণামে সফল হন।

প্রেতিনীদের মুখের ঐ গানটিও বিশেষ উল্লেখ্য :

---

৩৫ 'Jungheera'; II/10/4.

৩৬ do; II/13/3.

O! now do not leave me
Since false friends have flown
Dear love! do not grieve me
I've thought thee mine own…[৩৭]

সমকালীন বাঙালী সমাজে প্রচলিত নিধুবাবু প্রমুখের লৌকিক টপ্পা ইত্যাদি গানের প্রতিধ্বনিই কি পাওয়া যাচ্ছে না ভাবে এবং ভাষায়!

পরবর্তীকালে 'দি ফকির অফ জঙ্গীরা' বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, ইঙ্গভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক মহামূল্যবান দলিল হিসেবেই পরিগণ্য।

৪

'দি ফকির অফ জঙ্গীরা' ছাড়া ডিরোজিওর আরো একটি আখ্যানকাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, 'দি এন-চ্যান্টেস অফ দি কেভ'। এ ছাড়া নামে একটি দ্বৈতচরিত্র নির্ভর নাট্যকাব্যও 'এ ড্রামাটিক স্কেচ' তিনি লিখেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমটি কাল্পনিক হলেও, ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা অন্যতম কবিতা। সংক্ষেপে এর আখ্যানাংশ হল :

ভারতের আধিপত্য নিয়ে হিন্দু এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের আগের রাত্রে মুসলিম সেনাপতি নাজিম গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এক পর্বতের অধিবাসিনী জনৈকা যাদুকরীর কাছে ভাগ্য গণনা করাতে। সহধর্মিণীর জুমলীর কুশল চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন। ঠিক এই সময়ে নাজিম দেখলেন যে, যুদ্ধে আসার পথে হঠাৎ জুটে যাওয়া তাঁর বালক সহচরটি নিখোঁজ হয়েছে। অতঃপর যাদুকরীর কাছে নানা প্রশ্নের হেঁয়ালিভরা এবং এড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়া উত্তর পেয়ে বিমূঢ় নাজিম অবশেষে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, ডাকিনী আর কেউ না, ছদ্মবেশিনী জুমলী স্বয়ং! বালক সহচরের ছদ্মবেশে তিনি বরাবরই স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মতন থেকেছেন!

প্লটটি নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিক। 'জঙ্গীরা'র বিয়োগান্ত প্রেমের বদলে এর মিলনান্ত রোম্যান্স ভিন্নতর স্বাদ বহন করে। শেকসপীআরীয় টেকনিক 'সেক্স কনসীলমেণ্ট' এখানে চমৎকার নাটকীয় সৌষম্যে পরিবেষিত হয়েছে। মূলত কথোপকথনের মাধ্যমে পরিবেষিত এই আখ্যানটিকে এক অর্থে নাট্যকাব্য হিসাবেও গণ্য করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' (১৮৯১) দরিয়ার ছন্দবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা প্রসংগত স্মর্তব্য।

এই কাব্যের ভাষা এবং চিত্রকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে ডিরোজিও এক বিশেষ মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম চরিত্রের সমাহারে আখ্যায়িকা রচনার সময়ে, একজন সতর্ক শিল্পীর মতোই তিনি মুসলমানী শব্দ, মুসলিম পুরাকাহিনী অবলম্বী রূপকল্প এবং মুসলিম রীতিনীতির সুনিপুণ বর্ণনা করেছেন প্রয়োজন মাফিক ; যথা,

ক মূল কবিতার প্রথম চরণেই ডিরোজিও লিখছেন :

Bright shone Mehtab on many a hill[৩৮]

---

৩৭ Jungheera; II/5/1-4 (The Spirit's Song).
৩৮ 'Enchantrees of the Cave'; Stanza 1/Line 1.

অতঃপর, নিজেই 'মেহতাব' শব্দের অর্থ লিখে দিয়েছেন টীকা হিসাবে, 'দি মুন'। স্পষ্টতই, মুসলিম-আমেজ আনবার জন্যেই ডিরোজিও 'মেহতাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, নইলে 'দি মুন' লিখলেও ছন্দস্পন্দন অক্ষুণ্ণ থাকত।

খ And on his blode the koren verse
Bespeaks for very foe a curse[৩৯]

মুসলিম যোদ্ধপুরুষদের এই রীতির উল্লেখ নিঃসন্দেহে কবির সচেতন দৃষ্টির পরিচায়ক।

গ প্রচুরায়তভাবে মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এক বিশেষ আবহ সৃষ্টি করেছে এই কাব্যে; যেমন— 'কাফির', 'আফ্রিৎ', 'ইজরাফিল', 'এবলিস' ইত্যাদি।[৪০]

ঘ মুসলিম ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে ডিরোজিওর সুগভীর জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতার অন্তে তাঁর স্বকৃত ছটি টীকায়। 'ছুহুল মিনার', 'জামসেদের রত্ন', 'সোলেমান জারেদের পান্না,' 'সুখ্যাত পাথর' ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর সন্ধিৎসা দেখবার মতন।[৪১] 'জঙ্গীরা'র মতন এই কাব্যের টীকাংশেও তাঁর বিচিত্র এবং সন্ধিৎসু পাঠনিষ্ঠার গভীরতা জাজ্বল্যমান!

'এ ড্রামাটিক স্কেচ' নাট্যকবিতাটির পটভূমি পশ্চিম হিমালয়ের কোনো দুর্গম নির্জন গুহা। দূরে একটি নদী, সময় প্রদোষ। আলো এবং ঈশ্বরের বন্দনা সাঙ্গ করে ঋষি তাঁর শিষ্যকে (যে আসলে পুণ্যনগরী রোমের সন্তান)[৪২] শোনান এক-ব্রহ্মের মাহাত্ম্য এবং ঐহিক বিশ্বের অতিরেকে দিব্যজীবনের মহৎ বার্তা! জীবনপ্রেমিক শিষ্য চায় মানুষের মধ্যে থেকে সাধনা করত সমাজ ও সম্পর্কের মধ্যেই তার মতে সাধনার ভূমা। ক্ষুব্ধ ঋষি তিরস্কার করেন তাকে, প্রত্যুত্তরে সে তাঁকে এক অনবদ্যাঙ্গীর রূপ বর্ণনা করে শোনায়। প্রেমের মধ্যেই সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে প্রয়াসী! জীবন-বিমুখ ঋষি শিষ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন।...সংক্ষেপে এই হল এই নাট্যকাব্যের উপজীব্য। স্পষ্টতই, 'জীবনের কবি' ডিরোজিওর সহানুভূতি জীবনপ্রেমিক শিষ্যের দিকে। তাঁর মননের এই বিশেষ দিকটি এ কবিতায় বিধৃত হয়েছে।

ভারতীয় পর্যায়ের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'রুইনস অফ রাজমহল' উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি সমসাময়িক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ কবি হেনরী মেরেডিথ পার্কারের 'রুইনস অফ ব্যাবিলন'এর আদর্শায়িত।[৪৩] নবাবী আমলের এককালীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ কবির মনে যে বিষণ্ণ নস্টালজিআর সৃষ্টি করেছিল, রাজমহল থেকে বিদায়কালে তার স্মৃতিটুকু তিনি এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যেও 'এনচ্যানট্রেস'-এর মতোই স্বাভাবিক-মর্জিতে মুসলিম আবহ বজায় আছে।

---

৩৯ Jungheera; 2/13-'4.

৪০ do; 4/3, 7/18, 8/15, 13/5, respectively.

৪১ do; Notes A to F, respectively.

৪২ " . . . it bids me sadly call to mind.
The sacred city, standing to its marge.
Where all I ever know of Rome is fixed."

৪৩ ভারত প্রবাসী ইংরেজ কবিদের মধ্যে এইচ. এম. পার্কারই ডিরোজিওকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। শুধু এই কবিতাতেই নয়, 'জঙ্গীরা'-র শেষ অংশে পার্কারের 'ড্রট অফ ইমর্টালিটি' (১৮২৭) কাব্যের দুটি ছত্রের তুলনা করেছেন তিনি স্বকৃত টীকায়। পার্কারের আদর্শে শেকসপীআরীয়-বিষয় নিয়ে লেখা সনেট দুটি এবং তাঁর উদ্দেশেই নিবেদিত সনেটটির কথাও স্মর্তব্য।

অতীত স্মৃতির প্রতি নস্টালজিক হয়েও দেশপ্রেমের অগ্নিতে পরম আশাবাদী একটি সনেট লিখেছিলেন ডিরোজিও, 'দি হার্প অফ ইণ্ডিআ'— সাধর্ম্যে যেটি 'জঙ্গীরা'-র বহু-আলোচিত সনেটটির অনুরূপ। মুরের 'দি হার্প অফ এরিন' কবিতার অনুপ্রেরণায় লেখা হলেও, এর জলন্ত দেশপ্রেম প্রমাণ করতে পেরেছে ডিরোজিও-উত্তর বাংলাদেশের নবজাগ্রত আত্মবোধের প্রস্তুতিকে। কবিতার অন্ত-চরণে তিনি যে প্রার্থনা করেছেন Harp my country! let me strike the strain!—সে প্রার্থনা সফল হয়েছে। মাতৃভূমির বীণার তারে তাঁরই প্রদত্ত প্রথম ঝংকারে এদেশে নবযুগের সূচনা হয়েছে, এ কথা ধ্রুব।

ভারতীয় পর্যায়ে ডিরোজিওর বিশিষ্ট কাব্য হল 'অন দি অ্যাবলিশন অফ সতী'। ১৮২৯ সালে বড়লাট বেণ্টিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ করে দিলে রামমোহনের মহৎ-বিপ্লব সার্থকতা পেল। 'জঙ্গীরা' কাব্যে এই ঘৃণ্যপ্রথা সম্পর্কে ডিরোজিওর তীব্র সব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এর আগেই।[৪৪] এ কবিতাটির তীব্রতা আর জলন্ত এবং গাঢ়। কাব্যগুণে, ইমেজের অসাধারণত্বে এবং সর্বোপরি বক্তব্যের সঙ্গে ছন্দোস্পন্দের সুষম সাযুজ্যে এটি একটি অতুলনীয় সৃষ্টি।

কবিতাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে:

Red from his chambers came the morning sun
And frowned, dark Ganges on thy fatal shore
Journeying on high ; but when the day was done
He set in smiles, to rise in blood no more,
Hark ! heard ye not ? The widow's wail is over···

অতঃপর ডিরোজিও ঘৃণ্য পুরোহিততন্ত্রের কুৎসিত চেহারাটা বর্ণনা করেছেন:

The priestly tyrant's cruel charm is broken
And to his den alarmed the monster creeps.···

সামান্য অথচ সংহত বাগ্‌ভঙ্গীতে ডিরোজিও তাঁর বক্তব্যটি পেশ করেছেন! অতঃপর, বেণ্টিংক সম্পর্কে শ্রদ্ধাঞ্জলি:

Bentinck ! be thine the everlasting mead !

ইত্যাদি। তার পরে (সম্ভবত ?) রামমোহনের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন—

He is the friend of the man who breaks the seal
The despot custom sets in dead and thought,
He labours generously for human weal
Who holds omnipotence of fear as nought···

নাম না করলেও, মনে হয় ডিরোজিওর উদ্দিষ্ট 'মানববন্ধু' স্বয়ং রামমোহনই।

পরবর্তী কয়েক স্তবকে বিপ্লবের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে ডিরোজিও শেষ স্তবকে এসে বলছেন:

---

৪৪ 'Jungheera'; notes on I/10/17-'8, I/21/9-12.

ঝড় গতমান, ইন্দ্রধনু আদিগন্ত বিস্তৃত ; অন্ধকারের মসীরথ বিদায়ের পথে সঞ্চরণশীল ; মৃদু বাতাস আদর করছে উষার শিশুকে এবং,

Morning's herald star
Comes trembling into day : O ! can the sun be far ?

INDIA.

কবিতার সমাপ্তিতে মাতৃভূমির নাম সংযোজনটা অনুধাবনযোগ্য।

ভারতীয়-পর্যায়ের অন্য সব কবিতার মধ্যে 'ডেভিড হেআর'[৪৫] সনেটটি ও 'সং অফ দি ইণ্ডিআন গার্ল,'[৪৬] 'সং অফ দি হিন্দুস্তানী মিনস্ট্রেল' ইত্যাদি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ডেভিড হেআরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনটির অনুপ্রেরণা কিছু পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিগত বলেও মনে হয়।

৫

অতঃপর ডিরোজিওর ইউরোপীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচ্য। এই বিভাগে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর 'গ্রীক' কবিতাগুলি। মাতৃভূমির পরেই যে দেশকে ডিরোজিও সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন— তা হল গ্রীস। এই ভালোবাসা তার শৌর্য-বীর্য এবং সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য। ডিরোজিওর দুর্ভাগ্য যে তাঁর আমলে ভারতীয় শৌর্যের ইতিহাসমালা লিখিত হয় নি, মিলের ইতিহাস (১৮২৪)[৪৭] কিংবা তারও পূর্ববর্তী ডাওয়ের ইতিহাসে (১৭৬৪-৭২)[৪৮] বা মার্চেন্টের সমসাময়িক ইতিহাস (১৭৭২)[৪৯] বইয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বিবৃত না হয়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সাধন করেছিল মাত্র। পরবর্তীকালে এদেশে যা ঐতিহাসিক সাহিত্যের আকরগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়েছিল, টডের সেই 'রাজস্থান' (১৮২৯-৩০)[৫০] ডিরোজিওর জীবনকালে প্রকাশিত হলেও, তাঁর সায়াহ্ন যৌবনে ডিরোজিও রাজপুত ইতিহাস নিয়ে কাব্য রচনায় প্রবুদ্ধ হন নি কেন জানি না!

ডিরোজিওর দেশপ্রেম যে উৎসমুখ থেকে প্রবহমান, তাঁর গ্রীস-প্রীতিও সেই উৎসেরই ক্ষীণতোয়া পূর্বপ্রবাহ। হিন্দু কলেজে পরবর্তীকালে গ্রীসের ইতিহাস এবং মহাকাব্য দুটি পড়িয়েছেন তিনি;[৫১] কিন্তু তার আগে, কাব্যচর্চার আদি আমলেই তিনি গ্রীক-ইতিহাসের দেশপ্রেমাত্মক কাহিনীগুলির দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছেন। 'থার্মপলি', 'গ্রীকস অ্যাট ম্যারাথন', 'অ্যাড্রেস টু দি গ্রীকস', 'দি গ্রীসিআন সাআর অ্যাণ্ড সন', 'গ্রীস' এই সব কবিতাগুলিই ঐ একই ভাবনায় সংহত। 'থার্মপলি' কবিতায় শহীদ দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে ডিরোজিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন :

Let them rest—nought could appeal
Those who armed at Honour's call :

---

৪৫ সনেটটির উপলক্ষ্য ছিল ডেভিড হেআরের একটি তৈলচিত্র স্থাপন করার ব্যাপারে জনৈক ভদ্রলোকের একটি প্রস্তাব।

৪৬ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থরেণু' (১৯১০) বইতে 'বাল-বিধবা' নামে এই কবিতাটির একটি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে।

৪৭ 'History of British India' (1824) : J. Mill.

৪৮ 'History of Hindostan' (1764-'72, Vols. 1-3) : A. Dow.

৪৯ 'Considerations on India Affairs' (1772) : W. B. Merchant.

৫০ 'Annals & Antiquities of Rajsthan' (1829-30, Vols.1-2) : J. Tod.

৫১ 'Henry Derozio' (1884) : T. Edwards; Pp. 66.

Fell they not as heroes fall—
For Liberty ?

লক্ষণীয়, 'অনার' এবং 'লিবার্টি' শব্দ দুটিকে ডিরোজিও বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত করেছেন। বলতে পারি, এই শব্দ দুটি তাঁর জীবনের বীজমন্ত্র স্বরূপ! অধ্যয়নে, অধ্যাপনায়, সমাজচিন্তায়, কাব্যে— সর্বত্রই এ শব্দ দুটি তাঁর মৌল জীবনপ্রেরণা!

গ্রীক সংস্কৃতির সম্পর্কে তাঁর অনুরক্তির নিদর্শন মেলে মার্ণ্টীয় কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'দি ব্রাইডাল' কবিতাটিতে— যার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ কাহিনীর মিলটা আশ্চর্যরকমের— আর মহিলা কবি সাফোর উদ্দেশে নিবেদিত সমনাম্নী চতুর্দশীটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীক-সংস্কৃতি থেকে আমাদের নেওয়া ঋণের বিশ্লেষণ করে ডিরোজিও একটি ছোট্ট নিবন্ধিকাও লিখেছিলেন, যা আমরা সাময়িক পত্রের পাতায় পরবর্তী সময়ে খুঁজে পেয়েছি।[৫২] শুধু এই নয়, গ্রীসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তির সার্থকতম অভিব্যক্তি দেখতে পাই 'দি পোএট'স হ্যাবিটেশন' কবিতায়—যেখানে কবি ঈজীর সাগরের কোনো একটি দ্বীপের মধ্যে উধাও হতে উৎসুক![৫৩]

ফরাসী-ইতিহাস নির্ভর দুটি কবিতার মধ্যেও ডিরোজিও 'অনার' এবং 'লিবার্টি'-র জয়গান শুনিয়েছেন। 'অল ইজ লস্ট সেভ অনার' কবিতাটির নামকরণেই এ কথার যাথার্থ্য সুপ্রতিষ্ঠ; আর 'এনেকডোট অফ ফ্রান্সিস ওআন' কবিতায় মুক্তির বন্দনা করেছেন ডিরোজিও। স্পেনের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফরাসীসম্রাট মাতৃভূমিতে প্রবেশ করতে চলেছেন:

Now broken was his chain ;
What were his feelings when he cried
'I am a king again.'

মুক্তি যে মানুষের মহত্তম বৃত্তি— এই কথা তাঁর সর্বমানবীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কবিতাতে ব্যক্ত হয়েছে। 'ফ্রীডম অফ দি স্লেভ' কবিতা এবং এই 'এনেকডোট'-এর রূপকল্প পর্যন্ত তুলনীয়। সম্রাট থেকে ক্রীতদাস অবধি মুক্তির অনুভব যে সবার কাছেই সমান মহান— এই সাম্যবোধ ফরাসী-বিপ্লবোত্তরকালের একজন মহান প্রগতিবাদীর কাছে পাওয়াটা অবশ্য বিস্ময়ের নয়!

ইতালীয় কবিতাগুলি মূলত রোম্যান্টিক। তাঁর 'ইতালী' সনেটটিকে মধুসূদনের বিখ্যাত চতুর্দশী 'ইতালী বিখ্যাত দেশ কাব্যের কানন'[৫৪] কবিতার পূর্বধ্বনি মনে করতে পারি। ডিরোজিও এবং মধুসূদন দুজনেই অবশ্য ইতালীকে দেখেছেন 'দি ল্যাণ্ড অফ দি লাভার অ্যাণ্ড দি পোএট'[৫৫] হিসেবে! 'তাসো' কবিতাটিও প্রসঙ্গত কর্তব্য।

---

৫২ 'The Greeks, and what we have received from them' [Calcutta Literary Gazette', 3rd January, 1835].

৫৩ 'It should be an Ægean isle.'
'Where heaven, and earth, and ocean smile.'

৫৪ 'উপক্রম' (২) ['চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৫) : মাইকেল মধুসূদন]

৫৫ ঐ, এবং 'কবি দান্তে' [ঐ]

পর্তুগীজ সুরে তিনি মাত্র দুটি গান লিখেছিলেন— যা তাঁর কাব্যের কোনো সংস্করণেই সংকলিত হয় নি। পদবীর ঋণ শোধ করা ছাড়া এদের আর কোনো মূল্য স্বয়ং ডিরোজিওই দেন নি।[৫৬] এগুলিকে তিনি নিজেই কাব্য সংকলনে ঠাঁই দেন নি।

'জঙ্গীরা' এবং 'এনচ্যান্ট্রেস' কাব্যদুটিতে মৃদু শেকসপীআরীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে এর আগে। তাঁর শেকসপীআরীয় সনেট দুটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক শেকসপীআর সমালোচনায় যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিভাসিত হয়েছে, শেকসপীআরীয় চরিত্র এবং কাহিনী সংস্থানের ব্যাখ্যানমূলক মৌলিক সাহিত্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে— সওয়া শ বছর আগেই একজন তরুণ বাঙালী অধ্যাপক তার উপাদান সৃষ্টি করে গেছেন, এটা যথেষ্টই বিস্ময়কর!

এই পর্যায়ের সনেট দুটির মধ্যে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিএট' কবির নিজের জবানীতে লেখা এবং য়োরিক'স স্কালে'র জবানী সম্ভবত স্বয়ং হ্যামলেটের মুখেই বসানো হয়েছে। প্রথম সনেটটিতে প্রেম এবং দ্বিতীয়টিতে মৃত্যু সম্পর্কে ডিরোজিও তাঁর চেতনার সারটুকু নির্যাসিত করেছেন। 'লাভ'স ফার্স্ট ফীলিং', 'দি গোল্ডেন ভাস', 'হিআর'স এ হেলথ টু দী, ল্যাসি' প্রভৃতি কবিতায় প্রণয় সম্পর্কে তাঁর টুকরো টুকরো মর্জির পরিচয় পেলেও, এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাটুকু পিনদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এই সনেটে:

···It was something higher
Than aught that life presents ; it was above
All that we see—'twas all we dream of love.

বিশ্বসাহিত্যের অমর প্রণয়ীযুগলকে উপলক্ষ্য করে প্রেম সম্পর্কে তাঁর সার্বিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা যথাকালে আলোচ্য।

ডিরোজিওর লেখায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মেলানকলির আভাস লুকিয়ে আছে। কিন্তু ঐ বিষণ্ণ, নির্জনতামুখী, নৈঃসঙ্গ্যপ্রিয় ভাবটার সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অনুভবটা সর্বত্র প্রাপ্য নয়। 'য়োরিক'স স্কাল' সনেটে সেই সুদুর্লভ ব্যাপারটি ঘটেছে। হ্যামলেটের বকলমে কবি সেখানে পরম নৈর্ব্যক্তিতার সঙ্গে বলছেন, 'বিহোল্ড! দিস ইজ দি হিউম্যান ফেস ডিভাইন!'···ডিরোজিওর 'ডাস্ট' কবিতাতেও মৃত্যু সম্পর্কে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখি। কোনো অভিজাত বংশীয়ের কবর থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে সেখানে জুলিআন তুলনীয় উক্তি করছে— 'সী, দিস ইজ ম্যান!' ধূলির প্রাপ্য যে ধূলিতেই মেশে, এই প্রৌঢ় বোধিটুকু আঠারো বছরের ছেলের পক্ষে অভাবনীয় নিশ্চয়ই!

ইউরোপীয় পর্যায়ের অন্য কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখ বিশেষ কিছুই নেই। সমকালীন জনপ্রিয় ইংরেজ কবিদের অনুসারক এই কবিতাগুলি মোটামুটিভাবে সুখপাঠ্য হলেও, এগুলিই তাঁর দুর্বলতম কবিতা। তবু এদের মধ্যেই 'গুড নাইট' 'কানজোনেট (১, Z)', 'এ নিউ আটলান্টিস', 'গোল্ডেন ভাস', 'লাভ'স ফার্স্ট ফীলিংস', 'অ্যান ইনভিটেশ্যান' প্রমুখ কবিতাগুলির নামোল্লেখ করা চলে।

---

৫৬ 'ডিরোজিও' পদবী সচরাচর পর্তুগীজদের মধ্যেই পাওয়া যায়; তবে জনৈক গবেষকের মতে:
Both his parents were of this country, but his father appears to have been of Italian descent. ['English Poetry in India' (1869, Vol. 1) : T. B. Laurence; Pp. 98].

৬

ডিরোজিওর পাঁচমিশেলী কবিতাগুলিও তেমন কিছু বিশিষ্ট নয়। মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অবধান এদের কোনো কোনোটির মধ্যে পরিস্ফুট— তাঁর ভারতীয় পর্যায়ের মুসলিম-কাব্যধর্মের সঙ্গে এগুলির সাযুজ্য বিবেচ্য। 'ওডস ফ্রম দি পার্সিআন' হাফিজের কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ; 'সং অফ আণ্টার' প্রচলিত আরবীয় লোকবৃত্তের অনুপ্রেরিত। 'আরব্য রজনী'[৫৭] এবং 'ওমর খৈআম'-এর[৫৮] আভাসও তাঁর অন্যান্য কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়। 'ডন জুআনিকস' এবং 'পোএট্রি' কবিতাগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর আত্মকথনের প্রক্ষেপ থাকলেও, মূলত এগুলি দীর্ঘপত্ববিন্যাসের চেয়ে কিছু বেশি দাবী রাখে না। 'ম্যানিআক উইডো' একটি দীর্ঘ চারণগাথা— কাব্যমূল্য এরও তেমন কিছু নেই। অবশ্য এটা স্মর্তব্য যে, 'জঙ্গীরা' ছাড়া ডিরোজিওর অন্যান্য কবিতার মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সর্বমানবিক পর্যায় দুটির কবিতাগুলিই কাব্যমূল্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর 'টু মাই স্টুডেন্টস' সনেটটি সুবিখ্যাত। ডিরোজিওর প্রথম কবিতার একটি রূপকল্প সম্পর্কে এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা উল্লেখ করেছি: সবে পাখা মেলতে শেখা শিশু পাখির সঙ্গে তরুণ ছাত্রদের তুলনা করেছিলেন সেখানে বালক কবি নিজের ছাত্রাবস্থায়। নিজে শিক্ষকে পরিণত হয়ে ঐ ইমেজকে তিনি পুনরাবর্তিত করছেন, আরো সব চিত্রকল্পের বিন্যাসে ছবিটাকে সুসংহত করে:

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like the young birds in soft
summer hours)
Their wings to try their strength···

গুরু ড্রামণ্ডের থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া এই ছাত্রবাৎসল্যই তাঁর জীবনের পরমতম অর্জন। মা এবং বোনকে নিয়ে ছোট্ট সংসারের বাইরে এরাই ছিল তাঁর বৃহত্তর সংসারে নিত্যসঙ্গী; এমন কি তাঁর মৃত্যুশয্যাতেও তাঁকে 'আশার আনন্দময় বাণী' শুনিয়েছিল তাঁর এই সবে ডানা মেলতে শেখা ছাত্ররাই![৫৯]

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি ভাষণের সন্ধান অতি সম্প্রতি আমরা পেয়েছি যাতে তিনি মানবপ্রেম,

---

৫৭ 'Jungheera', notes on II/4/9-10.

৫৮ 'Come hither boy! fill up my bowl—' ['Here's a health to thee, Lassie!'].
মূল 'রুবাইআৎ-ই-ওমর খৈয়াম'-এ সাকী হল বালক; স্পষ্টতই, ডিরোজিও মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ডিরোজিওর ঠিক সমান বয়স্ক ফিটজেরালড তাঁর অনুবাদের কারিকুরিতে সাকীকে বালিকা বানিয়ে দিয়েছেন!

৫৯ মৃত্যুর কিছু আগে ডিরোজিও তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি ক্যাম্পবেলের 'প্লেজার্স অফ হোপ' কবিতাটি শুনতে চাইলে তাঁর জনৈক ছাত্র সেটি আবৃত্তি করে শোনান। ['Henry Derozio' (1884): T. Edwards, Pp. 167].

জ্ঞান এবং যোগ্যতা লাভের আশীর্বাদ করেছিলেন ;[৫৯-ক] এই দৃষ্টির আলোকে তাঁর সনেটের সমাপ্তিটুকু অনুধাব্য :

…When I see
Fame in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

অধ্যাপকের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। ভবিষ্য-দর্পণে যা দেখেছিলেন, তা সত্য হয়েছিল উত্তরকালে, তাঁর শিষ্যদল 'ইঅং বেঙ্গল' এ দেশের ইতিহাসে চিরায়ত যশোমাল্যের অধিকারী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত হিন্দু কলেজের সহপাঠীদের উদ্দেশে লেখা মধুসূদনের ইংরেজী একটি সনেটের কথাও হয় তো মনে পড়ে।[৫৯-খ]

ব্যক্তিগত উৎস থেকে লেখা অথচ সর্বময়ী রোম্যান্টিকতা অর্জন করেছে ডিরোজিওর একটি বিস্মৃত কবিতা 'সিস্টার-ইন-ল'। অনুজা আমেলিআ নাকি দাদা হেনরীর কাছে প্রায়ই আবদার করতেন একটি বৌদি পাবার জন্যে! অবশেষে একদিন প্রাতরাশের থালার নীচে তিনি দাদার কবিতা খুঁজে পেলেন 'বায়না'র জবাব হিসেবে[৬০] :

A sister-in-law, my sister dear
A sister-in-law for thee ?
I'll bring thee a star from where angels are
Thy sister-in-law to be.

কবির কল্পনা এরপর উদ্দাম পাখা মেলেছে! 'ঠাকুর ঘরের পুণ্যপ্রভা' বোনটির জুড়িদার হতে হলে তার বৌদিকে হতেই হবে 'পুণ্য হোমের টিপ'! বোনটির জন্যে হেনরী নাকি 'ঝড়ের রাতে পরীরানীর পাখা ধার করে নিয়ে উড়ে গিয়ে রামধনুর একটি রেখা ধরে আনবেন'— ছোট বোনটির বৌদি সেই হবে! কিংবা তার বৌদি হবে 'সাগরজলে ডোবা প্রবালরানীর মুকুটের মধ্যমণিটি!' শেষ স্তবকে হেনরীর কল্পনা ধাবমান 'পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার' হয়ে— কল্পনালোকের মন্দার ফুলটিকে এনে বোনটির হাতে ধরিয়ে দেবেন তার বায়না মেটাতে![৬১]

জানি না এই অনবদ্য কবিতা হাতে পেয়ে আমেলিআর মনোভাব কি হয়েছিল! কিন্তু এর থেকে একটা জিনিস বুঝে নেবার আছে ; সত্যি-সত্যিই বিয়ে করতে চান নি বলেই এত সুন্দর অথচ অসম্ভবের পাখনা-ছড়ানো কবিতাটির সাহায্যে ডিরোজিও অনুজাকে নিরস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন হয় তো বা!

বিয়ে না করতে চাওয়ার পেছনে কোনো মনোভাব সক্রিয় ছিল সেটা গবেষণার বিষয়। ডিরোজিওর

৫৯ ক 'Calcutta Literary Gazette', 3rd January, 1835.

৫৯ খ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (৪র্থ সং, ১৯২৫) : যোগীন্দ্রনাথ বসু ; পৃ ১১২-'৩।

৬০ 'English Poetry in India' (1869, Vol. 1) : T. B. Laurence, Pp. 104-'5.

৬১ উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে বিধৃত রূপকল্পগুলি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ 'বৌ-দিদি' ['তীর্থরেণু' (১৯১০)] থেকে নেওয়া।

জীবনীকার টমাস এডোআর্ডসের বক্তব্য অনুসারে, ভাগলপুরে যাবার সময়ে তাঁর জীবনে একটি প্রণয় আসে, যেটি মধুর পরিণতিতে সমাপ্তি লাভ করে নি কোনো অজানা কারণে।[৬২] এডোআর্ডস তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির না করলেও, ডিরোজিওর ব্যক্তিগত পর্যায়ের কিছু কবিতা বিশ্লেষণ করলে, তাদের অবলীন প্রমাণে ডিরোজিওর জীবনের এই প্রায় অজানা তথ্যটি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব।

ভাগলপুর থেকে 'ইণ্ডিআ গেজেট' পত্রিকার জন্য তিনি যে-সব কবিতা লিখে পাঠাতেন, পরে ডিরোজিও নিজেই তাদের মধ্যে অধিকাংশ প্রণয়-কবিতা আর সংকলিত করেন নি নিজের বই দুটিতে, যদিও এই বাতিল কবিতাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিই ভালো কবিতা। এই কবিতাগুলির মূল সুরটা হল প্রথম প্রণয়ের ভীরু এবং হতাশ ভাবটুকু; কবিতাগুলি অনুধাবন করলে এদের পিছনে কোনো বাস্তব জগতের শরীরিণীর অস্তিত্ব অনুভব করা চলে! 'টু—' (১, ২), 'এলিজিআক স্ট্যাঞ্জাজ', 'লাভ মি অ্যাণ্ড লীভ মি নট', 'লাইনস রিট্‌ন অ্যাট দি রিকোএস্ট অফ এ ইঅং লেডী',[৬৩] প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় কবিতাগুলিতে এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য মিলবে। এদের সবগুলিই ১৮২৫ সালে লেখা, জানুআরি থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এরপরই ১৮২৬এর গোড়ার কিছুদিনের মধ্যে ডিরোজিও কলকাতায় ফিরে আসেন আকস্মিকভাবে। এবং ১৮২৬ সালের মার্চ মাসে লেখেন 'হিআর'স এ হেলথ টু দি, ল্যাসি!' এই কবিতার একটি ইমেজ আমাদের ধারণাকে দৃঢ়তর করে:

> Though wild waves roll between us now
> Though Fate severe may be, Lassie…

উদ্দাম ধাবমান এই প্রবাহ সম্ভবত গঙ্গারই। ভাগলপুরবাসিনী 'ল্যাসি' এবং কলিকাতা নিবাসী 'হেনরী'র প্রণয়ের বাধার রূপকল্প ব্যবহার করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গার উদ্দাম প্রবাহের কথা মনে এসেছে ব্যর্থ প্রণয়ী কবির। ভৌগোলিকভাবেও গঙ্গাই তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল!

'ল্যাসি'র পরবর্তী প্রণয়কবিতাগুলি আরো উল্লেখযোগ্য। এতদিন পর্যন্ত 'ইণ্ডিআ গেজেট'-এর পাতায় তিনি 'জুভেনিস' ছদ্মনামে লিখতেন। এখন থেকে অন্যান্য কবিতা এবং প্রবন্ধ 'জুভেনিস' (এবং 'ইস্ট ইণ্ডিআন') নামে লিখলেও প্রণয়কবিতাগুলি স্বনামে ('হেনরী') লেখেন এবং এই কবিতাগুলির সাধারণ শিরোনাম দেন 'অ্যাড্রেসড টু হার, হু উইল বেস্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দেম।'[৬৪] সমস্ত ব্যাপারটুকু নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর জীবনের এই অনুদ্‌ঘাটিত তথ্যটি বিশ্লেষণে। প্রথম প্রণয়ের যে প্যাশনেট রোম্যান্স তরুণ কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, অন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠে তার দীপ্তি অমলিন হয় নি বলেই হয় তো বা তিনি আর বিয়ে করেন নি, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে এ সব তথ্য মিলিয়ে দেখে।

ব্যক্তিগত উৎস সঞ্জাত ডিরোজিওর আর দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'দি পোএট'স গ্রেভ' (১, ২); প্রথমটি ভাগলপুরে থাকবার সময় লিখেছিলেন তিনি, দ্বিতীয়টি মৃত্যুর কিছুদিন আগে। দ্বিতীয়টি

---

৬২ 'Henry Derozio' (1884) : T. Edwards; Pp. 24-'5.

৬৩ 'India Gazette'; (1825, different issues).

৬৪ do; (1826, do).

একটি সনেট এবং ডিরোজিওর কাব্যের স্বভাবসিদ্ধ অস্থায়ী-মেলানকলি ভাবটুকু নম্র মূর্তিতে ফুটেছে নিবিড়ভাবে এর মধ্যে :

Be it beside the ocean's foamy surge
On an untrodden, solitary shore
Where the wind sings an everlasting dirge
And the wild wave, in its tremendous roar
Sweeps o'er the sod !—There let his ashes lie
cold and unmourned !···

এর তুলনায় প্রথমটি স্পষ্টতই দুর্বলতর :

···How sweet the spot— the poet's tomb !
There ling'ring fancy silent weaps
And there eternal laurels bloom
To mark the spot where Genius sleeps.

এই কবিতাটি এখন পুরোনো সাময়িক পত্রের পাতায় অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে, ডিরোজিওর আরো অজস্র লেখার মতোই ![৬৫]

দ্বিতীয় কবিতাটির সমাপ্তিটুকুও অনুধাবনীয় :

There, all in silence, let him sleep his sleep !
No dream shall flit into that slumber deep—
No wandering mortal thither once shall wend,
There, nothing, o'er him but the heavens shall weep
There, never pilgrim at his shrine shall bend
But holy stars alone their mighty vigils keep !

মৃত্যু সম্পর্কে ডিরোজিওর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় তাঁর 'ডাস্ট' কি 'য়োরিক'স স্কাল' কি 'দি টুম' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্যুর বিরাট মহনীয়তাকে তিনি এখানে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন নিজের প্রেক্ষিতে, পরিণত প্রজ্ঞাবুদ্ধির আলোয়। ডিরোজিওর আত্মবীক্ষার পরিচায়ক এই সনেটটির সেদিক থেকে একটা পরমমূল্য রয়েছে।

৭

ডিরোজিওর কাব্যের অন্যতম প্রধান স্বরগ্রাম যে মানুষের বন্ধনহীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, এ কথা আমরা তাঁর দেশপ্রেমাত্মক ও গ্রীক, ফরাসী কাব্যপর্যায়গুলি প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছি। তাঁর সর্বমানবিক কাব্যও ঐ মুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাতেই অনুরঞ্জিত।

---

৬৫ 'India Gazette'; (1825, last issue of February.)

এ দেশে সামাজিক আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশের প্রথম নেতা ছিলেন ডিরোজিও, তাঁর ছাত্রবর্গসহ। পরবর্তীকালে আমরা শুধু তাঁর দেশপ্রেমের কথাটুকুই স্মরণ করে রেখেছি। কিন্তু বিশ্বপ্রেমের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রগতিশীলতা আছে— এদেশে তারও অগ্নিহোত্রী ডিরোজিওই। রামমোহন যদি 'ভারতপথিক' হন, তাহলে ডিরোজিওকে আমরা সেই মর্যাদার সঙ্গে এদেশের প্রথম 'বিশ্বপথিক' অভিধাতেও ভূষিত করতে প্রাক্তন-নির্দিষ্ট। তাঁর সর্বমানবিক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি কবিতার বিচারেই এই প্রাক্তন-নির্দেশ প্রস্ফুট হবে।

এই পর্যায়ের বিশেষ মূল্যসম্পন্ন কবিতাগুলির মধ্যে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স', 'ফ্রিডম অফ দি স্লেভ', 'মর্নিং আফটার দি স্টর্ম' এবং 'দি পোএট্রি অফ হিউম্যান লাইফ'এর উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। কোনো বিশেষ ঘটনার পটপ্রেক্ষায় নয়, সার্বিকভাবে, সর্বমানবিকবোধিতে যে মুক্তির প্রয়াস প্রবহমান—তারই ব্যাখ্যান করেছেন ডিরোজিও এইসব কবিতায়।

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'[৬৬] কবিতায় মুক্তির প্রবণতাকে একটি মৃদু প্রদীপের শিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন ডিরোজিও। অত্যাচারী ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে টিঁকে থাকবার জন্যে আপ্রাণ লড়াই করেও শিখাটি অনির্বাণ রইল না। নিজের হৃদয়কে ঐ দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করে অতঃপর কবি নিজেকেই প্রশ্ন করছেন :

> And wilt thou tremble so, my heart
> When the mighty breathe on thee ?
> And shall thy like this depart ?

কবিতার শেষ চরণে এসে ডিরোজিও নিজেই এর স্পর্ধিত জবাব দিচ্ছেন :

> Away ! it cannot be,

অপরাজেয় মুক্তিসংগ্রামীর লৌহদৃঢ় মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঐ একটি 'স্পার্টান'-চরণে বিবৃত হয়েছে !

মুক্তির ঐ অপরাভবী মনোভঙ্গী তাঁর 'দি ফ্রীডম অফ দি স্লেভ' কবিতাটিতেও সমানভাবে সোচ্চার। ১৮২৭ সালে যখন এই কবিতা লেখা হয়, তখনো পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রীতদাস প্রথা বর্তমান। রামমোহন যে সময়ে এ দেশে নারীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য লড়াই শুরু করেছেন— সে সময়েও এদেশের নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ধরে নিয়ে গিয়ে দেশ-দেশান্তরে বিক্রী করে দিচ্ছেন আমাদের তদানীন্তন শাসককুলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা। ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের ঢালাও নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন খবরের কাগজগুলি পর্যন্ত ফলাও করে তখন বার করত! মনে রাখতে হবে এই পটভূমিতে এ কবিতা লেখা; বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা রহিত হয় এরও ক'বছর পরে, এর সিকি শতাব্দী পরে শ্রীমতী স্টো-র 'আংকল টম'স ক্যাবিন' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছে, ডিরোজিওর সমান-বয়স্ক আব্রাহাম লিংকনের সাধনা সফল হয়েছে তারো পরে !

এই কবিতার মুখপাতে ক্যাম্পবেলের এক ছত্র কবিতা উধৃত হয়েছে :

> And as the slave departs, the man returns.

---

৬৬ 'The Orient Pearl' (1832).

—এই ছত্রটিই এর মূল অনুপ্রেরণা বলে মনে করতে পারি। ক্রীতদাসকে মুক্তির সংবাদ শোনানোর পর তার চিন্তা এবং কাজের ছবি আঁকা হয়েছে :

He knelt no more ; his thoughts were raised ;
He felt himself a man
He looked above— the breathe of heaven
Around him freshly blow ;
...
He looked upon the uning stream
That 'neath him rolled away
Then thought on winds, and birds and floods
And cried, 'I'm free as they !'

কবিতার শেষে মুক্তিসংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি বাণী :

And glory to the breast that bleeds,
Bleeds nobly to be free
Blest be the generous hand that breaks
The chain a tyrant gave,
And feeling for degraded man
Gives freedom to the slave.

—এই মানবতাবোধই ডিরোজিওর প্রগতিশীলতার মৌলসত্তা।

সর্বমানবিক পর্যায়ে ডিরোজিওর আর-একটি উল্লেখ্য কবিতা হল 'মর্নিং আফটার দি স্টর্ম' ; এর উৎসটা ব্যক্তিক হলেও ব্যঞ্জনাটুকু সর্বময়ী। ঝড়ের পরে প্রকৃতির বিধ্বস্ত রূপটি দেখে কবির মনে প্রকৃতিরই অবলীন ধ্বংসাশী শক্তিগুলির কথা প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবিতার প্রথম পর্যায় এই বিস্ময়ের অনুভূতির মধ্যে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অংশে, কবির মনে সহসা এক বিচিত্রতর অনুভবের সৃষ্টি হল ; ধ্বংসের মধ্যেই যে নতুন সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে, এই পরম দার্শনিকতত্ত্ব বুঝতে পারল তাঁর বিস্মিত মন, এবং,

—Oh ! there
I learned a moral lesson, which I 'll store
Within my bosom's deepest, inmost core ;

'পোএট্রি অফ হিউম্যান লাইফ' কবিতাটিও, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' কবিতার মতো ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এটিও সাময়িকপত্রের পাতায় বিলীন হয়ে আছে।[৬৭] জগৎ এবং জীবন, বস্তু এবং চেতনা সম্পর্কে তাঁর পরিণতচেতনা এর মধ্যে প্রগাঢ় রসমূর্তিপরিগ্রহ করেছিল বলে, এটিকে তাঁর দর্শনচিন্তারই ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা চলে। জীবনের ছোটখাট সব টুকরো টুকরো ঘটনার অ্যালবাম

৬৭ 'Bengal Annual & Literary Keepsake' (1830).

সাজানোর মধ্যেই যে জীবনের কাব্য লুকিয়ে রয়েছে, তার চিরন্তনমর্মর গুঞ্জরিত হচ্ছে প্রতিটি সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায়, জ্যোৎস্নায়-অন্ধকারে, বাতাসে-স্রোতোস্বিনীতে। ঐ গুঞ্জরণ—'শুভায় ভবতু' হয়ে ডিরোজিওর এই চূড়ান্ত-কবিতার বাণীরূপ ধরেছে। আর এই শুভাবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ, সেই হল সর্বশুভাশুভের নিয়ন্তা :

But *Man* has thought to which he giveth form.

এই চেতনাতেই ডিরোজিওর সমগ্র সাধনার ভূমা। মোপার্তুই এবং কাণ্ট ডিরোজিও অভিনিবেশ নিয়ে পড়ে ছিলেন।[৬৮]

---

৬৮ ৭নং টীকা পুনর্দ্রষ্টব্য।

পূর্বপত্র। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এস সি সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা ১২। ছয় টাকা।
লেখকের মুখোমুখি। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২। ছয় টাকা।
সম্পাদকের বৈঠকে। সাগরময় ঘোষ। আনন্দ পাব্লিশার্স, কলকাতা ৯। ছয় টাকা।
বিলুপ্ত হৃদয়। আজহার উদ্দীন খান। ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। তিন টাকা।

কাব্যে কবির যে ভাবরূপটি ফোটে, কবি মানুষটি তেমন না হতে পারেন, এমন কি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের মানুষ হতে পারেন, এই কথা বলেছেন কবিদের ভুবনে যিনি রাজ চক্রবর্তী স্বরূপ, সেই রবীন্দ্রনাথ। এ-কথার যাথার্থ্য নিয়ে আমরা তর্কও চালাতে পারি, আবার বিনা দ্বিধায় একে শিরোধার্যও করে নিতে পারি। কিন্তু একটা জিনিস স্বীকার করতেই হবে সকলকে যে মহান শিল্পী বা স্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠতা মানুষ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় মেনে নিলেও, মাত্র ঐটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। তাঁদের ব্যক্তি-মানুষের সমতলভূমিতে নামিয়ে এনে প্রতিদিনের পরিবেশে পরিচিত মানুষ হিসাবেও দেখতে চান। এই না দেখা পর্যন্ত যেন অন্তর ভরে না কারোর। মনে হতে থাকে বুঝি সমগ্র করে জানা বা পাওয়া হল না।

এ থেকেই এসেছে কবি, শিল্পী ও সুরকারদের জীবনী সম্বন্ধে সন্ধিৎসা এবং যেখানে তৈরি জীবনী মেলে নি, সেখানে মানুষের কুশলীকল্পনা গালগল্প ও উপকথার মালমশলা দিয়েই মনের মতো কাহিনী রচনা করেছে। এদেশে কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবীর, সুরদাস, বৈজুবাওরা, তানসেন, মীরাবাঈ, সবাইকে কেন্দ্র করে এত যে কাহিনী গড়ে উঠেছে, তা তো লোকমানসেরই সৃষ্টি এবং বলা দরকার যে তা তাঁদের শিল্পবস্তুরই প্রতিফলিত দ্যুতি। অর্থাৎ কাব্যে ও কবিকাহিনীতে মেলাবার প্রয়াস আছে চিরকালই, থাকবেও।

কিন্তু ছাপা বইয়ের যুগে মানুষের অবাধ কল্পনার মুখে লাগাম পড়ে গেছে। আজ আর কোনো কবি বা সুরকারকে আশ্রয় করে কল্পকথা বা কাব্যগাথা তৈরি হয় না। হয় সাল-তারিখ ও তথ্য সম্বলিত জীবনচরিতই এবং প্রায়শ তা হয় স্রষ্টার জীবনান্তের পর। অবশ্য জীবনকালেই যাঁদের জীবনী লিখিত হয়, তাঁরা দেখে যেতে পারেন, তাঁদের দান দেশবাসী কি ভাবে নিয়েছেন, স্থান কোনখানে চিহ্নিত করেছেন। তবে সে-রকম ভাগ্যবান আর কজন?

> Biography in the fruit of a tree, whose root
> Is stuck to the soil of death's eternal coil…

অবশ্য জীবিতদের জন্যেও একালীন কলম-কর্মীরা উদ্ভাবন করেছেন এক রকম সাহিত্যবস্তু, যাকে সাংবাদিক ভাষায় বলে রিপোর্টাজ। প্রকৃতপক্ষে তা হল প্রতিষ্ঠাবান মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলাপচারীর বিবরণ এবং তারই সূত্র ধরে উক্ত ব্যক্তির জীবন ও কৃতির পর্যালোচন। ইংরেজিতে জন গান্থার, লুই ফিশার, ইথেল মেনিন প্রমুখের এই জাতীয় অনেক বই আছে, কোনো কোনো বই খুব বিখ্যাতও। বাংলায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য বই পড়েছিলাম দিলীপকুমার রায়ের তীর্থঙ্কর, যাতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রাসেল ও রলাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গগুলি পরিপাটি ভাষায় পরিবেষিত হয়েছিল।

আনন্দের কথা যে একই সঙ্গে দুজন কৃতী লেখক এবং একজন সম্পাদক সম্প্রতি সাহিত্যের এই বিভাগটি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। প্রথম প্রথম কাজ আরম্ভ অবশ্য হয়েছে সাহিত্যিকদের সঙ্গে মোলাকাত তথা তাঁদের ঘরোয়া পরিচিতির প্রসঙ্গ নিয়ে। ক্রমে আশা করছি চিত্রশিল্পী, গায়ক, নট, বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিবিদ, নানা পর্যায়ের বিশিষ্ট মানুষেরই নিকট-পর্যবেক্ষণের বিবরণী লেখা হবে এবং সমসাময়িক কালে সাহিত্য গুণাশ্রিত who's who রূপে এ-সব বই বাজার-চলতি রম্যরচনার শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীও হয়ে উঠবে। বিশেষ করে নট-পরিচিতির বইগুলির ভবিষ্যৎ তো খুব বেশি সম্ভাবনীয়তাপূর্ণ হবে বলেই আশা করছি। তবু যে সূচনার অধ্যায়টা সাহিত্যিক সমীক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছে, এতে সাহিত্যপ্রেমিক মাত্রেই প্রীত হবেন। স্বাজাত্যগর্ব কার নেই ?

আলোচ্য বই চারটির মধ্যে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপত্র সুরু হয়েছে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কথা দিয়ে, যিনি মাত্র সেদিন দেহরক্ষা করলেন, আর শেষ হয়েছে আশালতা সিংহের প্রসঙ্গ দিয়ে, যিনি সুপ্রবীণা না হতেই সাহিত্যিক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেছেন। মাঝে আছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, যাঁরা অল্পদিন আগেই বিদায় নিয়েছেন এবং আছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু ও প্রভাবতী দেবী, যাঁরা আমাদের সৌভাগ্যবশত আজো আছেন এবং সাহিত্যলক্ষ্মীর আরাধনায় উপচারও জুগিয়ে চলেছেন।

মৃতদের মধ্যে নরেশচন্দ্রের রচনায় একদিন স্খলিত পতিত অবনমিত মানুষের কথা অমিত দুঃসাহসের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল এবং বাংলা সাহিত্যের যে-অধ্যায় আধুনিক নামে অভিহিত, তার আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, সাহিত্যের মুল্লুকে পুরানো জলাচরণীয়তার নিরিখ পালটে দিয়ে পত্তন করেছিল নূতন মূল্যমানের। সেই শক্তিমান অগ্রনেতাকে তাঁর জীবনসায়াহ্নে দেখেছি সাহিত্যজগত থেকে বহু দূরে অবস্থিত থাকতে। সেই ফুরানো বসন্তের পুরানো ফুলের সুবাসটুকুই পাওয়া যায় সুধীরঞ্জনের লেখায়।

আজকের নূতন পাঠক হয়তো জানেনই না যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন মুখোপাধ্যায় একদিন বাঙালীর প্রিয়লেখক ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বেষ্টন করে এঁরা এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণি গাঙ্গুলী ভারতী-গোষ্ঠীর সভ্য হিসাবে সাহিত্যে কর্তৃত্ব করতেন। অসমঞ্জ ও মণিলালের (বন্দ্যোপাধ্যায়) আসন ছিল প্রধানত মাতৃসমাজে, যেমন ছিল প্রভাবতীরও এবং মণীন্দ্রলালের রমলা ফুরফুরে রোমান্স হিসাবে সেদিনের যুবকমহলকে বিলকুল মাত করে দিয়েছিল। সময় চলে গেছে, সময়ের ফসলও বাসি হয়ে গেছে কালের সঙ্গে। ধাবমান নূতন কাল সেই পুরানো অধ্যায়কে পিছনে ফেলেই এবং ন্যায্য দাম না দিয়েই পালাতে চাইছে। সে-গতিকে বাধা দিয়ে সুধীরঞ্জন শুধু জাতির অকৃতজ্ঞতা স্খালনই করেন নি, গভীর শ্রদ্ধাশীলতা ও সাহিত্যনিষ্ঠারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপস্থাপিত কুশীলবদের রচনার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের স্বাক্ষর আছে এই নিবন্ধগুলিতে। এ ছাড়া তাঁর লিপিচাতুর্য তো ফুটেছেই প্রত্যেকটি লেখায়। বিশেষ করে ভালো লাগল অগ্রজকবি কুমুদরঞ্জনের প্রসঙ্গটি। কুমুদরঞ্জন মানুষটি যেমন নিখাদ সাদা, এই রচনাটি তেমনি নিখুঁত চরিত্রপর্যবেক্ষণ। এই অশ্রদ্ধাবাদিতার দিনে বইটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সহবত শিক্ষায় সহায়ক হলে সুখী হব।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বই লেখকের মুখোমুখির পরিকল্পনাও একই। তবে তাঁর আসরে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সজনীকান্ত দাস ও বিমলচন্দ্র সিংহ, এই চার জন প্রস্থিত ব্যক্তির কথা কীর্তিত

হয়েছে, বাকি সকলেই সশরীরে মর্ত্যলোক আলো করে আছেন। তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ থেকে সমরেশ বসু ও রমাপদ চৌধুরী পর্যন্ত নবীন পর্যন্ত বহুজনই আছেন। আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, জরাসন্ধ, বনফুলাদি। বর্তমান লেখক এবং মজতুবা আলিও বাদ পড়েন নি এই পরিচয়ের প্রীতিভোজ থেকে।

লক্ষণীয় যে সুধীরঞ্জনের ঝোঁকটা প্রধানত প্রবীণদের শ্রদ্ধা নিবেদনের দিকে। অরুণ মুখোপাধ্যায় নবীন প্রবীণ দু-তরফকেই ছুঁয়েছেন, যদিও উল্লেখের পক্ষপাতটা তাঁর প্রাগাধুনিক ও আধুনিকদের দিকেই। সেটা হয়তো দুই লেখকের বয়সের সীমা নিরূপক। তবে সুধীরঞ্জন যেখানে স্রষ্টার কাছ থেকে পাওয়া আলোয় সৃষ্টির মর্ম-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন, অরুণ সেখানে প্রধান মনোযোগটা রেখেছেন চরিত্রগুলির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর। বিদ্যাবৈদগ্ধ্য ও সদ্‌গুণাবলীর সঙ্গেই তাঁদের বাতিক এবং বদ-খেয়ালগুলিও তাই অনাবৃত করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বাচনভঙ্গীও তাঁর বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হয়েছে হৃদ্য, লঘু এবং পরিহাস প্রসন্ন। সব চেয়ে খুশি হবার মতো অধ্যায় হল সুনীতিকুমার প্রসঙ্গটি। পূজনীয় মাস্টার মশাইয়ের এ-রূপ তাঁর ছাত্রদের মনে স্থায়ী হবে নিশ্চয়।

তৃতীয় বই সাগরময় ঘোষের সম্পাদকের বৈঠকে প্রাণধর্মে একই জাতের রচনা। তবে তার বিন্যাস-পদ্ধতি একটু অন্য ধরণের। প্রথম দুটি বইয়ের মতো ব্যক্তিকে অনুসরণ করে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যাতে পৌছানোর চেষ্টা হয় নি এতে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন-কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুণ যে-সমস্ত সাহিত্যিকের কাছে যেতে হয়েছে, কিংবা কোনো-না-কোনো সময় যাঁরা এসেছেন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তাঁদের কাহিনী বিবৃত করেছেন তিনি হালকা হাতে এবং বেশ একটু বৈঠকী মেজাজেই। এই জন্যেই তাঁর লেখায় বিচার-বিশ্লেষণের নেশা শিং উঁচিয়ে দাঁড়ায় নি, বিবরণের ঝুলি খুলেও মণি-মাণিক্য পরিবেষণের চেষ্টা হয় নি, খাসা খোস-গল্পের ঢঙে বলা হয়েছে বহুজনের কথা। সেই গল্পের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সুখ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাতের মিছিল এবং সকলের সম্পর্কেই ফুটেছে রচয়িতার একটি সদয় সমদর্শিতা। এই এলবামে বিভূতি বাঁড়ুজ্যে, তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, কতজনকে দেখলাম। চেনার মধ্যেই যেটুকু অচেনা, দেখার মধ্যেই যে-জায়গাটা না দেখা, তার গুণেই আলেখ্যগুলি হয়েছে বিশেষ উপভোগ্য এবং যেহেতু লেখার মেজাজের সঙ্গে প্রায় আগাগোড়াই নিজের আশ্চর্য মিল দেখতে পেয়েছি, তাই দু-একবার মনে হয়েছে, বইটা আমার লেখাও হতে পারত। কিন্তু না, এত দীর্ঘ বৈঠকী আলাপ শোনার ধৈর্য যদিও আমার আছে, করার দম নেই! তার আগেই ক্লান্তিতে হাই উঠতে থাকে। সাগরময় অনলস উদ্যমে আসর জমিয়ে গেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তাই তাঁকে নির্ভেজাল প্রশংসার শিরোপা দিয়েই ভরতবাক্য উচ্চারণ করছি।

আগেকার বইগুলি থেকে চতুর্থ বইটি একটু অন্য জাতের। সমসাময়িক সাহিত্যসাধকদের স্মৃতি বা ঘনিষ্ঠ পরিচিতির আলেখ্য আঁকেন নি এতে লেখক। একদিনের খ্যাত ও সমাদৃত এবং অধুনা প্রায়-বিস্মৃত একদল গুণীলেখকের জীবন ও রচনার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তিনি। এঁদের মধ্যে যেমন উনিশ শতকের কয়েকজন আছেন, তেমনি আছেন কয়েকজন সাম্প্রতিক কালেরও এবং একজন আমাদের সৌভাগ্য বশত এখনো সাহিত্যসাধনায় নিরতও রয়েছেন।

বলা দরকার যে গ্রন্থকার এই বইয়ে মশারফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, আব্দুল করিম

সাহিত্যবিশারদ, ওয়াজেদ আলী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তাফা ও জসীম উদ্দীন এই আটজন মুসলীম সাহিত্যস্রষ্টার কথা বলেছেন এবং তাঁর আলোচনাগুলি মামুলি তথ্যপঞ্জীও না, ভাসা-ভাসা সৌজন্য প্রকাশও নয়। প্রত্যেকের জীবনকথা আশ্রয় করে তিনি গেছেন তাঁর জীবনদর্শনের গভীরে এবং তারই আলোয় ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

একটা কথা এখানে সঙ্কোচের সঙ্গেই বলতে হবে যে নজরুলের অনস্বীকার্য ঔজ্জ্বল্য কবুল করলেও বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আমরা মুসলমান সাহিত্যিকদের দানের কথা বড়-একটা বলি না। অথচ গণনীয় দান যে তাঁদের আছে এবং তা মেনে না নেওয়া যে আমাদেরই বিবেচকের দৈন্য প্রকট করে, এ-কথা সত্যনিষ্ঠ মানুষরা না বলে পারেন না। সেই ত্রুটি সংশোধনে অগ্রসর হয়ে আজহার উদ্দীন একটি বড় কাজই করলেন না, বাঙালী সাহিত্যসেবীদের মুখও রাখলেন। শুধু এ জন্যেই তিনি ধন্যবাদার্হ, যদিও তাঁর রচনা দাবী করে এ ছাড়াও কিছু এবং তা বেশ কিছুই।

আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি যে বাল্যে এক মুসলীম পরিবারে আমার পুত্রাধিক স্নেহে গৃহীত হওয়ার ভাগ্য হয়েছিল। সেখানেই প্রথম পরিচয় হয় আমার মশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু, কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য ও মোজাম্মেল হকের ফেরদৌসীচরিতের সঙ্গে। আরো অনেক বই পড়েছিলাম এখানে, যার মধ্যে এমদাদ আলির ডালি ও সৈয়দ হোসেনের যমজ ভগিনী কাব্য এবং এক্রামুদ্দীনের পারস্য-প্রতিভা আলোচনা-গ্রন্থের কথা এখনো মনে আছে। কাজেই আজহারের ক্ষোভের সঙ্গত কারণ আছে মেনে নিয়েও বলব যে আমারা কেউ কেউ এঁদের জানতাম। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকায় আমি এই সব কবি-সাহিত্যিকের কথা সংক্ষেপে আলোচনাও করেছি। ওয়াজেদ আলি, গোলাম মোস্তাফা, শাহাদৎ হোসেন ও জসীম আমার পরিচিত ছিলেন। শুধু পরিচিত নন, শেষোক্ত দুজন ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর তালিকাভুক্তই এবং শাহাদৎ যদিও আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, আর জসীম চলে গেছেন বিভক্ত বাংলার অপরার্ধে, তবু তাঁরা আজো হৃদয় ভরে আছেন, যেমন আছেন, হবিবুল্লা বাহার, তার ভগিনী শামসুন নাহার, আবদুল কাদির, জৈনুল আবেদীন, সুফী মোতাহের হোসেন এবং আরো সব সুহৃদ ও সহযাত্রীরা। বাংলা দেশ ভাগ হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাগ হয় নি, কোনোদিনই হবে না। অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এঁদের নাম।

সেই ইতিহাসের খসড়ায় যুক্ত করতে হবে আর যে-অধ্যায়টি, দেশের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে তা তুলে ধরলেন আজহার এবং এ-কাজ যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা বিচারশীল পাঠককে বোঝাতে হবে না। সাহিত্যের আকাশে সূর্য-চন্দ্র সব যুগেই কম দেখা দেন, কোনো কোনো যুগ একেবারেই ফাঁকা যায়। কিন্তু নূতনের পথ খুলে দেন এবং এক যুগ থেকে দেশের মানসিকতাকে আর-এক যুগে বয়ে নিয়ে যান যাঁরা, সেই অমহান লেখকদের দ্যুতি অল্প বলেই তাঁদের উপেক্ষা করা সমীচীন নয়, সুস্থ বিচারবুদ্ধিরও পরিচায়ক নয় তা। অথচ তাই করে থাকি আমরা এবং সেই কারণেই এমন অনেক সাহিত্যকীর্তির কথা আমরা অম্লান বদনে ভুলে যাই, যা রত্ন পর্যায়ের জিনিস। তেমনি এক গুচ্ছ উজ্জ্বল রত্ন উপহার দিয়েছেন আমাদের আজহার উদ্দীন, তাঁকে তাই আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গেই বলছি, এই জিনিস আরো চাই। নাল্পে সুখমস্তি!

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

স্বরলিপি

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি ॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি   স্বর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে   বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গানটি মীড়প্রধান। বিলম্বিত লয়ে গেয়

II রা -রপা^ম মা -জ্ঞা । -া -া রা সা I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া -া -া I
বা ০ ০ ণী ০ ০ ০ মো র না ০ হি ০ ০ ০ ০ ০

I রা -া রপা -া । -া -া -া -া I মা -পা পা পা । পা পা পা -ধা I
না ০ হি০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ত ব্ ধ হৃ দ য় বি ০

I মা -ণধা পা -ধা । পা -র্সা র্সা -ণা I ধা -ণা ধণা পধা । মা -^ধপা মা -জ্ঞা I
ছা ০০ য়ে ০ চা ০ হি ০ তে ০ শু০ ধু০ জা ০ নি ০

I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া রা সা I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া -া -া I
বা ০ ণী ০ ০ ০ মো র না ০ হি ০ ০ ০ ০ ০

I রা -া রপা -া । -া -া মা পা I মা পা ণা^২ -পা । না -া না -া I
না ০ হি০ ০ ০ ০ আ মি অ মা বি ০ ভা ০ ব ০

I র্সা -র্রা -নর্সা -পা । না না না -া I র্সা -র্রা -^নর্সা -া । র্সনা র্সা র্রা র্রা I
রী ০ ০০ ০ আ লো হা ০ রা ০ ০ ০ মে০ লি য়া অ

I র্রা -া র্রর্সা র্রা । র্রা -া -র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা -র্মা র্মা র্মর্রা । র্রা -র্সা র্সা -া I
গ ণ ণ০ তা রা ০ ০ ০ নি ষ্ ফ ল০ আ ০ শা য়্

I র্সনা -র্রা র্রা র্রর্সা । র্সা -ণা ণা -া I ণধা -পধা পা -া । -া -া -া -া I
নি৽ শ্ শে ষ৽ প ৽ থ ৽ চা৽ ৽ হি ৽ ৽ ৽ ৽ ৽
I পা -র্সা মা -জ্ঞা । জ্ঞা -পা মা -জ্ঞা I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া রা সা I
না ৽ হি ৽ না • হি • বা • ণী ৽ • ৽ মো র
I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া -া -া I রা -া রপা -া । -া -া -া -া I
না ৽ হি ৽ ৽ ৽ ৽ ৽ না ৽ হি৽ ৽ ৽ • • •
I ধা ণা ধা ণা । ধা -া র্সণা -ধণা I পধা -া পা -ধা । পা -র্সা ণধা পাধ I
তু মি য বে বা ৽ জা ৽ও বাঁ ৽ শি ৽ সু র্ আ৽ সে
I মা -ধপা মা -জ্ঞা । সা -জ্ঞা জ্ঞা রা I জ্ঞা -া জ্ঞা -জ্ঞরা । রসা -জ্ঞরা সা -া I
ভা • সি • নী ৽ র ব তা র্ গ ৽ ভী ৽৽ রে ৽
I সগা -া গা গা । গা -মা মা -া I মা -া পা পমা । মা -মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
বি ৽ হ্ব ল বা ৽ য়ে ৽ নি দ্ দ্রা স৽ মু দ্ দ্র পা
I জ্ঞরা -সরা সা -া । -া -া -া -া I মা পা পা পা । ণা২ পা না না I
রা৽ ৽ য়ে • • • ৽ ৽ তো মা র সু রে র প্র তি
I না -র্সা র্সা -া । র্সনা র্সা র্রা -া I র্রা -া র্রা -া । র্রর্সা -র্রা র্রা -র্জ্ঞা I
ধ্ব ৽ নি ৽ তো মা রে • দি ই ফি ৽ রা• • য়ে •
I -া -া -া -া । র্জ্ঞা -র্মা র্গর্মা -র্রা I র্রা -র্সা র্সা র্সা । র্সনা র্সর্রা র্রা র্রর্সা I
৽ ৽ ৽ • কে • জা ৽ নে • সে কি প৽ শে৽ ত ব৽
I র্সা -ণা ণা ণা । ণধা -পধা পা -া I পা পর্সা র্সা নর্সা । -ণা ণা ধণা পধা I
স্ব প্ নে র তী৽ ৽ রে • বি পু৽ ল অ ন্ ধ কা৽ র৽
I মা -ধপা মা -জ্ঞা । রা -পা মা -জ্ঞা I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া রা সা I
বা • হি ৽ না ৽ হি • বা ৽ ণী ৽ • ৽ মো র
I রা -া রা -জ্ঞা । -া -া -া -া I রা -া রপা -া । -া -া -া -া II II
না • হি ৽ ৽ ৽ ৽ • না ৽ হি• • • ৽ ৽ •

সম্পাদকের নিবেদন

সাত শ বছর আগে ইতালির ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলিগিয়েরি দান্তে। ইতালির এই জাতীয়-কবির সপ্তম-জন্মশতবার্ষিক উৎসব সেই দেশে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল। কয়েক বছর আগে শেক্সপীয়রের চতুর্থ-জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমরা সে উৎসবে যতটা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছি, দান্তের ক্ষেত্রে ততটা উৎসাহ আমাদের মধ্যে দেখা দিল না। অথচ, এ কথা আমরা স্বীকার করি যে, নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের যে স্থান এপিক কাব্যের ক্ষেত্রে দান্তের স্থান তার চেয়ে নিম্নে নয়। উৎসাহের অভাবের কারণ হয়তো এই যে, দান্তের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতটা অন্তরঙ্গ দান্তের রচনার সঙ্গে পরিচয় ততটা নিবিড় নয়। সমালোচকেরা বলেন যে, ইংলণ্ডের এ কালীন কবি এলিয়টের রচনায় দান্তের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বটে, তবুও ব্যাপকভাবে ইংলণ্ডে দান্তে তেমন সমাদৃত নন। বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ঘটে ইংলণ্ড দেশের মারফত ও ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে। সে দেশে দান্তের তেমন সমাদর হয় নি বলেই আমাদের দেশও নাকি সমাদর করার সুবিধা বা সুযোগ পেল না। সমালোচকদের এ অভিমত ভ্রান্ত না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যখন পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তখন আমরা যদি পরমুখাপেক্ষী না থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেরাই সংযোগ স্থাপন করে নিতে পারি তাহলে সেইটে আমাদের দেশের ও দশের মঙ্গল।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা দান্তে সম্বন্ধে অন্যান্য রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা পুনর্মুদ্রণ করলাম— এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় সাতাশি বছর আগে; এবং শতবর্ষ আগে দান্তের ষষ্ঠ-জন্মশতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসবে মাইকেল মধুসূদন 'little oriental flower' রূপে যে সনেটটি ইতালি-রাজের নিকট প্রেরণ করেন, তার পাণ্ডুলিপিচিত্র সহ সেই সনেটটি প্রকাশ করা হল।

স্বী কৃ তি

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

দান্তের চিত্র কলিকাতাস্থ ইতালিয়ান কনসালেট জেনারেল'এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র শ্রীরামকুমার কেজরিওয়ালের সৌজন্যে মুদ্রিত।

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭

দেশে বিদেশে
ঘরে ঘরে
নিখুঁত কারিগরি, সর্বাধুনিক ডিজাইন ও স্বচ্ছন্দ কার্য্যকারিতার জন্য উষা পাখা আজ পৃথিবীর চল্লিশটিরও বেশী দেশে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সমস্ত উষা পাখায় ডবল বল-বেয়ারিং লাগান আছে সেইজন্য ইহা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী।
প্রত্যেকটি পাখার জন্য দুই বছরের গ্যারান্টি।
দেশে বিক্রীত প্রতি দুইটি পাখার মধ্যে একটি উষা পাখা।
একটি
JAY
সামগ্রী
বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা

বিদেশে বাণিজ্য (৮)

INDIAN
BRANCH

• গ

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক
সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

রবীন্দ্রনাথ
অঙ্কিত

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ · বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩ · ১৮৮৮ শক

চিঠিপত্র

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা মোটের উপর ভাদ্রমাসের ব্যবহার ভালোই ছিল। বিদায় নেবার সময় অভদ্রতা করচে। মনে হচ্চে সমস্ত আকাশের জ্বর হয়েছে। —তুমি ছিলে না, তাই ভয়ে ভয়ে পরিশোধটাকে ঠেলে ঠুলে গড়ে তুলে ছিলুম— খারাপ হয় নি। এখন বর্ষামঙ্গল নিয়ে পড়েছি— নতুন মেয়েদের নাচ হবে— নতুন গানও বানিয়েছি। তার পরে আসবে ছুটি। আমি হয় তো চোখ কানের তাড়ায় কলকাতা অঞ্চলে ডাক্তারদের দরজায় ধন্না দেব। তখন ফলতা হবে আমার আশ্রয়। ইতি ১৩।৯।৩৮

বাবামশাই

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

কল্যাণীয়াসু,

এখানেও খুব বৃষ্টি, কিন্তু এখানকার বাদল ভালোই লাগে। দিলীপ সদলে আসবে বলে ভয় লাগিয়েছিল আসতে পারবে না বলে টেলিগ্রাম পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আজ চিত্রিতা লিখেছে অনিল তাকে আমার বাল্য থেকে শেষ বয়স· ·খানা ছবি পাঠিয়েছে। চিত্রিতা লিখেছে অনিলবাবু খুব ভালো লোক।··· তোমার শেষ গল্পটা পাঠিয়ে দিয়ো। চারুবাবু উদয়নে আসর জমিয়েছেন। অমিয় এসেছে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ভালোই লাগচে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী আজ আমার সেবার ভার নেবা মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ প্রকাশ করেছে। তবু দিন চলে যাচ্চে— খুব নীরবে।

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

কল্যাণীয়াসু,

এবারকার ভাপসা গরম শীঘ্র কাটবে বলে মনে হচ্চে না। তোমরা নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে ফেরবার চেষ্টা কোরো না। আমি এখানকার কাজে আর বই ছাপার ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। সেক্রেটারি

ভেগেছে দেশে, সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত, অমিয় দুই একদিনেই ফিরবে লাহোরে। সুধীন্দ্রও ছুটি নিয়ে চলে গেছে এখন আমার একমাত্র সহায় আমার নাতজামাই। খুকু এসেছিল, সে কাজ নিতে রাজি হয়েছে।…

গঙ্গার ধারের বাগানের রাস্তা বন্ধ। ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে। ভালোই। এখানে সুকুমার এসে কাজে যোগ দিয়েছেন আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা দরকার আছে।

স্টেলা ক্র্যামরিশের হাতে আমার ছবিগুলোর কী দশা হোলো জানিনে। কাগজে পড়লুম সে যাচ্চে আফগানিস্থানে। মৈত্রেয়ীদের কোনো খবর পাইনে— তারা উপরের সপ্তকে আছে, না নীচে।—তোমাদের শরীর ভালো আছে শুনলে নিশ্চিন্ত হব। ইতি নবমী ১৩৪৫

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা,

আমার মারফতে বিবি সরু সরু অক্ষরে এক পোষ্ট কার্ড ভর্ত্তি করে তোমাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আজ আশ্রমের সবাই আমাকে প্রণাম করতে আসবে— তাদের জন্যে আহারের জোগাড় হচ্চে। ওদিকে সুধাকান্ত শয্যাগত। বুড়ির উপরে আমার নির্ভর। নানা দেশ থেকে লোকজনের যাতায়াত চলচে, গরমটাও নরম হবার লক্ষণ দেখাচ্চে না। বিজয়া দশমী [১৩৪৫]

বাবামশায়

ওঁ

বৌমা,

…আজ শনিবার— বিকেলের গাড়িতে জোড়াসাঁকোয় যাব,— রবিবারে সেখানে অপেক্ষা করে সোমবারে যাত্রা করব। দার্জ্জিলিং মেল আমার চলবে না— যেটা রাত্তিরে ছাড়ে সিলিগুড়িতে সকালে নটাতে পৌছয় সেইটেতেই যাব। ওখান থেকে সেবোক পর্য্যন্ত রেলেতে যাওয়াই সুবিধে— সেখান থেকে মোটরে চড়ব সঙ্গে যাবে বনমালী আর রামচরিত (নতুন চাকর)। অন্নদা হবে আমার বাহন।

আশ্বিন প্রায় শেষ হয়ে এল কিন্তু এখনো ঠাণ্ডার লক্ষণ নেই, গরমে সকলেই হা-হুতাশ করচে— বোধ হয় আরো মাস খানেক লাগবে পৃথিবীর বুক জুড়োতে।

সুধাকান্তর ছেলের অসুখ এখনো চলচে। ইতি ৯।১০।৩১

বাবামশায়

ওঁ

[Post Mark
Santiniketan,
11 Oct. '38]
"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা,

যাওয়া ঘটে উঠল না। ফিরে এসেছি ধবলীতে। কদিন ধরে এখানে খুব বৃষ্টি। আশা করি থেমে গেলেই আবার সেই ভাদ্দুরে গুমট মাথা তুলবে না। তোমরা নবেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে কোনোমতেই এসো না। এখানে সব চুপচাপ। সুরেন ধীরেনের সঙ্গে রথযাত্রা করেছে হাজারিবাগে। সুধাকান্তর সঙ্গে এখনো সাক্ষাৎ হোলো না। কাজের ভার নিজের ঘাড়েই পড়েছে। এবারে ছুটির টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। একেই বলে গ্রহ।

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা,

তোমরা ২৪।২৫শে নামতে চাচ্চ— এমন কাজ কোরো না। ঘোরতর গরম। শরীর যেটুকু সেরেচে এখানে এই অসহ্য গুমটের মধ্যে সেটা নষ্ট কোরো না। যদি উড়োজাহাজ পেতুম আমি চলে যেতুম পাহাড়ে। মনে হচ্চে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দেবতার দয়া হবে না। আমার শরীর সর্ব্বসহিষ্ণু, নইলে শয্যাশায়ী করত। এখন ভাবচি মৈত্রেয়ীর কাছে হার মানলেই জিত হোতো, ইতি ১৬।১০।৩৮

বাবামশায়

মংপু

বৌমা,

দিন গণনা করচি। সীতাকে হনুমান উদ্ধার করেছিলেন আমি হনুমানের বাবার উপর নির্ভর করে আছি —অনিল আমাকে নিয়ে যাবেন এই রকম সংকল্প কিন্তু জানই তো কড়া পাহারা। আমাকে এবারে তোমরা দুজনে মিলে খুব জব্দ করেছ। ভেবেছিলুম কয়েকদিন এখানে থেকে কালিম্পঙে আশ্রয় নেব সে রাস্তা বন্ধ করেছ। লক্ষ্ণৌয়ের ঝুনু আশা করেছিল কালিম্পঙে আমার কাছে গিয়ে থাকবে গান শিখবে। সেই জন্যে এসেছিল দার্জিলিঙে। ভালো লাগচে না। তাকে বলেছি শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসবে যোগ দিতে— যদি রাজি হয় খুব ভালো হবে। আলমোড়ায় আমাকে নিয়ে গেলে না কেন— এখন মনে হচ্চে বেরেলি স্টেশনও খুব খারাপ জায়গা নয়।— কল্লিতাদেবীর নাম আমার অপরিচিত শুনে মৈত্রেয়ী বিস্মিত— তোমাকে

বোধ হয় লিখেছে, উত্তর না পেয়ে ভেবেছে রাগ করেচ। আমিও তাকে বলেছি ফাঁস করে দেওয়া ভালো হয় নি। তোমার কি প্ল্যান একটু জানতে দিয়ো।

বাবামশায়

ওঁ

বৌমা তুমি ভালো আছ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। চেষ্টা কোরো ভালো থাকতে। মংপু এবং মংপুর ঘর বাড়ি ও ব্যবস্থা বেশ ভালো লাগচে— বাতাসটি মন্দমধুর বইচে, বসন্তকালের মতো। আমার লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে চোখ মেললে কাজ কামাই হয়— নানা রঙের ফুলে চারদিক রঙীন হয়ে রয়েছে।— জোঁক একেবারেই নেই— তা ছাড়া সেই উপরে চড়বার দুর্গম রাস্তাটার সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না। ঐখানে অনিল ও সুধাকান্ত যমদূতের দর্শন পেয়েছিল বলে একটা খুব লম্বা চৌড়া গুজব শোনা গেছে। বাবামশায়।

ওঁ

[মংপু]

বৌমা,

মংপুর টান কাটিয়ে মৈত্রেয়ীকে কাঁদিয়ে চললুম শান্তিনিকেতনে। দেহটাকে নিয়ে টানাটানি করতে ভালো লাগে না। আশা করি গরমটা তেমন অসহ্য হবে না। কাল সকালের গাড়িতে যাত্রা করব। মৈত্রেয়ীরা আজই যাবে। ইতি। সোমবার।

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

কল্যাণীয়াসু,

এবারে ভালো চলচে না। পালাই পালাই করচে মন, জষ্টিমাস তার যষ্টি নামালেই দৌড় দেব। ছুটিটা গেল মিথ্যে। কলকাতায় নামলেই আমাকে কর্মজালে জড়াবে। অথচ শরীর মন একটুও প্রস্তুত নেই— উদ্ধার পাব কবে এবং কি করে জানিনে। নৈনিতালের ব্যর্থ পালা শেষ করে তোমরা জয়ন্তীর আশ্রয়ে ভালোই আছ আশা করচি। তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।— তোমার খুকুমণি পলাতকা। তার খোকারই হোলো জিৎ। ইতি ২৯।৮।৩৯

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা

নির্বিঘ্নে এসে পৌচেছি। গাড়িখানা খাদে পড়বার দিকে ঝুকছিল তখন আমার সহযাত্রিণী লাফ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, দুর্ঘটনার জবাবদিহি করবার জন্যে। শেষ মুহূর্তে ফাঁড়া কেটে গেছে। ঠাণ্ডা আছে কিন্তু শরীরটা পুরো পরিমাণ কর্মপটু হয় নি। এখনো কলম চালাতে পারচিনে— সেটা ভালো লাগচে না। ইতি ১৫।৯।৩৯

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোল আলুর মনটা শান্তিনিকেতনের দিকে গড়ায়মান অবস্থায়। তাই তার স্থলাভিষিক্ত করে সুধাকান্তকে ডেকে পাঠালুম— যদি বদল হওয়া ভালো। এখনো এ জায়গাটা ঠিক স্বাস্থ্যনিবাস হয়ে ওঠেনি এমন কি ইতিমধ্যে এখানকার গৃহস্বামীর চিকিৎসা ভার আমাকে নিতে হয়েছিল। আমার ডিস্‌পেন্‌সরি আমার সঙ্গেই থাকে। সেই জন্যে এখানকার হাওয়ায় যদি বৈরিতা দেখা দেয় আমি তার প্রতিকার করতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি সুসময় এসেছে বোধ হচ্চে— এখন রথী এলে তার উপকার হতে পারবে, আমার উপর দিয়ে প্রথম ধাক্কা কেটে গিয়েছে।

তোমার এবারকার লেখাটাতে অত্যলঙ্কৃত ভাষার বাড়াবাড়িতে তোমার স্বাভাবিক ছবি-আঁকা রচনা চাপা পড়েছিল, ঘনবর্ষায় গুল্ম জালে জড়িত তোমার বাগানের সুষমার মতো। জঙ্গল কেটে ছেঁটে তাকে উদ্ধার করেছি। আলুর হস্তাক্ষর কপি করার কাজে অনুকূল নয়, সেও কুণ্ঠিত, এইজন্যে ওটা অপেক্ষা করচে। গভীর আলস্যে বেষ্টিত আমার গল্প লেখার কাজ নিয়ে সময়ের টানাটানি, যেটুকু অবসর দেখা দেয় সেটা ঝিমিয়ে থাকে, তাই নিজে কিছু করতে পারিনে। আজ সকালের রৌদ্র কুহেলি শয্যা থেকে বেরিয়ে এসেছে— মনে হচ্চে ভালো দিনের সূচনা করচে। ইতি ২৯।৯।৩৯

বাবামশাই

ওঁ

বৌমা

রথী আসচেন আশা করি ভালই থাকবেন। এতদিনে অত্যন্ত ভিজে হাওয়ার উপদ্রব চলছিল ভালো লাগছিল না।— আশা করি রৌদ্রের প্রসন্নতা সুরু হবে।

তোমার লেখাটা মেজে ঘষে দিয়েছি— তার শেষ অংশটা বদলেছি কিছু মনে কোরো না। আমার

তো মনে হয় সব সুদ্ধ সুখপাঠ্য হয়েছে— পুজোর বাজারে অনায়াসে চলবে। তোমার বড়মা সন্ধান পেলে লুফে নেবেন। কিন্তু এটা প্রবাসীর যোগ্য। হাত বদল করতে চাও যদি পরিচয়ে চেষ্টা দেখতে পারো। এখান থেকে পালাবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু তুমি তো বম্বাই অভিমুখে, তাহলে আমি কার আশ্রয়ে যাব। শূন্যঘরে মন বসেনা।

আমার গল্পটা শেষ হয়ে গেছে চুনকাম পলস্তার কাজ চলচে।

আলু বোধ হয় দমে গেছে, অর্থাৎ আলুর দম। কথা ছিল আসচে বিশে তারিখে রওনা হব। সেটা ক্যান্‌সেল হয়ে গেছে। এখানে ওর প্রধান আড্ডা মিসেস গাঙ্গুলির ঘরে। মাসীর সঙ্গেও খুব উচ্চহাস্য চলে। ইতি ৬।১০।৩৯

বাবামশায়

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, তোমার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। ঈশ্বর তোমার শরীর মনের শান্তিবিধান করুন।

১লা বৈশাখের উপলক্ষ্যে কাল পর্য্যন্ত অতিথিদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। তাতে ক্লান্ত করেচে। ছুটি হয়ে গেলে কোথাও যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। দার্জিলিঙে যাবার ইচ্ছা নেই— সেখানে বিশ্রাম পাব না। দেখি, কোথায় যাওয়া ঘটে।

শুভানুধ্যায়ী

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার শরীর অসুস্থ হয়েছে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েচি। খড়দহে গঙ্গার হাওয়ায় ভালো আছ কিনা লিখো। এখন বুঝতে পারচি, দার্জ্জিলিং গেলে তোমার পক্ষে ভালো হোতো না। এখানে কিছুদিন খুবই গরম গিয়েছে। সকালের দিকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দেয় তার পরে সমস্ত দিন এবং প্রথম রাত্রি গরম থাকে। ক্রমে ক্রমে হাওয়াটা শুকিয়ে গেলে শীতের সময় আসবে। দিনু কলকাতায় গেছে। বুবুকে নিয়ে আজ সুহৃদ যাবে। তোমার শুশ্রূষার জন্যে যদি দরকার বোধ করো তাহলে হৈমন্তীকে খড়দহে পাঠিয়ে দিতে পারি। তুমি ওখানে একলা থাক, সুবিধা হয় না বোধ হয়। আশ্রম শূন্য হয়ে গেছে— তবু অতিথি সমাগম কম হচ্চে না। ছুটি উপলক্ষ্যে নানা লোক আনাগোনা করচে— সুধাকান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। তোমাকে ওষুধের কথা কি আর বলবো। তুমি তো সব জানো। Kali Phos 3x ঘন ঘন খেয়ে অমিয়া উপকার পেয়েচে। লাউয়ের রস খেয়ে দেখবে না কি।

বাবামশায়

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

বৌমা বুড়ির শরীরের খবর হয়তো পেয়েছ। তোমাদের কারোই স্বাস্থ্য ভালো নয়, আমাকে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন করে রাখে। পুরীতে গিয়ে ভালো থাকবে এই কামনা করি।

চিত্রাঙ্গদার দলের বম্বে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল— এখন আমার সম্পূর্ণ ছুটি। তোমার বিশাল পুরীতে কোথাও আর নূপুরের ধ্বনি নেই।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অনিল—অনিলকুমার চন্দ
অন্নদা—অন্নদা মজুমদার
অমিয়—অমিয় চক্রবর্তী
আলু—সচ্চিদানন্দ রায়
খুকু—অমিতা সেন
চারুবাবু—চারুচন্দ্র দত্ত
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দিলীপ—দিলীপকুমার রায়
ধীরেন—ধীরেন্দ্রমোহন সেন
নাতজামাই—কৃষ্ণ কৃপালানি
বড়মা—হেমলতা দেবী
বনমালী—ভৃত্য
বিবি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী
বুড়ি—নন্দিতা কৃপালানি
বুবু—পূর্ণিমা দেবী
সুকুমার—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়
সুধীন্দ্র—সুধীন্দ্র ঘোষ
সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ কর
সুহৃৎ—সুহৃদ্‌নাথ চৌধুরী
হৈমন্তী—হৈমন্তী চক্রবর্তী। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পত্নী

রবীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীম

ক্ষিতিমোহন সেন

সীমা অসীমের তত্ত্ব মধ্যযুগের কবীর দাদূ রজ্জবজীর মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইহার পরও দুই শতের অধিক অব্যক্ত লিঙ্গাচার সব মরমীর দল আছেন। তাঁহাদের সকলের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখা অসম্ভব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মতেও এই বিষয়ে বহু আলোচনা ও গভীর সব সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিদ্বৎ সমাজে তাঁহাদের পরিচয় ও কথা তবু অল্পাধিক জানা আছে তাই সেইগুলি আর তুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলাম না। চেষ্টা করিবার মতো অবসরও এখানে নাই।

এখন এই যুগের মনীষী ও কবি রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে কি বলেন তাহা একটু দেখা যাউক। তাঁহার কাব্য শিক্ষিত সমাজে খুবই পরিচিত তবু মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তাঁহার কোনো পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কি অদ্ভুত মিল তাহা দেখাইবার জন্যও তাঁহার বাণী সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখানো প্রয়োজন। এই বিষয়ে তাঁহার কাব্য সমুদ্রবৎ বিশাল এবং তদনুরূপই গভীর, বাদ দিবার মতো কিছুই নয়। তবু তাহারই মধ্যে কিছু কিছু এখানে দেখানো যাউক।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অসীম অরূপ গাঁট বাঁধিতে বাঁধিতে আসিতেছেন রূপ ও সীমার দিকে। আমি রূপ, আমাকে যাইতে হইবে উল্টা দিকে। আমাকে গাঁট খুলিতে খুলিতে যাইতে হইবে অরূপের দিকে। এই তত্ত্বই একদিন দাদূ রজ্জবজীকে বুঝাইয়াছিলেন। সেইসব না জানিয়াও রবীন্দ্রনাথ সেই একই কথা বলিয়াছেন। তিনি কবি, রূপ ও রস ছাড়া তাঁহার চলে না। তবু তাঁহার কাব্য দেখিয়াই বুঝি অরূপের দিকে যাত্রা না করিলে রূপের সার্থকতা কোথায়? গীতাঞ্জলিতে তিনি গাহিয়াছেন—

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ-রতন আশা করি॥ —৮৭

কবীরও বলিয়াছেন, প্রিয়তম অসীম আমার আসিতেছেন অরূপ হইতে রূপে, আর আমিও যদি রূপের দিকেই করি যাত্রা তবে এক দিকেই চিরদিন উভয়ে হইয়া চলিব অগ্রসর, দেখা আর হইবে না। দেখা যাঁহার সঙ্গে করিতে হইবে যাইতে হইবে তাঁহার দিকে। যাহাকে চাই তাহার উল্টা পথে যাইতে হয় এমন করিয়াই শিব আর শক্তি পরস্পর পরস্পরকে চান ও পান।

পাশ্চাত্য মরমী কবিরাও বলেন, অসীমকে যদি সকল সীমার মধ্যে উপলব্ধি না করা যায় তবে সে অসীম বৃথা। অসীমের আত্মপ্রকাশের জন্যই সব সীমার সৃষ্টি।

তাই প্রতি তিল স্থানে ও প্রতি পল কালে সেই অসীম অনন্ত দীপ্যমান। খেয়ার উৎসর্গপত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে লিখিলেন,

বন্ধু তুমি জান, ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তাহা নয়—
সত্য যেথা কিছু আছে, বিশ্ব সেথা রয়॥

এই কথাই বাউল গান করিলেন,

যাইতে তো চায় না রে মন মক্কা মদিনা।

এই বন্ধু আমার আছে, (আমি) রই রে তারি কাছে
(আমি) পাগল হৈতাম দূরে রইতাম (তোরে) দেখতাম রে যদি না।
আমার নাই মন্দির কি মসজেদ, নাই পূজা কি বকরেদ,
তিল তিলে মোর মক্কা কাশী পলপলে স্থদিনা ॥

সাধনায় একটু গভীরতা না হইলে, সীমা-অসীমের এই নিগূঢ় যোগের কথা অন্তরে ধরা পড়ে না। সাধনার প্রথম অবস্থায় মানুষ তাই সীমাকে বাদ দিয়া খুঁজিতে চায় অসীমকে আর অসীমকে বাদ দিয়াই বুঝিতে চায় সীমাকে। মানসীতে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ॥

সোনার তরীতে তিনিই আকাশের চাঁদ কবিতায় এইরূপ একজন অসীমের সন্ধানীর সন্ধান দিয়াছেন। সে শুধু চায়—

'হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ'
এই হল তার বুলি।

সারা জন্ম গেল তার এই ব্যর্থ ব্যাকুলতায়। একদিন হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল—

দেখিল চাহিয়া, জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়।· ·
ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি, ছোট কথা, ছোট সুখ।
প্রতিনিমিষের ভালোবাসাগুলি, ছোট ছোট হাসিমুখ।

তখন সে মনের ব্যথায় বুঝিল ব্যর্থ অসীমের সন্ধানে কেন সে বৃথা জীবন দিল নাশ করিয়া— যাহা সে উপেক্ষা করিয়াছিল তাহাই চাহিল পাইতে।

যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়, তার বেশি কিছু নহে।

তখনই কবি বুঝাইলেন এই-সব ছোটর মধ্যে সেই চিরপ্রার্থিত বড় আছে। নৈবেদ্যে কবি দেখাইলেন, সেই অনন্ত আপনিই ধ্যানাতীত ধারণাতীত লোক হইতে নিত্য আসিতেছেন আমাদের আনন্দময় সংগীতলোকে। আমাদের আনন্দের সঙ্গে যে তাঁরও যোগ চাই।

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি।

মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিয়াছিলেন সীমা ও অসীম আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে বন্ধু। কিন্তু সে সীমা তাহার ক্ষুদ্রতার দুঃখে মুহ্যমান 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' —কিন্তু সে যখন তাহার বন্ধু অসীমের মহিমা উপলব্ধি করে তখন আপন ক্ষুদ্রতা বিসর্জন দিয়া বীতশোক হয় —

জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ। মুণ্ডক, ৩, ১, ২ ; শ্বেতা, ৪, ৭

রবীন্দ্রনাথও সেই কথাই বলিলেন। বলিলেন অসীমের মধ্যে ডুবিলেই সীমার সব দুঃখ যায় ঘুচিয়া, যত দুঃখ তাহার সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিলে।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই।
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে স্বতন্ত্র হয়ে
আপনার পানে চাই। —নৈবেদ্য

অসীমের প্রকাশ সীমায়। আমি সীমা, তাঁহার প্রকাশের জন্য আমাকে তাঁহার প্রয়োজন আছে। মধ্যযুগের ভক্তরা এই-সব তত্ত্ব চমৎকার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আবার অসীম তাঁহাকে ছাড়াও আমার কোনো অর্থই নাই।

তিনি অসীম, প্রকাশের আনন্দ তাঁহার চাই। সেই আনন্দের জন্য প্রেমের লীলার জন্য তিনি আপনি হইলেন সীমা। তিনি এই যে সীমার বন্ধন স্বীকার করিলেন ইহাতে তাহার কোনোই দৈন্য বা লজ্জার হেতু নাই। এই বন্ধন তিনি আপনার প্রেমে আপনি স্বীকার করিয়াছেন। নারী যখন পত্নী বা মাতা হইয়া প্রেমের বন্ধন স্বীকার করেন তখন কি তাহাতে তাঁহার কোনো দৈন্য সূচিত হয়? প্রেমের বাঁধন তিনি গ্রহণ করিলেন, এইখানেই তাঁহার প্রীতিতর প্রকাশ, তাঁহার আনন্দের পরিপূর্ণতা।

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে। . .
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরচ কত মনোহরণ বেশে—
প্রভু নিত্য আছ জাগি। —গীতাঞ্জলি

কাজেই দেখা গেল তাঁহাকে ছাড়া যেমন আমার চলে না তেমনি আমাকে ছাড়াও তাঁহার প্রেমের লীলা অচল। আমার মূল্য আছে। মোট কথা আমিও তাঁহাকে যেমন চাই তিনিও ঠিক তেমনই আমাকে চান। উভয়ে উভয়কে না চাহিলে আর প্রেম কি? এইখানে মধ্যযুগের ভক্তদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কি আশ্চর্য মিল তাহা তাঁহার একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

স্থর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় স্থরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে স্বজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥ —উৎসর্গ

এই কথাই দাদূ বলিলেন,

ৱাস কহৈ হৌ ফুল কো পাউঁ ফুল কহৈ হৌ ৱাস।
ভাস কহৈ হৌ ভাব্ কো পাউঁ ভাব কহৈ হৌ ভাস॥
রূপ কহৈ হৌ সত কো পাউঁ সত কহৈ হৌ রূপ।
আপস মৈঁ দউ পূজন চাহৈঁ পূজা অগাধ অনূপ॥

অর্থাৎ গন্ধ বলে, হায় আমি যদি পাইতাম ফুলকে, ফুল বলে হায়, আমি যদি পাইতাম গন্ধকে? ভাস (ভাষা, প্রকাশ) বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাবকে। ভাব বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম ভাসকে? রূপ কহে, হায়, আমি যদি পাইতাম সৎকে, সৎ বলে, হায়, আমি যদি পাইতাম রূপকে? পরস্পর উভয়েই উভয়কে করিতে চায় পূজা; অগাধ এই পূজা, অনুপম এই পূজা।

কী আশ্চর্য মিল। অথচ আমি বলিতে পারি, এই কবিতা লেখার অন্তত পনর বৎসর পরে আমি দাদূ হইতে এই বাণীটি সকলের কাছে উপস্থিত করি। রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রকারেই ইহা জানার হেতু ছিল না। এইরূপ শুধু একটি দুইটি বাণীতে নহে আরো অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্রের মধ্য হইতে সেই কয়টি বাণী বাদ দিলেও তাঁহার কাব্যের কিছুই আসে যায় না। রবীন্দ্রনাথ একদিন হাসিয়া বলিয়াছিলেন এবং যথার্থই বলিয়াছিলেন, ইঁহারা দেখি বহু শতাব্দী আগে আমার লেখা হইতে চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। এই যে মিল ইহাতেই বুঝিতে পারি ইঁহারা সবাই পরস্পরে না জানিয়া ভারতের অন্তর্নিহিত মর্মকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সবাই ভারতসাধনার নিত্য ধারায় এক-একটি প্রকাশ-উৎস।

কবীর ও রজ্জবের বাণীর সঙ্গে মিল দেখাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের দুই একটি কবিতা পূর্বেই উদ্ধৃত করা গিয়াছে। এখানে আবার তাহা বলিতে হইবে। সীমা ও অসীমের মধ্যে প্রেমের যে একটি দুর্নিবার আকর্ষণ আছে তাহার মূলে আছে একটি নিগূঢ় সত্য। সীমা ও অসীম উভয়ই যে তিনি। এই কথাই নৈবেদ্যে তিনি বলিয়াছেন।

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।

অসীমের প্রকাশ নাই। সে প্রকাশ চাহে সীমার মধ্যে। আবার সীমা চাহে তাহার আশ্রয় ও সঞ্চরণক্ষেত্র অপার অসীমে, যদিও শুধু অসীম এক মহা 'নাই নাই স্বরূপ'।

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস ;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই— নাই নাই বাণী।

তাই সীমাতেই প্রেমের নীড়, প্রেমের সেখানে বর্ণগন্ধগীতময় প্রকাশ ও বিশ্রাম।

হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।

আবার সীমাকেও দেখি তাহার সঞ্চারের ক্ষেত্র ও প্রাণের পরিপূর্ণতার জন্য চাহিতেছে অসীমকে। দুঃসহ সেই চাওয়ার ব্যাকুলতা।

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। —উৎসর্গ

সেই গন্ধ চাহে আকাশের মধ্যে আপন মুক্তি, আপন সার্থকতা।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে,
ফিরিছে আপন-মাঝে—
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
না জানি কিসের কাজে।

সেই অসীম আকাশকে না পাইয়া তাহার জীবন ব্যর্থ, তাই তার এত কান্না—

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে,
ভাবিছে উদাস-পারা—
'জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা'।

তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে হয়, সুসময় আসিবে, জীবনের সকল ব্যর্থতা দূর হইবে।

কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।

এইখানে মনে পড়ে ভক্ত কবি জ্ঞানদাসের গান—

নীড়েই তো তুই রাত কাটালি কোথা ছিল রে তোর গান। এখন তো সুরে ছাইলি গগনরে তিমির অবসান। আরামেই তো তুই থাকিস নীড়ে, কেন গগনে উঠিস মাতিয়া ? অসীম অগাধ মহা অতি গভীর সেই গগনে তোর কি আনন্দ ?

উত্তর— সীমা হতে সীমায় দিন যখন আমার কাটিল, ভোগ বহু আমি পাইয়াছি, কিন্তু অসীমের অগাধে যখন গেলাম ডুবিয়া তখনই তো গাইয়া উঠিল আমার আত্মা—

প্রশ্ন : ঘোঁসল মেঁ তূঁ রৈন গয়ায়া কহাঁ রহা রে গানা।
অবতো সুর সে ছায়া গগনরে তিমির ঔসানা॥
বৈন রহন তোয় ঘোঁসল মেরে গগন মেঁ ক্যোঁ মাতা।
অহদ অযাহ মহা অতি গভীরা উসমেঁ ক্যা সুখ পাতা॥

উত্তর : হদসে হদসে জিন বিতা জন
ভেষগ বহুত হম পায়া।
বেহদ মেঁ জব ডুবা অযাহ
তরহী আপা গায়া॥

এইখানে খেয়ার 'বালিকাবধূ' কবিতাটি মনে আসে। কেন আজ এত অধীরতা? একদিন যখন যৌবন আসিবে তখন সকল ব্যর্থতা আপনিই হইবে দূর। কুঁড়ির পক্ষেও এমন দিন আসিবে যখন—

সে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি—
জনম ব্যর্থ যাবে না। —উৎসর্গ

সীমা ও অসীমের মধ্যে শুধু যুক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধ পাইলেই তত্ত্বার্থীর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু তত্ত্বের সাধক নহেন। তিনি কবি। এত বড় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াও তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা মেটে না। সীমা ও অসীমের মধ্যে যে প্রেমের সম্বন্ধ আছে তাহা তাঁহার উপলব্ধি করা চাই। সেই প্রেমের বেদনাই তো তাঁহার কাব্যের প্রাণ।

এই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিলেন বলিয়া শুধু বুদ্ধির বলে কল্পিত ও দার্শনিক দলের পরিগৃহীত মায়াবাদ তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে তত্ত্বজিজ্ঞাসুটি আছে সে প্রথমে ঐ দিকে ঝুঁকিয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার কবিচিত্ত তাঁহাকে সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে দিল না।

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি' জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।· ·
লক্ষকোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা। —মায়াবাদ, সোনার তরী

ভক্ত বলেন, বিশ্ব হইল ঈশ্বরের আনন্দের লীলা। মায়াবাদী বলেন, ইহা বিধাতার শিশুজনোচিত চঞ্চলতা, খেলা।

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।· ·

জেনো মনে, শিশু তুমি এ বিপুল ভবে,
অনন্ত কালের কোলে,· ·
থেকো না অকাল বৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা ! —খেলা, সোনার তরী

তত্ত্বজ্ঞানী বলিলেন, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি সবই বন্ধন।

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন—
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান।· ·
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন মুক্তি ভ্রমে। —বন্ধন, সোনার তরী

কবি বলিলেন, সুখে দুঃখে বিশ্বের সঙ্গেই হইবে চলিতে,

চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর—
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর। —গতি, সোনার তরী

দুঃখে ব্যথায় ব্যাকুল বিশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি আবার কি ?

বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তিসমাধিতে ? —মুক্তি, সোনার তরী

পৃথিবী আমাদের মাতা। হয়তো তিনি অক্ষমা, দরিদ্রা। তাই তাঁহার স্নেহ বড় মধুর। এই স্নেহ কি উপেক্ষা করা চলে ?

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে। —দরিদ্রা, সোনার তরী

স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা) কবিতাতে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া কবি যে পৃথিবীর প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে স্মরণীয়।

বৈরাগী ভাবিতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার সবই বন্ধন। এই-সব বন্ধন ছাড়িয়া বনে গিয়া ভগবানকে পাইতে হইবে। তাই একদিন গভীর রাত্রে সে সব ছাড়িয়া চলিল ; ভগবান তাহাকে বার বার ফিরাইতে চাহিলেন। কহিলেন, এই সবই আমি। সে ফিরিল না। তখন

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ? —বৈরাগ্য, চৈতালি

এইখানে কবীরের কথা মনে পড়ে। তরুকে ছাড়িয়া যেমন বনকে পাওয়া যায় না তেমনি সকলকে ছাড়িয়া আমাকে পাইবে না।

কহৈঁ কবীর। বিছুড় নহিঁ মিলিহে
সো তরবর ছোড় বন ধাম রী॥

প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিলে জগতে কিছুই তুচ্ছ নয়।

যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজ মনে হয়। —দুর্লভ জন্ম, চৈতালি

প্রেম নাই বলিয়া এই উপলব্ধিটি আমাদের ঘটে না। দৈবযোগে যদি প্রেমের আলো দীপ্ত হইয়া ওঠে তখন যথার্থ দৃষ্টি যায় খুলিয়া।

দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো · ·
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে। —প্রেম, চৈতালি

বাউলরা যে এই তত্ত্বটি খুবই জানেন তাহা তাঁহাদের প্রকরণে দেখানো হইয়াছে। দেহের কাছে দেহ রাখিলেই আমরা কাহাকেও যে পাইতে পারি, তাহা নহে। চৈতন্যচরিতামৃতকার এই কথাই বলিয়াছেন—

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের লিখন।

এই প্রেমের আলোক যদি জীবনে ভগবানের কৃপায় দীপ্ত হইয়া উঠে তবে—

ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো। —ধরাতল, চৈতালি

এ কথা সত্য, পৃথিবীতে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই আমরা মনের ব্যাকুলতা দিয়া যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। স্বর্গে সেই অস্থায়িত্ব নাই বলিয়া স্বর্গে কারও জন্য কারও একটুও ব্যথা নাই। তার ঐশ্বর্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতাটিতে এই কথাই আগাগোড়া। পৃথিবীর ক্ষণিক মিলনে তাই এত ব্যথা, এত ভালোবাসা।

ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে। —ধরাতল, চৈতালি

এই দৃষ্টি দিয়া দেখিলে জগতে তুচ্ছ কিছুই নাই, কেহই তুচ্ছ নয়। প্রত্যেকের জীবনই কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়া অজ্ঞাত অনন্ত মহা ভবিষ্যতে করিয়াছে যাত্রা। প্রেমের আলোকে যখন দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন কাহাকেও ক্ষণকালের জন্য দেখিলেও তাহার অনন্ত ভবিষ্যৎ যেন ধ্যানদৃষ্টির কাছে উঠে ভাসিয়া। তাই একদিন কবি নৌকা হইতে দেখিলেন এক হিন্দুস্থানী মজুরের কন্যাকে। পরদিন নৌকা খুলিয়া সেই ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় কবির মনে হইল, আজ এই মেয়েটি তো ছোট, কাল সে বড় হইবে তার পর কত কত ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্য দিয়া তার অজ্ঞাত জীবন পথ চলিবে।

ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানি নে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি।

কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়। —অনন্ত পথে, চৈতালি

প্রেমের এই অনন্ত দৃষ্টিতে দেখিলে মানব তো তুচ্ছ থাকে না তখন মানবে দৈবতে ভেদ হয় প্রেমে মাখামাখি। তখন সংসারে মানুষের মধ্যেই দেবতাকে করা যায় উপলব্ধি। তখন তাঁহাকে আর বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করিতে হয় না। প্রেমের দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায় সবই অসীম মহিমায় পরিপূর্ণ। তাই বৈষ্ণবকবিতায় কবি বলিতেছেন,

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে— আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। —বৈষ্ণবকবিতা, সোনার তরী

তখন বুঝা যায় জগতের সেবাই হইল ভগবানের সেবা

সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে। —নৈবেদ্য

তত্ত্ববাদীর সঙ্গে কবির আর একটি মহা প্রভেদ। অদ্বৈতবাদী সকল বৈচিত্র্য ও সীমার মধ্যে খুঁজিতেছেন এক অদ্বৈত অসীমকে। সীমাকে তিনি মিথ্যা বলিয়াই জানেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একাধারে সাধক ও কবি। তিনি অন্তরের এককেও গভীর ভাবেই মানেন, জগতের বৈচিত্র্যকেও আনন্দেই স্বীকার করেন। অন্তরস্থিত সেই একেরই প্রকাশ বলিয়া এই বিশ্ববৈচিত্র্য আমাদের এত প্রিয়।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী ?· ·
অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী। —চিত্রা

এদিক দিয়াও সীমা ও অসীমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সীমাও তাঁহারই প্রেমের ধন। কাজেই অদ্বৈতবাদীর কাছে সীমা তুচ্ছ হইলেও সেই অসীম প্রেমময়ের কাছে তুচ্ছ নয়। তাঁহার প্রেম দিয়া তিনি সকল সীমা হইতে সব তুচ্ছতা সব দৈন্য দিয়াছেন দূর করিয়া। সবই মহা গৌরবময়। তিনি অসীম আমি সীমা, কিন্তু প্রেমে আমাকে যে দিয়াছে অপরূপ মহিমা! আমি কি তাঁহার কম সাধনার ধন ? তাই কবি সাহস করিয়া তাঁহাকে বলিতে পারিয়াছেন,—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে। —গীতাঞ্জলি

আমার জন্য অসীম তাঁহার এই অনন্ত কালের যাত্রা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর তো নহে। তবু না জানিয়াও আমার চিত্ত মন প্রাণ চলিতে চায় তাঁহারই খোঁজে। বিশ্ব পূর্ণ করিয়াই তিনি, তাই কারণ না বুঝিয়াও দেখি বিশ্ব-বসুধা সবই আমার প্রিয়। তাঁহারই সম্পর্কে অসীম অনন্ত স্থানকালময় বিশ্বজগৎ যেন আমার আপন। তাঁহাকে স্বীকার করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হয়।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া। —উৎসর্গ

ঘরে ঘরে সেই এক পরমাত্মীয় আছেন বলিয়া সকল ঘরকেই মনে হয় যেন আমারই ঘর। সকল ঘরে যেন তাঁহাকেই খুঁজিতেছি। এই হইল আমার অসীমের খোঁজ।

ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

জনমে জনমে কত অজানাকে জানাইয়াই তিনি আমাদের অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সকল নূতন নূতন বন্ধুর মধ্যে সেই চির পুরাতন বন্ধুকেই খুঁজিতেছ।

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই। —গীতাঞ্জলি

কাজেই বিশ্বজগতে যেখানে আমি যে রূপেই যাই-না কেন, সর্বত্রই তাঁহার প্রেমের সম্বন্ধে আমার আপন পরমাত্মীয়।

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা—
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা। —উৎসর্গ

বাহিরে যখন চাহিয়া দেখি তখন দেখি বিশ্বজগতে তাঁহার সিংহাসন, তারই চতুর্দিকে তাই নিরন্তর চলিয়াছে প্রেমোৎসবের নৃত্যগীত।

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্য কলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। —নৈবেদ্য

আবার অন্তরের দিকে চাহিলে দেখা যায়—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। —গীতাঞ্জলি

আমার বাহিরের সকল স্থান পূর্ণ করিয়াও তিনি, আমার অন্তর পূর্ণ করিয়াও তিনি। তখন বৃহদারণ্যকের বাণী মনে হয়, যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ এই আকাশ।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে পুরুষঃ—বৃঃ আঃ, ২, ৫, ১০

তিনিই আবার অন্তরাকাশ—

যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ—বৃঃ আঃ, ২, ৫, ১৪

কবীরেরও কথা—জল ভর কুম্ভ জলৈ বিচধারয়া বাহর ভীতর সোই

ভিতরে বাইরে সকল দিকে সেই অসীম আছেন সীমাকে ঘিরিয়া। কোথাও যেন তাঁহাকে খুঁজিয়া আমাকে শ্রান্ত হইতে না হয়। এই কথাই কবীর বলিয়াছেন, তিনি আমাকে এমন করিয়া ভিতরে বাহিরে ঘিরিয়াছেন যেন তাঁহার দাস তাঁহাকে খুঁজিবার দুঃখ না পায়।

কহৈঁ কবীর মোহিঁ ব্যাপিয়া

যত দুখ পাবৈ দাস

কিন্তু তবু কি সব সময় আমাদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়ে। তাই বাহিরে সমস্ত বিশ্ববসুধাকে ভরিয়া দিয়াছেন অপরূপ সৌন্দর্য দিয়া। অন্তরকে ভরিয়া দিয়াছেন মধুর ভাব রসে। এই মাধুর্য ও সৌন্দর্য হইল তাঁহার ব্যাকুল অনুনয়। তিনি নিরন্তর এই সৌন্দর্য দিয়া বলিতেছেন, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখ, দেখ আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি বসিয়া। এইজন্যই প্রেমের জগতে সৌন্দর্যের এত বড় স্থান। প্রেম যে এই অনুনয় দিয়াই ভরা। আমি সামান্য, আমি সীমা। তবু অসীম এই আমাকেই অনুনয় করিতেছেন সৌন্দর্য দিয়া। সৌন্দর্যের ভিতরের মর্ম কি তাহা বুঝাইতে গিয়া বাউল বলিলেন, আমার প্রিয়তম, আমার পায়ে ধরিয়া কহিতেছেন, হে প্রিয় আমাকে একবার চাহিয়া দেখ

সত্য কৈরা কইরে সখী

আমার পায়ে দিছে হাত।

কি প্রচণ্ড সাহস! তবু কত বড় বিরাট সত্যকে এমন অনায়াসে সে বলিতে পারিল।

তবু তত্ত্ববাদী বলিতেছেন সৌন্দর্য হইল বন্ধন। প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক ভক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিলেন সৌন্দর্যই মুক্তিদাতা গুরু। সৌন্দর্য আমার মধ্যে আমাকে বদ্ধ থাকিতে দেয় না। সকলেই মুক্তির প্রার্থনা করেন। দার্শনিক ও তত্ত্ববাদীও করেন। কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন। অনেকেই সৌন্দর্যকে বন্ধন মনে করিয়া করেন প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ মুক্তির প্রার্থনা করিলেন চির সুন্দরেরই কাছে —

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি

হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,

তোমার আহ্বানবাণী।

আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সুর,

নিয়ে যাক্ পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুন্দর। —মুক্তি

নীড়ে সুপ্ত যে পাখি তাকে যখন জাগায় প্রভাতের আলো ও সংগীত তখনই তার আসে মুক্তি নীড় হতে অসীমের দিকে

পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি।
সে কি শোনে আকাশকোণে ভোরের আলোর কানাকানি॥ —প্রবাহিণী

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই গতি ও মুক্তির উপাসক। কিন্তু সৌন্দর্যকে এই মুক্তির কখনও বাধা মনে করেন নাই। তিনি নিজেকে চিরযাত্রীই মনে করিয়াছেন—

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে ?· ·
ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন। —বলাকা

এইখানেই মনে পড়ে কবীরকে যিনি বলিলেন— প্রবহমান জলধারাই ভালো, বদ্ধ জলই হয় দুর্গন্ধ কলুষিত। সাধকও ভালো যে সদা সচল, তবে আর তাহাতে লাগে না কোনো দাগ।

বহতা পানী নির্মলা বন্ধা গন্ধিলা হোয়।
সাধক তো চালতা ভলা দাগ লগেন জোর॥

তাই কবীর গাইয়াছেন, ওরে মন অবসন্ন হইও না, যতক্ষণ জাগরণ, ততক্ষণ সম্মুখে যাত্রা।

কয়না নহী মন দিল গিরী।
জব জাগো তব মুসা ফিরী॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈ বেতি চরৈ বেতি' নামে কয়টি বাণীতে ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যাত্রার জয়গান। এই চলার দ্বারাই কবি থাকেন নিত্য পবিত্র—

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ। —বলাকা

এই নবীন যৌবনের প্রাণের শক্তির জোরে তিনি সবজীর্ণতা জয়ী।

ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

কবি চিরযুবাকে স্তব করিয়াছেন—

চির যুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

যাত্রা কেন তাঁহার এত প্রিয়? যাত্রা পুরাতন অশুচি জীর্ণতা সব অপগত করিয়া অসীমের পথে মুক্তির পথে করিয়া দেয় অগ্রসর। আমার মিলন লাগি যিনি কবে থেকে আসচেন— তাঁর দিকে যাত্রা করিয়া আমরা তাঁহার প্রেমের দিই প্রত্যুত্তর। বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথও বলিলেন এই যে দেহ সেও হইল সেই অসীম যাত্রার পথে, এই জীবনের ঘাটের পারাপারের একটি ভেলা। নূতন নূতন ঘাটে নূতন নূতন করিয়া ভেলা আশ্রয় করিতে ও ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। এই ছাড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে বৈরাগ্যের ত্যাগটাই বড় কথা নয়। মহাযাত্রার পথে বারবারই তো উপকরণকে অতিক্রম করিলে চলে না।

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেবো ভেলা। —বলাকা

অজানা অসীমের জন্য আমার এই যাত্রা। তাহাতেই আনন্দ

আমি যে অজানার যাত্রী, সেই আমার আনন্দ।

আমরা সীমাকেই ভাবি নির্ভরযোগ্য আর অজানাকে করি ভয়। অথচ এই অজানা অসীমই হইল যথার্থ মুক্তিদাতা।

জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ। —বলাকা

কাজেই সেই অজানাই পরমামুক্তি, আবার এই অজানার যাত্রা-পথে তিনি আছেন জীবনের হাল ধরিয়া। তিনিই আমার নিত্য সাথি।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি। —বলাকা

হালের মাঝিও তিনি, আমার জীবনতরী আবার চলিয়াছে তাঁহারই সন্ধানে। এ এক পরম রহস্য।

কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ? —বলাকা

সেই অসীম যেমন 'কবে থেকে' আমার দিকে আসিতেছেন আমারও তাঁর উদ্দেশে যাত্রা 'অনেককালের'।

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে। —গীতিমাল্য

হঠাৎ মনে হইতে পারে তবে বুঝি সে যাত্রা আমার অনেক দূরে। তাহা নহে। তিনি কি দূরে আছেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে জীবনতরীর তিনিই তো মাঝি। অন্তরেই তিনি আছেন। অথচ অনন্ত ব্যবধান।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর। —গীতিমাল্য

এই কথাই বাউল গাহিয়াছেন,

সহজ হওয়া নয় রে সহজ তার দিবানিশি চাই সাধনা

বাঁধা পথে সেখানে পৌঁছাইবার কোনো উপায় নাই।

তাই কবি গাহিলেন

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টলিয়ে দাও গো ডুলিয়ে দাও॥ —গীতিমাল্য

এই অন্তরের প্রেমলোকে যে বিরাজমান সে কি দূরে? অথচ অনন্ত জীবন করিয়াছে তাঁহার উদ্দেশে যাত্রা। ভগবানের কত কৃপা হইলে তবে সাধক পৌঁছায় সেখানে। বাহ্য বিধি কি বিধানে কেহ কি পৌঁছিতে পারে সেই অতি নিকটের অতি সুদূরে? মুণ্ডক বলিয়াছেন,

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্। —মুণ্ডক, ৩, ১, ৭

সেখানে আছেন প্রেমময়। বাহ্যপথে গেলে অসীম সেই ঐশ্বর্যময়ের দূরত্ব। কখনো তাহাতে পৌঁছানো অসম্ভব। প্রেমের সোজা পথে গেলে পৌঁছা না পৌঁছা সে প্রেমময়ের ইচ্ছা। কারণ সীমার মধ্যেই যে অসীম ব্যবধান। চৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলিলেন, বাহ্য প্রথা ও আচারগত ধর্ম ছাড়িয়া অনুরাগের পথে করিতে হইবে যাত্রা, তবু মিলা না মিলা তাঁহার ইচ্ছা।

ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাউল নিতাইকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। বাবা, মানবীয় প্রেমের কি কিছু অনুভব তোমার আছে? নিতাই বলিলেন, বাবা, ছিল একজন, তার দেহের কাছে দেহ রেখে ছিলেম। কিন্তু তাতেই কি বাবা মানুষকে পাওয়া যায়, বারো-তেরো বৎসর এমনই চলল। তার পর তিনি গেলেন চলে। তার পরও বারো-তেরো বৎসর তাঁকে মনে মনে কাছে কাছে রাখি। একদিন হঠাৎ অর্ধদণ্ডের জন্য তাঁকে পেলাম। বাবা, সে পাওয়া পরশমণি! আমার সব যে একেবারে সেই মুহূর্তে সোনা করে দিয়ে গেল। তুমি ভাবছ, মাত্র অর্ধদণ্ড! আমি বলি, এতই বা কেন? অর্ধপলই তো যথেষ্ট। আর এমন পরশ অর্ধপলের জন্যই কি উপযুক্ত আমার তপস্যা আছে?

কাজেই সেই অতি নিকটে অথচ অতি সুদূরে যে প্রেমলোক সেইখানে পৌঁছিতে পারিলেই সাধকের

জীবন— তাহার আদি অন্ত চরিতার্থ। সেখানে পৌঁছিয়া সাধক দেখিতে পায় অসীমের আনন্দে তাহার সব কিছু ভরপুর। তাই সীমা হইয়াও সে অসীম হইতে কম নয়। এই আনন্দের গান কবি গাহিয়াছেন—

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।· ·

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেচে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।· · —গীতিমাল্য

এই ভারতে দেবতার পূর্ণাভিষেক করিতে হইলে তাঁহাকে সর্বতীর্থসলিলে অভিষেক করিতে হয়। সর্ব লোকনাথকে কি শুধু এই জনমের তীর্থবারিতে অভিষেক করিলে পূর্ণাভিষেক হইবে? জনম-জনমের লোকলোকের তীর্থোদক সংগ্রহ করিয়া সর্বতীর্থ-বারিতে করিতে হইবে তাঁহার অভিষেক। মায়াবাদী বলেন জন্ম একটা অভিশাপ। প্রেমযাত্রা যাত্রী জানেন, সীমা হইতে সীমার সর্বরস বৈচিত্র্যেই সেই অসীমের পরমাতৃপ্তি। এক এক জন্ম হইল এক-একটি তীর্থযাত্রা, কারণ এক এক লোক তাঁহার এক এক পুণ্যতীর্থ। প্রতিলোকে সেই লোকের মতো সেখানকার লোকনাথকে পূর্ণ প্রণতি করিয়া জীবনের সুধা-ভাণ্ডে সংগ্রহ করিতে হইবে সেখানকার প্রেম রসামৃত। একটি লোকের রসও তাহাতে যেন বাদ না যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

কোথা হতে আসিয়াছি, নাহি পড়ে মনে,
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থদরশনে
এই বসুন্ধরাতলে! লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশসমুদ্রের ঘাটের উপরি।

শুনা যায় চারিদিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসারশঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরী প্রান্তে পান্থশালা-'পরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ন হয়ে এল গল্পে হাসি গানে।
এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তার পর
নব তীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর। —নৈবেদ্য

এই পথে যে চলিয়াছে সে শুষ্ক বৈরাগ্যগ্রস্তের মতো কাহাকেও অপমান করিয়া ছাড়িয়া যায় না। সকল মন্দিরে সকল পুণ্যস্থানে সে তাহার প্রীতি ও প্রণতি জানাইয়া সবার কাছেই ব্যথিত চিত্তে মাগিয়া লয় তাহার যাত্রাপথের আশীর্বাদের সম্বল। সর্বত্রই তখন তাহার প্রেমের যোগ। নদী যেমন সকল ঘাটে সকল জনপদে তাহার সরস সেবাটুকু পরিবেশন করিতে করিতে সবার আশীর্বাদ বহন করিতে করিতে অসীম সমুদ্রের দিকে হয় অগ্রসর, তেমনি তখন চলে তাহার যাত্রা।

সে প্রেম একটি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। যে প্রেম অসীমের দিকে বহিয়া লইয়া যায় সে প্রেম তো বদ্ধ করে না, ক্ষুদ্র করে না। এই প্রেমপথের মধ্যেই চলে মুক্তি দিতে দিতে। তখন মুক্তির জন্য শুষ্ক বৈরাগ্যের নিষ্ঠুর হস্তে সব বাঁধন ছিন্ন করিতে হয় না। সম্মুখের অসীম সাগরের প্রেমের ডাক তখন সেবার পর সেবার প্রণতির পর প্রণতিতে প্রেমের যাত্রীকে লইয়া চলে অগ্রসর করিয়া। তখনই বুঝা যায় কবির এই গানের মর্ম—

> বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।· ·
> মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। —নৈবেদ্য

তখন অসীমের জন্য ব্যাকুলতাই দিবানিশি সাধককে ডাকে সম্মুখের দিকে। অসীম সাগরের মধ্যে আপনাকে হারাইতে আর সীমার নদীর কোনো ভয় থাকে না। অসীমের মধ্যে আপনাকে হারাইবার ভয় সাধনার পথে একটা কম বাধা নহে। কিন্তু প্রেম যখন জাগে, বালিকাবধূ যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয় তখন ভয়ই পরিণত হয় ব্যাকুলতায়। তখন সেই অসীম সীমাবদ্ধ জীবনকে প্রতিক্ষণে ডাকে, আর সেই ডাকে জীবন ওঠে ভরিয়া—

> আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।
> ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
> বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
> কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
> সে কথা যে যাই পাশরি। —উৎসর্গ

তখন তিনিই সব। সব ভয় তখন অপগত, অসীমের সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতায় তখন আর সব বাধা ভয় হইয়া যায় মিথ্যা। তখন দেহমন ভিতরবাহির সকল ঝড়-বাতাস-ঝঞ্ঝায় ভরিয়া ওঠে অসীম সাগরের প্রেমগানে প্রেমাহ্বানে।

> দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে
> ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ!
> গাও রে আজি নিশীথ-রাতে
> অকূল-পাড়ির আনন্দগান।

যাক্‌-না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক-না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে,
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দুহাত মেলি
অন্তবিহীন অজনাকে। —খেয়া

সন্ধ্যা — শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
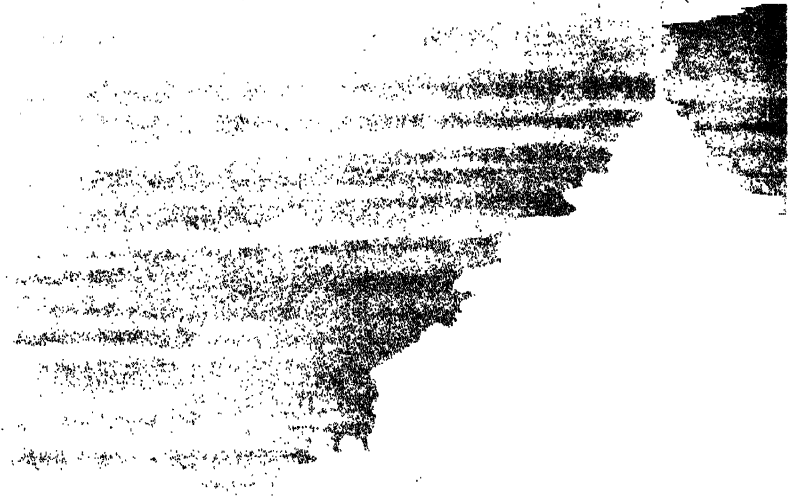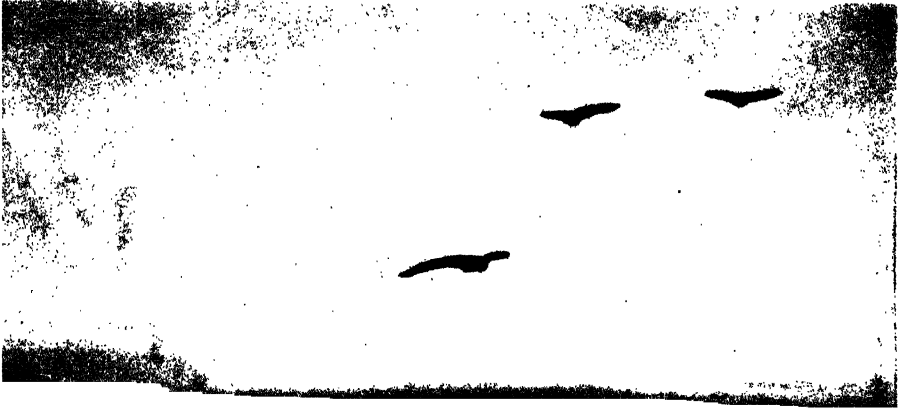
শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বাংলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই বেশি করে জানেন এবং তাঁকে কবিগুরু ও সাহিত্যসম্রাট বলে অভিহিত করে তাঁর কাব্য ও সাহিত্য -প্রতিভার উৎকর্ষ স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যই কবিগুরু এবং সাহিত্যসম্রাট সে বিষয়ে কোনোই মতান্তর নেই। রবীন্দ্রনাথের খণ্ডকবিতাগুলির তরঙ্গোচ্ছল ছন্দ-লালিত্য ও ভাববিন্যাস যে কত বিচিত্র তা পাঠকমাত্রেই পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছেন। সে-সকল কবিতার উদাহরণ দিয়ে এই রচনার কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। তাঁর অসংখ্য সংগীতের উদার গম্ভীর ও বিশুদ্ধ ভাব ও সুরধারা শ্রোতাদের মনকে উন্নত ও উদ্‌বুদ্ধ করে দেয়। তাঁর প্রাণমাতানো স্বদেশী গানগুলি আজকেও বাংলাদেশের হাটে মাঠে বাটে শোনা যায়। নৈবেদ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালির গানগুলি ছাড়া যদি তিনি আর কিছুই না'ও লিখতেন তাহলেও তিনি এই-সকল গানের জন্যই অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি কেবলমাত্র খণ্ডকাব্য ও সংগীতেই শেষ হয় নি। তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা আধুনিক ভারতবর্ষের গীতিনাট্যের প্রথম প্রয়াস ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। মিত্রাক্ষর ছন্দে মালিনী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিসর্জন এবং রাজা ও রানী ভাবে ও রচনার ভঙ্গীতে অতি উৎকৃষ্ট নাটক বলে স্বীকৃত। প্রায়শ্চিত্ত, শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা বা অরূপরতন, ডাকঘর ইত্যাদি নাটকের উল্লেখ না করে চলে না। নটীর পূজা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, শাপমোচন প্রমুখ নৃত্যনাট্যে একাধারে কাব্যগীত ও নৃত্যকলার যে অপূর্ব সমাবেশ দেখা দিয়েছে এমনটি আর কোথাও দেখি নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রহসনও বাদ যায় নি। বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ বা চিরকুমার সভা, গোড়ায় গলদ বা শেষরক্ষা, মুক্তির উপায়, হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক'এর একাঙ্ক নাটিকাগুলি বিশুদ্ধ নির্মল রঙ্গরসের অনির্বচনীয় উদাহরণ রূপে চিরকালই সতেজ সুন্দর হয়ে জীবিত থাকবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এ-সবের হাস্যরসদীপ্ত অনাবিল আনন্দের তুলনা মেলে না। এও সর্বজনবিদিত সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের রাজা এবং ভারতীয় সাহিত্যের এই বিভাগের প্রথম পথপ্রদর্শক। গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, নিশীথে, বিচারক প্রমুখ গল্পগুলি এক-একটি নিষ্কলঙ্ক মুক্তা বললেও অত্যুক্তি হবে না। গল্পগুচ্ছের নানা গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের নানা নির্বোধ কুসংস্কার ও নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচার ও অসহনীয় অসমতার নগ্নমূর্তি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে চোখে আঙুল দিয়ে সে-সকল ত্রুটি-স্খলনগুলিকে সংশোধন করে নেবার জন্যে প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর বড় উপন্যাসগুলিও বাংলা-দেশের পাঠকমণ্ডলীর কাছে সুপরিচিত। নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় ও অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে নায়কনায়িকাদের পরিবর্তনশীল মনের বিশ্লেষণে গল্পাংশগুলিকে সরস ও সজীব করে তুলেছেন। বাংলাদেশের নদী-নালা বিল-খালের এবং দিগন্তপ্রসারিত শস্যক্ষেত্রের যে নিখুঁত বর্ণনা তাঁর উপন্যাসে ও গল্পে পড়েছি তেমনটি পড়ি নি

তৎকালীন আর কোনো লেখকের রচনায়। কেবলমাত্র কবিতা নাটক গল্প গান লিখেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। ধর্ম ও সমাজ-সমস্যা, সাহিত্যসমালোচনা, রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে যে গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ তিনি করে গেছেন তার তুলনা নেই। শিক্ষা, সমবায়নীতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যে দেশের নানাবিধ সমস্যার মীমাংসার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন যে সময়ে সে-সব বিষয়ে তখন কেউ বড় একটা ভাবেনও নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে একা রবীন্দ্রনাথের যে প্রচুর দান রয়েছে এদেশের কিংবা বিদেশের কোনো-একটি লেখকের লেখায় এত ঐশ্বর্যের সমাবেশ কখনো হয় নি। বড় কবি হয়েছেন অনেকে, উচ্চাঙ্গের নাটকরচয়িতার সংখ্যা অনেক, সুনিপুণ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক সর্বদেশেই পাওয়া যায়, সংগীতবিশারদও অপ্রচুর নয় এবং গদ্য প্রবন্ধের ভাবুক লেখকও বিস্তর দেখেছি। কিন্তু একাধারে কবিতা নাটক উপন্যাস গল্প সংগীত সমালোচনা সামাজিক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য ছেড়েই দি, তাঁর কাছাকাছিও কেউ আছেন বলে জানি নে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে দেশবাসী কবিগুরু ও সাহিত্যসম্রাট বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু এত কথা বললেও রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বলা হয় না, কেননা এতেই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার শেষ নয়। তিনি আরো বড় ছিলেন। কি কারণে এ কথা বলছি তা এইবার সংক্ষেপে নিবেদন করব।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ যথারীতি একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হবে। সেখানে আমাদের শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগের অন্তর্গত কুটীরশিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রের বিচিত্র হাতের কাজ সাজানো হয়েছে। বয়নশিল্প, দারুশিল্প, গালার কাজ, হাতে-গড়া বিচিত্র চামড়ার জিনিস, বাতিকের কাজ, বাঁশের ও বেতের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সূচীশিল্প, মৃত্তিকার পালিশ-করা ফুলদানী, পেয়ালা, পিরিচ, বিচিত্র আলপনা —কিছুই বাদ পড়ে নি। এই-সকল দ্রব্যসম্ভার যেমনি কাজের তেমনি সুন্দর ও মনোরম। কিন্তু কেবলমাত্র *সৌন্দর্যসৃষ্টি* ও *শিল্পোৎকর্ষের জন্যই* কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? যদি 'না'-ই জবাব হয় এবং আমার মতে তা-ই সত্য জবাব— তবে তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে— শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ও তার মর্মবাণীটি কি ছিল? এই প্রশ্নটির সদুত্তর পেলেই রবীন্দ্রপ্রতিভার এমন-একটি বিশেষ দিক আমাদের চোখে পড়বে যার জন্যে তাঁর দেশবাসী আমরা সকলেই তাঁর কাছে আমাদের অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য হব। আজকের দিনে এই বিষয়টি সম্বন্ধেই আমাদের ভালো করে ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে জানতে হলে এ ভাবনা ও পর্যালোচনা অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্যরচনাতেই শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা সকলেই জানি যে প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রণালী তাঁর মনকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল। নিভৃত তপোবনে গুরুগৃহের শান্ত পরিবেশের মধ্যে সুকুমারমতি তরুণ বিদ্যার্থীদের দেহমন যেমন করে পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে বিদ্যার্জনের জন্য প্রস্তুত হত, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আমাদের দেশের বর্তমান বিদ্যার্থীরাও সেই রকম প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়ে উঠবে। সেইজন্যে তিনি শহরের কলকোলাহল থেকে দূরে তদীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যান দিয়ে গড়া শান্তির নীড় শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সুচারু শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল, তা তিনি নানা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি সুন্দরভাবে তাঁর শিক্ষাদর্শের কথা লিখেছেন—

"বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে— এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।" — শিক্ষাসমস্যা। 'শিক্ষা'

তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে এই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সুকুমারমতি বিদ্যার্থীরা দেহেমনে স্বাস্থ্যবান হয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে বিদ্যাগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবে। তিনি জেনেছিলেন যে, ছাত্ররা বিদ্যার্জন তখনই করতে পারবে যখন তারা সত্যকার গুরুর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। তিনি সত্য গুরু সম্বন্ধে লিখেছেন—

"এই শিক্ষকই যদি জানেন যে, তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন ; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত ; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।"

—শিক্ষাসমস্যা। 'শিক্ষা'

নিতান্তই বালক বয়সে আমার সৌভাগ্য ঘটেছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মী কয়েকজন সত্য গুরুর পাদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করবার ও নিত্য তাঁদের শুভাশীর্বাদ পাবার— যা আমার জীবনে আজ পর্যন্ত অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। গুরুদেবের মনের ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদ্যালয়টি পরিপুষ্টিলাভ ক'রে বিশ্বভারতী রূপ পরিগ্রহ করে দেশবাসীর সামনে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা গুরুদেবের প্রতিভার এক অপূর্ব স্ফুরণ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজ যখন ভালোভাবেই চলছিল তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে আর-একটি ভাবধারা দুর্বার স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে, তাঁর পিতৃদেব তাঁকে পৈত্রিক জমিদারির কাজ পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে পতিসর ও শিলাইদা অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের কৃষক প্রজা ও গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠতা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি লিখে গেছেন—

"শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা, পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার ব্যবসায় ছিল

জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ-নালিশ-আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়া-তরুতলে তাদের কুটীর— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌছত।··· তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্‌-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।"

—শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ। 'পল্লীপ্রকৃতি'

মনের এই রকম অবস্থা নিয়ে অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে যখন এই-সব বিষয়ে কেউই মাথা ঘামান নি তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় কি করে গ্রামোন্নয়ন করা যায়, সমবায়নীতির সাহায্যে গ্রামবাসীরা কি করে নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পল্লী-সমাজের নানা দুরূহ সমস্যার মীমাংসা-নির্দেশ করে গেছেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর যে আত্মিক যোগ ঘটেছিল তারই মাধ্যমে তিনি তাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দ্বেষ হিংসা, তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট দৈনন্দিন জীবনের শূন্যতা রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিত বলেই তিনি সেই-সব দীনতা কি করে মোচন করা যায় তার জন্যে যত্নবান হয়েছিলেন। সেই জমিদারির কাজ দেখাশোনার কাল থেকেই তিনি ভেবেছিলেন যে পল্লীর কাজ করতে হবে। শান্তিনিকেতনের কাজ শুরু হবার কিছু পরেই তিনি সুরুলের এই কুঠিবাড়িটি যা আমাদের সামনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেটিকে কিনেছিলেন এবং সেইখানেই 'শ্রীনিকেতন' নাম দিয়ে তিনি পল্লীসংগঠন কাজে লেগে গেলেন। সেই কাজে তাঁর সহায় হয়েছিলেন স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ, লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট; আর রথীদা[১] সন্তোষদা[২] ও গৌরদা[৩] যাঁরা তিনজনই চলে গিয়েছেন। পল্লীসেবার কর্মসূচী সম্বন্ধে গুরুদেব এই ক'টি কথা বারবারই বলে গেছেন—

"আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সে উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে।···

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।··· যারা বীরজাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে; নিজেকে শুকিয়ে মারার অহঙ্কার তাদের নয়— ; তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।"

— অভিভাষণ। 'পল্লীপ্রকৃতি'

---

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ সন্তোষকুমার মজুমদার ৩ গৌরগোপাল ঘোষ

এই রকম উচ্চ আদর্শ নিয়ে গুরুদেব পল্লীসেবায় অনুব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পল্লীবাসীদের মনে তাদের আত্মশক্তির উন্মেষ করা এবং তাদের নিরানন্দময় দৈনন্দিন জীবনে কিছু আনন্দ এবং সৌন্দর্যবোধ এনে দেওয়া। এই কাজে তিনি পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, মুরুব্বিয়ানার ভাব আদৌ ছিল না। এই কাজের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রীতি ও দেশবাসীদের প্রতি অকপট স্নেহ ও সমবেদনা। তাঁর সহকর্মীদের তিনি বারবার বলেছেন—

"যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমনভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ, এ'কে দূর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কি পল্লী কি নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে—সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য-নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্যে শিক্ষার একটুখানি যে-কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে, মন অহংকৃত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে'।"

—পল্লীসেবা, 'পল্লীপ্রকৃতি'

"আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।··· আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে।··· পাশেই প্রত্যহ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি,— এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।" — দেশের কাজ। 'পল্লীপ্রকৃতি'

উপরে লিখিত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুদেব সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে পল্লী-উন্নয়নের কাজে লেগেছিলেন নীরবে, বিনা আড়ম্বরে। আশেপাশের গ্রামগুলিতে কাজ শুরু হলে প্রথমে গ্রামবাসীদের সন্দেহজনিত বিরুদ্ধতা কিছুটা জেগেছিল। কিন্তু ক্রমে যখন তারা জানতে পারল যে গ্রামসংস্কারে, বিদ্যাশিক্ষায় তারা এবং তাদের ছেলেমেয়েরাই উপকৃত হবে তখন তারা উৎসাহিত হয়ে নিজেরাও লেগে গেল নিজের পায়ে দাঁড়াতে। অবসর সময়ে পল্লীবধূ ও কন্যারা নানা রকম হাতের কাজ শিখতে শুরু করল— গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্পের সূচনা হল। তাদের নিরানন্দ জীবনে একটু স্বচ্ছলতাও যে এসেছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। পূজা-পার্বণে বাড়ির আঙিনায় বিচিত্র আলপনা ও সায়াহ্নে পল্লীসংগীতের মূর্ছনায় তাদের সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দের বিকাশ হতে লাগল।

তাঁর আরব্ধ কাজের সাফল্যের সূচনা গুরুদেব কিছুটা দেখে গিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে তাঁর পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্যে সত্যার্থ নিহিত আছে। দেশ ছিল তখন পরাধীন। তিনি তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁর শেষ আবেদন জানিয়ে গেছেন—

"সব শেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের

রাজারা দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

"তোমরা স্বদেশের প্রতীক, তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি, দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো।···আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি পরীক্ষা করে দেখো, এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঙ্কল্প পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও, আনন্দিত মনে এর রক্ষণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ুদান করতে পারে।"

—অভিভাষণ। 'পল্লীপ্রকৃতি'

গুরুদেব চলে গিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পরম পরিতোষের বিষয় তাঁর এই মর্মস্পর্শী আবেদন অগ্রাহ্য হয় নি। আজকে দেখতে পাই গ্রামে-গ্রামে কুটীরশিল্পের কাজ দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে চলেছে। অতি বিচিত্র হাতের কাজের দ্রব্যাদি বাজারে আসতে শুরু করেছে। ভারত-সরকার ও রাজ্য-সরকার সকলেই গুরুদেবের প্রবর্তিত পথে এগিয়ে চলেছেন। যিনি এই পল্লীসেবায় তাঁর মনের সকল মাধুরী, সকল স্নেহ-ভালোবাসা নীরবে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর মহৎ হৃদয়ের অকুণ্ঠ দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

পল্লীসংগঠন বিষয়ের প্রসঙ্গেই লোকশিক্ষা-সংসদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গুরুদেব লিখেছেন—

"মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে স্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরে মেয়েরা কিম্বা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।"

— শিক্ষার বিকিরণ। 'শিক্ষা'

কিছুদিন পরে ১৯৩৬ সালে বাংলা সরকারের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আজিজুল হক সাহেবকে গুরুদেব যে চিঠি লিখেছিলেন তার কিয়দংশ থেকে তাঁর এ বিষয়ে মনোভাব বোঝা যায়। গুরুদেব লিখেছিলেন—

"দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটো বড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে।

এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।··· এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।"

— পরিচয় : গ্রন্থপরিচয়। 'রবীন্দ্ররচনাবলী' ১৮

কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা উৎসাহ না আসায় ১৯৩৬ সালে একরকম বিনা আড়ম্বরেই গুরুদেব লোকশিক্ষা-সংসদের কাজ শুরু করে দেন। স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথ হলেন তাঁর সম্পাদক। পাছে কেউ মনে করে যে পল্লীবাসীদের জন্যে যা-হোক-একটু লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে তাদের উপর অনুকম্পা দেখানোই এই সংসদের উদ্দেশ্য সেই জন্যে গুরুদেব বলেছেন—

"প্রাথমিক শিক্ষা বলিয়া বিশেষভাবে পল্লীবাসীর জন্য পরিমিত কোনো জ্ঞান বিতরণ এই সংসদের উদ্দেশ্য নহে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে আধুনিক যুগের উৎকর্ষ প্রাপ্ত সর্বপ্রকার বিদ্যানুশীলনের প্রচারসাধন এই সংসদের উদ্দেশ্য।"

গুরুদেব চলে গিয়েছেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং দেশবাসী বিশ্বভারতীকে একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিয়ে বিশ্বভারতী আইন পাস করল (১৯৫১)। কিন্তু সেই আইনে লোকশিক্ষা-সংসদের কোনো স্বীকৃতি এমন-কি কোনো উল্লেখই ছিল না। পরে, ১৯৬১ সালে, বিশ্বভারতী আইন সংশোধন করে লোকশিক্ষা-সংসদ ও তার অভিজ্ঞানপত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে লোকশিক্ষা-সংসদের ও তার অভিজ্ঞানপত্রের মান বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং গুরুদেবের আশা পূর্ণ হয়েছে, কেননা, "এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে।" এই লোকশিক্ষা-সংসদের প্রবর্তনও গুরুদেবের দূরদর্শিতার এবং তাঁর অন্তরের বিকাশের সাক্ষ্য দেয়।

এই যে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের ও লোকশিক্ষা-সংসদের কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে গেল এ-সকলের প্রেরণা এল কোথা হতে? এ-সব কি সম্ভব হত যদি না গুরুদেব মনেপ্রাণে পল্লীবাসী ও বিশ্ববাসীদের আপনজন বলে জানতেন? যে মমতা তিনি হৃদয়ে পোষণ করতেন তা তিনি পেলেন কোথা থেকে? এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের সাধনার ধারাটিকে একেবারে মর্মে অনুভব করেছিলেন। একদা এই ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা উপনিষদের ঋষি পর্বতচূড়া থেকে নির্ভীক কণ্ঠে অসংশয় চিত্তে বলেছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

ঋষি কেবলমাত্র ভারতবাসীদের সম্বোধন করলেন না। তিনি বললেন "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" অর্থাৎ 'বিশ্বের যে যেখানে আছ তোমরা শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্রকন্যা, সুতরাং অমৃতের অধিকারী।

আমি এ কথা বলছি, কেননা সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি।" মানুষকে ঋষি "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে সম্বোধন করে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং নিখিল মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করলেন। এই ভ্রাতৃভাব যে মুহূর্তে স্বীকৃতি পেল তখনই আত্মপর ঘুচে গেল। ভৌগোলিক সীমানা যা দেশগুলিকে খণ্ডিত করে রেখে বিরোধের সৃষ্টি করেছে তা ভেঙেচুরে এক হয়ে গেল, সব মানুষই আপন হয়ে গেল। এই শাশ্বতবাণী অতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও বহন করে চলেছে। এই মনোভাবের যে বিকার কখনো ঘটে নি তাও বলা চলে না। কিন্তু একের পর এক সাধু ব্যক্তিগণ এই বাণীর হারানো সুর ফিরিয়ে এনেছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই বিশ্বমানবিকতার বাণীই পুনরুদ্ধার করে গিয়েছেন। এই বাণীতেই গুরুদেব ও মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ জীবনকে সার্থক করে গেছেন।

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পর গুরুদেব পশ্চিমের বহুদেশ ঘুরেছিলেন বিশ্বমানবিকতার বাণী বহন করে। সেখানে তিনি দেখলেন যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তিগুলি তখনো পরস্পর প্রতিহিংসা-দ্বেষ-পরবশ হয়ে আবার নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। গুরুদেব বুঝেছিলেন যে জাতীয়তার অপরিসর গণ্ডির থেকে বের হয়ে এসে মানুষ যদি বিশ্বমানবিকতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারে তবেই হবে তার আত্মার মুক্তি ও পৃথিবীর পরিত্রাণ। এই কথাই তিনি প্রচার করে গেছেন। তার জন্যে অনেক লোকনিন্দাও তাঁকে সইতে হয়েছে। ইউরোপ থেকে শান্তিনিকেতনের একটি তরুণ অধ্যাপককে[১] গুরুদেব যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে তাঁর মনের আকুল প্রার্থনা জানা যাবে। তিনি লিখেছিলেন—

"ভারতের যে বাণী উপনিষদের, যে বাণী বুদ্ধদেবের সেই বাণী এখানকার ঘোরতর হট্টগোলের মধ্যে আমার হৃদয়ে এসে পৌঁছায়। তা না হলে এখানকার গোলমালে আমার মনকে তলিয়ে ডুবিয়ে দিত। আমি এদের টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি যতই দেখি ততই বলি এর মানে কী? ততঃ কিম্? যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূভাগ কামান-বন্দুকের আয়োজন করুক, যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। এই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে— যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ মুছে যাক— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক— সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটিমাত্র দেশ আছে সে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ।"

এই হল বিশ্বভারতীর অন্তরের কথা। পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার বাণী তিনি দেশে দেশে শুনিয়ে এসেছেন। সেই বাণী ভারতবর্ষেরই সাধনা-প্রসূতা। তাঁর জীবনে ফুটে উঠেছিল ঈশ্বরে প্রীতি, ঈশ্বরের পিতৃত্বে স্বীকৃতি এবং সর্বমানবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃভাব। এই ভ্রাতৃভাব থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর পল্লীসংগঠন কার্যের প্রেরণা, এর থেকেই এসেছিল লোকশিক্ষা প্রসারের প্রয়াস। এই ভ্রাতৃভাবই শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী।

---

১ সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত, ১১ ডিসেম্বর ১৯২০। দ্র' 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা', শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

কবি ও কাব্য : রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে— লক্ষ্য করবার বিষয়, যে কবি এ কথা বলেছেন তিনিও নিজেই নিজের জীবনচরিত লিখেছেন। অবশ্য সে জীবনচরিত গতানুগতিক চরিত-কাহিনী নয়। সেখানে স্থান কাল সন তারিখের ভিড় নেই অর্থাৎ জিনিসটা নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। কবি সাহিত্যিকের জীবনে ঘটনার ভূমিকা খুব বড় নয়। ঘটনার একটা চাক্ষুস মূর্তি আছে। সে তার চতুস্পার্শ্বে চাঞ্চল্যের ঢেউ তোলে, সরবে নিজেকে ঘোষণা করে, নানাভাবে নিজেকে জাজ্বল্যমান করে তোলে। যে মানুষ কর্মী তাঁর জীবনে সেটা এক রকম মানিয়ে যায়— সেখানে ছোট বড় সব ব্যাপারই সোরগোল করে ঘটে। কিন্তু যে মানুষ ভাবুক প্রকৃতির, তাঁর জীবনে কোনো কিছুই ঘটা করে ঘটে না। বিশেষ করে কবির মন এক অদ্ভুত আধার—সব জিনিসকে সে গ্রহণ করে না। ছাঁকনির ফাঁক দিয়ে অনেক বৃহৎ ঘটনাও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গলে যায়; আবার অনেক ক্ষুদ্র জিনিস চিরকালের জন্যে মনের তারে বাঁধা পড়ে যায়। মনের তারে যে জিনিস ঝংকার তোলে তাকে ঘটনা বলতে হয় বলুন, কিন্তু সে ঘটনার স্বভাব অন্যরূপ। কবির জীবনে ঘটনা বলতে দুটি— একটি সুন্দরের অনুভূতি, অপরটি সুন্দরের প্রকাশ। ঘটনা হলেও এরা উভয়েই নম্রস্বভাব। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সংসারে পরমাশ্চর্য ঘটনাগুলি পরম নিঃশব্দে ঘটে। সোরগোল করে ঘটে না বলে সহজে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যিনি প্রধানতঃ মননের জীবন যাপন করেন তাঁর জীবনে বহিরঙ্গের বহরটা খুব বড় নয়। সেজন্যে কবির জীবনচরিত রচনা করা কখনোই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে যা ঘটেছে এবং তার প্রসাদ যিনি অন্তরে লাভ করেছেন নিজ মুখে ব্যক্ত না করলে তা জানবার উপায় থাকে না। দুঃখের বিষয় খুব কম কবিই এ কাজটি করে গিয়েছেন। নিজে যা করেন নি অপরে তা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছে উল্টো এবং সেই কারণেই অনুমান করা যায় কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে— এ কথা শুধু রবীন্দ্রনাথের নয় সকল কবিরই মনের কথা। কবির জীবন অন্তর্মুখীন, সে কখনোই খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। জীবনীকারেরা এখানেই ভুল করেন। স্থান কাল বংশপরিচয়ের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুস্পষ্ট-সীমানার মধ্যে জীবনটিকে তাঁরা বাঁধতে চান। এর ফলে দেখা গিয়েছে কবি মানুষের জীবনচরিত— অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি-স্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কথাটা শুনতে আপাতবিরোধী হলেও বলব, এই অতি-স্পষ্টতার দরুণই কবির কবিস্বভাবটি ঢাকা পড়ে যায়। সেখানে কবির লৌকিক জীবনের পরিচয় যদিবা পাওয়া যায়, কাব্য-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। টমসন লিখিত কবির জীবনচরিত যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখেছিলেন, "টমসন তাঁহার কেতাবে আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়— রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সেই অতিস্ফুটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষের কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে, তাহার সম্বন্ধ আছে— সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি নির্দিষ্ট নহে। আমার সেই সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান নাই।"

যিনি যত বড় কবি তিনি তত বড় রহস্য— আমাদের কাছে তাঁর জীবন তত বেশি অস্পষ্ট। কারণ তিনি নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন, বাইরে বহুলাংশে অপ্রকাশ। প্রাচীন যুগের মহাকবিদের উল্লেখ বাহুল্য-মাত্র। তাঁদের জীবনকাহিনী কিম্বদন্তীর বিষয়ীভূত। আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্সপীয়ার। এ কালের সকল কবি সাহিত্যিকের তুলনায় তাঁর জীবন সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান স্বল্পতম[১]। এলিজাবেথীয় যুগের ইতিহাস নিয়ে কত মোটা মোটা গ্রন্থ রচনা হল, ছোট বড় মাঝারি কত মানুষের কাহিনী লেখা হল, কিন্তু সে যুগের যিনি মহত্তম পুরুষ, বৃহত্তম বিস্ময় তাঁরই কাহিনী অজ্ঞাত থেকে গেল। ইতিহাসের ছাকনিতে স্থূল জিনিসগুলোই ধরা পড়ে; যা সূক্ষ্ম, যা অনির্ণেয়, অনির্দিষ্ট তা ছাকনির ফাঁক দিয়ে গলে যায়। ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিওর স্বভাব বড় প্রগল্ভ, তিনি হাঁক ডাক জাঁক ভালোবাসেন। যথেষ্ট সমারোহ ব্যতীত তাঁর কাছে সমাদর পাওয়া যায় না।

ইতিহাস রসের কারবারী নয়। ইতিহাস যাকে তুচ্ছজ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, রসিক চিত্ত তাকে অগ্রাহ্য করে না। কবির জীবনে সামান্যর স্থান অসামান্য এবং বৃহতের স্থান নগণ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Prelude কাব্যগ্রন্থ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলা বাহুল্য এই জীবনচরিতকে কেউ ঘটনাপঞ্জী বলবে না। Preludeএর অপর নাম The growth of a poetic mind— এটিই উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত নামকরণ। কবি-মনের গঠনে কোন্ ঘটনার কতখানি গুরুত্ব তা একমাত্র কবিই যথাযথ বলতে পারেন আর কথঞ্চিৎ পারেন তেমন রসজ্ঞ এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন চরিতকার যদি পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যিকারের কবি যেমন বিরল, যথার্থ রসজ্ঞ জীবনচরিতকার বোধ করি ততোধিক বিরল। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, কবির জীবনে বৃহৎ ঘটনার কোনোই প্রভাব নেই এমন কথাও সরাসরি বলা চলে না। কবির আপন জীবনে অথবা তাঁর সমকালীন সমাজজীবনে এবং জাতির জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে পারে যা কবির মনে নিঃসন্দেহে গভীর রেখাপাত করেছে। আসল প্রতিপাদ্য কথাটা হল কবি এবং কাব্য অবিচ্ছিন্ন। কবির জীবনের মধ্যেই কাব্যকে খুঁজতে হবে। কবিকে বুঝলে তবেই কাব্যকে বোঝা সম্ভব। সুতরাং 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'— এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজ মুখে বললেও আমরা বলব কথাটা আংশিক সত্য— পুরোপুরি সত্য নয়। পুরোপুরি সত্য নয় এই কারণে যে কথাটা এক তরফা। কবির যেমন বলবার অধিকার আছে, কাব্যেরও তেমনি অধিকার আছে। কাব্যকে যদি জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কেমন করে জানব— কাব্য বলবে, কবিকে জানবার চেষ্টা কর, তাঁকে বুঝলে আমাকেও বুঝতে পারবে। কবির জীবনই তাঁর কাব্যের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য টীকাগ্রন্থ। সেই জীবনকে যদি জীবনচরিতের পাতায় জীবন্ত করে তোলা যায় তবে সেই চরিতকারই হবেন কাব্যের প্রকৃষ্ট ভাষ্যকার। কবি নিজে যদি লেখেন তবে আর কথাই থাকে না। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মকাহিনী লিখেছেন তা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর কাব্যের স্বরচিত ভূমিকা। পরবর্তীকালে সে কাহিনীরও আবার পরিশিষ্ট লিখেছেন— আত্মপরিচয় নামক গ্রন্থে। এ ছাড়াও বহু প্রবন্ধে, অগণিত চিঠিপত্রে

---

১ এ যুগের কবি অডেন্ বলেছেন, শেক্সপীয়ারের কাব্য উপভোগের জন্য শেক্সপীয়ারের জীবনকাহিনী জানা অত্যাবশ্যক নয়। কবি সম্পর্কে কবির মতামতের যথেষ্ট মূল্য আছে তথাপি বলব জীবনকাহিনী জানা থাকলে রসাস্বাদন পূর্ণতর হত। কৌতুকের কথা এই যে স্বয়ং অডেন্ অন্যত্র বলেছেন, কোনো কবিতার রসগ্রহণে যে প্রশ্ন ক'টি সর্বাগ্রে পাঠকের মনে হবে তার মধ্যে প্রধান একটি হল— What kind of a guy in habits the poem? অডেন্এর নিজ উক্তিই তাঁর পূর্বোক্ত মতকে খণ্ডন করছে।

তিনি নিরন্তর নিজের কথা বলেছেন। যে পরিবার পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন, যে শিক্ষা এবং শিল্পরুচি বালক-বয়সে তিনি প্রতি মুহূর্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, যে সব দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখে দেখেছেন, যে সব অনুভূতিকে মূল্য দিতে শিখেছেন, যে আদর্শকে আপন মনে লালন করেছেন, যে ব্রত আজীবন পালন করেছেন সে সব কথা নানা সূত্রে নানা ভাবে কথায় এবং লেখায় প্রকাশ করেছেন। আপন কাব্যের সম্যক পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই আত্মপরিচয়ের এই প্রয়াস। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে Preludeএর উল্লেখ আগেই করেছি। কীটস-কাব্যেরও প্রকৃত টীকাগ্রন্থ তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন।

২

কবির জীবনকাহিনীর উপর এতখানি গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে কবির জীবনের মধ্যে যার প্রকাশ কাব্যেও তারই প্রকাশ। তাই যদি না হত তবে কাব্য শুধু মুখের বুলি হয়ে দাঁড়াত। প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনই কাব্য হয়ে ফুটে ওঠে। এখানে জীবন বলতে বুঝি কবির জীবনধর্ম, তাঁর স্বভাবধর্ম। গান্ধীজী যে অর্থে বলেছিলেন, my life is my message— আমার জীবনই আমার বাণী, ঠিক সেই অর্থেই কবিও বলতে পারেন, আমার জীবনই আমার কাব্য। এ কথা মানতেই হবে যে কবি আগে, কাব্য পরে। আগে কবিজীবন যাপন করতে হয়, কবিধর্ম পালন করতে হয়, তবেই কাব্য রচনা সম্ভব হয়। গোটা মানুষটার কতখানি অংশ কবি তাই দিয়ে কাব্যের মহিমা। ইংরেজ কবি স্ত্রী এবং পুরুষ প্রেমিকের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— Man's love is of man's life a thing apart, 'Tis woman's whole existence। পৃথিবীর সুবৃহৎ কবি-সমাজেও কবিতে কবিতে পার্থক্যের অবকাশ আছে। সাধারণ অর্থে কবি নামে যাঁরা পরিচিত বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যাবে জীবনের খুব কম অংশেই এঁরা কবি। গোটা মানুষটার সামান্যতম অংশে কবিধর্মের ছাপ পড়েছে, কবিস্বভাবের পরিচয় আছে। অর্থাৎ কবিধর্ম এঁদের জীবনে a thing apart ; ফলে কালের বিচারে এঁরা শেষ পর্যন্ত মাইনর পোয়েট -এর পর্যায়ে পড়েন। আর পৃথিবীতে যাঁরা মহাকবির আখ্যা লাভ করেছেন তাঁদের বেলায় সেই কবিধর্ম— তাঁদের whole existence। এঁরা সর্বক্ষণ সর্বান্তঃকরণে কবি, এঁরা মনসা কর্মনা বাচা কবি। সত্যিকারের যিনি কবি তাঁর কবিসত্তা এমন অবিসম্বাদিত রূপে ভাবে ভঙ্গিতে কথায় আচরণে সমস্ত দেহে মনে ফুটে উঠবে যে তাঁকে চিনতে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না। কবিপ্রকৃতি স্ব-প্রকাশ। নিজেকে কবি প্রমাণ করবার জন্যে তাঁকে কবিতা আওড়াতে হয় না। মানুষটা একেবারেই আর পাঁচ জনের মতো নয়। বাইরে থেকে দেখতে যতই সাধারণ হোক, কবির অন্তঃপ্রকৃতিই তার গোত্র বদল করে দেয়, সাধারণকে অসাধারণ করে। তাঁর সেই অনন্যতা কোনো ব্যক্তির চোখ এড়াতে পারে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে দেখে অশিক্ষিত সরাইওয়ালার মনে যে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল তা এরই কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত। কত মানুষ নিত্য তার সরাইখানায় আসে, কই এমন মানুষ তো কোন কালে সে দেখেনি— "standin' 'by hisself and stopping agapin', with his jaws workin' the whoal time ;···ye kna—it was potry as did it." মানুষটা যে কবি ঐ অশিক্ষিত লোকটির দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছে। অপর দিকে গ্যয়টেকে দেখে নেপোলিয়নের বিস্ময় অপর প্রান্তের আর-এক দৃষ্টান্ত। দিগ্বিজয়ী বীর— রাজা-উজির তো বটেই, জ্ঞানী-গুণীও অনেক দেখেছেন, কিন্তু গ্যয়টেকে দেখে একেবারে যেন চমকে উঠলেন— here's a man! এতদিনে দেখলেন

মানুষের মতো মানুষ, পরিপূর্ণ মানব— অদ্বিতীয়, অনন্য। এ বিস্ময় কেন? গ্যয়টের কবিপ্রতিভার দীপ্তি এবং কবিস্বভাবের লাবণ্য নিঃসন্দেহে মুখে চোখে জাজ্বল্যমান ছিল, মনের ঐশ্বর্য সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রথম-দর্শনে রবীন্দ্রনাথকে দেখে চমকে ওঠেন নি এমন মানুষ কমই আছেন। সে যে কেবল তাঁর দেবদুর্লভ দেহকান্তির জন্যে এমন নয়। এটি কবিমনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ইংরেজ সাহিত্যিক আর্নেস্ট রীস্-এর উক্তি মনে পড়বে—"For a moment I was abashed : it was as if the Prophet Isaiah had come to one's door." পরমুহূর্তেই বলেছেন— অথচ অত্যন্ত সরল সহজ মানুষটি, বসে বসে বড় বড় তত্ত্বকথা বলেন নি। খুব ঘরোয়া রকমের সাধারণ কথাই বললেন, চা খেলেন, বান খেলেন। অথচ গৃহে পদার্পণ মাত্র মনে হল যেন এক অভাবনীয় আবির্ভাব। মনে প্রাণে, সর্ব অঙ্গে মনে কবি— সেই কারণেই মানুষকে এতখানি তিনি অভিভূত করতে পেরেছেন। পৃথিবীর সকল মহাকবিই নিজ নিজ যুগের মানুষকে এইভাবে অভিভূত করেছেন। কবিমনের ঐশ্বর্য মানুষকে অমোঘ শক্তিতে টানে।

সে ঐশ্বর্য সর্বব্যাপী, একমাত্র কাব্যরচনাতেই তার প্রকাশ— এমন নয়। কবিকে সব দেশেই বলা হয়েছে স্রষ্টা। স্রষ্টার মন অকৃপণ মন। সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ তার অজস্রতা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে সৃষ্টিলীলা দেখছি তার অজস্রতা আমাদেরকে অভিভূত করে। চতুর্দিকে ঝরছে পড়ছে উড়ছে মরছে নষ্ট হচ্ছে অথচ কোথাও কিছুর কমতি নেই। এত অপব্যয়েও ভাণ্ডার সর্বদাই পূর্ণ। 'অপব্যয়ের ভয় নাহি তার পূর্ণের দান স্মরি।' যাকে অপব্যয় মনে করি সে শুধু সৃষ্টির লীলা। এই যা কিছু মনে করছি নষ্ট হচ্ছে এ আর কিছু নয়— উপচে পড়ছে। সৃষ্টির মধ্যে কোথাও আটপৌরে ভাব নেই, শুধু প্রয়োজনটুকু নিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটা উদ্বৃত্ত, যেটা না হলেও চলত সেই উদ্বৃত্তের মধ্যেই তার ঐশ্বর্যের প্রকাশ। সৃজনী মন অর্থাৎ কবির মনও এমনি ভরাট, কানায় কানায় পূর্ণ— খানিকটা সারাক্ষণই ছলাৎ করে উপচে পড়ছে। সেই উদ্বৃত্ত অংশ কাব্যে যতটুকু প্রকাশ পায় তার চাইতে বেশি পায় আলাপে ব্যবহারে, আচারে রুচিতে, চিন্তায় কর্মে। কারণ কাব্যের চাইতে জীবনের ব্যাপ্তি বৃহত্তর। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা এই উদ্বৃত্তের সাধনা।

৩

মনের সম্পদ যে সব চাইতে বড় সম্পদ সে কথা বলাই বাহুল্য। কবিমনের স্পর্শমণিতে সমস্তই সোনা হয়ে ওঠে। সেটিই কবির আসল ঐশ্বর্য। অবশ্য এ কথা এমন সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে এর উল্লেখ মাত্র নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে কথাটার উল্লেখ প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সাংসারিক অর্থে আমরা যাকে ঐশ্বর্য বলি সে ঐশ্বর্যও রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। এখানে আবার সেই জীবনচরিতের প্রশ্নেই ফিরে আসতে হয়। ঐশ্বর্যবানের গৃহে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। মোগল রাজত্বের অন্তিম পর্যায়ে— ব্রিটিশ আগমনের সূচনায় ঠাকুরবংশের অভ্যুত্থান। বাদশাহী আমলের হালচাল, জাঁকজমক এ পরিবারে প্রবেশ করেছিল। দ্বারকানাথের বিরাট ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথ দেখেননি কিন্তু তার যে ভগ্নাবশেষ তিনি দেখেছেন তারও তুলনা নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথের জীবনে যে রাজসমারোহ রবীন্দ্রকাব্যে সেই সমারোহের সুস্পষ্ট আভাস। পিতা দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি আখ্যা লাভ করেছিলেন, কিন্তু রাজর্ষি আখ্যা বোধকরি তাঁকে আরো বেশী মানাত। তিনি যথার্থই রাজপুত্র। যৌবরাজ্যে অভিষেক-মুহূর্তে তাঁর বনবাস— পিতার ঐশ্বর্য দেনার দায়ে নিঃশেষিত। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য অর্থাৎ পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য

দেবেন্দ্রনাথের দারিদ্র্য বরণ এবং আপন পৌরুষ বলে হৃত ঐশ্বর্যের পুনরুদ্ধার— এ সবের মধ্যে আমাদের প্রচলিত রূপকথার আমেজ আছে। রাজর্ষি আখ্যা এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য যে রাজ-ঐশ্বর্য লাভ করেও নিরাসক্ত তাঁর মন। ত্যাগের মধ্যেই ভোগের আনন্দ লাভ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রগাঢ়তম প্রভাব। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যে রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছেন, ভিক্ষুবেশী রাজা অশোককে যে তিনি পুরুষোত্তমের আসন দিয়েছেন তার মূলে (রাজর্ষি) দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত। শিবাজীর প্রতি গুরু রামদাসের আজ্ঞা— রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন— মহর্ষির জীবনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর পক্ষে সংসারের সহস্র বন্ধনের মধ্যে থেকেও— লভিব মুক্তির স্বাদ— এ সমস্তই মহর্ষি-জীবনের প্রতিধ্বনি। জীবনের উপরিস্তরে রাজসমারোহ, অন্তস্তলে নিরাসক্তি— এ দুই জিনিসই রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক আবহাওয়া থেকে পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রত্যাশী ছিলেন না। কিন্তু ঐশ্বর্যের রূপ তাঁর কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে (কবি মাত্রেরই মন ঐশ্বর্যবিলাসী)। এই কারণে জীবনে যা কিছু বৃহৎ মহৎ কামনীয় এবং বরণীয় মনে হয়েছে তাকেই তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে দেখেছেন। দেবতাকে যখন আবাহন করেছেন, অন্তরতমকে চেয়েছেন তখন তাঁকেও দেখেছেন রাজবেশে। বলেছেন— রাজসমারোহে এস। তাঁর দেবতার আগমন স্বর্ণরথে—

> 'তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণরথে· ·
> আমি মনে ভাবতেছিলেম এ কোন্ মহারাজ।'
> 'মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে'
> 'গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা'
> 'হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন'

এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। যা বরণীয় তা তো বটেই, যা কামনীয় তাকেও রাজা হিসাবেই দেখেছেন এবং রাজসমারোহ তাতে আরোপ করেছেন—

> 'রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে
> প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।'

দেবতার বেলায় যেমন মানুষের বেলায়ও যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ দেখেছেন সে মানুষকেও তিনি রাজা হিসাবেই দেখেছেন। গান্ধীজী কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধী নন, তিনি গান্ধী মহারাজ। অগণিত মানুষের উপর যাঁর বিপুল প্রভাব তিনিই যথার্থ রাজা। তাঁর গল্পে যে মানুষ প্রকৃত প্রেমিক, যে নারীর মনোহরণ করেছে সেও রাজা— 'অস্ত, অস্ত আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা।' 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় প্রথমেই বলে নিয়েছেন, 'তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট।'

যে কালে রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছেন সেকালে রাজা উজীর নিয়ে নাটক লেখার রেওয়াজ প্রায় উঠে গিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি নাটকেই একটি রাজা আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ভূমিকাটি কোনো কোনো নাটকে অনাবশ্যক মনে হতে পারে। ফাল্গুনী নাটকে ছেলের দল বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করে যৌবনের জয়গান করছে। কেন ? না, মহারাজের মন খারাপ হয়েছে, তাঁর মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছে অর্থাৎ কিনা 'যমরাজ কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন।' মহারাজের মন প্রফুল্ল রাখতে হবে, অতএব নৃত্যে গীতে যৌবনের পালা জমাতে হবে। মনে হতে পারে 'রাজা'

ব্যাপারটা এখানে অবান্তর; বাস্তবিকপক্ষে তা নয়। মহারাজের মনে অশান্তি হলে সমস্ত রাজ্যেই অশান্তি হবে, মহারাজের জীবনে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এলে সমস্ত রাজ্যেই মৃত্যুর ছায়া পড়বে। কিন্তু এ আইডিয়া রবীন্দ্রনাথ কোথায় পেলেন? সাহিত্যরসিকদের পক্ষে ভাবা অসঙ্গত নয় যে এটি একটি পাশ্চাত্য মিথলজির প্রাচ্য রূপায়ণ। বারান্তরে এর আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজা— একটি অত্যাবশ্যক প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন তখনও তাকে রাজার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন— আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনে রাজাকে বাদ দিয়ে সকলে মিলে সমান দরের প্রজা সাজতে পারলেই সাম্যবাদী সমাজ গড়ে ওঠে না। আদর্শ মানবসমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাজসম্মানের অধিকারী। সকলে সমান ধনী হলে তবেই সমাজে সমতা আসবে। ধনীকে নির্মূল করে সকলে সমান নির্ধন হওয়াটা সমাজকল্যাণের আদর্শ নয়। সরল অনাড়ম্বর জীবনের কথা নিরন্তর বলেছেন কিন্তু সাংসারিক অর্থে আমরা যাকে বলি দারিদ্র্য তাকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেননি। দারিদ্র্যের ললাটে জয়তিলক পরিয়ে একদা আমাদের সাহিত্যে দারিদ্র্যের জয় ঘোষণা চলছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাকে ভর্ৎসনা করেছেন। অধুনা বহুশ্রুত 'সর্বহারা' কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন— রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা— কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের সর্বহারা আজকের দিনের প্রলিটারিয়েট নয়। ভাগ্যদেবীর স্বৈরাচারকে উপেক্ষা করে অদৃষ্টকে পরিহাস করবার সাহস এবং শক্তি যারা রাখে তাদেরকেই তিনি সর্বজয়ী সর্বহারা আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। এ কালের বহু বিজ্ঞাপিত প্রলিটারিয়েট ডিক্টেটরশিপ বা সর্বহারার রাজত্ব মন ভোলানো স্তোকবাক্য মাত্র; প্রকৃতপক্ষে সর্বহারার দাসত্বই সর্বত্র প্রকট।

রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্তরে যার অপরিমেয় ঐশ্বর্য দারিদ্র্য শুধু তাকেই মানায়, দারিদ্র্য তাকে কলঙ্কিত করতে পারে না। ভিক্ষা শুধু তাঁকেই মানায় যাঁর কিছুরই অভাব নেই। 'আমায় কিছু দাওগো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত'— এই ভিক্ষুক স্বর্ণরথে উপবিষ্ট দরিদ্রের নারায়ণ। আমরা যে দরিদ্রনারায়ণ বলি এ শুধু মন-ভোলানো কথা। দরিদ্র মাত্রই নারায়ণ হয় না, একমাত্র নারায়ণতুল্য ব্যক্তিকেই দরিদ্র হলেও মানায়। যিনি ইচ্ছা করলেই ভোগ করতে পারেন কিন্তু ভোগে যাঁর স্পৃহা নেই, যিনি ত্যাগের মধ্যে ভোগের তৃপ্তি লাভ করেন দারিদ্র্য তাঁরই ভূষণ। দরিদ্র জীবনের নিষ্করুণ বাস্তব চিত্র রবীন্দ্রনাথের চাইতে নিপুণতর হস্তে এঁকেছেন একাধিক আধুনিক লেখক, সে কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু দরিদ্র জীবনের মহিমা রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে প্রকাশ করেছেন এমন আর কেউ নয়। ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী পেশোয়া নৃপতির বিচারশালার খেলাঘর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন— তেজস্বী ব্রাহ্মণের সেই দারিদ্র্যবরণ দারিদ্র্যকে চিরকালের জন্য মহিমান্বিত করেছে:

> ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরব পদ,
> দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ,
> গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
> দীন দরিদ্র বিপ্র।

রবীন্দ্রনাথ যে দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন তার মধ্যেও একটি ঐশ্বর্যের আভাস আছে। যেই দীন নারী

অরণ্য আড়ালে রহি কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।—

সেই নারী কি সত্যিই দীন? এই দান দীনতার দান নয়, অন্তর-গত পরম ঐশ্বর্যের দান। লৌকিক অর্থে আমরা যাকে বলি দীনতা রবীন্দ্রনাথ তাকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ঐশ্বর্যের কবি। সে ঐশ্বর্যের একদিকে পূর্ণতার সমারোহ অপর দিকে রিক্ততার মহিমা— একই জিনিসের দুই ভিন্ন প্রকাশ। সংসার-জীবনে ঐশ্বর্যের যে দ্বিবিধ রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে লক্ষ্য করবার বিষয় প্রকৃতির রাজ্যেও সেই দুই রূপেরই বিচিত্র লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবনকাব্য এবং প্রকৃতিকাব্যের মূল তত্ত্বটি প্রধানতঃ এক। ঋতু পর্যায়ে প্রকৃতিদেবী কখনো সম্রাজ্ঞী কখনো তপস্বিনী। 'তরুলতার শাখা পল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর বিচিত্র নাট্যাভিনয়' তাঁর কাব্যকে বিচিত্র রংএ রঞ্জিত করেছে। 'নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চির প্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে।' 'শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্ত-ব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার।' বসন্তের তো কথাই নেই। রাজপুত্ররূপী বর্ষার যেমন যৌবরাজ্যে অভিষেক, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব তেমনি 'ভুবনমোহন নববরবেশে'। তার অভ্যর্থনার আয়োজনও রাজকীয়—

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, 'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাণে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে মধুপের মনোহরা।'

প্রকৃতির এই এক মূর্তি— যেখানে রাজসমারোহ, অপরদিকে তার নিরাভরণ তপস্বিনী মূর্তি। প্রকৃতির ঐশ্বর্য অফুরন্ত বলেই শীতের প্রকৃতি এমন করে নিজেকে রিক্ত করতে পারে। নিঃশেষে দান করবার মধ্যেই ঐশ্বর্যের নিঃসংশয় প্রমাণ। 'ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে ভরিতে নূতন করি।' সেই কারণেই 'সঞ্চিত ধনে' তার 'উদ্ধত অবহেলা'। এ ছাড়া মনে তার নিরাসক্তি। বর্ষায় বসন্তে যে ভোগের মেলা বসেছিল তার পাট চুকিয়ে দিয়ে এখন সে বসেছে যোগের আসনে ত্যাগের সাধনায়— 'বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন।' বর্ষা বসন্তের বর্ণসমারোহ যেমন কবির মনোহরণ করেছে, শীতের তপঃক্লিষ্ট মূর্তিও তেমনি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। রুক্ষ এবং কঠিনের মধ্যেও তিনি কোমলের স্পর্শ দেখেছেন— 'জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রই তার অশ্রুশূন্য রোদন'।

রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে প্রাচুর্য এবং অজস্রতার মধ্যে যেমন,

রিক্ততার মধ্যেও তেমনি ঐশ্বর্যের প্রকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ত্যাগের মধ্যে ভোগের তৃপ্তি, রিক্ততার মধ্যে পূর্ণতার প্রকাশ— ভারতীয় সাধনার এই দুই কেন্দ্রগত সত্য রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই শিক্ষা তিনি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেছেন পিতার কাছ থেকে, পরোক্ষভাবে উপনিষদের বাণী থেকে।

এরই থেকে প্রবাহিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুই বিপরীতধর্মী জিনিসকে তিনি বহু ক্ষেত্রে এক করে দেখেছেন। অর্থসমৃদ্ধ আপাতবিরোধী উক্তি তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ— 'অন্ধকারের বুকের মাঝে নিত্য আলোর শিখা জাগে'; 'যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে'; 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। কেবলমাত্র চমকপ্রদ বা আকর্ষণীয় উক্তি হিসাবে দেখলে একে ছোট করে দেখা হয়। এসব উক্তি কেবলমাত্র ভাষাগত কারসাজি নয়, সাধনালব্ধ উপলব্ধির ফল। প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের দর্শন, বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান— তাঁর জীবনের একটি বিশেষ সাধনা। প্রধানতঃ এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই, কিম্বা দোষেও বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে মিস্টিক কবির আখ্যা লাভ করেছেন। বলা আবশ্যক যে কেবলমাত্র মিস্টিক হিসাবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়। তাঁর বিচিত্ররূপিণী প্রতিভার বহুলাংশ তাতে বাদ পড়ে যায়। ভারতীয় মনে মিস্টিসিজম্‌এর বিশেষ একটি আবেদন আছে, অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ছিল। এইজন্য ভারতীয় পাঠক সমাজ এককালে এই জিনিসটিকেই খুব বড় করে দেখবার চেষ্টা করেছে। অপরপক্ষে পশ্চিম দেশীয়রা অনুবাদের মারফৎ প্রধানতঃ মিস্টিক ধরণের কবিতার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যের অন্যবিধ স্বাদ গ্রহণের সুযোগ তাঁরা পান নি।

সাহিত্যে ঋতু পরিবর্তন সর্বত্রই ঘটে, ইয়ুরোপেও ঘটেছে। যে মিস্টিসিজম্‌ এককালে তাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, উনবিংশ শতকে সেই মিস্টিসিজম্‌-এর প্রতি তাদের ঔৎসুক্য দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেক্‌ পাগল আখ্যা লাভ করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় এবং কবি হিসাবে তিনি বহু সমাদর লাভ করেন। পূর্বদেশীয় মিস্টিসিজম্‌-এর প্রতিও পশ্চিমের বেশ একটু মোহের সঞ্চার হয়েছিল। এককালে ইয়ুরোপ পূর্ব-মহাদেশকে gorgeous east বলে জানত, পরবর্তীকালে তারা প্রাচ্যদেশকে mystic east বলে ভাবতে শিখেছিল। সেই অনুকূল মুহূর্তে গীতাঞ্জলির মরমিয়া কাব্য ইয়ুরোপের মর্মে প্রবেশ করে। গীতাঞ্জলির দিগ্বিজয় কাহিনী বোধ করি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে সব চাইতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বিদেশী কাব্যের অনুবাদ সকল দেশেই হয়ে থাকে। কিন্তু আঁদ্রে জিদ্‌এর ন্যায় মহারথী অপরের কাব্য অনুবাদ করছেন এমন দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর উক্তি আরোই বিস্ময়কর; বলেছেন, কবি যেমন ভক্তিনম্র হৃদয়ে দেবতার কাছে নিজেকে নিবেদন করেছেন আমি সেইরূপ ভক্তিনম্র হৃদয়ে কবির কাছে নিজেকে নিবেদন করছি। বলেছেন— It has appeared to me that no thought of our times merits more respect, I would say devotion, than that of Tagore and I have taken my pleasure in making myself humble before him, as he made himself humble to sing before God. স্পানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন সে দেশের সুবিখ্যাত কবি হিমেনেৎসএর পত্নী (বলা বাহুল্য স্বামীর সহায়তায়)। স্বামী স্ত্রী উভয়ে কবির প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আজকের দিনে তা

অবিশ্বাস্য মনে হবে।[১] ইয়েটস্‌এর উচ্ছ্বাস ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকাতেই নিঃশেষিত হয় নি। একটি চিঠিতে তিনি ভারতবর্ষে আগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন আর কোনো কারণে নয়— শুধু যে দেশের মাটিতে, যে দেশের হাওয়াতে এই কাব্যের জন্ম হয়েছে সেই দেশটি একবার তিনি দেখে যেতে চান। পরবর্তী কালে এই উচ্ছ্বাস কি ভাবে নির্বাপিত হয়েছিল সে কথাও সকলেই জানেন। ইয়েটস্‌এর কটূক্তিতে আমাদের দেশবাসী অনেকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করেছেন। এসব ব্যাপারে আমরা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। মানুষের রুচির পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। এক কালে যে জিনিস আমার অতি প্রিয় খাদ্য ছিল আজ তাতে আমি স্বাদ নাও পেতে পারি, কিন্তু তাতে উক্ত খাদ্যবস্তুর স্বাদ বা গুণ অন্তর্হিত হয় না। কবি অডেন তাঁর অক্সফোর্ড লেকচার্সে বলেছিলেন, রিলকের কবিতা আমি এখন আর পড়তে পারিনে but I still think he is a great poet. কাজেই ইয়েটস্‌এর এক বাক্যাঘাতেই রবীন্দ্রনাথ ভূমিসাৎ হয়েছেন এমন মনে করবার কারণ নেই।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের প্রতি অবিচার করেছেন। নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করতে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। মহৎ কবির কাব্য ভিন্-দেশীয়েরা নিজ গরজে নিজেরাই অনুবাদ করে নেবেন। এটাই সাহিত্যজগতের নিয়ম এবং সেজন্যে অপেক্ষা করা ভালো। অবশ্য তেমন দুর্ধর্ষ ইংরেজ পণ্ডিতের হাতে পড়লেও ফল একই হত। কারণ অনুবাদ মাত্রই এম্‌ব্রয়ডারির উল্টো পিঠ— giving the design without the beauty. রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, অন্তঃপুরিকাকে জোর করে অন্য অন্তঃপুরে নেবার চেষ্টা করলে শুধু তার শ্লীলতার হানিই হয়, আর কোনো লাভ হয় না। কে যেন বলেছিলেন Translation is treason. অন্ততঃ কাব্যের বেলায় কথাটা খাঁটি। সেই কবিদ্রোহের ব্যাপারে কবি স্বয়ং যদি লিপ্ত হন তবে বড় দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথকে তার ফলভোগ করতে হয়েছে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কবি যখন ক্রমাগত অনুবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ইংরেজ কবি বন্ধু স্টার্জ মুর এ বিষয়ে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বলেছিলেন, আপনি যে মহৎ কবি সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই, but the translations do not bear it out।

গীতাঞ্জলির যুগে ইংলণ্ডের জ্ঞানীগুণীরা কিরূপ অভিভূত হয়েছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। অবশ্য অভিভূত হওয়াটা কোনো ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ অভিভূতের ভূতগ্রস্ত ভাবটা বেশিদিন থাকে না। ইয়ুরোপে মিস্টিসিজম্‌এর পরমায়ু অল্প দিনেই নিঃশেষিত হয়েছে। প্রথম-মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর আঘাতে ইয়ুরোপকে এক অতি নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মানুষের ক্ষতবিক্ষত মন সেদিন বড় বেশি সজাগ হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক আদর্শবাদের ধোঁয়াটে কথাকে সে যেমন হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কাব্য-সাহিত্যের আবছা অস্পষ্ট হেঁয়ালিকেও তেমনি সন্দেহের চোখে দেখেছে। যা চক্ষুগোচর এবং বুদ্ধিগোচর তাকেই সে গ্রহণ করেছে, যা অপ্রত্যক্ষ যা বুদ্ধিদ্বারা অনির্ণেয় তাকে নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পরে এই অবিশ্বাস আরোই বদ্ধমূল হয়েছে। এ যুগের মানুষ এমন-সব কঠিন বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন যে অবাস্তব এবং অপ্রত্যক্ষের কথা ভাববার তার সময় নেই। আধুনিক জীবন যেমন সমস্যাসঙ্কুল

১ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত মাদাম হিমেনেৎসএর চিঠি দ্রষ্টব্য। এঁর স্বামী Juan Ramon Jimenez ১৯৫৬ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন

সাহিত্যও তেমনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সকল সমস্যারই সমাধান আছে। যে মুহূর্তে সমাধান হল সে মুহূর্তে সেই সমস্যার মৃত্যু ঘটল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাজাত সাহিত্যেরও। এই জাতীয় সাহিত্য নিজেই নিজের আয়ুষ্কালকে খণ্ডিত করে। জীবনের উপরিস্তরে বিক্ষুব্ধ স্রোত, সেখানে সমস্যা। জীবনের গভীরতর স্তরে যেখানে জীবন শান্ত স্থির সেখানে জীবনের অতল রহস্য। সমস্যা (problem) এবং রহস্য (mystery) দুই ভিন্ন বস্তু। মহৎ সাহিত্য সমস্যার সমাধান করে না, রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে। সেই মানুষই কবি যিনি সাধারণ মানুষের চাইতে একটু বেশি দেখেন, তাঁর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। আমাদের three dimensional মন দিয়ে আমরা যা দেখি কবি তাঁর প্রখরতর মন নিয়ে তার চাইতে অধিকতর দেখেন— সেই বেশি দেখাটুকুকেই আমরা বলি মিস্টিসিজম্‌। তাহলে মনে রাখা প্রয়োজন যে আমার কাছে যা অপ্রত্যক্ষ, কবির তৃতীয় নয়নে তাই অনেকাংশ প্রত্যক্ষ। আমার দৃষ্টির ক্ষীণতা এবং আমার মননশক্তির অক্ষমতা অপরের গোচরীভূত সত্যকে অপ্রমাণ করতে পারে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন বলেন— I have felt a presence তখন তাঁকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ আমি দেখি না— হতে পারে আমি নিজে সেই presence কখনো feel করি না। কোলরিজ যে suspension of disbeliefএর কথা বলেছেন সে যে কেবল অতি-প্রাকৃত ঘটনার বেলাতেই প্রযোজ্য এমন নয়, কবির heightened imagination বা উদ্দীপ্ত কল্পনার আলোকে যা তাঁর মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়েছে তার প্রতিও প্রযোজ্য।

প্রকৃতপক্ষে মিস্টিসিজম্‌কে আমরা যতখানি অবাস্তব বলে মনে করি জিনিসটা ততখানি অবাস্তব নয়। সত্যি বলতে কি, সকল কবিই কম বেশি মিস্টিক, এমনকি আধুনিকরাও; ওটা কাব্যের স্বভাবগত। কাব্যের ভাষা এবং ভাষ্য কখনোই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে পারে না। সে ইঙ্গিতে কথা বলে। সেই ইঙ্গিতময়তাই মিস্টিসিজম্‌এর আকার ধারণ করে। টি. এস. এলিয়ট যখন বলেন, I will show you fear in a handful of dust অথবা who is the third who walks always beside you? তখন তাঁকে মিস্টিক বললে কিছু অন্যায় হয় না, তাঁর প্রতি কোনো অবিচারও করা হয় না। কারণ তিনি যা বলছেন তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এলিয়ট যদিচ অতিশয় ইতিহাস-সজ্ঞান ব্যক্তি তথাপি কালের যাত্রা এবং সভ্যতার কুটিল গতিকে তিনি মিস্টিকের চোখেই দেখেছেন। এই দৃষ্টিই তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। এ ছাড়া অনুসন্ধানী পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন যে Christian mysticism প্রচুর পরিমাণে তাঁর কাব্যে প্রবেশ করেছে। ভবিষ্যতে এলিয়ট যদি প্রধানতঃ মিস্টিক কবি হিসাবে পরিচিত হন তবে অবাক হবার কোনো কারণ দেখি না।

৫

মিস্টিসিজম্‌এর প্রতি ভারতীয় মনের বিশেষ প্রবণতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথেরও স্বাভাবিক প্রবণতা ঐ দিকে। তিনি আমাদের ন্যাশনেল পোয়েট। যে মননভঙ্গি জাতির অভ্যাসগত, যে বিশ্বাস জাতির মজ্জাগত তাঁর কাব্যে তা প্রতিফলিত হবে, এটা খুব স্বাভাবিক; নতুবা তিনি আমাদের জাতীয় কবির আখ্যা পেতেন না। তাহলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, যে-কোনো জিনিসেরই আতিশয্য দুর্বলতায় পরিণত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তা ঘটেছে, কোনো কোনো বিষয়ে একটু অতিশয়তা প্রকাশ পেয়েছে। অসীম, অনন্ত, অনাদি, সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, রূপের মধ্যে

অরূপের, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের, নিত্যের মধ্যে অনিত্যের, রিক্ততার মধ্যে পূর্ণতার, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের আভাস ইত্যাদি জিনিস কাব্যে সাহিত্যে নূতন নয়। এ জাতীয় জিনিসের পৌনঃপৌনিকতা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কবিতা বিশেষ কোনো ideaকে প্রকাশ করবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই ; এ কথা নিশ্চিত যে আইডিয়ার গুরুত্বের উপরে কবিতার কবিত্ব নির্ভর করে না। কোনো আইডিয়া কবির জীবনকে যদি রঞ্জিত করে থাকে সেই রংএর আভাটুকু কবিতার সামগ্রী। সেই রং কখনো আনন্দে স্বর্ণাভ, কখনো বেদনায় নীলাভ, কখনো শান্তির শুশ্রূষায় শুভ্র। সেই আভা রবীন্দ্রকাব্যে সর্বত্র বিচ্ছুরিত কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলে আইডিয়াকে অযথা প্রাধান্য দিয়েছেন। এরও কারণ ভেবে দেখা উচিত। আমাদের দেশে জীবনের যে ক্ষেত্রেই যিনি বড় হন-না কেন তাঁকে ঋষি বানাতে না পারলে আমাদের মন ওঠে না। আমাদের রাজনৈতিক নেতাকে মহাত্মা হতে হয়, কবিকে গুরুদেব, এমন-কি উপন্যাস-রচয়িতাও ঋষি আখ্যা লাভ করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা রসজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। কবি সাহিত্যিককে আমরা যখন গুরু বা ঋষির আসনে বসাই তখন তাঁর কাছে আর রসের দাবি করি না, message দাবি করি। কবি তখন আপন ভূমিকা ভুলে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে কখনো কখনো বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে সে দুর্দৈব ঘটেনি এমন কথা বলা চলে না।

এ কথাও অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে উপনিষদ্ তাঁর জীবনকে যতখানি উন্নত করেছে কাব্যকে ততখানি করেনি ; বরং কতক পরিমাণে ভারাক্রান্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুই বৃহৎ প্রভাব— উপনিষদ্ ও বৈষ্ণব সাহিত্য। নিজেই বলেছেন, 'বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে।· · আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল। সৃষ্টির পক্ষে এই দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে।' এই দুই'এ মিলে তাঁর মনে যে আনন্দলোকের সৃষ্টি হয়েছিল তাই থেকে তাঁর কাব্যের একটি সুবৃহৎ অংশ উদ্ভূত,[২] এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। দুই'এরই প্রসাদগুণ লাভ করেছে তাঁর কাব্য। একটি দিয়েছে লাবণ্য, অপরটি দিয়েছে ভাবগাম্ভীর্য। কিন্তু কোথাও কোথাও ভাব বা আইডিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার দরুণ কবিতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।

অবশ্য কাব্য শুধু আনন্দ দেবে, তার কাছে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, এমন কথা মানি না। মহৎ কবি মাত্রই জ্ঞানী পুরুষ, তাঁরাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। রামায়ণ মহাভারতের চাইতে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশে আর কোথায় ? আর-একটি কথা— শিক্ষাদানে কবি সাহিত্যিকের অনায়াস-পটুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির কাছে লোকে জ্ঞান দাবি না করেই জ্ঞানলাভ করে। সেই জ্ঞান message হিসাবে আসে না, অলক্ষিতে আনন্দমিশ্রিত রসবোধের সঙ্গে wisdom হিসাবে আসে। message এবং wisdom এক কথা নয়। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'— সেই wisdomই কাব্যের wisdom ;

২ তাঁর মিস্টিসিজমএর মূলেও এই দুই বিষমের মিলন। রবীন্দ্রনাথের মতে— 'সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না।' যিনি স্রষ্টা বা কবি তাঁরও চিত্ত অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ তাঁর মন সর্বদাই দুই বিপরীতকে মেলাবার চেষ্টা করছে।

কবিকে যখনই স্রষ্টা বলি, দ্রষ্টা বলি তখনই তাঁর wisdomকে আমরা স্বীকার করে নিই। সেই wisdom তত্ত্ব কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না, দু চোখ মেলে তিনি জীবনের যে শোভাযাত্রা দেখেছেন তাকেই মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা সাধারণরা সেই শোভাযাত্রায় অন্তর্গত বলে তার সমগ্র রূপটি স্পষ্ট দেখতে পাই না। কবি মাত্রই দর্শক—সেই দর্শনই তাঁর জীবনদর্শন। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ—ঐ তাঁর জীবনদর্শন। এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই কিন্তু এ শুধু বাতায়নপথে প্রকৃতির লীলা দর্শন নয়, মানুষকেও দেখেছেন। নিজেই বলেছেন, আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মানবজীবনকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষদ্ মিলে তাঁর মনের হাওয়া তৈরি হয়েছে, এটুকু বললে অনেক কথা বলা হয় কিন্তু সবটুকু বলা হয় না। এই মনই সকল তত্ত্ব ছাড়িয়ে একদা মুক্তি খুঁজেছে আকাশের নীলে, ধরণীর ধূলায়। বলেছেন,

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়, ঘাসে ঘাসে।

একেবারেই নতুন কথা এমন বলব না। প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হয়ে ঋষিরাও বলেছেন, দেবস্য পশ্য কাব্যম্—দেখ দেবতার কাব্য—এ শুধু রূপদর্শন। রবীন্দ্রনাথ সেখানেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর সকল পাওয়া তিনি প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যেই খুঁজেছেন। এই মনের হাওয়া রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, ধার করা নয়। অনেক ধর্মের আলোচনা করে যেমন, মানুষের ধর্মে উপনীত হয়েছিলেন তেমনি বহু জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে শব্দ স্পর্শ বর্ণ গন্ধের ধরণীকেই তিনি হৃদয়ের সকল ভালোবাসা অর্পণ করেছেন। বলেছেন, ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে। ধরণীকেই 'মহাতীর্থ' আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন 'তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে'। একদা যাকে ধ্যানযোগে পাবার চেষ্টা করেছিলেন—তাকে পেলেন পথের ধূলায়, পথের মানুষের মধ্যে। দেবলোক থেকে মানবলোকে এসে পূজা তাঁর সমাপ্ত হল। মানুষ কবিকে ঋষি বানাতে চায়, রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্ব বর্জন করে কবি হয়েছেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে জীবনের মধ্যপর্বে তাঁর কাব্যে যে আধ্যাত্মিকতার সুর দেখা দিয়েছিল শেষ দিকে ক্রমে তা কমে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মন কখনোই নিশ্চল হয়ে কোথাও বাঁধা পড়েনি। তাঁর সৃজনী প্রতিভা তাঁকে নিত্য নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। গীতাঞ্জলির অভাবনীয় সাফল্য সত্ত্বেও তিনি যে গীতাঞ্জলির (আজকে অনেকেই স্বীকার করবেন যে গীতাঞ্জলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ নয়) মোহকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এটি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। দেবলোক থেকে মানবলোকে প্রবেশের এটি বিশেষ একটি সুফল। গীতাঞ্জলির পরবর্তী রচনায় অধিকতর বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে। এ কথা নিশ্চিত যে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ঢের বেশি human।

৬

এই সূত্রে আর-একটি প্রশ্ন এসে যায়। রবীন্দ্রনাথের মন চিরনবীন। চিন্তার দিক থেকে তিনি কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছেন, অনেক বিষয়ে কালকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এ যুগের ইয়ুরোপীয় কবিদের তুলনায় প্রকাশভঙ্গিতে তিনি পিছিয়ে ছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর গদ্যের ভাষায় যে চমকপ্রদ এবং চাঞ্চল্যকর ক্রমবিকাশের পরিচয় রয়েছে কাব্যের ভাষায় সেটি নেই। এর কারণ পদলালিত্যের প্রতি

রবীন্দ্রনাথের চিরকালের মোহ। বালক-বয়সে বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর মনকে অধিকার করেছিল সে কথা নিজেই বলেছেন। এখানেও লক্ষ্য করবার কথা যে চণ্ডীদাসের চাইতে বিদ্যাপতি তাঁর কিশোর মনকে টেনেছে বেশি। মৈথিলী পদের লালিত্য এবং শব্দঝংকারই এই মোহের কারণ। পরে কবি হিসাবে বাংলার ভাষার স্বাভাবিক লালিত্য এবং সংগীতময়তাকে তিনি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে ইংলণ্ডের কাব্যক্ষেত্রে পশার জমিয়েছেন টেনিসন। যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী এবং কীটস্‌-এর সঙ্গে তাঁর মনের মিল বেশি তথাপি বহিরঙ্গে ভিক্টোরীয় কবির ছাপ খানিকটা পড়েছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। টেনিসনের পদলালিত্য সর্বজন-বিদিত। সেই পদলালিত্যই তাঁর কাব্যের একটি প্রধান দুর্বলতা; এই দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল এবং এটি তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এমন-কি গদ্যছন্দে যখন লিখেছেন তখনও ভাষার লালিত্য বর্জন করতে পারেন নি। অনাড়ম্বর ভাষায় কথা কওয়ার ভঙ্গিতে খুব কম কবিতাই লিখেছেন। যেখানে লিখেছেন সেখানে গদ্যকবিতার নাম সার্থক হয়েছে— গদ্যেরও মান থেকেছে, কবিতারও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে 'পত্রলেখা' (দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন— কতমতো লেখার আসবাব) অথবা 'ছেলেটা' (ছেলেটার বয়স হবে বছর-দশেক, পরের ঘরে মানুষ) কিম্বা 'শেষ চিঠি'—যেখানে বলেছেন অমলির কথা। এমন কবিতা আরো কিছু আছে। কিন্তু এরই বিপরীত স্বভাবের কবিতা— 'পৃথিবী' (আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী— শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে)। গদ্যছন্দে এই সুদীর্ঘ কবিতাটি অনেকটা যেন বক্তৃতার মতো শোনায়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যেমন কবিতাটিতেও তেমনি তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। ছন্দে বেঁধে দিলে আর কিছু না হোক 'পৃথিবী'টি একটু কৃশকায়া হত। ছন্দের একটা ডিসিপ্লিন আছে, গদ্যকবিতায়ও সেই ডিসিপ্লিন রক্ষা করা প্রয়োজন। এরূপ কবিতায় সেই ডিসিপ্লিন বা বাক-সংযমের একান্ত অভাব। কবিতাটি অযথা বাক্যভারে পীড়িত এবং অনাবশ্যক দৈর্ঘ্যের দরুণ শ্লথ-গতি। রবীন্দ্রনাথ ভাষার যাদুকর, ভাষার অপপ্রয়োগ কদাপি করেন নি কিন্তু অপব্যয় করেছেন প্রচুর। Economy of language কাব্যের, বিশেষ করে, লিরিক কাব্যের অপরিহার্য গুণ। কবিতা স্বভাবে সলাজকুণ্ঠিতা স্বল্পবাক্‌, আকারে মেদবাহুল্যবর্জিত তন্বী মূর্তি। ছন্দে লেখা কোনো কোনো কবিতারও অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক। ইচ্ছা করলেই ঐ সব কবিতার কিছু কিছু অংশ তিনি বর্জন কর্তন করতে পারতেন। তাতে রস ঘনীভূত হত এবং ভাষা আরো আঁটসাঁট হতে পারত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার একটি অতি প্রিয় কবিতার উল্লেখ করছি। বীথিকা কাব্যের 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি (মনে পড়ে যেন এক কালে লিখিতাম— চিঠিতে তোমারে 'প্রেয়সী' অথবা 'প্রিয়ে') বিগত দিনের একটি অতি করুণ-মধুর চিত্র। তারই অশ্রুসিক্ত স্মৃতি-চারণের মধ্যে হঠাৎ পরিহাস-লঘু সুরে কেন যে তিনি 'গদ্য জাতীয় ভোজ্যের' আমদানি করেছেন আমি তা বুঝে উঠতে পারিনে। অনাবশ্যক পদ-বৃদ্ধির দরুণই কবিতাটির পদস্খলন হয়েছে। ঐ সম্পূর্ণ স্তবকটি বাদ দিলে তবেই কবিতাটির চরিত্র বজায় থাকে।

আধুনিক কবিতা অনেক বেশি আঁটসাঁট। তার মুখরতা কমেছে, প্রখরতা বেড়েছে। এ যুগের দাবি যে রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন না এমন নয়, কৌতুকের সুরে শেষের কবিতায় সে কথার উল্লেখ করেছেন— 'চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা— তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো; কাঁটার মতো, ফুলের মতো

নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো— খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার সুরে sarcasm সুস্পষ্ট। বেশ বোঝা যায় এ জাতীয় আধুনিকতায় তাঁর মনের সায় ছিল না। এ কথা নিশ্চিত, আজকের কাব্যে ভাষাটাকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে যে ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ মানুষের স্বভাব অনুযায়ী নয়। এটা যুগের স্বভাব অনুযায়ী। যুগটা হচ্ছে যন্ত্রের। মানুষের মনের উপরে, ভাষার উপরে যন্ত্রের চাপ পড়েছে। যন্ত্রের ভিতর দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর এলে যেমন খানিকটা metallic শোনায়, আজকের কাব্যের ভাষাও খানিকটা metallic শোনাচ্ছে।

এককালে কবিতা ছিল অলংকৃতা বণিতা। সে ছিল লাবণ্যময়ী, সে মনোহরণ করত। আজকের পাঠক বলে, আমি লাবণ্য চাইনে, আমার মনোহরণ করতে হবে না, প্রাণ জুড়াতে হবে না। আমাকে তুমি একটু তাপ দাও, ঝাঁঝ দাও; ধারালো কথা ঝাঁঝালো কথা শোনাও। সেদিনের অলংকৃতা বণিতা আজ লজ্জা পেয়েছে, বলছে— তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ। কাব্যসরস্বতী আজ কঠিন সাজে সজ্জিত, বর্মপরিহিত তার মূর্তি। এটা হল ভাষা আর টেকনিকের কথা; কিন্তু কাব্যের স্বভাব যায় না ম'লে। আধুনিক কবিতা যেখানে সার্থক হয়েছে সেখানে সেও লাবণ্যবর্জিত নয়। দেবী চৌধুরানী রণরঙ্গিণী হয়েও ব্রজেশ্বরের মন ভুলিয়েছেন, এও তেমনি। কঠিন বর্ম দিয়েও সে তার লাবণ্যকে ঢাকতে পারছে না। রসজ্ঞের চোখে তার লাবণ্য ধরা পড়ছে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার মূর্তি রুক্ষ, বাক্য কর্কশ। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এ যুগের কবিরা যত রকম দুঃসাহসী টেকনিকের প্রয়াস দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। এক গদ্যছন্দের ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো ধরণের সাজসরঞ্জাম তিনি ব্যবহার করেন নি। ভাষার লালিত্যও শেষ পর্যন্ত বজায় রেখে চলেছেন। শেষ দিকের কোনো কোনো কাব্যে কাব্যিক ভাষা বা poetic diction ছাড়িয়ে সাধারণ চলতি ভাষার ব্যবহার একটু বেশি করেছেন। এ ছাড়া কাব্যের ভাষায় তেমন কোনো ক্রমবিকাশ দেখা যায় না।

আধুনিক কবিতার একটি দুর্বলতা, অযথা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ। Didactic poetry যেমন উঁচু দরের কাব্য নয় pedantic poetryও তেমনি উঁচু দরের কাব্য হতে পারে না। পুঁথি-পড়া বিদ্যা দিয়ে কাব্য রচনা সম্ভব নয়। টি. এস. এলিয়ট সেই চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে তাঁর স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার ক্ষতিই হয়েছে। পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁর কবিতা খানিকটা academic, এটা প্রশংসার কথা নয়। এমন-কি নিজ পাণ্ডিত্যকে একস্থানে bogus scholarship বলেও উল্লেখ করেছেন। হতে পারে সেটা বিনয় প্রকাশ। তাঁর পাণ্ডিত্যকে কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু প্রশ্ন হল বহু কাব্য, বহু গ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের উল্লেখ বিনা এবং নানা ভাষার মিশ্রণে multi-lingual কবিতা ছাড়া কি তাঁর মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না? পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে বৈকি কিন্তু তার প্রকাশেরও রকমফের আছে। কবি রসের কারবারী, তিনি যখন তাঁর বিদ্যাবত্তাকে কাব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন তখন সেই বিদ্যা পাণ্ডিত্যের আকারে দেখা দেয় না, রসের আকারে দেখা দেয়। তাকে আর আলাদা করে পাণ্ডিত্য বলে চেনা যায় না। বোধ করি সেই কারণেই এত কাল যে কথা বলার প্রয়োজন হয় নি আজ সে কথা বলারও প্রয়োজন হয়েছে।

বলতে হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথও অসাধারণ পণ্ডিত। তবে সে পাণ্ডিত্য অনাবশ্যক উদ্গীরণে প্রকাশ পায় নি। তাঁর লেখার মধ্যে নাম ধাম, ঠিকুজি কোষ্ঠী, এবং পাতা-জোড়া কোটেশন -এর বালাই নেই বলে একালের পণ্ডিতেরা তাকে পাণ্ডিত্য বলে স্বীকার করেন না। সাম্প্রতিক কালে এইসব পণ্ডিতম্মন্যদের মুখে খেদোক্তি শোনা গিয়েছে, 'আহা, ভদ্রলোক যদি আরেকটু পড়াশোনা করতেন তাহলে—।' মজার কথা এই যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে ঠিক এই উক্তিটি ওদেশের 'পণ্ডিত'মহলে এককালে শোনা গিয়েছিল। কাজেই আমাদের 'পণ্ডিত'রা যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইত্যাকার বুলি আওড়াতে শুরু করবেন তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও শিশুসুলভ। সমাজে যেমন unearned income বলে একটা জিনিস আছে— বাপ-দাদার জমানো টাকায় কিম্বা সম্পত্তিতে বাবুগিরি করা— তেমনি পুঁথিগত বিদ্যা হল unearned learning। এটাও এক ধরণের পরের ধনে পোদ্দারি। সেটা শেষ পর্যন্ত মুখস্থ বুলিতে দাঁড়ায়, সেটার নাম বিদ্যা-ফলানো। পুঁথির বিদ্যা যখন নিজের চিন্তার দ্বারা শোধিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজস্বীকৃত হয় তখনই তাকে বলা যায় বিদ্যা, তার পূর্বে নয়। বিদ্যার সাঙ্গীকরণ এবং স্বকীয়করণের মধ্যেই আসল পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ সেই নির্জলা পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি : বুয়র যুদ্ধ

দেবীপদ ভট্টাচার্য

ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ (Boer war) আফ্রিকার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বুয়র ও বৃটিশ শক্তির মধ্যে ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০২ অবধি তিন বছরের বেশি কাল ধরে এই যুদ্ধ চলে। বুয়রেরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং বৃটিশের অধীনতা মেনে নেয়। বুয়রেরা মূলে হলাণ্ডের অধিবাসী, আফ্রিকায় ভাগ্যান্বেষী কৃষিজীবীরূপে আসে। আফ্রিকায় যে-অঞ্চলে তারা প্রথমে বসবাস চাষ-আবাদ গড়ে তুলেছিল, কালক্রমে সেদিকে বৃটিশের দৃষ্টি পড়ল। কাজে কাজেই তারা উত্তর দিকে নাটাল ও অরেঞ্জ-নদী-বাহিত অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়। কিছুকালের জন্য বুয়রেরা স্বাধীনতার স্বাদ পেলেও ১৮৪২ সালে বৃটিশ সরকার নাটাল দাবি করল এবং অরেঞ্জ-নদী উপনিবেশ অঞ্চল গ্রাস করে নিল। তখন বুয়রেরা আরো উত্তরে সরে গিয়ে ট্রানস্‌ভালে বসতি গড়ে তুলল। বৃটিশ সরকার এবারে বুয়রদের স্বাধিকার-দাবি মানল বটে কিন্তু নাটালকে আর ফিরিয়ে দিল না।

ইতিমধ্যে ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ-নদী-বাহিত এলেকায় প্রচুর হীরা ও সোনার সন্ধান মিলে যায়। ১৮৭১ সালে বৃটিশ সরকার কেপ কলোনীর গভর্নর সার্‌ হেন্‌রি বার্কলেকে ক্ষমতা দান করেন 'হীরক-অঞ্চল'কে তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসতে। যুক্তি দেখানো হয় যে, খনি-অঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খল খনকদের দস্তুরমত শায়েস্তা করবার উপযুক্ত পাত্র বৃটিশ রাজ। এরই ফলে ১৮৭৭ সালে বৃটিশকে যুদ্ধে নামতে হয় প্রথমে আফ্রিকান্‌ জুলুদের ও তার পর ডাচ বুয়রদের বিরুদ্ধে। তবুও দেখা যায় ১৮৮১ সালে বৃটেন ট্রানস্‌ভাল সরকারকে মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছে।

ওদিকে ট্রানস্‌ভালে হীরা ও সোনার খনি আবিষ্কৃত হওয়াতে সারা ইউরোপের বণিক-জিহ্বা লালাসিক্ত হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ-ধিক্কৃত 'সভ্যের বর্বর লোভ' প্রচণ্ড মূর্তি নিল। বেলজিয়ম ফ্রান্স পোর্তুগাল ইটালী জার্মানী কেউই কালো আফ্রিকার দেহে হিংস্র দাঁত বসাতে কসুর করল না। বৃটিশের কথা তো প্রশ্নবহির্ভূত। এই ভাগাভাগির জোট তৈরি হল ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত 'আফ্রিকা সম্মেলনে'। গ্লাডস্টোন (১৮০৯-৯৮) জার্মানী ও ব্রিটেনের মধ্যে অফ্রিকার ভাগাভাগি সম্পর্কে স্বার্থ-সাম্য ঘোষণা করলেন। কিন্তু দোহাই পাড়লেন অসভ্য জাতিকে সভ্য করার মহান ব্রতের : "She [Germany] becomes our ally and partner in the execution of the great purposes of Providence *for the advancement of mankind*"। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের ঘোষণাকে "দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী" বলে কঠোর বিদ্রূপ করেছেন।

এই সময় থেকে পল ক্রুগারের নেতৃত্বে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বুয়রদের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। অনুরূপ ভাবে ইংরেজরাও 'জাতিপ্রেমে'র দোহাই দিয়ে পরবর্তী কালের হিটলারী ধরণে পাল্‌টা আন্দোলন চালাতে থাকে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সেসিল রোডস্‌ নামে অক্সফোর্ডে শিক্ষিত একজন ধনী। তিনি আফ্রিকায় সোনা-হীরার ব্যাবসা করে কোটি-কোটি

রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

শান্তিনিকেতন। ১৩৪০

টাকার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর নামেই 'রোডেসিয়া'র (Rhodesia) নামকরণ। এই সময়ে ট্রানস্‌ভালের সোনা-হীরার খনিতে কাজ করতে পাঠানো হল মুখ্যত ইঙ্গ-আমেরিকান খনকদের। তাদের বলা হ'ত উইটল্যাণ্ডার ('Uitlanders')। অনিবার্য কারণে বুয়রদের সঙ্গে বহিরাগত বিদেশী শ্রমিক-খনকদের গোলমাল বাধল। তারই পরিণতি 'জাতিগত সংঘর্ষ' বা racial conflict। সেসিল রোডস্‌ তখন কেপ কলোনীর প্রধান মন্ত্রী।[১] ১৮৯৫ সালে তিনি ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলেন কী কৌশলে ট্রানস্‌ভাল সরকারের পতন ঘটিয়ে তার অধিকারভুক্ত রত্নখনি করায়ত্ত করা যায়। বুয়র ও বহিরাগত বিদেশী খনকদের সংঘাতকে একটি অজুহাতরূপে তৈরি করা হল। বুয়রদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালনা করলেন ডা. জেমসন। কিন্তু পল ক্রুগার সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৯৬ সালে বুয়রদের এই জয়লাভে জার্মান সম্রাট ক্রুগারকে অভিনন্দনসূচক তার পাঠান। অবশ্য ইংরেজকে হটিয়ে জার্মানীর স্বার্থ কায়েম করাই তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। এই অভিনন্দন পাঠানোর ফলে বৃটেন জার্মানীর উপর চটে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার আফ্রিকায় যে দলে-দলে আবিষ্কারকেরা (লিভিংস্টোন, স্টান্‌লি, প্রভৃতি) বা মিশনরিরা যাত্রা করেছিল তার পিছনে শুধু ভৌগোলিক জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল না, ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের স্বর্ণতৃষ্ণাও ছিল।

তাই অনুন্নত দেশের ধনসম্পদ অপহরণের দুর্বার রিপু একদিন 'বুয়র যুদ্ধ' ডেকে নিয়ে এল। ১৮৯৯ সালের ১০ই অক্‌টোবর তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

১৮৯৩ সালে গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান। তখন দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসনে ভারতীয়দের কোনো সম্মানজনক স্থান ছিল না কোনো ক্ষেত্রে। গান্ধীজি যখন আবদুল্লা শেঠের মামলা নিয়ে ডারবান শহরের আদালতে যান তখন তাঁকে মাথা থেকে পাগড়ি খুলতে বলা হয়েছিল। তিনি সে নির্দেশ মানেন নি। ঐ সময়ে ভারতীয়দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল "semi-barbarous Asiatics or persons belonging to the uncivilized races of Asia". ট্রানস্‌ভাল বা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটেও অর্থাৎ বুয়র-শাসিত অঞ্চলেও ভারতীয়দের অমর্যাদাকর ব্যবহার পেতে হত।

বুয়র যুদ্ধ যখন বাধল, তখন বৃটিশ সেনা প্রথমে মার খেল খুব বেশি। বুয়রদের হাতে যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন সেকালের 'সাংবাদিক' উইনস্টন চার্চিল। গান্ধীজি বুয়রদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা তাঁর 'duty' বা কর্তব্য কর্ম বলে মনে করেছিলেন। যদিও তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "It must be largely conceded that justice is on the side of the Boers". তাঁর জীবনীকার টেন্‌ডুলকার এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন :

> "His loyalty to the empire drove him to side with the British in the teeth of opposition from some of his countrymen. Gandhiji felt that if he demanded rights as a British citizen, it was also his duty, as such, to participate in the defence of the empire."

---

১ "Mr Cecil Rhodes, brother of Colonel Rhodes of Lord Harris' staff, has been appointed Premier of Cape Colony, in the place of Sir Gordon Spring, resigned"—The Statesman, July 26, 1890

এই কর্তব্যপালনের জন্য তিনি প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক 'ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠন করেন। এই সূত্রে তিনি ঘোষণা করেন :

"We do not know how to handle arms. The motive underlying this humble offer is to endeavour to prove that in common with other subjects of the Queen Empress in South Africa, the Indians too are ready to do duty for their sovereign on the battlefield."

বার্নার্ড শ যিনি ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক দলভুক্ত ছিলেন, তিনিও সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের জয়গান করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার রত্নখনিগুলির বিশ্বের সর্বজাতিক মালিকানার কথা বলেও মন্তব্য করলেন, "The British Empire is the only available substitute for a world federation"। গান্ধীজি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষে সেবাকার্য করেন। সেজন্য বৃটিশ সেনাপতি বুলার (Buller) তাঁর কার্যের প্রশংসা করে তাঁকে একটি পদক উপহার দেন। 'বয়েজস্কাউট' আন্দোলনের স্রষ্টা বেডেন পাওয়েলও বুয়র যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। জেনারেল বুলার বুয়রদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত, তিনি সৈনাপত্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন।[২] তখন কিচেনার সৈন্যাধ্যক্ষ হন। ১৯০২ সালের ৩১শে মে বুয়ররা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই যুদ্ধে বুয়রেরা যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখায় তার সঙ্গে আমাদের রাজপুতদের তুলনা করা চলে। গান্ধীজির জীবনীকার লিখেছেন :

"The brave Boer women took part even in fighting and when they could not do that they encouraged their husbands and sons to fight and to die."

এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে ৫৭৭৪ নিহত ও ২২৮২৯ আহত হয়। বুয়র পক্ষে নিহতের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। বুয়র যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। 'দি ইংলিশম্যান', পত্রিকায় ১৯০০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে আমেরিকায় বুয়র-সমর্থক আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছিল, "A message from New York states that Mr. Alger, late Secretary of War, strenuously denounces the Pro-Boer agitation in the United States."

ফ্রান্সের খবরে জানা যায় বুয়রদের সমর্থনে ফরাসী যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাত্রার সঙ্কল্প করেছিল, "It is the intention of French volunteers to go to the assistance of the Boers disembarking at Lourenco Marques...[৩]

বুয়রদের সাহায্য দেবার জন্য অগ্রসর জর্মান স্টিমারকে সার্চ করে বৃটিশরা আটক রাখে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজা-মহারাজারা অর্থ-অশ্ব-সৈন্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। এই সময়ে, ১৯০০ সালের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে, কলকাতা টাউন হলে বুয়র যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্যদানের জন্য কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা

২ দি ইংলিশম্যান, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০০

৩ দি ইংলিশম্যান, ২৪ জানুয়ারি ১৯০০

হয়। ঐ সভায় দারভাঙ্গার মহারাজা, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর হোসেন, রেভারেণ্ড প্রতাপ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ সেন, জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বলেন, "The war would never have occured if President Kruger and his followers had continued to acknowledge the Queen's sovereignty in Pretoria and other places…" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রস্তাব করেন, "That prayers be offered in places of worship for the victory of British arms and the speedy termination of the war"। সভায় ৬৫,৩০১৲ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল বুয়র যুদ্ধ তহবিলে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দিয়েছিলেন ৫০০০৲ টাকা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বুয়র যুদ্ধকে কী চোখে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। আফ্রিকায় এবং এশিয়ায়, বিশেষতঃ চীনদেশে, বৃটিশ ও অন্যান্য বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির অন্যায় আক্রমণে কবি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ১৩০৯ (১৯০২) সালে ১লা বৈশাখ বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি 'নববর্ষ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার মুখে। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"কোথা হইতে বণিকের কামান· · আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব সভ্যতার বক্ষে বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।"

সভ্যতাবিস্তারের তথাকথিত মহান দাবিকে কবি এইভাবে ধূলিসাৎ করেন। বুয়র যুদ্ধের উৎসাহদাতা, উগ্র বৃটিশ জাতিপ্রেমের অন্যতম উদ্গাতা সেসিল রোড্স্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে তাঁর "ইম্পীরিয়লিজ্ম্" প্রবন্ধে (১৩১২)। তিনি লিখেছেন :

"বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন।· ·

"যাহারা ইম্পীরিয়লিজ্মের খেয়ালে আছেন তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।· ·

"সেসিল রোড্স্ একজন ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা সকলেই জানেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা প্রজা' গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে (১৩১৫) বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে 'অগ্নিযুগ' শুরু হয়েছিল এবং তাকে দমন করবার জন্য বৃটিশ শক্তি যে কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেছিল তাকে ধিক্কার দিতে গিয়ে বুয়রদের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন :

"অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া, নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধ-ব্যাপারের একটা

অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'মার্শাল ল' শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা।"

পুনরায় 'সমাজভেদ' নামক ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত মৌলিক পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে 'য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র' এবং 'প্রাচ্য-সভ্যতার কলেবর ধর্ম'। চীনে শক্তিমদমত্ত বৃটিশ তথা ইউরোপীয় শক্তিগুলির অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি পুনরায় বুয়রদের উল্লেখ করেছেন :

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে,· · ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

পূর্বলিখিত গদ্য প্রবন্ধগুলিতে কবি বুয়রদের সম্বন্ধে যে রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন অনুরূপভাবে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যের (১৩০৮) কয়েকটি কবিতায় পাশ্চাত্য পররাজ্যগ্রাসী শক্তিগুলির অন্তর্নিহিত স্বরূপ বলিষ্ঠ ভাষায় উদ্‌ঘাটিত করেছেন—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল ; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী।· ·

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম· ·

লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।· · [৬৪]

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে। [৬৫]

চিতার আগুন
পশ্চিমসমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ, স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা। [৬৬]

শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।

দেশ হতে দেশান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তময় পল্লী যত করে ছারখার। [৯২]

বুয়র যুদ্ধ শুরু হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'বিরোধমূলক আদর্শ' (১৩০৯) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৪] ঐ প্রবন্ধে তিনি 'ন্যাশনাল ধর্মনীতি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রধান অবলম্বন।" এই সূত্র ধরে তিনি বুয়রদেরও সমালোচনা করেছেন :

> "ন্যাশনালধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ার জাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে— কিসের জন্য? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনালধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই?"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে জওহরলাল নেহরু বুয়র যুদ্ধ সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তার মিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, গান্ধীজির সঙ্গে নয়। নেহরু লিখেছেন :

> "Meanwhile at the end of the century England had a little war of her own in South Africa. The discovery of gold in the Boer Republic of the Transvaal led to this war in 1899. The Boers fought with amazing courage and perseverence for three years against the leading power of Europe. They were crushed and had to acknowledge defeat."[৫]

৪ 'সমূহ' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ১০

৫ Nehru, *Glimpses of World History.*

রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোলাঁ

রথীন্দ্রনাথ রায়

জেনেভা লেকের ধারে রোলাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁর সাক্ষাৎকারের সেই ছবিটির আবেদন অবিস্মরণীয়। সপ্ততিস্পৃষ্ট রবীন্দ্রনাথের কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশে ও শ্মশ্রুতে তুষারশুভ্রতা— প্রাচ্য ঋষির দেবোপম মূর্তি। রোলাঁর বয়সও প্রায় পঁয়ষট্টি। চুলের বেশির ভাগই পাকা, চিন্তাক্লিষ্ট শীর্ণমুখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। এই দুই অসামান্য ব্যক্তিত্ব এক ঘরোয়া পরিবেশে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের কথাবার্তায় ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার সুর। সংগীত-শিল্প-সাহিত্য থেকে তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যন্ত তাঁরা আলোচনা করে চলেছেন। এক-একটি কথার আলোয় জ্বলে উঠেছে তাঁদের বুদ্ধির রশ্মিলেখা, চিন্তা-সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা থেকে জেগে উঠেছে এক-একটি দুর্লভ প্রত্যয়ের রত্নকণিকা! মনে হয় অলিম্পাস-শিখরাসীন দুই দেবতাত্মা মহামানব! নীচের পৃথিবীতে বিরোধ-বিসংবাদ ও হীন স্বার্থকৌটিল্যের উত্তপ্ত আবহাওয়া— মদোদ্ধত বিজয়ীর দুর্বিনীত অট্টহাসি নির্যাতিতের আর্তকণ্ঠের সঙ্গে মিশে এক বীভৎস প্রেতভূমির সৃষ্টি করেছে।

নিম্নভূমির এই কল-কোলাহল এই দুই 'অলিম্পিয়ান'কেও বেদনাবিদ্ধ করেছে, সেই পাহাড়ের পাদদেশও হয়তো উঠেছে কেঁপে। তবু তাঁদের বিশ্বাস ও প্রত্যয় শিথিল হয় নি। উন্মত্ত ঝড়ের অন্ধ আবেগ তাঁদের আঘাত করেছে, যুগজীবনের প্রলয়মেঘ তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। তবু অলিম্পাস-শিখরাসীন এই দুই মনীষীর বিশ্বাস টলে নি, মুক্তমনের আঙিনায় জেগে উঠেছে আলো-হাওয়ার দাক্ষিণ্য। ছবিখানা দেখে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতায় মর্ত্যসীমা অতিক্রমকারী মানবের দেবোপম মহিমার কথা—

> নিদারুণ দুঃখরাতে
> মৃত্যুঘাতে
> মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
> তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?[১]

আর মনে পড়ল রোলাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি :

Great souls are like mountain peaks. Storms lash them ; clouds envelop them ; but on the peaks we breathe more freely than elsewhere. In that pure atmosphere, the wounds of the heart are cleansed ; and when the cloudbanks part, we gain a view of all mankind.[২]

---

১ বলাকা, ৩৭নং কবিতা।

২ *Rolland and Tagore* Visva-Bharati, Sep, 1945, pp. 5-6.

মনে হল মানবমহিমার এই দুই অত্যুচ্চশীর্ষ খণ্ডকালকে অতিক্রম করে এক চিরন্তনকালের দরবারে তাঁদের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন— যে বাণী দীর্ঘকালের আত্মসমীক্ষায় লব্ধ, অনুভূতি ও উপলব্ধিতে সিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও রোলাঁর (১৮৬৬-১৯৪৪) বন্ধুত্ব ও আত্মিক সম্পর্ক বর্তমান শতাব্দীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ব-পশ্চিম, ইউরোপ ও এশিয়া— দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটা সম্ভব নয়, এইজাতীয় কিপলিঙসুলভ মনোভাবের সংকীর্ণ ক্ষেত্র অতিক্রম করে ইউরেশিয়ার নতুন ভাবভূমি রচিত হয়েছে। আমেরিকা থেকে কবি এসেছেন লণ্ডনে (২৪ মার্চ ১৯২১)। তিন সপ্তাহ লণ্ডনে থাকার পর তিনি এলেন প্যারিসে। এলবার্ট কাহ্নের প্রাসাদোপম বাগানবাড়িতে কবির বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। প্যারিসে আসার পরের দিনই রোমা রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎপরিচয় হল (১৭ এপ্রিল ১৯২১)। রোলাঁর ভগিনী মদেলিন দোভাষীর কাজ করলেন।[৩] অবশ্য সাক্ষাৎপরিচয় না থাকলেও দুই মনীষীর পত্রালাপ ছিল। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশানালিজম্' (১৯১৭) পড়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পশ্চিমের 'নেশন'তত্ত্বের ধ্বংসকরাল মূর্তিকে কবি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কবি তথাকথিত ইউরোপের দানবীয় নেশনের করালগ্রাস থেকে রক্ষার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন :

> We have felt its [soulless organization] iron grip at the root of our life, and for the sake of humanity we must stand up and give warning to all, that nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality.[৪]

শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে মদোদ্ধত 'নেশন'এর স্বরূপধর্মকে কবি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর অব্যর্থলক্ষ্য তীক্ষ্ণ ভাষায় :

> The Nation, will all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the *Nation is the greatest evil for the Nation*, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril.[৫]

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটি নতুন মূর্তি দেখেছেন। একদা 'রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ-রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপ যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়েছিল', তার ওপর ছিল কবির গভীর বিশ্বাস। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মনীষীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এক সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন "য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতার যুগ।" কিন্তু প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইউরোপ সম্পর্কে কবির মোহভঙ্গ শুরু হয়েছিল। কবি বলেছেন :

৩ রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড, ১৩৫৯); প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৫২।

৪ *Nationalism*, p. 16.

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৯-৩০।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি— এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।[৬]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন তাঁরা দুজনেই যন্ত্রণাজর্জরিত মানবাত্মার অপমাননায় বেদনার্ত। পশ্চিমের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা তখনো সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয় নি। কিন্তু রোলাঁ ইউরোপের কেন্দ্রে বসে পশ্চিমী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য বীভৎসতাকে আরো স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। যুদ্ধের চার বছর তিনি জন্মভূমি থেকে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসন। মানবতার সপক্ষে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। যুদ্ধবিরতির পর তিনি ইউরোপকে দেখলেন— সে ইউরোপ একটি 'দগ্ধতৃণ বন্ধ্যাভূমি' ও 'বিশাল ভগ্নস্তূপ' ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি দেখলেন পূর্বদিগন্তে আলোর অনির্বাণ শিখা। মানবপ্রত্যয়ের এই ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ শিল্পী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার মধ্যে খুঁজে পেলেন তাঁর ঈপ্সিত আশ্রয়।

২

ফরাসীদেশের ক্লেমেসিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে রোলাঁর জন্ম হয় (২৯ জানুয়ারী ১৮৬৬)। তিনি সংগীতশিল্পের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন মায়ের কাছ থেকে। বিশ বছর বয়সে রিচার্ড ভাগ্‌নারের গীতিনাট্য এবং টলস্টয়ের উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই দুই মনীষীর প্রভাবে রোলাঁর মানসলোক রচিত হয়েছিল। তরুণ-বয়সে শেক্সপীয়রের প্রভাবে 'ওরসিনো' নাটক রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালের ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাস নিয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রির গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ছ'খানা নাটক রচনা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সুমহান নৈতিক চেতনা ও মানবিক প্রত্যয়।[৭]

ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, নিট্‌শে, লুই ব্লাঙ্ক, ইবসেন, ভাগ্‌নার প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে রোমে মলহ্বিদা ভন্‌ মিসেনবার্গ নামে এক জার্মান মহিলার সঙ্গে রোলাঁর পরিচয়

৬ 'কালান্তর', কালান্তর

৭ "Romain Rolland makes an immediate impression of ethical fervour and of democratic and humanitarian sentiment, coloured with the idealism of the French Revolution"— *A History of French Literature.* L. Cazamian.

রোলাঁ

রবীন্দ্রনাথ

হয়। তরুণ রোলাঁর চিন্তা-চেতনা ও উন্নত আদর্শবাদ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে রোলাঁ নিজের আদর্শকেই নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে রোলাঁ সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

> In this young Frenchman I discovered the same idealism, the same lofty aspiration, the same profound grasp of every great intellectual manifestation that I had already found in the greatest men of other nationalities.[৮]

তরুণ-বয়স থেকে মহৎ-জীবনপ্রত্যয়ের যে বেদনা তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল, তারই বিচিত্রধারা চরিত-সাহিত্যে, উপন্যাসে, সংগীত ও শিল্প-সমালোচনায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জ্যাঁ-ক্রিস্তফ্' (১৯০৪-১২) দশ খণ্ডে ফরাসী দেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অসাধারণ উপন্যাসের মহাকাব্যোচিত বিস্তৃতির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে রাইনল্যাণ্ডের এক প্রতিভাবান সংগীতশিল্পী ও স্বরস্রষ্টার জীবনেতিহাস। জার্মানীর ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সাধনার সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে এই চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসে সে যুগের আত্মিক সংকটের ছবি যেমন আছে, তেমনি আছে ইয়োরোপে নতুন সভ্যতার প্রত্যাশা। নায়ক চরিত্রে যে আত্মিক সংকট মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা যে বহুলাংশে রোলাঁরই মানস-সংঘাতের ছবি এ বিষয়ও অনুমান করা অসংগত নয়। উপন্যাসের সপ্তম খণ্ডের ভূমিকায় রোলাঁ যা লিখেছেন, তা তাঁর মানসরহস্য উন্মোচন করবে—

> I was isolated : like so many others in France I was stifling in a world morally inimical to me : I wanted air : I wanted to react against an unhealthy civilization, against ideas by a sham elite : I wanted to say to them : 'you lie ! you do not represent France !' To do so I needed a hero with a pure heart and unclouded vision, whose soul would be stainless enough for him to have the right to speak ; one whose voice would be loud enough for him to gain a hearing. I have patiently begotten this hero.[৯]

শুধু এই উপন্যাসেই নয়, সারাজীবন তিনি অনুসন্ধান করেছেন মহৎ নায়কের। তারই ফলশ্রুতি তাঁর চরিতগ্রন্থগুলি। তাঁর মতে "great men are the men of absolute truth." তাই মহৎ জীবনের মধ্যে তিনি সেই পরম সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। 'বীঠোভেন' (১৯০৩), 'মাইকেল এঞ্জেলো' (১৯০৫), 'টলস্টয়' (১৯১১), 'গান্ধী' (১৯২৪), 'রামকৃষ্ণ' (১৯২৯), 'বিবেকানন্দ' (১৯৩০) প্রভৃতি চরিতগ্রন্থ রোলাঁ-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রোলাঁর ভাবজীবনে এক নতুন দিগন্ত দেখা দিল। প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ তাঁকে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রুশ বিপ্লবকেও একসময় তিনি জানিয়েছিলেন সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। একদা তিনি

---

৮ *Jean-Christophe* Modern library Edition. Translated and edited by Gilbert Cannan, Preface, p. IV

৯ 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্' সপ্তম খণ্ডের ভূমিকা "To the friends of Christophe" থেকে।

লেলিনবাদ ও গান্ধীবাদের একটি সমন্বয় করারও চেষ্টা করেছিলেন। গোর্কির মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন—

> Gorky was the first, the greatest of the paths to the proletarian revolution, brought to it their entire co-operation the prestige of their glory and rich experience.[১০]

যেখানেই তিনি মহৎ চরিত্র অথবা কোনো মহান আইডিয়ার পরিচয় পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর পরিশীলিত মন তা গ্রহণ করেছে। দেশ-কাল বা ভৌগোলিক ব্যবধান তাঁর এই উদার মানবিকতা বা সত্যানুসন্ধিৎসায় কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। গভীর মানবতন্ত্রী দৃষ্টি ও উদার বিশ্বমানসিকতা রোলাঁকে এক জ্যোতির্লোকের তীর্থপথিকে পরিণত করেছে। রণবিক্ষুব্ধ ইউরোপের আকাশ যখন রক্ত-পিঙ্গল মেঘে আচ্ছন্ন, রোলাঁ তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে দেখেছেন এক অনাদিকালের সমৃদ্ধ ভাব-প্রবাহ— যে প্রবাহ যুগযুগান্তরব্যাপী চলেছে পরম পরিপূর্ণতার দিকে। রোলাঁর সুগভীর ভাবুকতা, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও মুক্ত মনের সত্যজিজ্ঞাসা প্রাচীন প্রজ্ঞার তীর্থভূমি এশিয়াকে নবব্যাখ্যা দিয়েছে। তিনি তার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন, দেখেছেন এশিয়া ও ইউরোপের মিলনাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন![১১]

একদা রবীন্দ্রনাথ 'বড়ো-ইংরেজ'-এর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছিলেন :

> সে সৃজনধর্মী, য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎশিক্ষা তার চিত্তকে প্রতি মুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল, অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী।[১২]

বড়ো-ইংরেজ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় আত্মিক সংকটের কথা বলেছেন, যে অগ্রচারণা ও সৃজনধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন, রোমা রোলাঁ যে তাঁদেরই প্রতিনিধি, এমনকি তাঁদের চেয়েও বড়ো, এ কথা আজ সংশয়াতীত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিন্তানায়কদের কেউ কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে রোমা রোলাঁর মতো আর কোনো মনীষীই এত গভীর ভাবে ভারতব্যাখ্যা করতে পারেন নি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ভারতপথিকের কর্মকৃতিকে সশ্রদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করে রোলাঁ ভারত-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের নবজাগরণকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। 'ইন্‌ডিয়া অন্ দি মার্চ'[১৩] এবং 'দি বিল্‌ডার্স অব্ ইউনিটি'[১৪] প্রবন্ধদ্বয়ে তিনি

১০ Adieu to Gorky, Modern Review, August 1936.

১১ "My European companions, I have made you listen through the Wall, to the bows of the coming one, Asia···go to meet her! She is working for us. We are working for her. Europe and Asia are the two halves of the Soul. Man *is not* yet. He *will be*."— *Vivekananda,* p 315

১২ 'ছোটো ও বড়ো,' কালান্তর।

১৩ The Modern Rivew, April 1929

১৪ 'রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়।

আবেগদীপ্ত কাব্যধর্মী ভাষায় নবজাগ্রত ভারতবর্ষের যে মহাভাষ্য রচনা করেছেন, তা বিস্ময়কর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভারত ব্যাখ্যাতা রোলাঁ ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর 'মনের মানুষ'কে খুঁজে পেয়েছেন। রণক্লান্ত ইউরোপ তাঁকে যা দিতে পারে নি, ভারতবর্ষের ক্রান্তদর্শী কবির কণ্ঠে পেয়েছেন তারই আশ্বাস।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর বন্ধুত্ব নানাদিক থেকেই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের অসামান্যতার কথা তো সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও, উদার হৃদয়বত্তার সঙ্গে বিদ্যা ভাবুকতা ও সংস্কৃতির এমন সমন্বয় সমকালীন বিশ্বের ইতিহাসে নিতান্ত দুর্লভ। সংগীত শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁদের মন্তব্যগুলি সুমার্জিত মনের আলোকে নতুন অর্থব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়েছে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ভিলেন্যুভে রোলাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর আলাপ শুরু হয়েছিল গ্যেটে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে। ভাইমার রাজসভায় কবিকুলগুরু গ্যেটের জীবনচর্যা ও সাহিত্যসাধনা নিয়েও অনেক কথা হল। তারপরেই আলোচনার মোড় ফিরল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংগীতের দিকে। কথাটা প্রথমে তুললেন রোলাঁই।

রোলাঁর জীবনের প্রধান অংশই কেটেছে সংগীতচিন্তায়। সংগীতের গবেষণা ও ইউরোপীয় বিভিন্ন সুরস্রষ্টার জীবনী ও শিল্পরীতির আলোচনা নিয়ে তিনি জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগীত সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথমেই তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সুরকার গ্লুকের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর আগে ইউরোপীয় সংগীত ছিল অনেকটা মধ্যযুগীয় গথিক শিল্পের মতো। ইউরোপীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় সংগীতে প্রত্যেকটি জিনিসকেই যেন কতকগুলি নির্দিষ্ট রূপের (definite terms) মধ্য দিয়ে মূর্ত করা হয়। রোলাঁ অবশ্য ইউরোপীয় সংগীতের এই ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ইউরোপীয় সংগীতের সঙ্গে আমাদের সংগীতের পার্থক্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার নানাভাবে বলেছেন। ইউরোপীয় সংগীতের মানবিক বৈচিত্র্যের কথা কবির মনে হয়েছে, অপরপক্ষে আমাদের সংগীত প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্য অতিক্রম করে করুণা ও বৈরাগ্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি বলেছেন—

> ··আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।[১৫]

ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি এরও বিশ বছর আগে (১৮৯১) একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন :

১৫ 'বিলাতি সংগীত', জীবনস্মৃতি।

ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে; এইজন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা-ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ; তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।[১৬]

বলা বাহুল্য রোলাঁর সঙ্গে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গেও কবির মনে পূর্বোদ্ধৃত মতামতগুলির কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ইউরোপীয় সংগীতের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল হার্বার্ট স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) লেখা পড়ে। স্পেন্সার নানাদিক থেকে তৎকালীন তরুণদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। স্পেন্সারের "The origin and function of music" নামক প্রবন্ধের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ একদা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় কবি সংগীতের নতুন পরীক্ষা করলেন। তার সমর্থনে লিখলেন তিনটি সংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধ।[১৭] এদের মধ্যে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধটিতে তিনি স্পেন্সারের 'The origin and function of music' প্রবন্ধের চিন্তাধারাকে সমর্থন করেছেন।[১৮] প্রবন্ধাকারে ইউরোপীয় সংগীত আলোচনার আগে থেকেই ইউরোপীয় সংগীতের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছিল। বিলাত যাওয়ার আগে থেকেই ঠাকুর-পরিবারে তথা বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিলাতি সংগীতের একটি প্রবল আন্দোলন জেগেছিল।[১৯] বাল্মীকি প্রতিভাকে কবি বলেছিলেন "সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা"। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ও অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় সংগীত সম্পর্কেও রোলাঁর ছিল অসামান্য কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ রোলাঁর সঙ্গে সংগীত আলোচনায় ভারতীয় বর্ষাসংগীতের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কবি বলেছিলেন যে ভারতীয় বর্ষাসংগীত বৃষ্টিধারা পতনের শব্দকে অনুকরণ করার কোনো চেষ্টা নেই। নববর্ষা মানবহৃদয়ে বর্ষার উৎসবমুখরতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, বর্ষার বিচিত্র ভাবানুষঙ্গ জাগ্রত করে।[২০] একদা দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রোলাঁ যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য :

…তোমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখা তোমাদের কর্তব্য আরও এইজন্যে যে বৈসাদৃশ্যের (unlike) অভিঘাতে জাতির ও মানুষের উভয়েরই প্রতিভা দীপ্ততর হয়ে ওঠে। তাই তোমাদের

---

১৬ ছিন্নপত্র, পতিসর ১৮৯১।

১৭. 'সংগীত ও ভাব', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮; সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮; 'সংগীত ও কবিতা' ভারতী, মাঘ ১২৮৮।

১৮. স্পেনসারের এই প্রবন্ধটি Fraser's Magazine-এ (১৮৫৭) প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে *Essays—Scientific Political and Speculative* vol I (1868)-তে প্রকাশিত হয়।

১৯. দ্রষ্টব্য শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অধ্যায়।

২০. *Rolland and Tagore*, P 85

সংগীতের স্পর্শ থেকে লাভ করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। বর্তমানে য়ুরোপীয় হার্মনির বিকাশ এত জটিল হয়ে উঠেছে যে আধুনিক য়ুরোপের সংগীতকারেরা এগুতে পারছেন না···আমরা হাতড়াচ্ছি, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের সংগীত থেকে এদিকে একটা নতুন আইডিয়া লওয়া আমার মোটেই অসম্ভব মনে হয় না।[২১]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর বিচিত্র বিষয়াশ্রিত আলোচনা যেমন ভাবগর্ভ তেমনি বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্পর্কেও রোলাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও ব্যক্তিত্বে তিনি পেয়েছিলেন "ভারতাত্মার এক সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।" ভারতবর্ষের ধর্ম সম্পর্কিত সহিষ্ণুতা রোলাঁকে বিস্মিত করেছিল। রোলাঁ এর দুটো কারণ অনুমান করে কবিকে বলেছিলেন: "The cosmic nature of your religion and the composite character of your civilization, makes this possible."

কথোপকথনের অনুলিপি ছাড়াও দুজনের পত্রাবলী অনুসরণ করলেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুই মনীষীর গভীর একাত্মতা উপলব্ধি করা যায়। এই চিঠিগুলির মধ্যে যেমন আছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, তেমনি আছে অন্তরঙ্গতার সুর। রোলাঁর ভগিনী মদেলিন রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ফরাসী অনুবাদ করেন। তার ভূমিকাস্বরূপে রোলাঁ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের তিনটি উপন্যাস (গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দামিনী চরিত্র সম্পর্কে রোলাঁর মন্তব্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।[২২] প্রথম দর্শনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব যে তাঁকে কতখানি অভিভূত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবন্ধটির প্রথমেই। রবীন্দ্রনাথের এমন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ছবি যথার্থই দুর্লভ। রোলাঁ বলছেন:

> Meeting him at first, one involuntarily feels as though one were at church and talks in a hushed voice. Then if you are permitted to watch more closely the fine and proud profile, you will observe beneath the placid symphony of the lines the dominant sadness, the gaze without illusions, the virile intellect which resolutely faces the battle of life and does not let the spirit be ruffled by it.[২৩]

রোলাঁর ষষ্টিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রিয়বন্ধুকে নিবেদন করেছিলেন বিমুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি।[২৪]

---

২১ তীর্থংকর, দিলীপকুমার রায়, পৃ ২২-২৩।

২২ On Rabindranath Tagore (November, 1942)। মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২৩ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

২৪ *Rolland and Tagore*, p 1-2.

৪

রোলাঁর অন্তর্জীবন ধ্রুপদী মহিমায় সমুন্নত। তাই জীবনের প্রথম থেকে তিনি যাঁদের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা ছিলেন মহৎ জীবনের অধিকারী। তাঁর মতে মহৎ শিল্প বেদনাসম্ভব। মাইকেল এঞ্জেলা, বীঠোর্ভেন, ভাগ্‌নার, রেমব্রাণ্ট প্রমুখ শিল্পীর অন্তর্জীবন দুঃখ-বেদনার বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। 'আত্মার অসহ্য বেদনা' তাঁদের শিল্পকে মহিমান্বিত করেছে। এখানেও রোলাঁ 'Great Artist' ও 'Good Artist'এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। টলস্টয়ের সঙ্গে টুর্গেনিভের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

> টলস্টয়কে আমি টুর্গেনিভের বহু উর্ধ্বে মনে করি। শুধু আমি বলেই নয়, খুব কম ফরাসিই এক নিশ্বাসে এদের দুজনের নাম করবেন—টলস্টয় যাকে বলা চলে প্রকৃতির এক প্রকাণ্ড শক্তিপ্রপাত যিনি 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের স্রষ্টা, আর টুর্গেনিভ যাঁকে বলা যেতে পারে বড় জোর 'চমৎকার শিল্পী'—এঁরা দুজনে আলাদা জগতের অধিবাসী।[২৫]

মাত্র একুশ বছর বয়সে তরুণ রোলাঁর মনে শিল্প ও শিল্পীর জীবনবোধ সম্পর্কে প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দেখলেন সংশয়াতুর ইউরোপে আর কেউ নেই, যাঁর কাছে এর জবাব পাওয়া যায়। শুধু এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের সমুচ্চ মহিমার কথা তাঁর মনে এলো। তিনি টলস্টয়ের কাছে চিঠি লিখলেন। এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন টলস্টয়। "শিল্প-বিজ্ঞান আত্মত্যাগসম্ভূত, কতকগুলি বস্তুগত সুখসুবিধা থেকে তাদের জন্ম হয়নি"—এই ছিল তাঁর অভিমত। এই চিঠিতে টলস্টয় তাঁর উদার মানবিক দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়েছেন, তা অনুধাবনযোগ্য।

> I can never be happy except under a condition of the world wherein *all beings would love the others more than they love themselves.* If this thing is realised then the entire universe would be happy. I am human being and Reason gives me the law of happiness for all beings. I must then follow the law of my Reason—that *I love others more than I love my own self.*[২৬]

টলস্টয়ের এই চিঠি তরুণ রোলাঁকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অমৃতের সন্ধান দিয়েছিল। সত্যানুসন্ধান ও আত্মিক সংগ্রামের যে ভাবরূপ তিনি টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্যে পেয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার দিনেও পথ দেখিয়েছে। রোলাঁকে টলস্টয়ের জীবন উদ্বোধিত করেছিল, গ্যেটের মহতী প্রজ্ঞা মুগ্ধ করেছিল। সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একই কারণে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

'আধ্যাত্মিক' শব্দটি এ যুগের বস্তুবিচারে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটিকে এতো স্থূলভাবে ও বিকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয় যে, আমরা এর যথার্থ অর্থব্যঞ্জনার সন্ধান পাইনা। যে-

---

২৫ তীর্থংকর, দিলীপকুমার রায়, পৃ ৩।

২৬ ৪ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই চিঠি মডার্ন রিভিউ জানুয়ারী ১৯২৭-এ মুদ্রিত হয়।

কোনো গভীর ভাব-কল্পনা আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য। এর সঙ্গে তথাকথিত ধর্মসংস্কারের কোনো সম্পর্কই নেই। গভীর আত্মোপলব্ধি ঘটলে দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য। রোলাঁ যখন জ্যাঁ ক্রিস্তফ রচনা করেন, তখনো তাঁর সত্য সন্ধানের প্রথম পর্ব। কিন্তু এই উপন্যাসে যে তীব্র সংগ্রামের পরিচয়, আছে তা আধ্যাত্মিক জাতীয়। তাঁর চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানেও তিনি কতকগুলি ঘটনার পঞ্জী রচনা না করে মহৎজীবনের অভিব্যক্তি সূত্রগুলিকে বয়ন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্যাটার্ন যে মহাশিল্পীর রচনা তাঁর কিছু কিছু বিস্ময়কর শিল্পকর্মের সঙ্গে এর আগে রোলাঁর পরিচয় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে টলস্টয়, গ্যেটে, বীঠোভেন সম্পর্কে রোলাঁর মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন রোলাঁর প্রথম পত্রালাপ ঘটে, তখন কবি 'গীতাঞ্জলি-পর্ব' পরিক্রমা করে 'বলাকা-পর্বে' প্রবেশ করেছেন। কবির জীবনবিধাতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে মালা রচনা করেছেন, তা যেমন পূর্ণাঙ্গ তেমনি আত্মোপলব্ধির প্রশান্ত বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল। সংশয়ের বেদনা সম্পর্কে কবি যা বলেছেন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার এক দিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিমুক্ত সত্য অন্য দিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করছে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করছে।[২৭]

রবীন্দ্রনাথকথিত এই "সংশয়ের বেদনা"কে রোলাঁ দেখতে পেয়েছেন বীঠোভেনের "শ্রেষ্ঠ সংগীত" ও ভাগ্‌নারের "পার্সিফালের দীর্ঘনিশ্বাস"এর মধ্যে। টলস্টয় এর চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মতে "শিল্পীকে তাঁর বিশ্বাসের জন্যে, শিল্পের জন্যে ছাড়তে হবে ঐহিক সুখ শান্তি।" অধ্যাত্মচেতনার উদ্ভব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> The idea of the humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal, is the main subject of this book. This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning. On the contrary, it has followed the current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my consciousness with a direct vision.[২৮]

এক সার্বভৌম ও উদার মানবিক প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁকে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ করেছিল। প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের সেই বিক্ষুব্ধ মুহূর্তে যখন গোটা ইউরোপের আবহাওয়া উত্তপ্ত, তখন রোলাঁ বৃহত্তর মানবতার সপক্ষে যুদ্ধবিরোধী মতবাদ নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে তিনি "অ্যাবাভ্‌ দি ব্যাটল্" (সেপ্টেম্বর ১৯১৪) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর প্রায় পাঁচ বছর পর যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি শান্তিকামী মানুষের সপক্ষে 'Declaration of Independence of the Spirit' নামে একখানি প্রচারপত্র রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের জন্য পাঠিয়ে দেন। এই প্রচারপত্রে অপরাজিত মানবাত্মার চিরন্তন মুক্তি কথাই ঘোষিত হয়েছিল :

---

২৭ 'সংশয়,' শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড

২৮ *The Religion of Man* (1963),

We serve Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race caste. Of course we shall not dissociate ourselves from the interests of Humanity. We shall work for it, but for it *as a whole.*[২৯]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে তখন সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি ও মানবীয় প্রত্যয় দুই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মানবমুক্তির বেদমন্ত্র রচনা করেছে। তাই দেখি মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন জীবনসন্ধ্যায় আহত কবির কণ্ঠ ক্ষোভে বেদনায় বজ্রগর্ভ হয়ে উঠেছে :

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—'এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥'[৩০]

এর সঙ্গে মনে পড়বে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের শেষাংশের কথা— যেখানে কবি দেখেছেন অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রার জ্যোতির্ময় পথ। এইখানেই তিনি টলস্টয়ের উত্তরসূরী, রোমা রোলাঁর আত্মার আত্মীয়।

---

২৯ *Rolland and Tagore*, p 22.

৩০ 'জন্মদিন,' সেঁজুতি।

ডি. এইচ. লরেন্সের একটি কবিতা

নলিনীকান্ত গুপ্ত

ডি. এইচ. লরেন্স একজন নামকরা ইংরেজ লেখক— নামকরা বটে, কিন্তু সুনামের চেয়ে হয়তো দুর্নামই তাঁর বেশি। সুনাম এইজন্য যে তিনি একজন সত্যকার স্রষ্টা— বিষয়ের দিক দিয়ে, ভাষার দিক দিয়ে, ভঙ্গির দিক দিয়ে, অভিনব জীবন্ত। কাব্যদেবী যখন প্রাচীন পূর্বতন ফ্রেমের মধ্যে আটকা পড়ে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন তখন যে-কয়জন মা-সরস্বতীর দুঃশীল দজ্জাল ছেলে সব ভেঙে-চুরে বের হয়ে পড়েছিল বাহিরের ঝাড়-জঙ্গল ভেদ করে নূতন গোঠ-মাঠের জন্য— তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রধান ; নূতন দৃষ্টি দিয়ে নূতন অনুভূতি দিয়ে মানুষকে জগতকে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে অদৃশ্য গোপন কি মহিমা, কি রহস্য রয়েছে। এই দিক দিয়ে এল তাঁর দুর্নাম আবার। তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন— তাঁর সতীর্থ বহুজনের মতো সে যুগে— মানুষের অবচেতনার কথা, তার ক্লেদাক্ত অন্ত্যজ বৃত্তির কথা। প্রেমের মধ্যে এনে দিলেন একান্ত শারীরিক বৃত্তি কেবল নয়, বিকৃতি ; আদিরসের ভিয়ান তো দিলেনই, তাতে মিশিয়ে দিলেন আধুনিক মানুষের স্থূল আঁধার-বিলাসী ঔৎসুক্য ও কুটিলতা।

তবুও যা হোক পৃথিবীর তলা খুঁড়তে খুঁড়তে এ কবি মাটি ভেদ করে চলে গিয়েছেন যেন ওপারে, পৃথিবীর ও-পিঠে পৌঁচেছেন গিয়ে আবার এক আকাশে বাতাসে আলোয়। লরেন্স কি ধরণের আলো-আকাশ নিয়ে এলেন তার পরিচয় পাব আমরা আজ যে কবিতার উল্লেখ করছি তার মধ্যে। কবিতার বিষয়টি এই—

মা আমাদের বহুবার বলেছেন এই দেহটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না, পৃথিবীর উপরে এটা হল আমাদের দুর্গ। জগতে জীবনে দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় হতাশায় পড়ে আমরা এসব হতে মুক্তির জন্যে অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা করি মৃত্যু ; বিশ্বাস, দেহটাই নষ্টের গোড়া, দেহটাকে কোনো রকমে ফেলে দিলে ছেড়ে গেলে অমনিই পেয়ে যাব আমরা স্বস্তি শান্তি তৃপ্তি। মা বলছেন, এই ধারণার মতো বড় ভুল আর কিছু নাই। দেহটা গেলেই যে আসবে শান্তি তা মোটেও নয়, আসে অন্যরকম জিনিস। দেহ-বিচ্যুতির পরে প্রায়ই আসে যত বিভীষিকা। দেহের ওপারে রয়েছে লোক-সব, জগৎ-সব, সেখানেও আমরা নিয়ে চলি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সব, আরো বহুগুণ অধিকমাত্রায়।

এ জীবনেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আমাদের তো প্রায়ই এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়, যাকে বলে 'বোবায়-পাওয়া' 'নিশিতে পাওয়া' ; কত রকম শত্রুর আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত নিরুপায় হয়ে পড়ি তখন আমরা। এসব আর কিছু নয় শরীরের বাইরে দুর্গ ছেড়ে খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। তখন একমাত্র উপায় চিৎকার করে কি জোরে ঝাঁকানি দিয়ে জেগে ওঠা অর্থাৎ ফিরে আবার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়া ; নতুবা শরীরের সঙ্গে বন্ধনসূত্রটি যদি ছিঁড়ে যায় তবে অশরীরী প্রেত হয়ে ভুত হয়ে বিচরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তখনই চেষ্টা হয় শরীরী মানুষের মধ্যে প্রবেশ করবার বা ভর করার অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করবার। এর উদাহরণ আমরা যথেষ্ট পেয়ে থাকি।

ইতালীয় কবি দান্তে এ সম্বন্ধে বড় সুন্দর— এবং বিভীষণ— চিত্র দিয়েছেন, তাঁর সাক্ষাৎ অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা। জীবনের অর্ধপথ তিনি অতিক্রম করেছেন, হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন— এসে পড়েছেন একটা ঘনঘোর অরণ্যের মধ্যে, সোজা পথ কবে কোনো রকমে তাঁর হারিয়ে গেছে, অর্থাৎ তিনি এসে পড়েছেন জীবনের বাহিরে, দেহাতিরিক্ত জগতে। ক্রমে একে-একে তিনি দেখতে পেলেন কি যন্ত্রণাসব কতরকমের উৎপীড়নসব ভোগ করছে মানুষেরা— পৃথিবীর উপরে তাঁর পরিচিত নাম সব। এ জগতটিরই নাম হল নরক— নরকযন্ত্রণা ভোগ ততদিন— কারো চিরকাল— ততদিন যতদিন তাদের সুকর্ম যদি কিছু থেকে থাকে তাদের উদ্ধার করে না নিয়ে যায়। পরে তারা উঠে চলে শুদ্ধতর লোকে, সুকৃতির ফলে বা কারো করুণার বা সাহায্যের ফলে। শুদ্ধির লোক ছেড়ে আরো উঠে চলে যাওয়া যায় স্বর্গের দুয়ারে, স্বর্গের মধ্যে। সেখানেই ভগবানের সান্নিধ্যে মানুষের সার্থকতা।

লরেন্স বলছেন তাঁর মতো করে অনুরূপ কথা। মানুষ, মৃত্যুর আগে তৈরি হও, নিজেকে তৈরি করে রাখ, তবে বৈতরণী সুখে পার হবে, যাবে সুখের স্বস্তির জগতে। সব নির্ভর করে এই তৈরি হওয়ার উপর।

হেমন্তের গান গাই আমি, পড়ন্ত ফুলের গান গাই,
গাই গান দূরের পাল্লার, বিস্মৃতির পারে—

মৃত্যুর তরণী তুমি গড়েছ কি? গড়েছ কি?
না গড়ে থাক, গড় তা হলে মৃত্যুর তরণী
কাজে আসবে তোমার।
মানুষ নিজেকে শান্ত করে দিতে পারে কি
একখানা ছোরার ঘায়ে?
ছোরা দিয়ে, ছুরি দিয়ে, গুলি দিয়ে
মানুষ তার দেহে একটা ক্ষত করে দিতে পারে
তার জীবনের নিষ্ক্রমণের জন্য—
কিন্তু তাকে বলে কি শান্তি, বল না, তাই কি শান্তি?

শান্তি হল দীর্ঘযাত্রার লক্ষ্য
দীর্ঘতম যাত্রা, বিস্মৃতির অভিমুখে।

অন্তরের জীবটিকে, অদৃশ্য বস্তুটিকে বের হয়ে আসতে দাও,
এখনও সে ঢাকা সকল রকম মানস-অনুভূতির সাদা চাদর দিয়ে—
এখনও তাকে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ঘন লাল অদৃশ্য আবরণের মধ্যে
শরীরের এখনও মৃত্যুমুখী স্মৃতিরাজির তলে।

ভীত নিঃসঙ্গ জীব তার ঘর থেকে বের হয়ে এল,
কিংবা ঠেলে তাকে বের করে দেওয়া হল,

দেখে সে একা, জনাকীর্ণ সীমান্তে এক,
জগতের জীবনধারায়।

বলি তোমায় আবার সহজ নয়, অত সহজ নয়,
ধীরে উঠে চলা সুদীর্ঘ এই, দীর্ঘতম এই যাত্রার পথে

সহজ বরং দেহের এই রুপালি শহর থেকে
ঠেলে বের করে দেওয়া
দেহের দেয়ালে যে কোনো একটা ছ্যাদার ভেতর দিয়ে ;
জোর করে বের করে দেওয়া ওই ছায়াপথ
ধূসর, ধূসর সৈকতের উপর ;
জীবনধারা এই সুদীর্ঘ সীমানা ধরে ধরে চলে,
রয়েছে যেখানে দলে দলে ভিড় করে যত
ভ্রষ্ট ভ্রান্ত জীব
সেই মাঝখানের জগতে, আমাদের এই কঠিন দুর্গ
আর ঐ ওপারের সচঞ্চল সাগরের মাঝে।

তৈরি করো, তৈরি করো, মৃত্যুর তরণী
তৈরি করে ফেল সময় থাকতে,
তৈরি কর আদরে ভরে দিয়ে, তোমার অন্তরের
দুটি হাত দিয়ে, সযত্নে।

দিনের প্রাচীর-ঘেরা রুপালি জীবনের তোরণ ছেড়ে
একবার যদি বাহিরে এসে দাঁড়াও,
একবার যখন বাহিরে ধূসর সিক্ত সৈকতের উপরে,
ভ্রষ্ট জীব-আত্মারা কেঁদে বেড়ায়, রোদন করে যেখানে—
লক্ষ লক্ষ তারা, রওনা তারা দিতে পারে না,
নৌকা তাদের নেই, ঐ যে গভীরতম দীর্ঘতম সাগর
তরঙ্গসঙ্কুল শব্দবিহীন
তার উপর ভাসিয়ে দিতে
একবার তোরণের বাহিরে যখন
কি করবে তখন, তোমার অন্তর-আত্মার জন্যে
তরণী নাই যখন—

মৃতেরা যারা মরে গেছে, তাদের জন্যে অশ্রু ফেলো,
তারা আর যাত্রা শুরু করতে পারে না ;
তারা কেঁদে বেড়ায় আর বৃথাই দরজায় আঘাত করে
আমাদের এই আত্মসার জীবন-ক্ষেত্রের, রুপালি অনড়
দেয়ালের উপর ।

তারা কেঁদে বেড়ায়, দরজায় তারা আঘাত করে, তারা দাঁতে দাঁত ঘষে ;
তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ;
নূতন জীব-আত্মারা বাহিরে চলে আসছে যারা, ক্ষিপ্তের মতো
তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নিক্ষেপ করে
ক্রোধের বাণ, ব্যর্থতার গুলিগোলা,
এই আমাদের জীবনধারার প্রস্তর-নিথর দেয়ালের উপর দিয়ে—
যদিও তা একান্ত অজেয় নয় ।

অশ্রু ফেলো, অশ্রু ফেলো, ঐ-সব আর্ত মৃতের জন্যে ;
জীবন থেকে যাদের বহিষ্কৃত করা হয়েছে,
যারা শুধু ভিড় করে থাকে এই দুস্তর বীভৎস সীমানা সৈকতের উপর ;
বসে থাকে, শুধু বসে থাকে, যতদিন না অবশেষে এসে যায়
পুরানো মাঝি তার পুরানো ডিঙিখানা নিয়ে,
নিয়ে যায় দূরে, সুদূরে ; বিস্মৃতির মহান্ অন্তে ।

অশ্রু ফেলো, অশ্রু ফেলো বেচারি বিশীর্ণ মৃতদের জন্যে
যারা আর মরতে পারে না—
দূরে, নিলীয়মান দাঁড় বেয়ে বেয়ে—
না, তাদের কেবলই ঘুরতে হবে রাস্তায় কুকুরের মতো
জীবনক্ষেত্রের সীমানা ধরে ধরে ।
তাদের কথা ভেবো একবার, অন্তরের সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে,
পৌঁছে দিয়ো তাদের কাছে কাছে তরণের নৌকা ।

কিন্তু আমি, আমার জন্যে, আমার অন্তর-আত্মার জন্যে
তৈরি করব ছোট্ট একখানা নৌকো, তার দাঁড় থাকবে, থাকবে আহার,
থাকবে ছোট্ট থালাক'টি আর বস্ত্র যা-কিছু প্রয়োজন, পরিচ্ছিন্ন, প্রস্তুত—
পথযাত্রী জীবের জন্যে ।

সেটিকে উৎসর্গ করব শিহরিত অন্তর-আত্মার দুটি হাত দিয়ে—
সময় এলে, শেষ দুয়ার যখন বন্ধ হয়ে যাবে পিছনে,
সে ধীরে নেমে পড়বে অদৃশ্য সব তীর বেয়ে—
একদিকে তার অর্ধদৃশ্যমান জনতারাজি,
অন্যদিকে চলে গিয়েছে দূরতম দীর্ঘতম সাগর এক,
পৌঁচেছে গিয়ে আমাদের জীবনের শেষ সীমানায়—
পলক-চঞ্চল, অনিচ্ছা-বিহ্বল তরঙ্গমালা যেখানে।

ছোট তরীখানি সে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে,
নিজের চারদিকে ঘিরে রয়েছে দেহের স্মৃতি-মণ্ডিত
ঘোর লাল চাদর একখানা—
ক্ষুদ্র, তনুগাত্র আত্মা-পুরুষটি বসে রয়েছে,
চলেছে সবেগে, ধরে আছে দাঁড়—
চলেছে, চলেছে, চলেছে দূরে অন্ধকার গভীরের দিকে,
সম্মুখে, তলহীন গভীরে— দূরে দূরে— এই যে ধূসর বেলাভূমি
তার ছায়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে জগতের সমস্ত জীবনক্ষেত্র,
তা থেকে বহুদূরে।

সাগরের উপর দিয়ে, দূরতম সাগর যে তারও উপর দিয়ে
দীর্ঘতম যাত্রাপথে ছায়ায়-গড়া পাহাড়ের বন্ধুর গাত্রের পাশ দিয়ে
আর্তস্মৃতির নেপথ্যচারী অষ্টভুজের পাশ দিয়ে
স্মৃতিলাঞ্ছিত লালসার অদ্ভুত সব ঘূর্ণির পাশ দিয়ে
সারা জীবনব্যাপী মিথ্যাচারের মৃত আগাছা সব পার হয়ে
ধীরে ধীরে অন্তর-আত্মা আমার তার ছোট্ট তরণীটি বেয়ে
শব্দহীন সাগরের মধ্যে সবচেয়ে শব্দহীন যে সাগর
তার উপর দিয়ে দীর্ঘতম যাত্রা শুরু করেছে যে!

সারা জীবনব্যাপী দুঃসাহসের দীর্ঘ দাঁড় টেনে টেনে,
ছোট্ট একটি পাত্র থেকে আস্থাময় জল পান করে,
স্বস্তিকর জ্ঞানের ভরসা ভরা এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে
বেয়ে চলো, হে আমার অন্তর-আত্মা, বেয়ে চলো,
দীর্ঘতম যাত্রাপথে মহত্তম লক্ষ্য অভিমুখে।

ঋজু নয়, কুটিলও নয়, এখানেও নয়, সেখানেও নয়,
ছায়া রয়েছে ভাঁজ করা গভীরতর ছায়ার উপরে,
আরো গভীরে, কেবল বিস্মৃতি-গড়া মর্মতলে,
ছায়াময় ঝিনুকের গায়ে আলপনার মতো
আরো গভীরে, জঠরের মধ্যে কুণ্ডলীর মণ্ডলীর মতো।

ভেসে চলো, ভেসে চলো হে অন্তর-আত্মা আমার, সেইদিকে
যেখানে রয়েছে শুদ্ধতম ঘোরতম বিস্মৃতি।
অন্তিমের পূর্ববর্তী তোরণে, ঘোর লাল চাদরখানি,
শরীরের স্মৃতি-ভরা, খসে পড়ে, মিশে যায়
ঝিনুকের মতো, কুণ্ডলিত জঠরের মতো, কুণ্ডলিত বলয়িত ছায়ার অন্তরে।
তার পর জমাট আঁধারের বিপুল শেষ বাঁক ঘুরে,
যেখানে চেতনার অভিজ্ঞতা হারিয়ে ফেলেছে তার সীমার ঘের,
দাঁড়গুলি নৌকো ছেড়ে সরে গিয়েছে, ছোট্ট থালাগুলিও
গিয়েছে, গিয়েছে চলে, নৌকোটিও গলে যায় মুক্তার মতো—
যে মুহূর্তে অন্তর-আত্মা অবশেষে নিঃশেষ ডুবে যায় লক্ষ্যের মধ্যে যেখানে
পূর্ণ বিস্মৃতির, পরমা শান্তির মর্মস্থান
চরম শান্তির জঠর, জীবন্ত রাত্রির অন্তরে।

শান্তি, কি মধুর শান্তি, এই অন্তরাত্মা আমার আনন্দে
গলে যায় শান্তির রসস্রাবে
কি মধুর, কি মধুর মৃত্যুর এই শেষ বিদায়
বিশুদ্ধ বিস্মৃতির মধ্যে, দীর্ঘতম যাত্রার শেষপ্রান্তে।

শান্তি, পরিপূর্ণ শান্তি
কিন্তু এও কি নবসৃষ্টির সূচনা?

গড়ো তবে মৃত্যুর তরণী তোমার
গড়ো, গড়ো তবে
দীর্ঘতম যাত্রা ছাড়া কি চাই আর,
আর কিছুরই দরকার নেই।

উমর খইয়ামের 'নৌরূজ'-কাহিনী

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

রুবাইয়াৎ (বা চতুষ্পদী) লিখে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ফারসী কবি উমর খইয়াম আধুনিক সাহিত্য-জগতে খ্যাতিলাভ করেছেন; এবং তাও অনেকটা ইংরেজ কবি Fitz Geraldএর কল্যাণে। মধ্যযুগে তিনি বিশেষ করে গাণিতিক জ্যোতির্বিদ ও অজ্ঞেয়তাবাদী দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। আর তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করতে না পেরে অনেকে তাঁকে ভগবৎ-আস্তিত্বে আস্থাহীন ও 'মদ ও পেয়ালার কবি' বলতেও কার্পণ্য করেন নি। তেমনিভাবে আমাদের ভারতেও অবহেলিত হয়েছে বৌদ্ধ-'নির্বাণ' ও 'চার্বাক'-মতবাদ। বস্তুতঃ খইয়াম ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক ও কবি। কবি হিসেবে তিনি মধ্যযুগের অন্যান্য ফারসী সুফী কবিদের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহেন। প্রসিদ্ধ সুফী কবি হাফেজের ভাবধারা তাঁরই সগোত্রীয়। আবার, প্রসিদ্ধ ফির্দৌসীর মহাকাব্য শাহনামাতে যে মূলতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তাই খইয়ামের 'নৌরূজনামা' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে দেখতে পাই।

খইয়াম যেমন একজন শ্রেষ্ঠ সুফী দার্শনিক-কবি, তেমনি তিনি একজন প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্। প্রসিদ্ধ শহরজুরী তাঁর 'নুজহতুল্-আর্ওআহ:' (বা মহাত্মাদের বিনোদন-স্থান) নামক জীবনকাহিনীতে খইয়াম সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন আরবী ভাষাবিদ্ ও পবিত্র কোরানের সাত প্রকার ব্যাখ্যা তাঁর জ্ঞাত ছিল। কি মহৎ চরিত্রের নিদর্শন! মানুষের স্তরভেদে সুফী 'হফ্‌ৎ আলম', বৈদান্তিক সপ্তলোক বা যৌগিক ষট্‌চক্রে অবস্থিত মন (অর্থাৎ দেহে অবস্থিত আত্মা বা পুরুষ) কোরানের ন্যায় পবিত্র গ্রন্থাদির গূঢ় হতে গূঢ়তর অর্থের সঠিক অনুধাবন করতে পারে। তাই আমাদের ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও ব্রাহ্মণ (বা ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা)-দের এত শ্রদ্ধা ও সম্মান। মহৎ গ্রন্থের বিভিন্ন ব্যাখ্যার কথা আধুনিক যুগেও উল্লিখিত হয়েছে। Gustav E. Mueller তাঁর Philosophy of Literature-এ ইতালীয় কবি দান্তের Divine Comedy-কে উদ্দেশ্য করে মহৎ গ্রন্থের পাঁচ প্রকার ব্যাখ্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতা বা নাটক বিভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত হতে পারে। কবিবর নিজেও তাঁর 'পঞ্চভূত' নামক গ্রন্থে এর ইঙ্গিত দিয়েছেন। পঞ্চভূতের পাঁচটি বিশেষ চরিত্র তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী একই বিষয়ের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং 'মন' তাঁদের উপরে থেকে এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানা প্রবন্ধে বা চিঠিপত্রে সময় সময় তাঁর মনকে দ্রৌপদী (বা কৃষ্ণা)-র সহিত তুলনা করেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম যেন মহাভারতের পাঁচটি বিশেষ চরিত্র ও দ্রৌপদী তাঁদের আনন্দদায়িনী ইচ্ছাশক্তি। আবার, আধ্যাত্মিক-ভাবে এও বলা যেতে পারে যে, পুরুষ-রূপী কৃষ্ণ মহাভারতের ধর্মক্ষেত্র কুরু-(বা আত্ম-) ক্ষেত্রে সারথি হয়ে সর্ব আত্মদ্রোহের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। আর কবির জীবনের মহাভারতরূপ চলার পথে সেই অন্তর্যামী-পুরুষ 'জীবনদেবতা' বা 'রাজা' রূপে তাঁর নানা কাব্য ও নাটকে প্রকাশ পেয়েছে।

উমর খইয়ামের আরবী ও ফারসী এই উভয় ভাষায়ই গণিতশাস্ত্র দর্শনগ্রন্থ ও কাব্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ তার নিদর্শন পূর্বে বিশেষ পাওয়া যায় নি। এখন তাঁর

'নৌরূজ নামহ' সম্পাদিত হওয়ায় এদিকটার কথাও আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পারি। তবে তিনি সাধারণ ভাষাবিদ্‌দের ন্যায় শব্দাদির উৎপত্তি বা অর্থান্তর নিয়ে আলোচনা করেন নি। এখানে আমরা তাঁকে বৈদিক ভাষাবিদ্ যাস্ক-র সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তবে বৈদিক ভাষাবিদ্ একই শব্দ বা অক্ষরসমষ্টির বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন; আর আমাদের দার্শনিক-ভাষাবিদ্ একই প্রতীককে নানা প্রকারে আলোচনা করে সেই 'অক্ষর' বা পরম-প্রতীকের মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করেছেন।

'নৌরূজনামহ' কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: উপক্রমণিকা, নৌরূজের তথ্য ও তত্ত্বকথা, ইরানীয় রাজাদের আনন্দোৎসবের রীতিনীতি ও নৌরূজ-উৎসবে প্রধান পুরোহিতের সম্রাটকে নববর্ষের-উপঢৌকন হিসেবে মদসহ পাত্র, অঙ্গুরী, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা, নব কচিপত্রসহ অনঙ্কুরিত যব শস্য, তরবারি, তীর ও ধনু, মসিপাত্রসহ কলম, ঘোড়া, বাজ বা শ্যেন পাখি ও সুশ্রী সেবক (বা সেবিকা) প্রদান। নৌরূজ-ব্যাখ্যাতা তারপর একে একে প্রত্যেকটি উপঢৌকনের মর্মকথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

নৌরূজ বা নববর্ষের তারিখ নির্ধারণ সম্বন্ধে খইয়াম বলেন, "তাঁরা দেখলেন যে সূর্যের দুটি গতি— আহ্নিক ও বার্ষিক— এদের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে চতুর্থ বৎসরে আবার একই রাশিচক্রে সম্মিলিত হয়, কিন্তু এ মিলনের ব্যবধানে একটু কমতি দেখা যায়। জমশেদ এ ব্যবধান লক্ষ্য করে একে 'নৌরূজ' নাম দিলেন ও এ উপলক্ষে আনন্দোৎসব করেন।" ইরানীয় প্রথম সম্রাট গয়ুমর্ত সংবৎসরকে দিন ও মাসে ভাগ করে প্রত্যেকটি মাসের পৃথক নামকরণ করেন। তাঁর পরবর্তী সম্রাট হুশঙ নানা কারুকার্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই মতো সকল দৈত্য ও দানব- দমনকারী তহমুরতও শিল্পাদির বিশেষ উন্নতি করেন। পরবর্তী সম্রাট জম্‌শীদ্ তাঁর প্রথমজীবনে ছিলেন পরম দয়ালু, ভগবৎ-ভক্ত ও প্রজা-বৎসল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করায় প্রজারা হয় বিদ্রোহী, আর ভগবৎ-অনুগ্রহ হতে তিনি হন বিচ্যুত। ধহ্‌হাক্ নামে প্রসিদ্ধ বে-ওয়ারস্‌প্ তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তিনিও অত্যাচারী হয়ে উঠেন; আর জমশেদেরই বংশোদ্ভূত অফ্রীদূন তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অধিকার করেন। এবং এ বিজয়কে উপলক্ষ করে তিনি আনন্দোৎসব করেন। এই বিজয়া উৎসবই এখনো ইরানে ও তুরানে চলে আসছে। আর সূর্য ফরওর্দীনে (যেন অনেকটা আমাদের 'বিশাখা' নক্ষত্রের অনুরূপ) গমন করলে আবার তিনি নৌরূজ উৎসব করেন। তারপর প্রজাদের একত্র করে সকল সাম্রাজ্য তথা তুরস্ক রোম ও ইরান যথাক্রমে তাঁর তিন পুত্র তূর, সল্‌ম ও ঈরজকে ভাগ করে দেন।

পরবর্তীযুগে অফ্রীদূনেরই বংশধর গুশ্‌তস্‌পের রাজত্বকালে জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয় এবং তাঁর গত্রীধর্ম প্রচারিত হয়। গুশ্‌তস্‌প ও তাঁর পরবর্তী সব সম্রাটই নৌরূজ উৎসব পালন করেন। এই উৎসব যেমন পরবর্তী সম্রাট আলেকজেণ্ডার, তেমনি অর্দশীর বাবকান ও নৌশিন্‌রওয়ানও সম্পাদন করেন। এবং এই উৎসবই গতানুগতিকভাবে মধ্যযুগে খলিফা মামুন ও তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ পালন করে এসেছেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে খইয়াম 'নৌরূজ'কে ইরানীয়দের একটি গতানুগতিক শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে বর্ণনা করলেও, তাঁর বর্ণনার মাঝে মাঝে এমন-সব ইঙ্গিত রয়েছে যাতে মনে হয় তিনি যেন মানব-মনের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ধারাটি ইতিহাসাকারে বিবৃত করেছেন। আর এই নৌরূজ যেন বস্তুতঃ 'চিরনূতন' দিনের উৎসব— যাঁর কোনো আদি ও অন্ত নেই। মহাকবি ফির্দৌসীও উল্লিখিত সম্রাটদেরই গুণগরিমা ও যুদ্ধ-

বিগ্রহ তাঁর অমর কাব্য শাহনামায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের নৌরূজ উৎসবের আতিশয্য অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। খুস্‌রৌ পরবীজকে লক্ষ্য করে একস্থানে বলা হয়েছে, "তার সকল দিন (চির-) নূতন দিনে রূপান্তর লাভ করুক (হমহ রূজ্‌গারশ্‌ নৌরূজ্‌ বাদ্‌)"। আর নৌরূজনামায় ব্যক্ত হয়েছে, "তার পর জম্‌শেদ সেই স্মরণীয় দিনের উৎসব সম্পন্ন করে একে নৌরূজ নাম দিলেন এবং ফরওর্দীনের নব-দিনটিকে প্রতি বৎসর সমারোহে সম্পন্ন করতে প্রজাদের আদেশ দিলেন। তারা একে দীর্ঘকাল নৌরূজ বলেই জানবে যে পর্যন্ত না এ সত্য নৌরূজে রূপান্তর লাভ করে (···আঁ রূজে-নৌ দানন্দ্‌ তা আঁগাহ কি দৌরে-বুজুর্গ্‌ বাশদ্‌ কি নৌরূজে-হকীকৎ বুওদ।)।"

গয়ূমর্তকে কোরানের আদমের সহিত তুলনা করা হয়। গয়ূমর্ত (বা জীবচেতনাশক্তির রূপক) সৃষ্টি করেন বর্ষ ও মাসের বিভাগ। এবং প্রত্যেকটি ইরানীয় মাস ভারতীয় মাসসমূহের ন্যায় বেশ অর্থপূর্ণ। খইয়াম বলেন, "ফরওর্দীন্‌ মাহ পহলবী (ফ্রবর্তীন্‌ মাহ্‌>প্রা. পারসীক ফ্রবর্তিনাম্‌—ফ্রবর্তি শব্দের বহুবচন: তুলনীয় সং প্রবৃত্তি) হতে উদ্ভূত। এ মাসে উদ্ভিদাদি জন্মে; এ মাস বিশেষ করে মেষ রাশির জন্য নির্দিষ্ট এবং সারা মাস সূর্য এর মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

"অর্দিবিহিশ্‌ৎ মাহ (পহ্লবী উর্‌ৎ-বহিশ্‌ৎ>প্রা. পা. ঋতম্‌-বহিশ্‌তম্‌) এইজন্যে এরূপ কথিত হয় যে, এ সময়ে সারা পৃথিবী স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে। পহ্লবীতে উর্দ্‌ অর্থ সমতা বা সাদৃশ্য। এ সময়ে সূর্য তার গতিপথে বৃষ রাশিতে আবদ্ধ থাকে এবং সময়টি বসন্তকাল।

"খুর্দাদ্‌ মাহ (পহ্‌. হোর্দৎ>প্রা. পা. হৌর্বতাৎ>সং সর্বতাতি)—এ মাস গম, যব ও ফলাদি দ্বারা লোকেদের খাবার যোগায়। এবং সূর্য এ মাসে মিথুন রাশিতে আবদ্ধ থাকে।

"তীর্‌মাহ (অবেস্তা তিস্ত্রিয়)—এ মাস এইজন্যে এরূপ কথিত হয় যে, গম যব ও অন্যান্য শস্য তখন লোকেদের নিকট বিতরিত হয়। এ মাসে সূর্যের তীর প্রচণ্ডভাবে বর্ষিত হয়। এ সময়ে সূর্য কর্কট-রাশিতে আবদ্ধ থাকে ও তখন গ্রীষ্মকালের সূচনা হয়।

"মুর্দাদ্‌ মাহ (পহ অমুর্দাদ্‌, অবেস্তা অমেরেতাৎ)—এ মাসে সবজী ও পাকাফলের মাধ্যমে মাটি তার সকল সম্পদ বিলিয়ে দেয়, তাই সব কিছু পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ধূলায় সব দিক আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এ মাস গ্রীষ্মঋতুর অংশ বিশেষ এবং সূর্য তখন সিংহরাশিতে থাকে।

"শহরীওর্‌ মাহ (পহ শথরেবর্‌, অবে. ক্ষত্রেম্‌-বৈরিম্‌)—এ মাস এইজন্যে এরূপ কথিত হয় যে মিথ্যা ও অন্যায় এ সময়ে সংযমিত হয় অর্থাৎ সব-কিছু রাজশাসনে থাকে। প্রজাদের রাজাকে খাজনা দেওয়া সহজ হয়। তখন সূর্য কন্যা রাশিতে বর্তমান থাকে। এবং এ সময় গ্রীষ্মকালের শেষাংশ।

"মিহির্‌ মাহ (পহ মিতর্‌, প্রা পা মিথর্‌, সং মিত্র)—পরস্পর মিত্র ভাবাপন্ন থাকে বলে এ মাসকে এরূপ বলা হয়। শস্য, ফল ও অন্যান্য যে-সব সম্পদ উৎপন্ন হয় তা সকলে মিলে মিশে ভাগ করে খায়। এ সময়ে সূর্য তুলা রাশিতে অবস্থান করে। এ সময় শরৎকাল বা চাষ-আবাদের সময়।

"আবান্‌ মাহ (পহ আপান্‌—জল দেবতার নাম)—এ মাসে অত্যধিক বৃষ্টি হয় এবং চাষের জন্য লোকেরা এ জলের ব্যবহার করে। সূর্য এ সময়ে বৃশ্চিক রাশিতে থাকে।

"অধর্‌ মাহ—পহ্লবীতে অধর্‌ অর্থ অগ্নি। এ মাসে বায়ু বিশেষ আর্দ্র থাকে; আর তাই আগুনের দরকার হয়। এইজন্যে এ মাসকে আতিশ্‌ বা অগ্নি-মাস বলে। এ সময়ে সূর্য ধনুরাশিতে অবস্থান করে।

"দৈ মাহ— পহ্লবীতে দৈব্ বা দেব্ (সং দেব) অর্থ অসুর (প্রা. পা. অসুর অর্থে— অহুর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মজ্দা, ওরমুজ্দ্ বা শ্রেষ্ঠ পূজ্য দেবতা উক্ত হয়ে থাকে)। এই কারণে এ কালটি হয় নীরস ও পৃথিবী সুখ হতে নিবৃত্তি লাভ করে। সূর্য মকর রাশিতে অবস্থান করে ও এ সময়ে শীতের সূচনা হয়।

"বহমন্ মাহ (পহ বহুমন্, অবে. বহুমনহ অর্থাৎ সৎ মন বিশিষ্ট) পূর্ব মাসের ন্যায় একই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ দৈ-মাসের ন্যায় শুষ্ক ও শীতযুক্ত। সূর্যের দীপ্তি এ সময়ে শনি গ্রহের আশ্রয় লাভ করে— মীন ও কুর্ম রাশির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকে।

"ইস্‌কন্দারমধ্ মাহ (অবে স্পেন্ত অর্মৈতি)— এ মাস এরূপ উক্ত হবার কারণ ইস্‌কন্দ পহলবীতে ফল বুঝায়, অর্থাৎ সবজি ও ফল এ মাসে উৎপন্ন হতে আরম্ভ করে। সূর্যের গতি এ মাসে রাশিচক্রের শেষ মীন রাশিতে অবস্থান করে।"

সাধারণভাবে 'প্রকৃতি' প্রাণহীন মনে হলেও, ভারতীয় ঋষি, জরথুস্ত্র ধর্মাবলম্বী বা যে কোনো মহৎ ব্যক্তির নিকট বিশ্বচরাচরের সব-কিছুই যেন প্রাণময়। এঁরাই হলেন আরবী মলাইক্, ইরানীয় য়জ্দান্ বা আর্য দেবতা। আর এই দেবতাদেরই কেউ কেউ ইরানীয় মাস-সমূহের অধিকর্তা বলে উক্ত হয়েছেন। শাহনামায়ও দেখা যায় কৈখুস্‌রৌর স্বার্থে বীর রুস্তম যখন দৈব সাহায্যের প্রার্থনা করছেন, তখন এ-সকল দেবতাদের নিকটই তিনি তাঁর আবেদন জানাচ্ছেন।

বস্তুতঃ সকল দেবতাই সেই পরমাত্মার ইচ্ছাই নতশিরে পালন করে যাচ্ছে। কোনো বিরুদ্ধ শক্তি শয়তান, অহরিমন বা দানবরূপে যখন এই একক ইচ্ছায় বাধা দেয়, তখনই সংসার-চক্রের বিবর্তন হয়। আবার সেই বিরুদ্ধ শক্তির নিপাত হলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। সেই পরম-মিলনের অবস্থাকে আদমের স্বর্গীয় উদ্যানে অবস্থানের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এ যেন অনেকটা হিন্দুদের নারায়ণের বৈকুণ্ঠ-বাস বা হরগৌরীর কৈলাসে অবস্থান। কিন্তু সেই পরম অবস্থার কথা নানা উপমা বা ইঙ্গিত ছাড়া ব্যক্ত করার উপায় নেই। সেই মহা-মিলনের একমাত্র উপায় একক ভগবৎ-পথে চলা ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ (হমীনস্‌ৎ রয় হমীনস্‌ৎ রাহ; ব-য়জদান্ গিরায় ও ব-য়জদান্ পনাহ)। শাহনামায় কৈ-খুসরো যে পথের উপদেশ দিয়েছেন, মহাভারতের যুধিষ্ঠিরও সেই উপদেশই দিতেছেন, যথা ধর্ম তথা জয়। আর সেই উপদেশে চালিত হয়ে এমন একদিন আসবে, যখন আমাদের এই প্রতিদিনকার নূতন প্রভাত, সেই চির নূতন প্রভাতে রূপান্তর লাভ করবে। তাই খইয়াম তাঁর রুবাইয়াতে গেয়েছেন,

সূর্য তার আলোর পাশ আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে,
আর দিনের রাজা পেয়ালায় মদ ঢেলে দিয়েছে;
জাগ ও পান কর, কারণ প্রভাতের দূত হতে,
'পান কর'— এই বাণী চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

খুর্‌শীদ্ কমন্দে-সুবহ বর্ বাম্ অফ্‌গনদ্,
কৈখুস্‌রৌয়ে-রূজ্ বাদহ দর্ জাম্ অফ্‌গনদ্;
মৈ খুর্ কি মনাদিয়ে-সহরগহ খীজান্,
আওয়াজয়ে উশ্‌রুবু দর্ অইয়াম্ অফ্‌গনদ্।

এ যেন সর্বস্থানে প্রতি মুহূর্তে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সংকীর্ণমনা পেচক-দৃষ্টি সেই চির-দীপ্তিমান পরমাত্মার রশ্মি সহ্য করতে পারছে না। তাই খইয়াম অন্য একটি রুবায়ীতে গেয়েছেন,

আকাশ-বাতাস এখন খুশিতে ভরপুর রয়েছে,
আর সব প্রাণবান তার জন্যে অগ্রসর হয়েছে ;
প্রতি ডালে ডালে মুসার হস্ত ফুটে রয়েছে,
আর প্রতিক্ষণ ইসার নিশ্বাসে ভরপুর হয়েছে।

অকনূন্ কি জহান্‌রা বখুশী দস্‌ৎ-রস্ অস্‌ৎ,
হর্ জিন্দহ দিলে রা স্যুয়ে স্বহরা হবসীস্‌ৎ ;
দর্ হর্ শাখে ত্বুলুয়ে-মুসা দস্তীস্‌ৎ ;
দর্ হর্ নফ্‌সে খরূশে-ঈসা নফ্‌সীসৎ।

বস্তুতঃ এই পরম আনন্দময় স্বরূপটি লাভের জন্যই ইরানীয়দের নৌরূজ-উৎসবের আয়োজন। তাই প্রধান পুরোহিত (মৌবদে-মৌবদান্) সম্রাট (বা সেই অবস্থা লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি)-কে সম্বোধন করে বলছেন, "হে রাজন, ফর্‌ওর্দীন্ মাসের নৌরূজের দিনে তোমার দেবতাগণ ও প্রাচীন রাজাদের আশ্রয় করে নিজকে মুক্ত কর। সরূশ্ (অর্থাৎ দেবদূত, মহৎ উদ্দীপনা বা সুবুদ্ধি) তাঁর সৃষ্টি-রহস্য জানবার জন্য তোমাকে উপযুক্ত করুক ! সৎ-চরিত্র নিয়ে তুমি দীর্ঘায়ু হও ও স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করে সুখী হও। জম্‌শীদের পাত্র হতে মদ পান কর এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা -গুণে সমন্বিত তোমার পূর্ব পুরুষদের সদাচরণ ও তাঁদের মহৎ আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখ। তোমার বুদ্ধি হউক প্রাণবন্ত এবং যৌবন হউক যবের শীষের ন্যায়। তোমার অশ্বটি (অর্থাৎ কর্মশক্তি) হউক সফল ও বিজয়ী ; আর অসি হউক শক্রর বিরুদ্ধে দীপ্তিমান ও কার্যক্ষম। তোমার শ্যেন পাখিটি হউক শিকারী ও উদ্যমশীল এবং তোমার উদ্যম হউক তীরের ন্যায় সরল ও অভ্রান্ত, যাতে করে তুমি নূতন নূতন রাজ্য অধিকার করতে পার। রাজাসনের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আবশ্যক ; তোমার নিকট হবে কবির সৃষ্টি ও দার্শনিকের দর্শন মূল্যবান, আর মুদ্রাদি হেয়। তোমার প্রাসাদ হউক সুষ্ঠু, আর জীবন বৰ্দ্ধিষ্ণু।"

ঠিক এরূপ অনুভাবে ভাবিত হয়েই তাঁর একটি প্রার্থনার মর্মকথা রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখছেন, "মানুষের ছোটো আর বড়ো— দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেছে— সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো— সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর দুটি আবর্তন আছে— একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরছে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,— কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি ; এ ঘোরাতেই জানতে

পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি।··· এইজন্য ছোট-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করছে নমস্তেঽস্তু— বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই।"[১]

নৌরূজে সম্রাটকে প্রদত্ত প্রত্যেকটি অর্ঘ্যের তত্ত্বকথা বলবার স্থান এখানে নেই। তাহলেও দুচারটি উদাহরণ থেকেই এগুলির মর্মকথা অনুধাবন করা যাবে মনে হয়। তীর ও ধনু সম্বন্ধে নৌরূজনামায় বলা হয়েছে, "তীর-ধনু প্রয়োজনীয় অস্ত্রবিশেষ এবং এই অস্ত্র-শিক্ষা সংস্কৃতির নিদর্শন। পয়গাম্বর মহম্মদ বলেন, 'তোমরা ছেলেদের ধনুর্বিদ্যা ও সন্তরণবিদ্যা শিখাবে।'··· প্রথম যে ব্যক্তিটি তীর ও ধনু সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন গয়ুমর্ত!··· ধনুর্বিদ্যা রহরমগুরের রাজত্বকালে এরূপে পরিণত হয় যে তিনি ধনুকে অস্থি সহযোগে দৃঢ়বদ্ধ করলেন এবং তীরে চারটি পালক স্থাপন করলেন। এবং গাছের ছাল বা ধাতু দ্বারা আবৃত করায় তীরটি দেখতে অনেকটা আকাশের অংশবিশেষের রূপ ধারণ করে। আর এজন্যেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা চক্রবৎ আকাশের অংশবিশেষকে কুসী বা ধনু বলে অভিহিত করেছেন। আকাশের বিভিন্ন অংশে যে সকল সীমারেখা তৈরি হয়েছে তাদের অউতার বা জ্যা বলা সঙ্গতই হয়েছে। যখন কোনো একটি দৃশ্যমান সীমারেখা আকাশের অংশাদির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সমস্ত অক্ষাংশটিকে সিহাম্ বা তীর বলে অভিহিত করা হয়। এরূপ কথিত আছে যে, নক্ষত্রাদির প্রভাবে যে-সব ভালোমন্দ পৃথিবীতে নেমে আসে এবং ভগবৎ-আদেশ ও অদৃষ্টবশতঃ লোকের সহিত যুক্ত হয়, তারা সবই এ-সব অউতার ও কুসীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। ঠিক যেন প্রত্যেকটি দুর্ঘটনা ধনুর্ধারীর হস্তস্থিত তীর ও জ্যা হতে নিক্ষিপ্ত তীরের জন্যই ঘটেছে। ধনুর একদিকে আরোপিত হয়েছে মানুষের গড়নটি, তাতে রয়েছে শিরাদি, পা, হাড়, চামড়া ও কান; আর জ্যাটি যেন তার জীবন যাতে করে সে পেয়েছে তার অস্তিত্ব। কারণ, যতক্ষণ জ্যা ধনুর সহিত সংযুক্ত থাকে, তখনই ইহা জীবিত ও কার্যক্ষম; এবং এই কার্যক্ষমতা সে পেয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে।" তারপর গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন নানা প্রকার ধনুর কথা ও এদের বিশেষত্ব।

বাহ্যদৃষ্টিতে তীর ও ধনুর গুণ-কীর্তন হলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যাবে মানব-দেহটিই যেন ধনু, তীর তার কায়াদি এবং জ্যা তার প্রাণ। আরো অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করলে এও অনুভূত হবে যে, দেশ ও কালের উর্ধ্বে রয়েছে ধনু, তার জ্যাটি তাকে দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। এবং এই কারণেই সুফী কবিতায় বলা হয়ে থাকে ভগবান মানুষ হতে এক ধনুর তফাত। ভগবান আমাদের সকল কর্মের নিয়ন্তা এ কথা বলতে গিয়ে কি সুন্দরভাবে মৌলানা রূমী তাঁর মসনবীতে বলেছেন, "কোরানের আয়াৎটি ব্যাখ্যা করে এরূপে আবৃত্তি কর যে, ভগবান বলেছেন, 'যখন ছুঁড়ে ছিলে, তুমি ছুঁড় নি।' যদিও আমরাই তীর ছুঁড়ে থাকি, এ তাঁর হতেই নিক্ষিপ্ত। আমরা কেবল ধনু মাত্র, ধনুর্ধারী হলেন ভগবান।"

---

১. ভানুসিংহের পত্রাবলী, ২৯শে ভাদ্র ১৩২৫।

তু জে কুরান্ বাজ্ খান্ তফ্সীরে-বয়ৎ ;
গুফ্ৎ য়জদ্ মা রময়ত ইধ্ রময়ৎ।
গর্ ব-পর্নীম্ তীর আন্ নহ জে মা-স্ৎ ;
মা কমান্ ও তীরন্দাজশ্ খুদা-স্ৎ।

শ্রীমৎ গীতায়ও এমনিভাবেই বলা হয়েছে, "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।" অর্থাৎ যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন, সেখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে ইহাই আমার মত। বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্র রূপ ধর্মযুদ্ধে যখন ধনুর্ধারী জীবাত্মা ভগবৎ-বিরুদ্ধ কামবাসনার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, তখন পরমাত্মার সহিত সন্নিবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সারথিরূপে সততই তাকে রক্ষা করেন, যতক্ষণ না সে পরমাত্মাবোধ লাভ করে।

একই চিন্তাধারা একটু ঘুরিয়ে উপনিষদে বলা হয়েছে সেই পরমাত্মাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি বা সব প্রার্থনা-বীজ হল ধনু, আর জীবাত্মা তার তীর। যখন একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই কেবল লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে বা তোমাকে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করবে, তখন তীরের ন্যায় তাঁরই সহিত একত্র মিশে যাবে। অর্থাৎ অহরহ তাঁর অনুধ্যানের ফলে ক্রমে ক্রমে তুমি পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়ে যাবে।[২]

খইয়াম তীর ধনুর বিশেষত্ব ও এর গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনাকালীন কয়েকটি কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন। এদের একটিতে রয়েছে, "কথিত আছে নৌশীন্ রবান্ একদিন তাঁর একজন শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, 'অস্ত্রধারীদের মধ্যে কে সবচেয়ে সফলকাম?' তিনি উত্তর করলেন, 'তীর ও ধনুধারণকারী।' এ শুনে রাজা অতি আশ্চর্য হয়ে, এর তত্ত্বকথা শুনবার জন্য তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কেমন করে হয়, কারণ তারা তো (সাধারণ) মানুষ মাত্র?' তিনি বললেন, 'কারণ, তাদের সমস্ত দেহ এক-মন হয় ও তাদের সকল মন এক বাহুতে রূপান্তর লাভ করে। এটিই আবার ধনুতে পরিবর্তিত হয়, এবং ধনুটি তীরে। তারপর ইহা শত্রুর হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এর তত্ত্বকথা কি করে বুঝব?' তিনি উত্তর করলেন, 'কারণ, তাঁদের বাহুবলের ন্যায় মনও সমর্থ এবং তাঁদের জহ (বা পুরুষ-বীজ) উপযুক্ত ও ধনুর ন্যায় সবল এবং তাঁদের তীর শক্ত ও জিহ (বা জ্যা)-র ন্যায় নমনীয়। এরূপ অবস্থা হলেই মানুষ তার তীরকে শত্রুর হৃদয়মধ্যে দেখতে পায়।" আর যাস্ক বলেন, "'জি' (জয়লাভ করা) ধাতু হতে 'জ্যা' হয়েছে; অথবা তীরগুলিকে দ্রুত চালনা করতে সক্ষম বলেই জ্যা এরূপে অভিহিত।" এর অনুমোদনকারী উদ্ধৃত শ্লোকটি আরো মনোরম: যুদ্ধে জয়লাভ বা যুদ্ধদ্বারা আমাদের মুক্তির হেতু ধনুতে শায়িত তার প্রিয় বন্ধু জ্যা-কে আলিঙ্গন করে তীর যেন একটি গূঢ় রহস্য কানে কানে বলবার জন্য কানের নিকটে এসে মৃদুস্বরে স্ত্রীলোকের ন্যায় কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করে।"[৩]

সেই মহামিলন বা পরমাত্মাবোধ স্থানকালের উর্ধ্বে উঠতে পারলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তাকেই বলা হয়েছে চির-নূতন দিন। এই দৃশ্যমান জগৎ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়েই প্রকৃতিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

---

২. প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ —মুণ্ডক ২।২।৪

৩. নিরুক্ত, ৯; ১৭-১৮

এই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মানব-ও আরব বিজ্ঞানীদের মতে 'সপ্তপিতা' (অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলী) ও 'চারিমাতা' (বা পার্থিক উপাদান)-র ঔরসজাত বলা হয়ে থাকে। কাজেই সৃষ্টিরহস্য নব নব জন্ম ও মৃত্যুর মাধ্যমে আবহমান কাল থেকে কেবল পরিবর্তিতই হয়ে চলছে, যদিও এর মধ্যেও একটা স্থিতি ও সামঞ্জস্য আছে, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই দৃশ্যমান জগতের স্বরূপটি কি সুন্দরভাবে কবি খইয়াম তাঁর একটি চতুষ্পদীতে বলেছেন, "পৃথিবী নামে অভিহিত এই প্রাচীন 'রিবাৎ' (বা আস্তাবল যেখানে ঘোড়াকে ধর্মযুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করা হয়) সাদা ও কালো রঙে চিত্রিত সকাল ও সন্ধ্যার ক্ষণকালের আশ্রয়স্থল মাত্র। এটি একটি ভোজ-উৎসব যা শত শত জমশেদ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং একটি স্মৃতিচিহ্ন যেখানে শত শত বহরাম শায়িত।"

ইন্ কুহনহ রিবাৎ রা কি আলম্ নামস্ৎ,
আরাম্‌গহে-অব্‌লকে-সুবহ ও শামস্ৎ;
বুজ্‌মীস্ৎ কি উআমান্দয়ে-স্বদ্ জম্‌শীদস্ৎ,
গূরীস্ৎ কি তকিয়গাহে-স্বদ্ বহরামস্ৎ।

এই পৃথিবী 'জিহাদ' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের একটি স্থান মাত্র। এবং যে বাহনে চড়ে এই ধর্মযুদ্ধে জয়ী হতে হবে তা হলো ইন্দ্রিয়াদি—তা মানসিকই হউক বা আত্মিকই হউক। যেমন হজরৎ মহম্মদ তাঁর বুরাক্ মাধ্যম আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তেমনি উপনিষদে ঘোড়াকে ইন্দ্রিয়াদির সহিত তুলনা করে (ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ) বলা হয়েছে যে তাদের চলার পথ হল পার্থিব বিষয়সমূহ (কঠ ১।৩।৪) আবেস্তায় সূর্যের প্রতিরূপ হ্বরে (বৈদিক স্বর্—যা হতে সূর্যর উৎপত্তি) অর্থে বুঝায় সূর্যের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ার অধিকারী এবং একে অহুরামজদার চক্ষু বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪]

ঘোড়ার অন্তর্নিহিত অর্থ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান আত্মার বাহন বা 'মরকব্' এবং এর দ্বারা দৈনন্দিন কার্য সাধন করে অবশেষে জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে। যেমন অশ্বারোহীর চাই অশ্ব, তেমনি নিজকে প্রকাশ করার জন্য আত্মার দরকার একটি বাহন। ঠিক তেমনিভাবে সূর্য তার দিন ও রাত্রি রূপ ঘোড়ার সাহায্যে যথাকর্তব্য সাধন করে যাচ্ছে। শাহনামা কাব্যেও ঘোড়ার মধ্যে এই অর্থটি নিহিত আছে। ওই মহাকাব্যের প্রধান বীর রুস্তমের ঘোড়ার নাম 'রখ্‌শ্'। 'রখ্‌শ্' অর্থে বুঝায় শ্বেত ও রক্ত বর্ণের সমাহার অর্থাৎ দিনরাত্রি বা ভালোমন্দের মেলন—আলোর প্রতিবিম্ব অর্থও হতে পারে। রখ্‌শ্ যেন বীর রুস্তমের জন্যই নির্দিষ্ট। এবং এই ইঙ্গিতটি মহাবীর রুস্তম যখন তাঁর 'মরকব্'-কে প্রথম বাছাই করতে যাচ্ছেন, তখনই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। রুস্তমেরও অর্থ 'আমি সফল হই'। অর্থাৎ রুস্তমের ন্যায় 'সুরথ'-গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ।

যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বলেছেন, "সব কিছুই আর্দ্রতা ও উষ্ণতা দ্বারা অতিক্রম করতে পারে বলেই 'অশ্বিন্' (অস্ ধাতু হতে সম্পন্ন) এরূপে অভিহিত হয়। অশ্ব-অধিকারী বলেই তাঁরা অশ্বিন্ নামে অভিহিত।… কারো কারো মতে অশ্বিন্ অর্থে স্বর্গ ও পৃথিবী, অন্যমতে দিন ও রাত্রি। কেউ কেউ তাঁদের সূর্য ও চন্দ্র বলে মানেন; আবার ঐতিহাসিকদের মতে তাঁরা দুজন ধার্মিক রাজা মাত্র (অধ্যায় ১২; ১)।" নৌরূজনামায়ও

৪. তুলনীয় ম্যাক্‌ডনেল কৃত *Vedic Mythology*, পৃ ৩১

ঘোড়ার বিশিষ্টতা এরূপেই বর্ণিত হয়েছে। "পয়গামবর মহম্মদ বলেন 'ঘোড়ার কেশগুচ্ছের সহিত তার মহত্ত্ব জড়িত রয়েছে।' এবং পারসিকগণ ঘোড়াকে প্রাণবায়ু (বাদে-জান), রোমীয়গণ দ্রুতপদ বিশিষ্ট (বাদ্-পায়) তুরস্কবাসী বাসনায় বিচরণকারী (গাম্জনে-কাম্), হিন্দুগণ উড়ন্ত রাজাসন (তখ্তে-পর্‌রান্) এবং আরবীয়গণ একে পৃথিবীর বুরাক্ বলে অভিহিত করেন। কথিত আছে, যে ফেরেস্তা বা দেবদূত সূর্যের রথ টানে তাকে ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট 'অলুদ্' (অর্থাৎ প্রেমপ্রবণ বা রাগ-দৃষ্টি) বলা হয়। ঘোড়া সম্বন্ধে পুরাকালের মহান ব্যক্তিরা অনেক কথাই বলেছেন। কথিত আছে, মহান সুলেমানকে একটি ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ যে আমার আদেশ পালন করবার জন্য তিনি আমাকে দুটি 'বায়ু' (বাদ্) দিয়েছেন, একটি প্রাণবিশিষ্ট ও অন্যটি প্রাণহীন যাতে একটি দ্বারা পৃথিবীতে ও অন্যটি দ্বারা আকাশে বিচরণ করতে পারি।'...(কাহিনী) তারা খুস্‌রৌ পরবীজের সামনে তাঁর শব্‌দীজ্ নামে ঘোড়াটি চড়বার জন্য নিয়ে এলে, তিনি বললেন, 'যদি মানুষ হতে আর কেউ তাঁর সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ থাকত, তাহলে ভগবান এই পৃথিবী আমাদের জন্য সৃষ্টি করতেন না। আর চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া হতে আর কিছু যদি উৎকৃষ্ট হত, তাহলে তিনি এটা আমাদের চড়বার জন্য নির্দিষ্ট করতেন না।'...এবং অফ্রাসিয়াব বলেন, 'আকাশে যেমন চন্দ্র, তেমনি রাজাদের জন্য ঘোড়া নির্দিষ্ট হয়েছে।'...আর নুমান্ মন্‌ধির বলেন, 'রাতের (অন্ধকারে) ঘোড়া দুর্গ বিশেষ। যদি ঘোড়া না থাকত, তাহলে শুজাঅৎ (অর্থাৎ বীরত্ব) কিরূপে শুজা (অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয়) শব্দের সমার্থক হত?' আবার, নম্বর্ বিন সৈয়ার্ বলেছেন, 'ঘোড়া হল যুদ্ধরথ, এবং অস্ত্রগুলি (যেন পূজার) ফুল। এর হ্রেসারব যুদ্ধসংগীত; আর এর নিশ্বাস মদের মাদকতা নিয়ে আসে।' তারপর খইয়াম নানা প্রকার ঘোড়ার বর্ণনা সহ, এদের বিশেষত্বও কতকটা প্রকাশ করেছেন—এগুলিও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ।

নৌরূজনামার শেষ অধ্যায়ে 'মুখশ্রী' বা সৌন্দর্যতত্ত্ব' (খাস্বিয়তে-রূয়ে নিকু) প্রবন্ধটি সবচেয়ে উপাদেয় হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারী খইয়ামের লেখনী এখানে সার্থক হয়েছে। রুবাইয়াতের কবি যে প্রকৃতই সত্য প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রকাশেই উদ্বুদ্ধ তা তার 'সুন্দর মুখ' (রূয়েনিকু) অধ্যায়টি পড়লেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'মুখশ্রী' অধ্যায়েও খইয়াম অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় প্রথমে সুন্দর মুখের বর্ণনা করেছেন; এবং পরে কয়েকটি কাহিনীদ্বারা এর তত্ত্বটি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। "জ্ঞানীগণ 'সুন্দর মুখ'-লাভকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। এবং সুন্দর মুখের দৃষ্টিপাতকে তাঁরা একটি সুলক্ষণ বলে গ্রহণ করেছেন। এরূপ কথিত হয় যে, শুভদৃষ্টির সৌভাগ্য আকাশের শুভনক্ষত্রাদির ন্যায় মানুষের উপর ফলদায়ক হয়। একটি সুবাস বসনের সহিত একে উপমিত করা হয়, যদিও এর সুগন্ধটি রয়েছে আতরের সিন্দুকে। ঠিক তেমনিভাবে জলে পতিত সূর্যের প্রতিবিম্বের সহিত এর উপমা দেওয়া হয়—এই দূরবর্তী স্থানে সূর্য না থাকলেও তাঁর প্রতিবিম্বটি ছড়িয়ে রয়েছে। কারণ শুভনক্ষত্রের প্রভাববশতঃ সুন্দর চেহারার এমন একটি উৎকর্ষ আছে, যা ভগবৎ-নির্দেশে মানুষের সহিত যুক্ত হয়েছে।"...ইত্যাদি।

"কাহিনী: কথিত আছে, একদিন সুলতান মহমুদ শহরপ্রান্ত হতে অবসর-বিনোদনের পর শহরে ফিরছেন। তিনি তখন যুবরাজ এবং তাঁর পিতা জীবিত আছেন। শহরে ঢুকবার মুখে তাঁর দৃষ্টি দর্শনার্থীদের মধ্যে একটি বালকের উপর পড়ে। ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বালকটির বয়স মাত্র বার। কিন্তু

তার মুখশ্রী অতি সুন্দর, এবং দেখতে অতি মনোহর। তার আকার যেমন সুগঠন, তেমনি সুসমঞ্জস। ঘোড়ার লাগাম টেনে, ওই ছোট বালকটিকে তাঁর নিকট আনতে আদেশ করলেন। শিশুটিকে আনা হলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে এবং তোমার বাবার নাম কি?' বালকটি উত্তর দেয়, 'আমার বাবা নেই; আমার মা অমুক রাস্তায় ভিক্ষায় বসে।'— 'তুমি কি কর?'— 'আমি কোরান মুখস্থ করি।' তাকে তখন রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসবার জন্য যুবরাজ আদেশ করলেন।

"মহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেই ছেলেটিকে ডেকে আনলেন ও তার সমস্ত খোঁজ নিলেন। তাকে একটা কাজ করতে দেওয়া হল এবং সে অতি বুদ্ধিমান ও মেধাবী বলে পরিচিত হয়। বস্তুতঃ ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন। তার মাকে ডেকে এনে সুলতান বললেন, 'আমি তোমার ছেলেকে গ্রহণ করেছি। আমিই ওকে লালন-পালন করব; তুমি ওর আশা ছেড়ে দাও।' মাকে অনেক টাকাপয়সা দিয়ে বিদায় করে, তার ছেলেকে দামী পোশাকে সুসজ্জিত করা হয়। শিক্ষক নিযুক্ত করে তাকে লেখাপড়া, অস্ত্রচালনা, ঘোড়াচড়া প্রভৃতি শিখান হল। তখন তিনি ছেলেটিকে বললেন, 'প্রতিদিন ভোরে আমি দরবারে বসবার পূর্বে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।'…তার সুলক্ষণ দৃষ্টিপাতের জন্য সম্রাটের প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য সফল হতে লাগল।…

"কিন্তু একদিন যখন সিংহাসনে বসে আছেন, একটি ওজরসহ কিছু দেরিতে এসে সে তাঁর সামনে দাঁড়াল। সুলতান তার এই ব্যবহারে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। এবং অতি রাগান্বিত হয়ে তাকে বললেন, 'সাবধান, আর যেন এমন না হয়। নিজের দিকে একবার তাকাও। তোমার কি মনে আছে, কি অবস্থা হতে তোমাতে এত মর্যাদা দিয়েছি? আর তোমার এখন এমন সাহস যে তুমি আমার সম্মুখ হতে দূরে থাক!' সম্রাট চুপ করলে যুবকটি উত্তর করলেন, 'আপনি যা বলেছেন, সবই ঠিক। আমার ন্যায় এ সামান্য ব্যক্তিকে আপনি মাটি হতে কুড়িয়ে আকাশে তুলে ধরেছেন। আমি ছিলাম নিঃস্ব; আর আপনার অনুগ্রহে আমি এখন পাঁচ শ হাজার দিনারের অধিক সম্পদের মালিক। তা ছাড়াও আমার কোনো পোষ্য বা চাকরাদির খরচা নেই। আপনি আমাকে এরূপ সম্মান দিয়েছেন যে আপনার রাজ্যের আর কোনো ব্যক্তির এরূপ মর্যাদা নেই। আর এ-সব অনুগ্রহ, সম্পদ ও মর্যাদা দিয়েও আপনি আমাকে কোনো কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন নি। কিন্তু আপনি যে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন এবং আমাকে এরূপ গভীরভাবে ভালোবাসেন, তার দুটি কারণ রয়েছে: প্রথমটি হল, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির দৃষ্টিপাতকে আপনি একটি শুভ-লক্ষণ বলে মনে করেন। আর দ্বিতীয় কারণ, আমি আপনার হৃদয়ের সুখ-শান্তির প্রান্তর ও ফলফুলে সমৃদ্ধ উদ্যানস্বরূপ। সম্রাট যদি তাঁর প্রান্তর বা উদ্যানটি সুসজ্জিত করেন, এর জন্যে আর কাউকে দায়ি করা উচিত নয়, যদিও আমি তাঁকে (আমার যথাকর্তব্য) কৃতজ্ঞতা দেখাই ও সুখ্যাতি করি।' সম্রাট তার উত্তর শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর আদর-মর্যাদা এইসঙ্গে আরো বেড়ে গেল।"

খইয়াম তাঁর একটি চতুষ্পদীতেও গেয়েছেন,

বলেন প্রতিমা তার পূজারীকে 'হে ভক্ত আমার,
জান কি তুমি কী হেতু উপাসক হয়েছ আমার?

তোমারি দীপ্তি যবে হয় প্রতিফলিত আমায়,
তোমা হতেই সে দৃষ্টি পড়ে, হে সাক্ষী আমার !'

বুৎ গুফ্‌ৎ কি বুৎ-পরস্‌ৎ কায়ে আবিদে-মা ;
দানী জে চিহ্ রূয়ে গুশ্‌তয়ি সাজিদে-মা।
বর্ মা বজমাল্ খুদ্ তজল্লী কর্দ-অস্‌ৎ ;
আন্ কস্ কি জ-তুস্‌ৎ নাজির্ অয় শাহিদে-মা।

আদর্শরূপটি যখন নিজের হৃদয়-রূপ আয়নায় প্রতিফলিত হয় তখনই তাঁকে সঠিক জানা যায়। পরমাত্মার স্বরূপটিই অনুভূতিদ্বারা নিজে হৃদয়ঙ্গম করা চাই— তার জন্যই যত সাধনা, যত উত্তম। প্রেমের মাধ্যম এই অনুভূতির প্রকাশ যেমন বৈষ্ণব কবিতা বা শাস্ত্রাদিতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুফী সাহিত্য বা দর্শনে। এই ভাবধারাটিই অতি সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে বিখ্যাত সুফী কবি আত্তারের মুন্‌তিকুৎ-তুয়র্ (বা পাখিদের আলোচনা) নামক কাব্যগ্রন্থে। অনেক খোঁজাখুঁজি বা সাধ্যসাধনার পর যখন ত্রিশটি পাখি তাদের রাজা 'সীমুর্গ' (অর্থাৎ ত্রিশটি পাখি)-এর দেখা পেল, তখন তারা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল যে তারা ও 'সীমুর্গ' বস্তুতঃ একই।

চুন্ নিগাহ কর্দন্দ্ ঈন্ সীমুর্গ জুদ্ ;
বীশক্ ঈন্ সীমুর্গ আন্ সীমুর্গ বূদ্।

মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ ভগবানকে বাইরে খুঁজতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন তার সঠিক উপলব্ধি হয়, তখন সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যেই ভগবান অন্তর্নিহিত রয়েছেন।

প্রসিদ্ধ সুফী কবি মৌলানা রূমী নব-বধূ বা প্রেয়সীর প্রথম দৃষ্টিপাতটিকে ভগবৎ-উপলব্ধি (হাল্) ও তার সহিত নির্জন-মিলনকে 'অনন্ত মিলন' বা চির-পরমাত্মবোধ (মকাম্ বা নৌরুজে-হকীকৎ)-এর সহিত তুলনা করে কি সুন্দরভাবে গেয়েছেন—

হাল্ চুন্ জলওআস্‌ৎ জান্ জীবা 'অরূস্ ;
ও ঈন্ মকাম্ আন্ খলওৎ আমদ্ বা 'অরূস্।

খইয়াম যেমন ভগবানের শুভযোগটি পাবার আশায় তাঁর গ্রন্থটি 'মুখশ্রী' অধ্যায় দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, তেমনি তাঁরি অনুকরণে আমি আবার "মুবারক্ বাদ বর্ নবীসিন্দহ ও খ্বানন্দহ" (অর্থাৎ পরমাত্মজীবন লাভ করুক লেখক ও পাঠক উভয়ই) বলে আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করছি।

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। প্রথম খণ্ড ১৯৬৫। সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন -পক্ষে গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ৭। মূল্য পনের টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কয়েক বছর পূর্বে কবিগুরুর জীবন, সাধনা, সারস্বত স্বরূপ প্রভৃতি নিয়ে এদেশে এবং বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে— এখনও সে আলোচনা থেমে যায় নি। বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে শেক্‌সপীয়র-সমালোচনার মতো যদি দেশে-দেশে মননের কেন্দ্র স্থাপিত হয় তা হলেই তাঁর প্রতিভার যথোচিত মূল্যায়ন সম্ভব। রূপ ও রসের আবেদন হৃদয়ের কাছে, কিন্তু মননের বিশ্লেষণ-যন্ত্রে ফেলে যাচাই করা, মাপজোখ করা মননধর্মী মানুষের বুদ্ধিপ্রত্যয়গত চিরকালীন স্বভাব। তাই ইদানীং যাঁরা বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁরা রবীন্দ্রগবেষণাকে একটি সুদৃঢ় বস্তুভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সাহিত্যবিচারের অভিনব পথ খুলে দিয়েছেন। তারই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের সুচারু সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'র প্রথম খণ্ডে। আশা করা যায় এই বার্ষিক রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা রবীন্দ্র-গবেষকদের নূতন পথের সন্ধান দেবে।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসবের সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করার পর বিশ্বভারতীর তদানীন্তন আচার্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছানুসারে বিশ্বভারতী এই গবেষণা-পত্রিকা প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। পরে শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলে তাঁর উপর এই পত্রিকা প্রকাশের ভার অর্পিত হয়। 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' নামে সেই পত্রিকার প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বৎসরে একটি করে খণ্ড প্রকাশিত হবে, কর্তৃপক্ষের এইরূপ বাসনা।

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'র প্রথম খণ্ডটি হাতে পেয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী নৈষ্ঠিক পাঠক ও তথ্যসন্ধানী গবেষক— উভয়েই পুলকিত হবেন। বাস্তবিক, অনেক দিন থেকে এই ধরণের একখানি বার্ষিক পত্রের অভাব বোধ করছিলাম, যা "একান্তভাবে রবীন্দ্রবিষয়ক পত্রিকা" হবে, যাতে "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর বিচিত্র ও বহুমুখী সাধনা সম্পর্কে উন্নততর আলোচনা" এবং "বিশেষজ্ঞের লেখা নূতন তত্ত্বভূয়িষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা" (সম্পাদকীর মন্তব্য) প্রকাশিত হবে। বিচক্ষণ সম্পাদনায় প্রকাশিত বক্ষ্যমাণ 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' আমাদের চিত্ততলবাসী জিজ্ঞাসাকে প্রখর করে তুলবে, বহু প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে অপ্রত্যাশিতভাবে।

এই পত্রিকায় সুবিখ্যাত 'মালতী-পুঁথি', সম্পাদক-কৃত তার টীকা-টিপ্পনী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন প্রদত্ত পাণ্ডুলিপিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের গবেষণা-প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার' এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী' মুদ্রিত হয়েছে। পরিশেষে সম্পাদকের নিবেদনে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য সবিস্তারে এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, প্রকাশিতব্য রবীন্দ্রগবেষণার সূচীপত্র এবং 'মালতী-পুঁথি'র রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের কোনো কোনো রচনার সংযোগ-সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তাঁর বিবৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে— মোট আটটি উপশাখায় রবীন্দ্রগবেষণা নির্বাহ হবে :

১. কবিগুরুর অপ্রকাশিত রচনা ও চিঠিপত্র
২. সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা
৩. কবিগুরুর পাণ্ডুলিপির বিবরণ
৪. সাময়িক পত্র থেকে আহৃত তথ্য
৫. রচনাপঞ্জী
৬. রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রচিত সমালোচনা-গ্রন্থ পরিচয়
৭. রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র, কবির স্বহস্তাঙ্কিত অপ্রকাশিত চিত্র ও পূর্বপ্রকাশিত চিত্রের পুনর্মুদ্রণ
৮. স্বরলিপি ও গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ

এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞের মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ গবেষণা-প্রবন্ধও প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রথম আটটি উপবিভাগই হচ্ছে এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য।

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ 'মালতী-পুঁথি'র যথাযথ মুদ্রণ। এই পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসাহিত্যরসিক পাঠকমহলে প্রায়ই উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ) নামে একটি প্রবন্ধ, নানা সময়ে প্রকাশিত তাঁর আরও কয়েকটি আলোচনা এবং *Visva-Bharati News*এ (1943, February) প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ ভিন্ন এ বিষয়ে অনেকেই বিশেষ কোনো সংবাদ রাখেন না।

রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই শো পাণ্ডুলিপি আছে, তার মধ্যে বাংলা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় দু শো— বাকিগুলি ইংরেজিতে টাইপ-করা। এই বাংলা পাণ্ডুলিপিগুলি ভবিষ্যতে কালানুক্রমিক-ভাবে টীকা ও পরিচয় -সহ 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'য় প্রকাশিত হবে সম্পাদক তা আমাদের জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই "বাংলা পাণ্ডুলিপিগুলি রবীন্দ্রানুশীলনের পক্ষে মহামূল্য উপকরণরূপে গণ্য হবে" (সম্পাকদীয় মন্তব্য)। কারণ এতে কবিগুরুর বাল্য থেকে পরিণত বয়সের হাতের লেখার ক্রমিক বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে। কবি পাণ্ডুলিপিতে অনেক কাটাকুটি করেছেন— তার থেকেও মনঃপ্রকৃতির রহস্যসন্ধান সহজ হবে।

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত যে পাণ্ডুলিপিটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে, সেটিকে রবীন্দ্রসাহিত্যরসিকগণ 'মালতী-পুঁথি' বলে জানেন। পুঁথিটির নামকরণও কৌতূহলোদ্দীপক। রবীন্দ্রসদনে বাংলা পুঁথির তালিকায় 'মালতী পুঁথি'র ক্রমিক সংখ্যা ২৩১। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের তদানীন্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী মালতী সেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেনের হাত দিয়ে রবীন্দ্রসদনকে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোর বয়সের একখানি অতি পুরাতন জীর্ণ পাণ্ডুলিপি উপহার দেন। সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার *Visva-Bharati News*এ তার সংবাদও ঘোষিত হয়। তার কয়েক মাস পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৫০) একটি প্রবন্ধে এবং আরও দু-এক প্রসঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন।

শ্রীমতী মালতী সেন লাহোর-প্রবাসী ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রচর্চার অনুকূল হাওয়া বইত। তাঁর ভ্রাতা স্বর্গত সুধীন্দ্রকুমার সেনের রবীন্দ্র-গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের একখানি পাণ্ডুলিপিও ছিল। ১৯৩৬ সালের দিকে শ্রীমতী সেনেরা যখন লাহোর ত্যাগ করে যান, তখনই তাঁদের

দৃষ্টি পড়ে এই পাণ্ডুলিপির উপর। লাহোরে এটিকে পাওয়া গিয়েছিল বলে শ্রীমতী সেন এটিকে 'লাহোর-পুঁথি' নাম দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি এই পুঁথিটি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে দেন। রবীন্দ্রসদনে এটি স্থান পায় ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকে। কি করে এই মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপি শ্রীমতী মালতী সেনের পরিবারে ঠাঁই পেল তার রহস্য এখনও জানা যায় নি। পরে এটি শ্রীমতী সেনের নামানুসারে 'মালতী-পুঁথি' নামে পরিচিত হয়েছে।

এই ছোট বাঁধানো খাতায় মোট ৭৬ খানি পৃষ্ঠা আছে— রচনাগুলির সবই প্রায় কালিতে লেখা, কিছু কিছু পেন্সিলের লেখাও আছে। খাতাখানির এখন ভগ্নদশা। পৃষ্ঠাগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে, সেলাই খুলে গেছে, একদিকে শক্ত পিচবোর্ডের মলাট, অন্য দিকে মলাট নেই, তার সঙ্গে কয়েকখানি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যতগুলি পাণ্ডুলিপি আছে 'মালতী-পুঁথি' তার মধ্যে প্রাচীনতম। এর আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের দু'খানি কবিতার খাতার উল্লেখ পাই। একখানি নীলকাগজের খাতা, কোনো এক কর্মচারী সাত-আট বছরের বালক রবীন্দ্রনাথকে বেঁধে দিয়েছিলেন। সে খাতাটির কোনো সন্ধান নেই। "সেই নীল ফুলস্ক্যাপের খাতাটি লইয়া করুণাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না।"— জীবনস্মৃতি। অবশ্য বিলুপ্তিদেবীকে স্বয়ং বালক-কবিই সাহায্য করেছিলেন। কবিত্বের ইজ্জত রাখবার জন্য "সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া একখানা বাঁধানো লেট্স্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।" নীলখাতায় "আঁকাবাঁকা লাইনে সরুমোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো" লেখা কবিতাগুলো আর পাওয়া যাবে না। লেট্স্ ডায়ারিতে কবিতা ফাঁদার সময় কবির বয়স বারো বছরের কিছু কম। সে খাতাও "জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ" করেছে। মনে হয় 'মালতী-পুঁথি' তৃতীয় খাতা এবং ভাগ্যক্রমে এটি রক্ষা পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ে' নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে স্থির করেছেন ১৮৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৮৮২ সাল, অর্থাৎ কবির তের-চোদ্দ থেকে কুড়ি-একুশ বৎসরের মধ্যে রচিত কবিতা, খণ্ডকাব্যের অংশ, গান, কিছু গদ্যরচনা, সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের অনুশীলন, পড়াশুনোর টুকিটাকি বিবরণ, দুটি-একটি হিজিবিজি লেখা, ইংরেজিতে নাম স্বাক্ষর, মানুষের মুখের রেখাচিত্র ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত 'ঘরের পড়া'র যুগ থেকে 'বউঠাকুরানীর হাট' প্রকাশের পূর্ব (১৮৮২) পর্যন্ত ন' বছর ধরে তাঁর রচনাকর্ম চলেছিল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ন' বছর ধরে তিনি শুধু একখানা খাতাতেই লেখেন নি, হয়তো এই সময়ে আরও অনেক লেখা অন্য কোনো খাতায় স্থান পেয়েছিল এই রকম দু-একখানি পাণ্ডুলিপি (যেমন 'ভগ্নহৃদয়') সংগৃহীত হয়েছে।

'মালতী-পুঁথি'তে পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে অনেক কবিতা ও গানের খসড়া পাওয়া যাবে। 'শৈশব সঙ্গীত' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১), 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কৌতুককবিতা ("বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে"), 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর 'উপহার' শীর্ষক কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবরত্নমালা'য় রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংস্কৃত ও মারাঠী থেকে বাংলা অনুবাদ, কুমারসম্ভবের খানিকটা অনুবাদ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত সারস্বত সমাজের কার্যবিবরণী, প্ল্যানচেটের ফলাফল ইত্যাদি নানা ধরণের রচনা 'মালতী-পুঁথি'তে স্থান পেয়েছে। কাব্য-কবিতাগুলির প্রাথমিক খসড়া হিসাবে কবি এই খাতায় কিছু

কিছু রচনা করেছিলেন। পরে তার খানিকটা পরিমার্জিত হয়ে সাময়িক পত্রে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনেক স্থানে প্রচুর কাটাকুটি রদবদল চোখে পড়বে। টীকায় সম্পাদক অতি নিপুণতার সঙ্গে এর পাঠ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তোলাপাঠ, কর্তিত পাঠ, বানান, যুক্তাক্ষর লেখার রীতি, দেবনাগরী হরফের ধারা প্রভৃতি নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন এবং সম্পাদকের নিবেদনে "তথ্যলতিকা"য় 'মালতী-পুঁথি'র রচনার সঙ্গে মুদ্রিত রচনার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য (রবীন্দ্রভবনের কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সহায়তায়) তিনি যে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনেও সে রকম তথ্যনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক সতর্কতা লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য আধুনিক পাণ্ডুলিপি সম্পাদনের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রবীন্দ্রগবেষণার নূতন পথ খুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পাণ্ডুলিপি এইভাবে সম্পাদিত হলে বাংলা সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'মালতী-পুঁথি'র পাণ্ডুলিপি-পরিচয় প্রসঙ্গে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য উপস্থাপিত করেছেন সুদৃঢ় ঐতিহাসিক বোধ ও তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে। সংশয়ের দ্বারকে তিনি স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তের দ্বারা অবরুদ্ধ করতে চান নি, আবার যেখানে তথ্য হয়েছে পথের দিশারী সেখানে তিনি অসংশয়চিত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পুঁথিটির বস্তুগত যাবতীয় তথ্য তিনি যেভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা করেছেন, তাতে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— এটি এই সংখ্যার অলংকারবিশেষ। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির নৈষ্ঠিক সাধক বিশী-মহাশয়ের এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্য-ধারার একটি অভিনব দিক আলোকিত হয়েছে। সম্পাদক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এতে বেশি প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তবে বিশেষজ্ঞের লেখা নূতন তত্ত্বভূয়িষ্ঠ ও মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে।" শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয়ের প্রবন্ধটি এই ধরণের রচনার আদর্শস্থানীয়। এতে তিনি প্রধানতঃ 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের তথ্যভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিহাস, পুরাণ ও মধ্যযুগের কাব্য-কাহিনী ও আখ্যান থেকে কবি উক্ত কাব্যসংগ্রহে যে সমস্ত তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তার শিল্পরূপের পশ্চাতে তথ্যাদির স্বরূপ, প্রভাব ও কবি কর্তৃক তথ্যাদির পরিমার্জনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে ধরণের আলোচনা স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র-গবেষণা-সাহিত্যে তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাণ, পাঠান-মুঘল-শিখ-রাজপুত ইতিহাসের আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করে তা কবিতায় গ্রহণ করেছেন, প্রয়োজনস্থলে নীরস স্থূল, অসঙ্গত ও সামঞ্জস্যহীন তথ্যকে তিনি শিল্পীর রসদৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্জিত করে নিয়েছেন। তথ্য ও শিল্পের সম্পর্ক ও পার্থক্যটি বিশী-মহাশয়ের প্রবন্ধে অতি নিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-গবেষণার অনেকটাই এত দিন রস ও শিল্পের আলোচনার ধারা ধরে চলছিল। কিন্তু শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ বস্তু বা তথ্য সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে শিল্পরসের যথার্থ মূল্য বোঝা যায় না। তাই সাহিত্যালোচনায় তথ্যের পরিমাপ করা অতি প্রয়োজন। কবিকৃত শিল্পরূপ এবং তার অন্তরালবর্তী তথ্যের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয় খুব চমৎকার করে কবিকৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন— "বস্তুতে আর কবিতায় মিলিয়ে পড়লে অনুভব করতে পারা যায় যে পরিবর্জন, পরিবর্ধন

ও পরিযোজন ছাড়াও আর-একটা প্রক্রিয়া চলেছে রচনার সময়ে। একটি সুকুমার, অনুশীলিত, সূক্ষ্ম-রুচিসম্পন্ন মন কবিতাগুলির উপরে দিব্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। এই মনটি অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী হয়েও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, বীভৎসা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও তথ্যনিষ্ঠ, আর সর্বোপরি পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান।"—পৃ. ২১৩। এই মানবপ্রকৃতির অন্তর-সত্যটি 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের মূল কথা। আর সেই সত্য দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের বস্তুভিত্তির উপর, সুতরাং কাব্যবিচারে তথ্য ও বস্তুকে ভুলে থাকা অনুচিত। তবু শ্রীযুক্ত বিশী-মহাশয়ের ভাষায়— "তাজমহলের রসের সাধনাকে ধারণ করে রয়েছে যে-সব পাথর সেগুলো নিশ্চয় এই বস্তুবিচারের মতোই কঠিন ও নীরস।"—পৃ. ২২১।

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'য় আর-একটি মূল্যবান তথ্যবহ প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে— শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা: কালানুক্রমিক সূচী'। এই তথ্যপঞ্জীতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'ভারতী' পত্রিকায় কবির প্রকাশিত যাবতীয় রচনার তালিকা দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে পৃথক গ্রন্থাকারে বা রচনাসংগ্রহের মধ্যে তার কি রূপান্তর হয়েছে, তারও উল্লেখ করেছেন। এই কারণে এই রচনাপঞ্জী ভবিষ্যৎ-গবেষকদের খুবই কাজে লাগবে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংযোজন

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা : মালতীপুঁথির কাটাপাঠ

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম হইল 'মালতীপুঁথি'। সম্প্রতি বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত বার্ষিক রবীন্দ্রানুশীলন পত্রিকা 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা'র প্রথম খণ্ডে এই পুঁথির একটি সম্পাদিত-রূপ প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রকাব্যসাধনার আদিপর্বের ইতিহাসের একটি দুর্লভ উপকরণ রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকসম্প্রদায় লাভ করিলেন। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার সম্পাদক এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন— উভয়েই পুঁথির মধ্যবর্তী কাটাকুটি অংশের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 'মালতীপুঁথি : পাণ্ডুলিপি পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; "নানাস্থানেই কাটাকুটি আছে প্রচুর পরিমাণে; সংশোধিত পাঠগুলি সবক্ষেত্রে যথাস্থানে লিখিত হয় নি, আশেপাশে নানাস্থানে ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত।" কবি প্রথমে কবিতার একটি ছত্র লিখিয়াছেন এবং পরে তাহা মনঃপূত না হওয়ায় কাটিয়া তোলাপাঠে পাশে বা নীচে সংশোধন করিয়াছেন। কোনো কোনো পুঁথির পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই কবি এমন কতকগুলি কবিতার ছত্র পরপর কাটিয়া দিয়াছেন যাহার কোনো সংশোধিত-রূপ পুঁথিতে নাই। আমাদের কৌতূহল মুখ্যত: মালতীপুঁথির ওই কাটা অংশের প্রতি। রবীন্দ্রগবেষকের নিকট মালতীপুঁথির মূল্য কাব্যগত নয়, উপাদানগত। আমাদের হাতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার নিদর্শন বেশি নাই। কবির 'নীলখাতা' বা 'লেট্‌স্ ডায়ারী' আমাদের হস্তগত হয় নাই। এমন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার দুর্লভ নিদর্শন হিসাবে মালতীপুঁথির কাটা

অংশের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া এই কাটাকুটি ও সংশোধন প্রণালীর মধ্যে কবির তৎকালীন মনের গতিপথটি অধিকতর স্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে। ছন্দ সম্পর্কে, শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে, ভাষা ও কাব্যরীতি সম্পর্কে মাত্র তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে কবি কতখানি সচেতন হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ মিলিবে কবির স্বলিখিত রচনার স্বহস্তকৃত সংশোধনের মধ্যে। আমরা এখানে মালতীপুঁথির সংশোধিত পাঠ নয়, কবি যে-পাঠ প্রথমে লিখিয়া মনঃপূত না হওয়ায় কাটিয়াছেন, সেই বর্জিত কাটা পাঠগুলিই পাণ্ডুলিপির মধ্য হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা 3/২ক

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা পৃষ্ঠা ২, ছত্র ১৮—‘কেমন আরামে যেত জীবন কাটিয়া’। পুঁথিতে কবি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, ‘বিজনে পোহায়ে যেত জীবন আমার’। তাহার পর ‘বিজনে পোহায়ে’ কাটিয়া তোলাপাঠে ‘কেমন আরামে’ লেখেন এবং ‘আমার’ কাটিয়া তাহার পাশে ‘কাটিয়া’ শব্দটি যোগ করেন।

পৃ. ৩, ছ. ১০—‘কেহই আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া !’। পুঁথি এইরূপ : যখন (লিখিয়া কাটা) কেহই (কাটা নয়) মোর ছিল না (লিখিয়া কাটা) আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া। (কাটা নয়)।

পৃ. ৩, ছ. ১৫—‘চিরকাল হৃদয়ে তা রহিবে মুদ্রিত’। পুঁথিতে কবি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, ‘চিরকাল হৃদয়ে তা রহিবেক গাঁথা’। তাহার পর ‘রহিবেক’এর ‘ক’ ও ‘গাঁথা’ কাটিয়া পাশে ‘মুদ্রিত’ শব্দটি যোগ করেন।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 4/২খ

পৃ ৫, ছ. ২—‘ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে’। কবি প্রথমে সম্ভবতঃ ‘পথিক সে ফিরে ফিরে চায়’ লিখিয়াছিলেন। পরে ‘পথিক সে ফিরে ফিরে’ অংশটুকু কাটিয়া কাটা অংশের বাম পাশে ‘ভীত পান্থ’ এবং ডান পাশে ‘চায়’এর পর ‘ফিরে ফিরে’ যোগ করেন।

পৃ. ৫, ছ. ৯—‘এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার’। ইহার পর পুঁথিতে পাঁচটি খণ্ডিত ছত্র আছে। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার সম্পাদক সম্পাদকীয় টীকায় এই ছত্র কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুঁথিতে এই কবিতারই আর-একটি রূপ পাইতেছি যাহা কবির মনঃপূত না হওয়ায় কাটিয়া দেন এবং সংশোধন করিয়া ‘এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার’ কবিতাটি রচনা করেন। আমরা এখানে পুঁথি হইতে কবিতার খসড়া অংশটি, যাহা কবি একবার লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছেন— নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

‘আয় আয় এই বুকে— এইখানে থাক্ সুখে
বাণবিদ্ধ হরিণী আমার !
যদিও সবাই তোরে— গিয়াছে গিয়াছে ছেড়ে
এইখানে নিবাস তোমার !
এখানে যে আছে হাসি, কোনকালে মেঘ আসি
পারিবে না করিতে আঁধার !
চিরজীবনের মত, তোর কাজে রবে রত,
এই হস্ত হৃদয় আমার !
কারে বলে প্রেম তবে, যদি তাহা নাহি রবে,’

পৃ. ৫, ছ. ২০—'কষ্টের জীবন' কবিতার প্রথম লাইনটি পুঁথিতে কাটা। লাইনটি এই: 'গভীর হৃদয়তলে আছে যত প্রাণের কথন'।

পৃ. ৬, ছ. ৫—'ভগন দর্পণ যথা ক্রমে [গো] যতই ভগ্ন হয়'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, 'ভগন দর্পণ যথা যত যায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া'। পরে 'যত যায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া' কাটিয়া কবি লেখেন, 'ক্রমে [গো] যতই ভগ্ন হয়'।

পৃ. ৬, ছ. ৮—'হোক না শীতল স্তব্ধ শত শত ভগ্ন চূর্ণ মন'। পুঁথিতে 'হইলে' কাটিয়া 'হোক না'। ইহার পর পুঁথিতে দুইটি চরণ লেখা ও কাটা। তাহা এই:

'রক্তহীন শান্তিহীন তবুও তাহারে
নিস্তব্ধ শোনিত হীন'

পৃ. ৬, ছ. ১৪—'সে বিষ বাঁচায়ে রাখে কোন ক্রমে ভগন হৃদয়'। ইহার পর পুঁথিতে 'জীবনের মৃত্যুময় শাখামাঝে করি বিচরণ' লেখা ও কাটা।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 5/৩ক

পৃ. ৭, ছ. ৪—'সুন্দরীর পদাঘাত না পাইতে তবু'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'সুন্দরী রমণীদের নূপুর শিঞ্জিত'। কবি ছত্রটি লিখিলেন বটে, কিন্তু পাঠ করিবার সময় ছন্দে আঘাত পাইলেন। ছন্দের খাতিরেই কবিকে ছত্রটি সংশোধন করিতে হইল।

পৃ. ৭, ছ. ৫—'ফুটিয়া উঠিল যত অশোকের ফুল'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'অমনি উঠিল ফুটি অশোকের ফুল'। পরে 'অমনি উঠিল ফুটি' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ফুটিয়া উঠিল যত' করেন। ইহার পর পুঁথিতে একটি ছত্র লেখা ও কাটা। তাহা এই: 'অমনি পল্লবজালে ছাইল পাদপ'।

পৃ. ৭, ছ. ১০—'ফুটিল, নাইক যাহে সুবাসের লেশ'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'ফুটিল, যদিও নাই সুবাস তাহাতে'। পরে 'ফুটিল', এই অংশটুকু রাখিয়া বাকি অংশ 'যদিও নাই সুবাস তাহাতে' কাটিয়া দেন এবং তোলাপাঠে 'নাইক যাহে সুবাসের লেশ' যোগ করেন।

পৃ. ৮, ছ. ১৪—'নমেরু তরুর ডালপালার আড়ালে'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'নমেরু গাছের ডাল লুকায়ে লুকায়ে'। পরে 'নমেরু' এই অংশটুকু রাখিয়া বাকি অংশ 'গাছের ডাল লুকায়ে লুকায়ে' কাটিয়া দেন এবং তোলাপাঠে 'তরুর ডালপালার আড়ালে' যোগ করেন।

পৃ. ৮, ছ. ১৫—'হেরিল মহাদেবের ধ্যানের প্রদেশ'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'শিবের সমাধিস্থান করিল দর্শন'। পরে ছত্রটি কাটিয়া খাতার ডানপাশে সংশোধিত চরণটি লেখেন।

পৃ. ৯, ছ. ১১—'থর থর কাঁপি খসি পড়িল ধনুক'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি লেখা ও কাটা:

'হেন কালে উমা করিলেন আগমন
বনদেবী আইলেন পশ্চাতে তাঁহার
হেরি সেই রূপরাশি আশ্বাস পাইয়া
মদন তুলিয়া নিল ধনুর্ব্বাণ তার—

জিনি পদ্মরাগ আভা অশোক কুসুম
কণক বরণ জিনি কর্ণিকার ফুল
মুক্তা কলাপের মত সিন্ধুবার মালা
বাসন্তী ফুলভূষণ করিছে মদন'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 6/৩খ

পৃ. ৯— পুঁথির পৃষ্ঠার গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটি লেখা ও কাটা :

'ওই ওই উড়ে গেল বিহঙ্গ আমার—
মনোদুঃখে বনবাসী দেখ হতভাগ্য
আমারে করিল বিধি…'

পুঁথিতে ইহার পরে লাইন 'স্তনভারে আনমিত সুকুমার কায়' লেখা এবং পরে 'আনমিত সুকুমার কায়' অংশটুকু কাটিয়া তোলাপাঠে 'নতকায় ঈষৎ অমনি' যোগ করা হয়। অর্থাৎ সংশোধিত চরণটি হইল এইরূপ : 'স্তনভারে নতকায় ঈষৎ অমনি'।

পৃ. ১০, ছ. ৬— 'রতিপতি বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'মদন হৃদয়ে নিজ বাঁধিল সাহস'। পরে 'মদন হৃদয়ে নিজ' অংশটুকু কাটিয়া তোলাপাঠে 'রতিপতি বক্ষে নিজ' যোগ করা হয়।

পৃ. ১১, ছ. ৬— 'দিগন্তে করিল দেব ত্রিনয়ন-পাত'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'দিশে দিশে করিলেন ত্রিনয়ন-পাত'। পরে 'দিশে দিশে করিলেন' কাটিয়া তাহার স্থানে তোলাপাঠে 'দিগন্তে করিল দেব' যোগ করা হয়।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 9/৫ক

পৃ. ১৮, ছ. ৩— 'প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'প্রেমে মগ্ন মন মোর বলিত অমনি' পরে 'অমনি' কাটিয়া পাশে 'তখন' শব্দটি বসান। কিন্তু এই সংশোধন কবির মনঃপূত হয় না। শেষে 'বলিত অমনি তখন' এই তিনটি শব্দ একসঙ্গে কাটিয়া তাহার স্থানে তোলাপাঠে লেখেন, 'বলে গো আমায়'। অর্থাৎ সংশোধিত রূপটি দাঁড়াইল এই: 'প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়'।

পৃ. ১৮, ছ. ১১— 'সে ভূলে উজলি উঠে নয়ন আমার'। পুঁথিতে কবি প্রথমে, 'সে ভূলে নয়ন মোর উঠিত জ'— এই পর্যন্ত লেখেন। পুঁথিতে দেখা যাইতেছে শেষের জ অক্ষরটি সম্পূর্ণ লেখা হয় নাই। কবির প্রথমে 'জ্বলিয়া' লিখিবার অভিপ্রায় ছিল মনে হয়। কিন্তু লিখিতে লিখিতেই মত বদলায়, 'জ্বলিয়া'র স্থলে 'উজলি' অধিকতর উপযোগী হইবে মনে করেন। তাই জ পর্যন্ত লিখিয়া ব-ফলা লাগাইবার পূর্বেই কাটিয়া দিয়া 'উজলি' লেখেন। 'জ্বলিয়া'র বদলে 'উজলি' হইল বটে কিন্তু ইতিমধ্যে কবির মনে সমস্ত লাইনটারই ছক বদলাইয়া গেল। 'সে ভূলে নয়ন মোর উঠিত উজলি' পছন্দ হইল না। সংশোধন করিয়া লিখিলেন, 'সে ভূলে উজলি উঠে নয়ন আমার'। 'নয়ন মোর উঠিত' কাটা এবং 'নয়ন আমার' ডাহিনে তোলাপাঠে বসানো হইয়াছে।

পৃ. ১৯, ছ. ১৩— 'সুকোমল ম্লানভাব কপোলে তাহার'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'মলিন

বিবর্ণ হাসি কপোলে তাহার'। পরে 'মলিন বিবর্ণ হাসি' কাটিয়া তাহার স্থানে তোলাপাঠে 'সুকোমল ম্লানভাব' যোগ করেন।

পৃ. ১৯, ছ. ১৪— 'ঢাকিল সে হাসি তার ক্ষুদ্র মেঘ যথা'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'শরত মেঘের মত ঢাকিল সে হাসি'। পরে সম্পূর্ণ ছত্রটি কাটিয়া তোলাপাঠে সংশোধিত রূপ 'ঢাকিল সে হাসি তার ক্ষুদ্র মেঘ যথা' লেখেন।

পৃ. ২০, ছ. ২— 'রবি অস্তাচলগামী পড়িছে ঢলিয়া'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'অস্তগামী দিবাকর পড়িছে ঢলিয়া'। পরে 'অস্ত'র আগে তোলাপাঠে 'রবি' বসান এবং 'অস্ত' ও 'গামী'র মাঝে তোলাপাঠে 'চল' বসাইয়া 'দিবাকর' শব্দটি কাটিয়া দেন। পুঁথিতে 'অস্তাচল' করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 10/৫খ

পৃ. ২০— পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার গোড়ায় অনেকগুলি কবিতার ছত্র লেখা ও কাটা। কবি-কর্তৃক বর্জিত কবিতার এই ছত্রগুলি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (পৃ. ২৮২) উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

পৃ. ২০, ছ. ১৬— 'তখন কৃষক হল লোয়ে স্কন্ধোপরি'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'কৃষক লাঙ্গল তার লোয়ে স্কন্ধোপরি'। পরে 'কৃষক'এর আগে 'তখন' এবং 'লাঙ্গল তার' কাটিয়া তোলাপাঠে 'হল' যোগ করেন।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 14/৭খ

পৃ. ৩০, ছ. ২২— 'দেখি দেখি কচি হাসি মুখানি তোলো'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'দেখি দেখি আধমুখে মুখানি তোলো'। পরে 'আধমুখে' কাটিয়া তোলাপাঠে 'কচি হাসি' বসান।

পৃ. ৩১, ছ. ৬— 'তৃষিত মনের আশা পুরাবি কি লো'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'তৃষিত নয়নে চেয়ে আছি ললনা'। পরে সম্পূর্ণ লাইনটি কাটিয়া নীচে সংশোধিত নূতন ছত্র রচনা করেন।

পৃ. ৩১, ছ. ৮— 'আঁখি মেল লো'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্‌ধৃত অংশটি লেখা ও উপর হইতে নীচ পর্যন্ত তিন-চারিটি লাইন টানিয়া ছত্র কয়টি কাটা :

'এত ক'রে (শুধু) তোরে সাধিলাম,
(তবুও কি) একটি কথাও তবু কহিতে কি নাই ?
কমল নয়ন দুটি (নত কেন লো) ফুটে ফুটে না
পূর্ণিমা জোছনা সম ওই মুখানি
সরমের মেঘবালা ছুটিবে কি লো'

বন্ধনী অংশগুলি কবি লিখিবার সময়ই কাটিয়াছিলেন।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 15/৮ক

পৃ. ২৯, ছ. ৮— 'ফুল বলে "এই লও লও"'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'ফুল বলে "মন লয়ে যাও"'। পরে পূর্ব-পংক্তি 'মধু দাও দাও' এর সঙ্গে মিলকে অধিকতর স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য 'মন লয়ে যাও' কাটিয়া 'এই লও লও' যোগ করেন।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 16/৮খ

পৃ. ২৯, ছ. ১২— 'যাহা আছে সব ল'য়ে যাও'। ইহার পর পুঁথিতে একটি ছত্র লেখা ও কাটা। তাহা এই : 'একি হর্ষ— হর্ষ আজি তার'।

পৃ. ২৯, ছ. ১৩— 'হরষ ধরে না তা'র চিতে'। পুঁথিতে কবি প্রথমে 'আনন্দ ধরে না তার চিতে' লেখেন। একটি লাইন পূর্বেই 'আনন্দ' শব্দটি একবার ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কবি বর্তমান ছত্রের গোড়ায় 'আনন্দ' কাটিয়া 'হরষ' শব্দ যোগ করেন।

পাণ্ডুলিপি 17/৯ক

পৃ. ২৬, ছ. ৮-১১—

'না উঠিতে শয্যা হোতে,
মিলি দলবলগুলা সাথে
করতাল বাজাইতে,
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।'

পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন :

'না উঠিতে উঠিতেই,
বিছানা হইতে অতি ভোরে
খর তাল বাজাইয়া,
কান দেয় ঝালাপালা কোরে।'

কিন্তু এই ছত্র কয়টি কবির মনঃপূত না হওয়ায় ইহা কাটিয়া তিনি পুনরায় সংশোধিত নূতন ছত্র রচনা করেন।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 19/১০ক

পৃ. ৩১, ছ. ১৩— 'উপায় নাইক আর এ তরঙ্গ হোতে'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'ফিরিতে না পাই পথ এ তরঙ্গ হোতে'। পরে 'ফিরিতে না পাই পথ' কাটিয়া তাহার স্থানে তোলাপাঠে 'উপায় নাইক আর' যোগ করেন।

পৃ. ৩২, ছ. ১৬— 'ভাঙ্গিয়া পড়িবে ঊর্মি সুধীরে চরণ তলে'। ইহার পর পুঁথিতে একটি চরণ লেখা ও কাটা। ছত্রটি এই : 'জলদের পটে লেখা সায়াহ্ন কিরণ রেখা'।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 19/১০খ

পৃ. ৩২, ছ. ২৩— 'দূরে থেকে কাছে থাক, আপনি হৃদয় তাহা'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'দূরে থেকে স্নেহ কর কি করে হৃদয় মোর'। পরে সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ চলিতে শুরু করে। 'স্নেহ কর' কাটিয়া তোলাপাঠে লিখিলেন, 'ভালবাস'। কিন্তু এই নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া কবি দেখিলেন পূর্বের লাইনেও 'ভালবাস' একবার ব্যবহার করা হইয়াছে। কাছাকাছি এক শব্দের দুইবার ব্যবহার শ্রুতিমধুর নয়। তাই কবি 'দূরে থেকে ভালবাস' এই সম্পূর্ণ অংশটি কাটিয়া নূতন করিয়া পুঁথির বাম দিকের কোনে লিখিলেন, 'দূরে থেকে কাছে থাক'। ইহার পর 'কি করে হৃদয় মোর' অংশে সংশোধনে হাত দিলেন। 'কি করে' কাটিয়া তোলাপাঠে 'আপনি' এবং 'মোর' কাটিয়া তোলাপাঠে

'তাহা' বসাইলেন। 'হৃদয়' শব্দটি পূর্ববৎ রহিল। অর্থাৎ সংশোধিত রূপ দাঁড়াইল: 'দূরে থেকে কাছে থাক আপনি হৃদয় তাহা'।

পৃ. ৩৩, ছ. ৯— 'উষার কিরণ সম নীরবে বিমল হাসি'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'উষার কিরণ সম নীরবে স্নেহের হাসি'। পরে 'উষার' স্থানে 'প্রভাত' হইলে কেমন হয় দেখিবার জন্য 'উষার' না কাটিয়া তাহার মাথায় 'প্রভাত' শব্দটি বসান। কিন্তু তাহা মনঃপূত না হওয়ায় 'প্রভাত' কাটিয়া দেন। 'স্নেহের' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বিমল' করা হয়।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 24/১৩খ

পৃ. ৪১, ছ. ১৭— 'নিরদয় রবি অব কাহতু আয়লি'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'নিঠুর উষা অব কাহতু আয়লি'। পরে 'নিঠুর উষা' কাটিয়া তোলাপাঠে 'নিরদয় রবি' যোগ করা হয়।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 25/১৪ক

পৃ. ৪২, ছ. ৭— 'নাইক এমন স্তব্ধ হরিত কবর'। পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন, 'এ হেন নিস্তব্ধ মোর'। পরে 'এ'র পূর্বে 'নাইক' বসান, 'হেন' কাটিয়া তোলাপাঠে 'মন' বসান, 'নিস্তব্ধ'র 'নি' কাটিয়া 'স্তব্ধ' করেন এবং পরের 'মোর' শব্দটি সম্পূর্ণ কাটিয়া বাদ দেন। ফলে সংশোধিত নূতন পাঠটি দাঁড়ায়, 'নাইক এমন স্তব্ধ'। এই ছত্রটির পর পুঁথিতে দুইটি লাইন লেখা ও কাটা। তাহা এই:

'কোথাও নাইক আর যেইখানে মোর
পৃথিবীর দুখো শোকে পরিশ্রান্ত দেহ'

এই কাটা লাইন দুইটিরই সংশোধিত রূপ:

'যেখানে আমার এই পরিশ্রান্ত দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 31/১৭ক

পৃ. ৪৭—পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত চারিটি ছত্র লেখা ও কাটা:

'সুচারু রজনী মেঘের আঁচল
চাপিয়া অধরে মেঘের শশি,
বিমল জোছনা সলিলে মজিয়া
আঁধার মুছিয়া ফেলেছে নিশি!'

এই কয়টি ছত্র কবি পুনরায় কবিতায় কাজে লাগান। কিন্তু গোড়ায় নয়, কবিতার মাঝে।

পৃ. ৪৭, শেষ ছত্র— 'লুকানো মরম-ব্যথা'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত চারিটি ছত্র লেখা ও কাটা:

'সুচারু রজনী হাসি ধারা ঢালি
চাঁদের জ্যোছনা উথলি যায়,
উথলি উঠিছে যমুনা লহরী
উথলি বহিছে মলয় বায়।'

পৃ. ৪৯, ছ. ১৩— 'ততই সে দুখ সহে'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত চারিটি ছত্র লেখা ও কাটা:

যাক সখা যাক অতীত কালের
সমাধি মাঝারে আছে যা গাঁথা
আজিকার এই সুখের নিশীথে
কি হবে তুলিয়া সে সব কথা!'

পৃ. ৫০, ছ. ২০— 'কাটাইব সারাক্ষণ'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র লেখা ও কাটা :

'সুখের শয়নে দুজনে মিলিয়া
সুখের স্বপন দেখিব।'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 38/২০খ

পৃ. ৬৬— পুঁথির পৃষ্ঠার গোড়ায় কয়েকটি ছত্র অস্পষ্ট ও ঈষৎ অবলুপ্ত। যতখানি পাঠযোগ্য তাহা উদ্ধৃত হইল :

'... কারাগার ঘেরিয়া চৌদিকে,
... গ্নিকুণ্ড সম জ্বলদগ্নিময়,
... সে অনলের নাহিক আলোক
[বাজাও] রাখাল তব সরস বাঁশরী
[গাও গো] মনের সাধে প্রমোদের গান,
[পাখীরা] মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত
[কানন] ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু
[উপত্য] কা ময় ফুটিয়াছে ফুল
[তখন] তোদের আর কিসের ভাবনা?
[দেখি] চির হাস্যময় প্রকৃতির মুখ'

এই দশ লাইনের মধ্যে কবি-কর্তৃক প্রথম তিনটি লাইন কাটা। পরবর্তী ছত্রগুলি 'কবিকাহিনী'তে আছে। রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 39/২১ক

পৃ. ৬৬— পুঁথির পৃষ্ঠার গোড়ার কয়েকটি ছত্র কবি-কর্তৃক কাটা। পুঁথিতে এই কাটা ছত্রগুলির বামদিকের কিছু অংশ অবলুপ্ত :

'... আর ভাবনা চিন্তার জ্বালায়
... সহিতে আর সংসারের কোলাহল
... বার, ঘুমাইতে দাও মোরে,
... হৃদয় মাঝে ঢালি বিরামের জল।'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 43/২৩ক

পৃ. ৭১, ছ. ৩— 'পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে'। ইহার পর পুঁথিতে কয়েকটি ছত্র লেখা ও কাটা। তাহার মধ্যে দুইটি মাত্র ছত্রের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কর যাইতেছে। তাহা এই :

'ঘুরিছে নয়ন দুটি পুষ্পমদভরে
কিন্নরীরা গীত গান করি মাঝে মাঝে'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 44/২৩খ

পৃ. ৭১— পুঁথির পৃষ্ঠার গোড়ায় কয়েকটি ছত্র লেখা ও লম্বালম্বি একটি লাইন টানিয়া অংশটি কাটা :

'[উ]ঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রমজল লাগি
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্পমদভরে
সেই অবসরটিতে কিন্নর রসিয়া
সে তার বদনখানি চুম্বে ঘন ঘন'

কাটা অংশের বিস্তারিত পরিচয় : ২য় ছত্রে কবি প্রথমে লেখেন, 'ঘুরিছে নয়ন দুটি', পরে 'নয়ন দুটি' কাটিয়া তোলাপাঠে 'আঁখি যখন' বসান। ৩য় ছত্রের পর একটি লাইন লিখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাটা হয়। তাহা এই : 'প্রিয়ার সে মুখখানি চুম্বিছে সঘনে'। এই ছত্রটি পছন্দ না হওয়ায় কবি ইহা কাটিয়া একটি নূতন চরণ রচনা করেন। এই নূতন ছত্রটি কবি প্রথমে এইভাবে লেখেন, 'সে তাহার মুখখানি চুম্বে ঘন ঘন'। পরে 'তাহার'এর 'হার' কাটিয়া তোলাপাঠে 'র' বসান এবং 'মুখখানি'র 'মুখ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বদন' যোগ করেন। অর্থাৎ ছত্রটি দাঁড়াইল, 'সে তার বদনখানি চুম্বে ঘন ঘন'। এই কাটা চারিটি ছত্র কবি তাঁহার কবিতার মধ্যে আবার কাজে লাগান নূতন দুই ছত্র রচনার পর। পূর্বের কাটা চারি ছত্রের মধ্যে নূতন ব্যবহারের সময় প্রথম তিন ছত্রের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু চতুর্থ চরণটির ক্ষেত্রে বোঝা যায় কবি কিছুতেই খুশি হইতে পারিতেছেন না। কবি লিখিলেন, 'সে বিধুবদনখানি চুম্বিছে সঘনে'। কিন্তু পছন্দ হইল না। ফলে লাইনটি কাটিয়া নীচে লিখিলেন, 'সে তার বিধুবদন'। লাইন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই কবি কলম বন্ধ করিলেন। ইহাও মনোমত হইতেছে না। 'তার' কাটিয়া 'তাহার' করিলেন এবং 'বিধুবদন'এর 'বদন' কাটিয়া পাশে যোগ করিলেন, 'মুখ চুম্বে ঘন ঘন'। অর্থাৎ ছত্রটি দাঁড়াইল, 'সে তাহার বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন'। একটিছত্র এতবার কাটাকুটি ও সংশোধন করিয়াও কবির মনঃপূত হইল না। এই ছত্রটিও কাটিলেন এবং সর্বশেষ লিখিলেন, 'প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন'।

পাণ্ডুলিপি পৃ. 55/২৯ক

পৃ. ৮২, ছ. ২১— 'নহে তা কি খরধারে বিঁধিবার মানসে ?' ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র লেখা ও কাটা :

'নলিনী হৃদয় পানে দেখ দেখি তাকায়ে
মনে তার নিশি দিবা ব্যথা'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 61/৩২ক

পৃ. ৯৮, ছ. ৭— 'শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্র দুইটি লেখা ও কাটা :

'যত অশ্রু বরষেছি এই দুই দিন
যত হাসি হাসিয়াছি এই দুই দিন'

পৃ. ৯৮, ছ. ১৯— 'সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্র দুইটি লেখা ও কাটা :

'শত মেঘস্তর ভেদি সূর্য্যকর রেখা
ঈষৎ আভাসমাত্র যায় যথা দেখা'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 63/৩৩ক

পৃ. ১০৪, ছ. ১৫-১৬—

'ক্ষম গো আমারে কুটীর স্বামী—
বিরাম আলয় চাইনা আমি'

পুঁথিতে কবি প্রথমে লেখেন :

'ক্ষম গো আমারে বিরাম আলয়
চাইনে কুটীর স্বামী'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 64/৩৩খ

পৃ. ১০৭, ছ. ২২— 'জনকের উপছায়া'। পুঁথিতে ইহার পরের লাইনে কবি প্রথমে লেখেন, 'তারকার মত জ্বলিছে নয়ন'। পরে কাটিয়া ডান পাশে নূতন করিয়া ছোট হরফে লেখেন, 'আগুনের মত আঁখি দু'টা জলে'। শৈশব সঙ্গীত গ্রন্থের পাঠ, 'আগুনের মত জলে দু-নয়ন'। (অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শৈশব সঙ্গীতের অন্তর্গত 'প্রতিশোধ' কবিতা দ্রষ্টব্য)

পাণ্ডুলিপি পৃ. 65/৩৪ক

পৃ. ১০৮, ছ. ১৬— 'সে ছুরি ধরিল তুলি'। ইহার পর পুঁথিতে একটি ছত্র লেখা ও কাটা। তাহা এই : 'থর থর থর কাঁপিতেছে হাত'।

পৃ. ১০৯, ছ. ৬— 'এসব কিসের লাগি'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্র দুইটি লেখা ও কাটা :

'তখন কুমার কহিলা গম্ভীরে
চাহি প্রতাপের পানে'

সংশোধিত রূপ :

'কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে'

পাণ্ডুলিপি পৃ. 69/৩৬ক

পৃ. ১১৮, ছ. ২— 'কত দিন শুনি নাই ও পুরানো তান'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্রটি লেখা ও কাটা : 'নির্ঝরের ঝরঝরে— নদীর অস্ফুট স্বরে'। ইহার পর কবি লেখেন, 'কখনো কখনো যবে একাকী নিশীথে'। পরে 'একাকী' কাটিয়া তাহার স্থানে তোলাপাঠে 'নীরব' বসান।

পৃ. ১১৮, ছ. ১৬— 'যেই গান এক সনে— গাহিতাম দুইজনে'। ইহার পর পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্রটি লেখা ও কাটা : 'সেই গানে ছিল পূর্ণ দুজনের প্রাণ'।

বর্জিত পাঠ যা উল্লিখিত হইল তাহা যে একেবারে নীরন্ধ্র হইয়াছে এমন দাবি করা যায় না। দুই-চারিটি কাটা শব্দ উল্লেখযোগ্য নয় বলিয়া মনে হইয়াছে, তাই সেগুলি উদ্ধৃত হইল না। আবার, এমন

শব্দ এবং ছত্রও অনেক আছে সেগুলির পাঠোদ্ধার করা গেল না। আশা করি ভবিষ্যতে সেগুলিও উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

গান্ধীজীবন। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য। শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস্‌, কলিকাতা ১২। মূল্য পনের টাকা।

শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় 'গান্ধীজীবন'এর মাধ্যমে ৫৪০ পৃষ্ঠায় যে কাব্যরস পরিবেশন করলেন তাতে তিনি শুধু একটি মহৎচরিত্রকেই রূপায়িত করেন নি, এপিক্‌ধর্মী সাহিত্যকেও উজ্জীবিত করার প্রয়াস করেছেন। অনেকেই মনে করেন যে সাহিত্যে এপিকের স্থান আজ ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। আজকের যুগে মহাকাব্যের দিন ফুরিয়েছে—দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী, দীর্ঘ বরষমাস নেই, গতির যুগে বিরামবিহীন প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব চলেছে। আর্থারের কাহিনী, ইউলিসিসের গল্প, রামরাবণের যুদ্ধ, পঞ্চপাণ্ডবের বীরত্ব, গান্ধীজির কথা, সবই মহৎ চরিত্রকে ঘিরে। আজকের দিন সাধারণ মানুষের দিন, অসাধারণ যাঁরা তাঁরা নমস্য, কিন্তু তাঁদের নিয়ে কাব্যগল্প, আদর্শগত বিচারবিশ্লেষণ সমাজজীবনের পরিস্ফুটতা প্রকাশ করে না—এখন আর রসিয়ে জড়িয়ে শুয়ে বসে মহাকাব্যের কল্পনাবিলাস চলে না। চলে না এ কথা হয় তো সত্য, কারণ সে মন নেই, মনন নেই ; কালীপদবাবুর প্রচেষ্টা তাই প্রশংসনীয়।

একটি বৃহৎপরিসর কাব্যে, ভাব ও ভাষার সমবায়ে ছন্দের সাবলীল গতি দু-এক জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে কাব্যের অন্তর্নিহিত সুর বাধাপ্রাপ্ত হয় নি এইটেই বড় কথা, তার কারণ কবির সরল আন্তরিকতা ও যে মহৎ জীবনের মহদাশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছেন তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব।

মানুষের আন্তরজীবনে ক্ষণে-ক্ষণে যে বিপ্লব ঘটে, দিনে-দিনে যে রূপান্তর হয়, মনে-মনে যে নূতনের আভাস আসে তার সম্পূর্ণ পরিচয় কোনো কবি-শিল্পী-চিত্রকরই প্রকাশ করতে পারেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কালীপদবাবু সেই সহজ অথচ দুরূহ কাজটিই করছেন। গান্ধীজীবনী খণ্ডকালের সীমাকে ছাড়িয়ে মহাকালের অসীমত্ব স্পর্শ যে করেছে সেই খবরটিই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক, তাঁর 'গান্ধীজীবন' কাব্যে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বী কৃ তি

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রঙিন চিত্র শ্রীরামকুমার কেজরিওয়ালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র রবীন্দ্রভারতী সমিতির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্বরলিপি

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন-হাতে
সূর্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে ॥
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে ॥
কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্মবাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি— সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম তখন বীণার মতন বাজবে মধুর মূর্ছনাতে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন

II সা সদা দা । দা দা দা I দা দা দা । দপা পা -া I
তো মা র হা তে র রা খী খা নি• বাঁ •

I পা -ণা -া । -দা -া -া I পা মপা জ্ঞা । পা মপা জ্ঞা I
ধো • • • • • আ মা র দ খি ন

I জ্ঞমা জ্ঞা -া । -জ্ঞঋা -সা -া I ণর্সা -ণা র্সা । র্সঋা র্সা -া I
হা• তে • • • • সূ র্ য যে• ম ন্

I র্সঋা র্সা -া । র্সঋা র্সা র্সণা I ণা -া ণা । ণা -া ণদা I
ধ• রা র্ ক• রে আ• লো ক্ রা খী • জ•

I ণদা -া দপা । পা -া -মা I -পা -া -মা । -ণা -া -া II
ড়া য়্ প্রা• তে • • • • • • • •

II { দা দা -া । ণা র্সা -া I র্সঋা ঋা -র্সা । না র্সা -া I
তো মা র্ আ শী স্ আ মা র্ কা জে •

I দা দা -র্জ্জা । র্জ্জর্রা র্জ্জা -া I র্জ্জা -র্রর্জ্জা র্জ্জা । র্জ্জঋর্সা র্সা -া } I
স ফ ল্ হ॰ বে ॰ বি ॰শ্ শ মা ঝে ॰

I র্সা -র্জ্জা র্জ্জর্ঋা । র্জ্জর্ঋা র্ঋা -র্সা I র্সর্ঋা -া র্সা । র্সর্ঋা র্সা র্সণা I
জ ল্ বে॰ তো মা র্ দী॰ প্ ত শি॰ খা আ॰

I ণা -া ণদা । ণদা -া দপা I পা -া পদা । মপা -া -জ্ঞা I
মা র্ স॰ ক ল্ বে॰ দ ॰ না॰ তে॰ ॰ ॰

I -পা -া -জ্ঞা । -ণা -া -া II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

II সা -া ঋা^২ । মা মা -পা I পা পা -া । পা পা -া I
ক র্ ম ক রি ॰ যে হা ত্ ল য়ে ॰

I পা -দা দা । দা দা -পণা I ণা ণদা^২ -ণা । ণদা^প পা -া I
ক র্ ম বাঁ ধ ॰ন্ তা রে॰ ॰ বাঁ ধে ॰

I ণর্সা র্সা -া । র্সর্ঋা ণর্সা -ণা I ণা ণা -দা । দা ণদা -পা I
ফ লে র্ আ॰ শা ॰ শি ক ল্ হ য়ে ॰

I মপা মপা জ্ঞা । জ্ঞপা ণদা -পা I মা জ্ঞঋা^২ -জ্ঞা । ঋা সা -া I
জ॰ ড়ি য়ে ধ॰ রে॰ ॰ জ টি॰ ল্ ফাঁ দে ॰

I { দা দা -া । ণা র্সা -া I র্সর্ঋা র্সা -া । না র্সা -া I
তো মা র্ রা খী ॰ বাঁ ধো ॰ আঁ টি ॰

I দা দা -জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞর্রা -জ্ঞা । জ্ঞর্ঋা র্সা -া } I
স ক ল্ বাঁ॰ ধ ন্ যা বে॰ ॰ কা টি ॰

I র্সা -জ্ঞা জ্ঞর্ঋা । জ্ঞর্ঋা জ্ঞর্ঋা -র্সা I র্সর্ঋা র্সা -া । র্সণা ণা -া I
ক র্ ম॰ ত খ ন্ বী॰ ণা র্ ম॰ ত ন্

I ণপা -া পণা । ণদা ণদা -পা I মপা -া পদা । মপা জ্ঞা -া I
বা॰ জ্ বে॰ ম॰ ধু র্ মূ॰ র্ ছ॰ না॰ তে ॰

I -ণা -া -া । -া -া -া II II
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১ মূল-গীতরূপ: I পা -পা -দা I পা মপা জ্ঞা I... দাদরা তালে মেলাবার জন্য স্বরলিপিতে তিন মাত্রা বাড়ানো হয়েছে।
খো ॰ ॰ আ মা র

সম্পাদকের নিবেদন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে যখন চেষ্টা চলেছে তখন রোমা রোলাঁ পৃথিবীর এই দুইটি প্রান্তের মিলনের সেতু রূপে নিজেকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মনের এই বিপুলতাই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের নিবিড়-সান্নিধ্যে এনেছিল। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও রোমা রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪) উভয়ে প্রায়-সমবয়সী। সমবয়সীর কাছে সম্মান পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এ দিক থেকে উভয়েই ছিলেন সমান ভাগ্যবান।

ভারতবর্ষের প্রতি রোলাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তিনি বলেছেন I find her deep inside me। ভারতবর্ষকে আত্মীয়-রূপে গ্রহণ ক'রে তিনি আমাদের নিবিড়-নিকটে এসেছেন।

আমরা তাঁর জন্মশতবার্ষিক-উৎসবে যোগদান করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত।

রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোলাঁ প্রসঙ্গ ছাড়াও বর্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে কয়েকটি রচনা প্রকাশ করা হল। এই বৎসর শ্রীনিকেতনের সাংবাৎসরিক উৎসবে শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের ভাষণ 'শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী' নামে এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস/শ্রীসুশীল রায়

দ্বাবিংশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৭২-আষাঢ় ১৩৭৩ · ১৮৮৭-৮ শক

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

২. প্রকাশের সময়-ব্যবধান : ত্রৈমাসিক

৩. মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় (ভারতীয়)
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

৪. প্রকাশক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৫. সম্পাদক : শ্রীসুশীল রায় (ভারতীয়)
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

৬. স্বত্বাধিকারী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ শান্তিনিকেতন। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ

আমি, শ্রীসুশীল রায়, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উল্লিখিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাঃ সুশীল রায়

১ মার্চ ১৯৬৬

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

Regd. No. R. N. 2700/57

প্রকাশক শ্রীসুনীল রায় • বিশ্বভারতী • ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন • কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় • শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড • ৫ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৯
চিত্র ও মলাট মুদ্রক • রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট • ৭/১ বিধান সরণী • কলিকাতা ৬